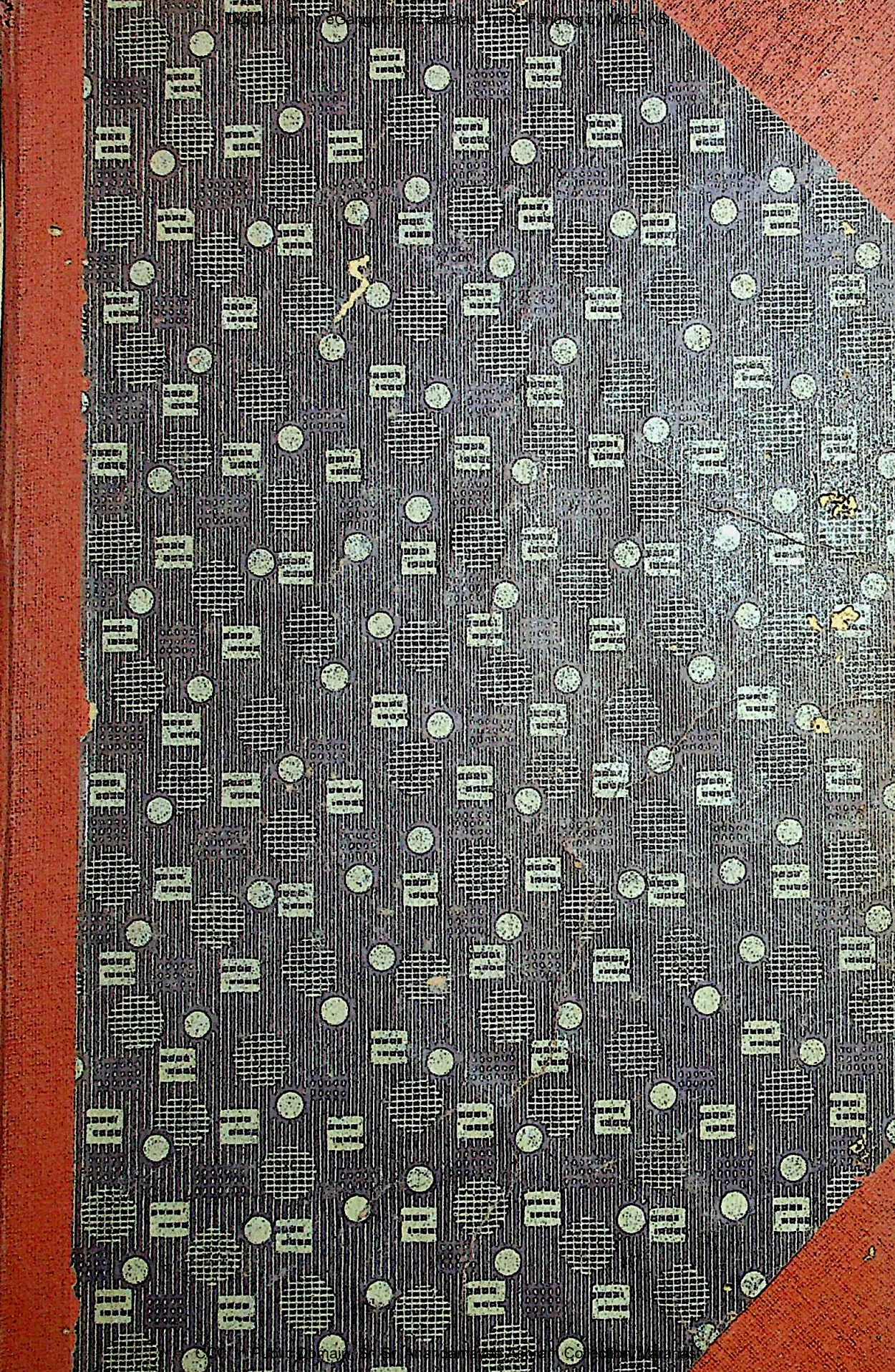
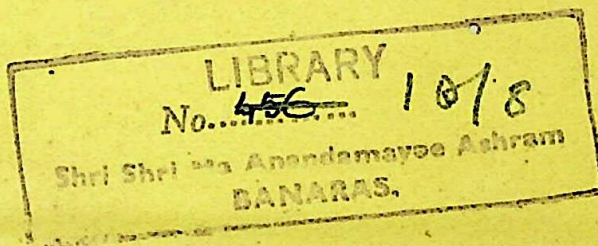




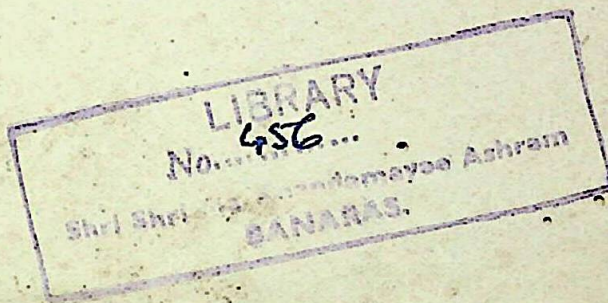
N-B-1

10/8



রবীন্দ্র-রচনাবলী

১৫ খণ্ড



LIBRARY

No...456....

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

Please return on or
before date mentioned
below.

Fine for overdue book
ten N.P. daily

28.3.74

10.12.76

20.1.78

12.5.78

10/8

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

বিশ্বনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী

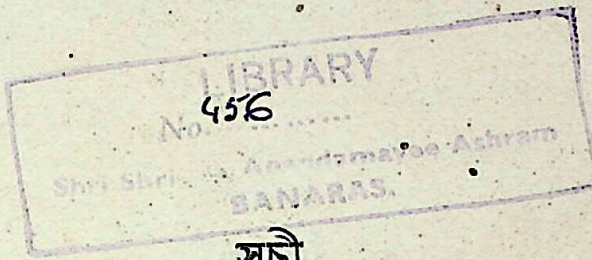
২ বঙ্কিম চাট্টোজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ	আশ্বিন, ১৩৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ	চৈত্র, ১৩৪৬
তৃতীয় সংস্করণ	চৈত্র, ১৩৪৭
চতুর্থ সংস্করণ	আশ্বিন, ১৩৪৯
পঞ্চম সংস্করণ	বৈশাখ, ১৩৫২

মূল্য ৫/-, ৭/- ও ৮/-

মুদ্রাকর শ্রীহর্ষনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কনওআলিস স্ট্রিট, কলিকাতা

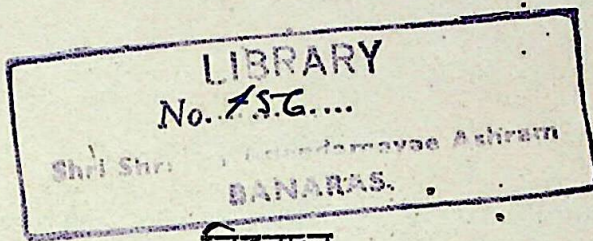
Esha
620

সূচী

চিত্রসূচী	১৮০
নিবেদন	১৮০
ভূমিকা	১৮০
প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞপ্তি	৫৮০
অবতরণিকা	১৮০
কবিতা ও গান	
সন্ধ্যাসংগীত	১
প্রভাতসংগীত	৫১
ছবি ও গান	১০৫
নাটক ও প্রহসন	
প্রকৃতির প্রতিশোধ	১৬৩
বাল্মীকি-প্রতিভা	২০৭
মায়ার খেলা	২৩১
রাজা ও রানী	২৬১
উপন্যাস ও গল্প	
বউ-ঠাকুরানীর হাট	৩৭৩
প্রবন্ধ	
যুরোপ-প্রবাসীর পত্র	৫৩১
যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি	৫৮৭
গ্রন্থপরিচয়	৬২৫
বর্ণানুক্রমিক সূচী	৬৩৭

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ	১
বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ	২০৮
বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয়	২১৬
ভগ্নহৃদয়ের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা	২৫৬
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহধর্মিণী	৩৬০
বিলাতে রবীন্দ্রনাথ	৫৩৬



নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনার একটি নূতন সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের আয়োজন হইল। প্রত্যেক খণ্ডে চারিটি ভাগ থাকিবে— (১) কবিতা ও গান (২) নাটক ও প্রহসন (৩) উপন্যাস ও গল্প (৪) প্রবন্ধ। রচনাগুলি যথাসম্ভব গ্রন্থপ্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে মুদ্রিত হইবে।

এইখানে একটি কথা উল্লেখ প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কবির অনেক রচনা কোনো পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। সেই সকল রচনা সংগৃহীত হইতেছে, সর্বশেষ খণ্ডে সেগুলি সন্নিবিষ্ট হইবে। প্রকাশকাল অনুসারে সেগুলি যথাস্থানে যোজনা করা এখন আর সম্ভব হইল না।

আর একটি কথা কবি তাঁহার ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রথম-বয়সের অনেক রচনা অত্যন্ত অপরিণত বলিয়া বর্জন করিতে ইচ্ছা করেন, এই রচনাবলীতে সেগুলিকে স্থান দিতে চাহেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

“ভূরিপরিমাণ যে-সকল লেখাকে আমি ত্যাগ্য বলে গণ্য করি আপনাদের সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম-স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবী কালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না। আপনারা তর্ক করে থাকেন, ইতিহাসের আবর্জনা দিয়ে যে গাধার টুপিটা বানানো হয় ইতিহাসের খাতিরে সেটা মহাকালের আসরে পরে আসতেই হবে। কবির তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতিবুদ্ধপিতামহের দেহে যে

রবীন্দ্র-রচনাবলী

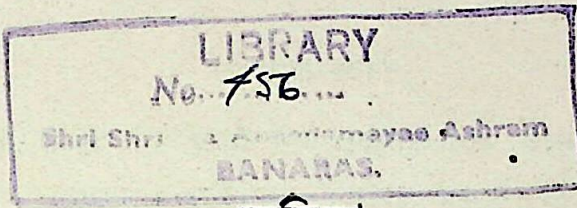
একটা লম্বান-প্রত্যঙ্গ ছিল সেটাকে সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, এ-কথা মানব-সন্তান মাত্রেই স্বীকার করে থাকে।”

ভূমিকাতেও তিনি এইরূপ যুক্তি দিয়াছেন। তবে শেষ অবধি একটা আপস-নিষ্পত্তি হইয়াছে, যে-সব রচনা তিনি বর্জনীয় বলিয়া মনে করেন তাহার অধিকাংশই পরিশিষ্ট খণ্ডে স্থান পাইবে।

বিভিন্ন সংস্করণে অনেক গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবি অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়াছেন। বর্তমানে যে পাঠ তাঁহার অনুমোদিত, এই রচনাবলীতে সেই পাঠই অনুমৃত হইল।

আখিন, ১৩৪৬

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য



ভূমিকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির অধ্যক্ষেরা আমার গত পত্ন সমস্ত লেখা একসঙ্গে জড়ো করে বিশেষভাবে সাজিয়ে ছাপাবার সংকল্প করেছেন। কাজটি পরিমাণে বৃহৎ এবং সম্পাদনায় দুঃখসাধ্য; এ রকম অনুষ্ঠান আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর সাহিত্যবিচারকদের সম্পূর্ণ মনের মতো করে তোলা কারো শক্তিতে নেই এ-কথা নিশ্চিত জেনে নিজে এর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নিয়েছি। যঁারা সাহস করে এর ভার বহন করতে প্রস্তুত তাঁদের জন্তে উদ্বিগ্ন রইলুম।

অতি অল্প বয়স থেকে স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারিদিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নূতন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে; একটা কোনো ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে। যঁারা বাইরে থেকে সম্মান ও চর্চা করেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির কাছে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু লেখকের কাছে সেটা স্পষ্ট গোচর হয় না। মনের ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যখন ফুল ফোটে ফল ফলায় তখন সেইটের আবেগ ও বাস্তবতাই কবির কাছে হয় একান্ত প্রত্যক্ষ। তার মাঝে মাঝে সময় আসে যখন ফলন যায় কমে, যখন হাওয়ার মধ্যে প্রাণশক্তির প্রেরণা হয় ক্ষীণ। তখন ইতস্তত যে ফসলের চিহ্ন দেখা দেয় সে আগেকার কাটা শস্যের পোড়ো বীজের অঙ্কুর। এই অফলা সময়গুলো ভোলবার যোগ্য। এটা হল উজ্জ্বলতার ক্ষেত্র তাঁদেরই কাছে যঁারা ঐতিহাসিক সংগ্রহকর্তা। কিন্তু ইতিহাসের সম্বল আর কাব্যের সম্পত্তি এক জাতের নয়।

ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা। কবির রচনাক্ষেত্রে তুলনা করা যেতে পারে নৌহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে কুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেইগুলিই কাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। বাকি যত ক্ষীণ বাষ্পীয় ফাঁকগুলি যথার্থ সাহিত্যের শামিল নয়। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী; বাষ্প, নক্ষত্র, ফাঁক কোনোটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।

আমার আয়ু এখন পরিণামের দিকে এসেছে। আমার মতে আমার শেষ কর্তব্য হচ্ছে, যে লেখাগুলিকে মনে করি সাহিত্যের লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে তাদের রক্ষা করে বাকিগুলোকে বর্জন করা। কেননা রসসৃষ্টির সত্য পরিচয়ের সেই একমাত্র উপায়। সব-কিছুকে নিবিচারে রাশীকৃত করলে সমগ্রকে চেনা যায় না। সাহিত্যরচয়িতারূপে আমার চিন্তের যে একটি চেহারা আছে সেইটেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যেতে পারলেই আমার সার্থকতা। অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।

একেবারে শ্রেষ্ঠ লেখাগুলিকে নিয়েই আঁট করে তোড়া বাঁধতে হবে এ-কথা আমি বলিনে। একটা আদর্শ আছে সেটা নিছক পয়লা শ্রেণীর আদর্শ নয়, সেটা সাধারণ চলতি শ্রেণীর আদর্শ। তার মধ্যে পরস্পরের মূল্যের কমিবেশি আছে। রেলগাড়িতে যেমন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। তাদের রূপের ও ব্যবহারের আদর্শ ঠিক এক নয় কিন্তু চাকায় চাকায় মিল আছে। একটা সাধারণ সমাপ্তির আদর্শ তারা সকলেই রক্ষা করেছে। যারা অসম্পূর্ণ, কারখানা-ঘরের বাইরে তাদের আনা উচিত হয় না। কিন্তু তারা যে অনেক এসে পড়েছে তা এই বইয়ের গোড়ার দিকের কবিতাগুলি দেখলে ধরা পড়বে। কুয়াশা যেমন বৃষ্টি নয় এরাও তেমনি কবিতা নয়। যারা পড়বেন তাঁরা

ভূমিকা

১১/০

এইসব কাঁচাবয়সের অকালজাত অঙ্গহীনতার নমুনা দেখে যদি হাসতে হয় তো হাসবেন তবু একটুখানি দয়া রাখবেন মনে এই ভেবে যে, ভাগ্যক্রমে এই আরম্ভই শেষ নয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখি, এই বইয়ে যে গীতিনাট্য ছাপানো হয়েছে তার গানগুলিকে কেউ যেন কবিতা বলে সন্দেহ না করেন।

সাহিত্যরচনার মধ্যে জীবধর্ম আছে। নানা কারণে তারা সবাই একই পূর্ণতায় দেখা দেয় না। তাদের সবাইকে একত্রে এলোমেলো বাড়াতে দিলে সবারই ক্ষতি হয়। মনে আছে একসময়ে বিজয়া পত্রে বিপিনচন্দ্র পাল আমার রচিত গানের সমালোচনা করেছিলেন। সে সমালোচনা অনুকূল হয়নি। তিনি আমার যে-সব গানকে তলব দিয়ে বিচারক্ষেপে দাঁড় করিয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিস্তর ছেলেমানুষি ছিল। তাদের সাক্ষ্য সংশয় এনেছিল সমস্ত রচনার পরে। তারা সেই পরিণতি পায়নি যার জোরে গীতসাহিত্যসভায় তারা আপনাদের লজ্জা নিবারণ করতে পারে। ইতিহাসের রসদ জোগাবার কাজে ছাপাখানার আড়কাঠির হাতে সাহিত্যমহলে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে। তাদের সরিয়ে আনতে গেলে ইতিহাস আপন পুরাতন দাবির দোহাই পেড়ে আপত্তি পেশ করে।

আজ যদি আমার সমস্ত রচনার সমগ্র পরিচয় দেবার সময় উপস্থিত হত্থে থাকে তবে তাদের মধ্যে ভালো মন্দ মাঝারি আপন আপন স্থান পাবে এ-কথা মানা যেতে পারে। তারা সবাই মিলেই সমষ্টির স্বাভাবিকতা রক্ষা করে। কেবল যাদের মধ্যে পরিণতি ঘটেনি তারা কোনো এক সময়ে দেখা দিয়েছিল বলেই যে ইতিহাসের খাতিরে তাদের অধিকার স্বীকার করতে হবে এ-কথা শ্রদ্ধেয় নয়। সেগুলোকে চোখের আড়াল করে রাখতে পারলেই সমস্তগুলোর সম্মান থাকে।

অতএব আমার সমস্ত লেখা সংগ্রহ করার মানে হচ্ছে এই যে, যে-সব লেখা অন্তত আমারই রচনার আদর্শ অনুসারে লেখায় প্রস্ফুট হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের একত্র করা। বিধাতার হাতের কাজে অসম্পূর্ণ সৃষ্টি

মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কিন্তু দেখা দিয়েছে বলেই যে টিকে যায় তা নয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না বলেই তাদের জবাব দেওয়া হয়। সেইরকম জবাব-দেওয়া লাঞ্ছনধারী রচনা অনেকগুলিই পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের শুরু থেকেই, তাদের ভিড় ঠেলে পাঠকেরা আপন চেষ্টায় যদি পঞ্চ করে চলে যান তবে তাদের প্রতি সন্মত্বহার করা হবে। প্রথম বুনোনির সময় যে-মাটি বৃষ্টি পায়নি, তার তৃষার্ত পীড়িত বীজ থেকে কুক্ষিত হয়ে যে অঙ্কুর বেঁরোয় সে যেমন কিছু একটা প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তার পূর্বেই ব্যর্থ হয়ে যায় মরে, সন্ধ্যাসংগীতের কবিতা সেই জাতের। একে সংগ্রহ করে রাখবার মূল্য নেই। এর কেবল একটা দাম আছে, সে হচ্ছে চিত্তচাক্ষুর্যের আবেগে বাঁধা-ছন্দের শিকল ভাঙা।

অনেকদিনের রচনাগুলো যখন একত্র জমা করা যায় তখন এই ভাবনাটা মনে আসে। তারা নানা বয়সের ও মনের নানা অবস্থার সামগ্রী। শুধু নিজের মনের নয়, চারিদিকের মনের। ইতিহাসের এই অনিবার্য বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই সাহিত্যের তরী চলে আপন তীরে। সকলের চেয়ে ভেদ ঘটায় রচনাশক্তির কমিবেশিতে। এক সময়ে বিশেষ রসের আয়োজনে মনকে যা টেনেছিল, আর-একসময়ে তা টানে না, কিংবা অল্প রকম করে টানে। তাতে কোনো ক্ষতি হয় না যদি তার তৎকালীন প্রকাশটা হয় সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে। অনেক সময়ে সেইটেই হয় না। আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিহীন হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবে সেটা উপেক্ষার যোগ্য। বয়সের এক পর্বে যা লিখেছি অল্প পর্বে তা লিখিনে কিংবা হয়তো অল্প রকম করে লিখি। সেই তার রূপ ও রসের পরিবর্তন যদি যথাসময়ে আপন প্রকাশরীতির যোগ্য বাহন পেয়ে থাকে তা হলে কোনো নালিশ থাকে না। যুগপরিবর্তন ইতিহাসের অঙ্গ, কিন্তু সাহিত্যের একটা মূলনীতি সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের মনকে আনন্দের জোগান দিয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের অলংকার-শাস্ত্রে যাকে বলে রসতত্ত্ব। এই রস আধুনিকী বা সনাতনী কোনো

ভূমিকা

৮০

বিশেষ মালমসলার ফরমাশে তৈরি হয় না। কখনো কখনো কোনো অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক গোঁড়ামি জেগে উঠে রসসৃষ্টি-শালায় ডিক্টেটরি করতে আসে, বাইরে থেকে দণ্ড হাতে তাদের শাসন চালায়, মনে করে চিরকালের মতো অপ্রতিহত তাদের প্রভাব। তাদের তকমা চোখ ভোলায় যাদের, তারা রসরাজ্যের বাইরের লোক, তারা রবাহূত; এক-একটা বিশেষ রব শুনে অভিভূত হয়, ভিড় করে। রসের প্রকৃতি হচ্ছে যাকে বলা যায় গুহাহিত, অভাবনীয়; সে কোনো বিশেষ উদ্বেজিত সাময়িকতার আইনকানুনের অধীন নয়। তার প্রকাশ এবং তার লুপ্তি মানবপ্রকৃতির যে নিগূঢ় বিশেষত্বের সঙ্গে জড়িত তা কেউ স্পষ্ট নির্ণয় করতে পারে না। স্বভাবের গহন সৃষ্টিশালায় গভীর প্রেরণায় মানুষ আপন খেলনা গড়ে আবার খেলনা ভাঙে। আমরা কারিগররা তার সেই ভাঙাগড়ার লীলায় উপকরণ জুগিয়ে আসছি। কিন্তু সেগুলো নিতান্ত খেলনা নয়, সেগুলো কীর্তি, প্রত্যেকবার মানুষ এই আশা করে, নইলে তার হাত চলে না। অথচ সেই সঙ্গেই একটা নিরাসক্ত বৈরাগ্যকে রক্ষা করতে পারলেই ভালো।

আমার আশি বছর বয়সের সাহিত্যিক প্রয়াসকে সম্পূর্ণ আকারে পুঞ্জিত করবার এই যে চেষ্টা আজ দেখছি, এর মধ্যে নিশ্চিত অনুমান করছি অনেক গাঁথুনি আছে, যার উপরে আগামী কালের বিস্মরণের দূত প্রত্যহ অদৃশ কালিতে আসন্ন লুপ্তির চিহ্ন অঙ্কিত করে চলেছে। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো মোহ নেই, এবং ক্ষোভ করাও বুথা বলে মনে করি।

এই যদি সত্য হয়, তবে যে সুহৃদরা আমার রচনাগুলি রক্ষণীয় বলে গণ্য করছেন তাঁদের ইচ্ছাকে কী বলে সম্মান করা যায়। এ উপলক্ষে পৃথিবীতে জীববংশধারার ইতিহাস স্মরণের যোগ্য। কালের পরিবর্তিত গতির সঙ্গে অনেক জীব তাল রেখে চলতে পারেনি, প্রাণরঞ্জশালা থেকে সেই বেতালাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবাই তো সরেনি। অনেক আছে কালের সঙ্গে তাদের মিল ভাঙেনি।

৮৬/০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

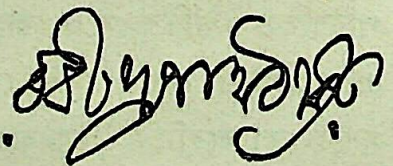
আজ নূতনও তাদের দাবি করে, পুরাতনও তাদের ত্যাগ করেনি। কি শিল্পকলায়, কি সাহিত্যে যদি তার যথেষ্ট প্রমাণ না থাকত তা হলে বলতে হত সৃষ্টিকর্তা মানুষের মন আপন পিছনের রাস্তা ক্রমাগত পুড়িয়ে ফেলতে ফেলতেই চলেছে। কথাটা তো সত্য নয়। মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না। পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক।

তাই বলছি, আজ যাঁরা আমার রচনাকে স্থায়ী সম্মানের রূপ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা আপন রুচি ও সংস্কৃতি অনুসারে তার স্থায়িত্ব উপলব্ধি করেছেন। মানুষ আপনার এই উপলব্ধিকে বিশ্বাস করেই পাকা ইমারতের কাজ ফাঁদে,— ভুল হতে পারে কিন্তু ভুল না হওয়ার সম্ভাবনাকে মানুষ যে আস্থা করে সেই আস্থারই মূল্য বেশি। বর্তমান অনুষ্ঠানকর্তাদের সম্বন্ধে এই হচ্ছে বলবার কথা। আর আমার কথা যদি বল, আমি মনুর উপদেশ মানব, নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং, যে যায় যাক যে থাকে থাক্, সেই সঙ্গে মিথ্যা বিনয়ের ভান করব না। বন্ধুরা আমার এতকালের অধ্যবসায়কে যে নিশ্চিত শ্রদ্ধার মূল্য দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন আমিও তাকে শ্রদ্ধা করে সেই দানের মধ্যে আমার শেষ পুরস্কার গ্রহণ করব। কাল তাঁদের ফাঁকি দেবে না এবং বিভ্রমনা করবে না কবিকেও, এই কথায় সংশয় করার চেয়ে বিশ্বাস করাতে উপস্থিত লাভ, কেননা কালের দরবারে এর শেষ মীমাংসার সম্ভাবনা দূরে আছে।

সবশেষে এই কথা জানিয়ে রাখছি যাঁরা এই গ্রন্থপ্রকাশের ভার নিয়েছেন তাঁদের দুঃসাধ্য কাজে আমি যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখব এবং তাঁরা আমার সমর্থনের অনুসরণ করবেন।

৩০।৬।৩২

ত্রীনিকেতন



প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞপ্তি

কবির সপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীগণের সংবর্ধনার উত্তরে তিনি যে প্রতিভাষণ পাঠ করেন, বালক-কবির সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পর্বের মধ্য দিয়া তাঁহার কবিজীবনের পরিণতির কথা অল্পপরিসরের মধ্যে তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অবতরণিকারূপে এই প্রতিভাষণটি মুদ্রিত হইল।

প্রথম খণ্ডের চারিটি ভাগে যথাক্রমে সন্ধ্যাসংগীত, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বউ-ঠাকুরানীর হাট ও যুরোপ-প্রবাসীর পত্র প্রথম স্থান পাইয়াছে। ইহার পূর্বে লিখিত অনেক রচনা আমাদের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুসারে পরিশিষ্ট খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

এই রচনাবলী প্রকাশকল্পে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া ও সর্বদা আমাদের উপদেশ দিয়া শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু আমাদের একান্ত কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন স্নাতরা, শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন এই রচনাবলীর সম্পাদনায় সহযোগিতা করিয়া গ্রন্থপ্রকাশ সহজসাধ্য করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রকাশকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোমের রচনা হইতে কোনো কোনো বিষয়ে সাহায্য লইয়াছি। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত পৃথ্বীসিং নাহার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর নানা বিষয়ে

১৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আমাদের আনুকূল্য ও সহায়তা করিয়াছেন। ইহাদের সকলের নিকট
আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনাবলীর সম্পাদন সহজসাধ্য ও
সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী সকলেরই সাহায্য ও
সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

শ্রীচাক্র চট্টোপাধ্যায়

অবতরণিকা

যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলির মতো, চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘরবাড়িতে কলরবে আকাশটাকে জাঁট করে বাঁধেনি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার-অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল গোটাকতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে-পড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুর-দালান, তিন চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সংবৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা-সাজানো স্বর্গকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে-সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সত্তা বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয়নি।

এ-বাড়ি থেকে এ-দেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সংকে গেছে তেমন পূর্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য-দীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহন-শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণসমাকীর্ণ পূর্বকালের আমোদপ্রমোদ-বিলাস-সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাভাবিক জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক,

১৮০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কলকাতার লোক যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিতসমাজ অন্তরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন, সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি চিঠিপত্রে লেখাপড়ায় এমন কি মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারেনি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্সপীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওঅল্টার স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের “স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে” আর তার পরে হেমচন্দ্রের “বিংশতি কোটি মানবের বাস” কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়। হিন্দুমেলায় পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলায় গান ছিল মেজদাদার লেখা “জয় ভারতের জয়,” গণদাদার লেখা “লজ্জায় ভারত-বশ গাইব কি করে,” বড়দাদার “মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।”

জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অস্থূষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এই সকল আকাজক্ষা উৎসাহ উদ্যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল, হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসেনি।

কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল-কলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়েনি। ইমারত-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেলবেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় তুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল বরনার মতো বারে পড়ত আমাদের দক্ষিণ-বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁইহুঁই শব্দ আসত কানে, আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেইও হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ি দাঁসীর কাছে গুনতুম রূপকথা। এই নিস্তরুণপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলাম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।

আরো একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিইনি, পাস করিনি, মাস্টার আমার ভাবী কালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুলঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন, সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।

ইতিপূর্বেই কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন বিনো

এমন ছিল ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত হত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর দশ অক্ষরের চৌকো-চৌকো কত রকম শব্দ-ভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।

এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে— সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হালকা। পিতৃদেব ছিলেন হিম্মলয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরাননি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্কের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাভ্য করতেন তাহলে ভেঙে-চুরে তেড়ে-বঁকে যা-হয়-একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সম্ভোষণকও হত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হত না।

শুরু হল আমার ভাঙাছন্দে টুকরো কাব্যের পালা, উচ্চাবৃষ্টির মতো; বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। এই রীতি-ভঙ্গের বোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত। এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ আমার ভাগ্যক্রমে সেকালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য—প্রতিযোগিতার উত্তেজনা উদ্ভূত হয়ে ওঠেনি। বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার অপ্রিয় আঘাত নামত, কিন্তু কটুক্তি ও কুৎসার উত্তেজনা তখনো সাহিত্যে বাঁধিয়ে ওঠেনি।

সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলাম বয়সে সবচেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সবচেয়ে কাঁচা। আমার হৃদয়গুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উজ্জ্বলিত বাপসা, ভাবার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন দেননি—আধো-আধো বাধো-বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণ-ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। তাই প্রশ্নের অভাব সত্ত্বেও বিরুদ্ধ রীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেন।

সেদিনকার খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। প্রকৃতির গুণগ্রাম ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনচ্ছায়ায় ছিলাম বসে। রুখনো কাটিয়েছি তেতলার ছাদের প্রান্তে কর্মহীন অবকাশে মনে মনে আকাশ-কুসুমের মালা গেঁথে, কখনো গাজিপুরের বুদ্ধ নিমগাছের তলায় বসে ইদারার জলে বাগান-সেঁচ দেবার করুণধ্বনি শুনতে শুনতে অদূর গঙ্গার স্রোতে কল্লনাকে অহৈতুক বেদনায় বোঝাই করে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে। নিজের মনের আলো-আঁধারের মধ্যে থেকে হঠাৎ পরের মনের কল্লুইয়ের ধাক্কা খাবার জন্তে বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে এমন কথা সেদিন ভাবিওনি। অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্তদের চেয়ে তা অনেক বেশি আবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সহিতে হয়নি। এও আমার খ্যাতি-পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ-কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি যে, প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্চিত করেছে, কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করেনি। এ ছাড়া আমার দুর্গ্রহ কালো

১৮০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বর্ণের এই যে পটটি ঝুলিয়েছেন এরই উপরে আমার বন্ধুদের সুপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়, সে-কথা বুঝতে পারি আজকের এই অনুষ্ঠানেই। বন্ধুদের কাউকে জানি, অনেককেই জানিনি, তাঁরাই কেউ কাছে থেকে কেউ দূরে থেকে এই উৎসবে মিলিত হয়েছেন, সেই উৎসাহে আমার মন আনন্দিত। আজ আমার মনে হচ্ছে তাঁরা আমাকে জাহাজে তুলে দিতে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন— আমার খেয়াতরী পাড়ি দেবে দিবালোকের পরপারে তাঁদের মঙ্গলধ্বনি কানে নিয়ে।

আমার কর্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোখুলিবেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌঁছল। আলো স্নান হবার শেষ মুহূর্তে এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মূল্য স্বীকার করবেন।

ফসল যতদিন মাঠে ততদিন সংশয় থেকে যায়। বুদ্ধিমান মহাজন খেতের দিকে তাকিয়েই আগাম দাদন দিতে দ্বিধা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। যখন গোলায় উঠল তখনই ওজন বুঝে দামের কথা পাকা হতে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফলন-শেষের হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।

যে-মানুষ অনেক কাল বেঁচে আছে সে অতীতেরই শামিল। বুঝতে পারছি আমার সাবেক বর্তমান এই হাল বর্তমান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। যে-সব কবি পালা শেষ করে লোকান্তরে, তাঁদেরই আঙিনার কাছটায় আমি এসে দাঁড়িয়েছি তিরোভাবের ঠিক পূর্ব-সীমানায়। বর্তমানের চলতি রথের বেগের মুখে কাউকে দেখে নেবার যে অসম্পৃষ্টতা সেটা আমার বেলা এতদিনে কেটে যাবার কথা। যতখানি দূরে এলে কল্পনার ক্যামেরায় মানুষের জীবনটাকে সমগ্রলক্ষ্যবদ্ধ করা যায় আধুনিকের পুরোভাগ থেকে আমি ততটা দূরেই এসেছি।

পক্ষাশের পরে বানপ্রস্থের প্রস্তাব মনু করেছেন। তার কারণ মনুর হিসাবমতো পক্ষাশের পরে মানুষ বর্তমানের থেকে পিছিয়ে পড়ে। তখন কোমর বেঁধে খাবমান কালের সঙ্গে সমান ঝোঁকে পা ফেলে চলার বেগে

অবতরণিকা

১৮০

যতটা ক্লান্তি ততটা সফলতা থাকে না, যতটা ক্ষয় ততটা পূরণ হয় না। অতএব তখন থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে সেই সর্বকালের মোহনার দিকে যাত্রা করতে হবে যেখানে কাল স্তব্ধ। গতির সাধনা শেষ করে তখন স্থিতির সাধনা।

মহু যে মেয়াদ ঠিক করে দিয়েছেন এখন সেটাকে ঘড়ি ধরে খাটানো প্রায় অসাধ্য। মহুর যুগে নিশ্চয়ই জীবনে এত দায় ছিল না, তার গ্রন্থি ছিল কম। এখন শিক্ষা বল, কর্ম বল, এমন কি আমোদপ্রমোদ খেলাধুলা, সমস্তই বহুব্যাপক। তখনকার সত্ৰাটেরও রথ যত বড়ো যত জমকালো হোক, এখনকার রেলগাড়ির মতো তাতে বহু গাড়ির এমন দ্বন্দ্বসমাস ছিল না। এই গাড়ির মাল খালাস করতে বেশ একটু সময় লাগে। পাঁচটায় আগ্নেসে ছুটি শাস্ত্রনির্দিষ্ট বুটে, কিন্তু খাতাপত্র বন্ধ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাড়িমুখে হবার আগেই বাতি জ্বালতে হয়। আমাদের সেই দশা। তাই পঞ্চাশের মেয়াদ বাড়িয়ে না নিলে ছুটি মঞ্জুর অসম্ভব। কিন্তু সত্তরের কোঠায় পড়লে আর ওজর চলে না। বাইরের লক্ষণে বুঝতে পারছি আমার সময় চলল আমাকে ছাড়িয়ে—কম করে ধরলেও অন্তত দশ বছর আগেকার তারিখে আমি বসে আছি। দূরের নক্ষত্রের আলোর মতো, অর্থাৎ সে যখনকার সে তখনকার নয়।

তবু একেবারে থামবার আগে চলার বোঁকে অতীত কালের খানিকটা ধাক্কা এসে পড়ে বর্তমানের উপরে। গান সমস্তটাই শমে এসে পৌঁছলে তার সমাপ্তি; তবু আরো কিছুক্ষণ ফরমাশ চলে পালটিয়ে গাবার জন্তে। সেটা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি। এর পরে বড়োজোর দুটো-একটা তান লাগানো চলে, কিন্তু চুপ করে গেলেও লোকসান নেই। পুনরাবৃত্তিকে দীর্ঘকাল তাজা রাখবার চেষ্টাও যা আর কইমাছটাকে ডাঙায় তুলে মাসখানেক বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাও তাই।

এই মাছটার সঙ্গে কবির তুলনা আরও একটু এগিয়ে নেওয়া যাক। মাছ যতক্ষণ জলে আছে ওকে কিছু কিছু খোরাক জোগানো সংকর্ম,

সেটা মাছের নিজের প্রয়োজনে। পরে যখন তাকে ডাঙায় তোলা হল তখন প্রয়োজনটা তার নয়, অপর কোনো জীবের। তেমনি কবি যতদিন না একটা স্পষ্ট পরিণতিতে পৌঁছয় ততদিন তাকে কিছু কিছু উৎসাহ দিতে পারলে ভালোই—সেটা কবির নিজেরই প্রয়োজনে। তার পরে তার পূর্ণতায় যখন একটা সমাপ্তির যতি আসে তখন তার সম্বন্ধে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে সেটা তার নিজের নয়, প্রয়োজন তার দেশের।

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জমীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রচাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।

তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্তে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালুতলে ভূমির মতো।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাবান প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্বজনসমক্ষে নিজের ব'লে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ্য রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

আমার জীবনের সমাপ্তিদশায় এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনো ভাবে নিজেকে লাভ না করে থাকে তবে আজকের

অবতরণিকা

১১/০

এই উৎসব অর্থহীন। যদি কেউ এ-কথায় অহংকারের আশঙ্কা করে আমার জন্তে উদ্বিগ্ন হন তবে তাঁদের উদ্বেগ অনাবশ্যক। যে খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশি হয়, ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে। ভুল মন্তব্য হয়েই দেখা যায়, চুকে যায় অতি ক্ষুদ্র হয়ে। আতশবাজির অভাবিদারক আলোটাই তার নির্বাণের উজ্জ্বল তর্জনী-সংকেত।

এ-কথায় সন্দেহ নেই যে, পুরস্কারের পাত্র নির্বাচনে দেশ ভুল করতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষণমুখরা খ্যাতির মৌনসাধন বার বার দেখা গেছে। তাই আজকের দিনের আয়োজনে আজই অতিশয় উল্লাস যেন না করি, এই উপদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। জেমনি তা নিয়ে এখনই তাড়াতাড়ি বিমর্ষ হবারও আশু কারণ দেখি না। কালে কালে সাহিত্যবিচারের রায় একবার উলটিয়ে আবার পালটিয়েও থাকে। অব্যবস্থিতচিত্ত মন্দগতি কালের সবশেষ বিচারে আমার ভাগ্যে যদি নিঃশেষে ফাঁকিই থাকে তবে এখনই আগাম শোচনা করতে বসা কিছু নয়। এখানকার মতো এই উপস্থিত অনুষ্ঠানটাই নগদ লাভ। তার পরে চরম জবাবদিহির জন্তে প্রপৌত্রেরা রইলেন। আপাতত বন্ধুদের নিয়ে আশ্বস্তচিত্তে আনন্দ করা যাক, অপর পক্ষে যাদের অভিরুচি হয়, তাঁরা ফুৎকারে বুদ্ধদ বিদীর্ণ করার উৎসাহে আনন্দ করতে পারেন। এই দুই বিপরীত ভাবের কালোয় সাদায় সংসারের আনন্দধারায় যমের ভগ্নী যমুনা ও শিবজটানিঃসৃত গঙ্গা মিলে থাকে। ময়ূর আপন পুচ্ছগর্বে নৃত্য করে খুশি, আবার শিকারি আপন লক্ষ্যবেধগর্বে তাকে গুলি করে মহা আনন্দিত।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্যে কলাসৃষ্টিতে লোকচিন্তের সম্মতি অতি ঘন ঘন বদল হয়, এটা দেখা যাচ্ছে। বেগ বেড়ে চলেছে মানুষের যানে-বাহনে, বেগ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্ছে মানুষের মনপ্রাণকে।

যেখানে বৈষয়িক প্রতিযোগিতা উগ্র সেখানে এই বেগের মূল্য বেশি। ভাগ্যের হরির লুট নিয়ে হাটের ভিড়ে ধুলার 'পরে যেখানে

য

১১৬০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সকলে মিলে কাড়াকাড়ি, সেখানে যে-মানুষ বেগে জেতে মালেও তার জিত। তৃপ্তিহীন লোভের বাহন বিরামহীন বেগ। সমস্ত পশ্চিম মাতালের মতো টলমল করছে সেই লোভে। সেখানে বেগবৃদ্ধি ক্রমে লোভের উপলক্ষ্য না হয়ে স্বয়ং লক্ষ্য হয়ে উঠছে। বেগেরই লোভ আজ জলে স্থলে আকাশে হিষ্টিরিয়ার চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরোল।

কিন্তু প্রাণপদার্থ তো বাষ্প-বিছাতের ভূতে তাড়া করা লোহার এঞ্জিন নয়। তার একটি আপন ছন্দ আছে। সেই ছন্দে দুই-এক মাত্রা টান সয় তার বেশি নয়। মিনিট কয়েক ডিগবাজি খেয়ে চলা সাধ্য হতে পারে কিন্তু দশ মিনিট যেতে-না-যেতে প্রমাণ হবে যে মানুষ বাইসিকেলের চাকা নয়, তার পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে। গানের লয় মিষ্টি লাগে যখন সে কানের সজীব ছন্দ মেনে চলে। তাকে ছন থেকে চোঁছনে চড়ালে সে কলাদেহ ছেড়ে কৌশলদেহ নেবার জন্তই হাঁসকাঁস করতে থাকে। তাগিদ যদি আরো বাড়াও তা হলে রাগিণীটা পাগলা-গারদের সদর-গেটের উপর মাথা ঠুঁকে মারা যাবে। সজীব চোখ তো ক্যামেরা নয়, ভালো করে দেখে নিতে সে সময় নেয়। ঘণ্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল দৌড়ের দেখা তার পক্ষে কুয়াশা দেখা। একদা তীর্থযাত্রা বলে একটা সজীব পদার্থ আমাদের দেশে ছিল। ভ্রমণের পূর্ণস্বাদ নিয়ে সেটা সম্পন্ন হত। কলকাতা গাড়ির আমলে তীর্থ রইল যাত্রা রইল না, ভ্রমণ নেই পৌঁছনো আছে, শিক্কাটা বাদ দিয়ে পরীক্ষাটা পাস করা যাকে বলে। রেল-কোম্পানির কারখানায় কলে ঠাসা তীর্থযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দামের বটিকা সাজানো, গিলে ফেললেই হল—কিন্তু হলই না যে সে-কথা বোঝবারও ফুরসত নেই। কালিদাসের যক্ষ যদি মেঘদূতকে বরখাস্ত করে দিয়ে এরোপ্লেন-দূতকে অলকায় পাঠাতেন তা হলে অমন দুইসর্গভরা মন্দাক্রান্তা ছন্দ দু-চারটে শ্লোক পার না হতেই অপঘাতে মরত। কলে-ঠাসা বিরহ তো আজ পর্যন্ত বাজারে নামেনি।

মেঘদূতের সেই শোকাবহ পরিণামে শোক করবে না এমনতর বলবান

অবতরণিকা

১১৮/০

পুরুষ আজকাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, এখন কবিতার যে আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে সে নাভিস্বাসের আওয়াজ। ওর সময় হয়ে এল। যদি তা সত্য হয় তবে সেটা কবিতার দোষে নয় সময়ের দোষে। মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে-বাঁধা, কিন্তু তার কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দ-ভাঙা।

আঙুরের খেতে চাষি কাঠি পুঁতে দেয়, তারই উপর আঙুর লতিয়ে উঠে আশ্রয় পায়, ফল ধরায়। তেমনি জীবনযাত্রাকে সবল ও সফল করার জন্যে কতকগুলি রীতিনীতি বেঁধে দিতে হয়। এই রীতিনীতির অনেকগুলিই নির্জীব নীরস, উপদেশ-অনুশাসনের খুঁটি। কিন্তু বেড়ায় লাগানো জিয়লকাঠের খুঁটি যেমন রস পেলেই বেঁচে ওঠে তেমনি জীবনযাত্রা যখন প্রাণের ছন্দে শান্তগমনে চলে তখন শুকনো খুঁটিগুলো অন্তরের গভীরে পৌঁছবার অবকাশ পেয়ে ক্রমেই প্রাণ পেতে থাকে। সেই গভীরেই সঞ্জীবন-রস। সেই রসে তত্ত্ব ও নীতির মতো পদার্থও হৃদয়ের আপন সামগ্রীরূপে সজীব ও সজ্জিত হয়ে ওঠে, মানুষের আনন্দের রং তাতে লাগে। এই আনন্দের প্রকাশের মধ্যেই চিরন্তনতা। একদিনের নীতিকে আর-একদিন আমরা গ্রহণ নাও করতে পারি, কিন্তু সেই নীতি যে শ্রীতিকে যে সৌন্দর্যকে আনন্দের সত্য ভাষায় প্রকাশ করেছে সে আমাদের কাছে নূতন থাকবে। আজও নূতন আছে মোগল সাম্রাজ্যের শিল্প—সেই সাম্রাজ্যকে, তার সাম্রাজ্যনীতিকে আমরা পছন্দ করি আর না করি।

কিন্তু যে-যুগে দলে দলে গরজের তাড়ায় অবকাশ ঠাসা হয়ে নিরেট হয়ে যায় সে-যুগ প্রয়োজনের, সে-যুগ শ্রীতির নয়। শ্রীতি সময় নেয় গভীর হতে। আধুনিক এই দ্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরিপানার মতোই সাহিত্যধারার মধ্যেও ভুরি ভুরি ঢুকে পড়েছে। তারা বাস করতে আসে না, সমস্তাসমাধানের দরখাস্ত হাতে ধরা দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলংকৃত হোক তবু সে খাঁটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবি মিটলেই তার অন্তধান।

এমন অবস্থায় সাহিত্যের হাওয়াবদল হয় এ-বেলা ও-বেলা। কোথাও আপন দরদ রেখে যায় না। পিছনটাকে লাথি মেরেই চলে, যাকে উচু করে গড়েছিল তাকে খুলিসাৎ করে তার পরে অট্টহাসি। আমাদের মেয়েদের পাড়ওআলা শাড়ি, তাদের নীলাশ্বরী, তাদের বেনারসি চেলি মোটের উপর দীর্ঘকাল বদল হয়নি—কেননা ওরা আমাদের অন্তরের অনুরাগকে আঁকড়ে আছে। দেখে আমাদের চোখের ক্লান্তি হয় না। হত ক্লান্তি, মনটা যদি রসিয়ে দেখবার উপযুক্ত সময় না পেয়ে বে-দরদি ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে উঠত। হৃদয়হীন অগভীর বিলাসের আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশনের বদল। এখনকার সাহিত্যে তেমনি রীতির বদল। হৃদয়টা দৌড়তে দৌড়তে শ্রীতিসম্বন্ধের রাগি গাঁথতে ও পরাতে পারে না। যদি সময় পেত সুন্দর করে বিনিয়ে বিনিয়ে গাঁথত। এখন ওকে ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর। সুন্দর পুরোনো, সুন্দর সেকেলে। আনো একটা যেমন-তেমন করে পাক-দেওয়া শণের দড়ি—সেটাকে বলব রিয়ালিজম। এখনকার ছদ্মদাড় দৌড়ওআলা লোকের ঐটেই পছন্দ। স্বল্পায়ু ফ্যাশন হঠাৎ-নবাবের মতো উদ্ধত—তার প্রধান অহংকার এই যে, সে অধুনাতন, অর্থাৎ তার বড়াই গুণ নিয়ে নয়, কাল নিয়ে।

বেগের এই মোটর-কলটা পশ্চিমদেশের মর্মস্থানে। ওটা এখনো পাকা দলিলে আমাদের নিজস্ব হয়নি। তবু আমাদেরও দৌড় আরম্ভ হল। ওদেরই হাওয়া-গাড়ির পায়দানের উপর লাফ দিয়ে আমরা উঠে পড়েছি। আমরাও খর্বকেশিনী খর্ববেশিনী সাহিত্যকীর্তির টেকনিকের হাল ফ্যাশন নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি, আমরাও অধুনাতনের স্পর্ধা নিয়ে পুরাতনের মানহানি করতে অত্যন্ত খুশি হই।

এই সব চিন্তা করেই বলেছিলুম আমার এ-বয়সে খ্যাতিকে আমি বিশ্বাস করিনে। এই মায়ামৃগীর শিকারে বনে-বাদাড়ে ছুটে বেড়ানো যৌবনেই সাজে। কেননা সে-বয়সে মৃগ যদি বা নাও মেলে মৃগয়াটাই যথেষ্ট। ফুল থেকে ফল হতেও পারে, না হতেও পারে, তবু আপন

অবতরণিকা

১৮০

স্বভাবকেই চাঞ্চল্যে সার্থক করতে হয় ফুলকে। সে অশান্ত, বাইরের দিকেই তার বর্ণগন্ধের নিত্য উত্তম। ফলের কাজ অন্তরে, তার স্বভাবের প্রয়োজন অপ্রগল্ভ শান্তি। শাখা থেকে মুক্তির জন্যেই তার সাধনা— সেই মুক্তি নিজেরই আন্তরিক পরিণতির যোগে।

আমার জীবনে আজ সেই ফলেরই ঋতু এসেছে। যে-ফল আশু বৃত্তচ্যুতির অপেক্ষা করে। এই ঋতুটির সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হলে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের শান্তি স্থাপন চাই। সেই শান্তি খ্যাতি-অখ্যাতির দ্বন্দের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়।

খ্যাতির কথা থাক। ওটার অনেকখানিই অবাস্তবের বাষ্পে পরিষ্কীত। তার সংকোচন-প্রসারণ নিয়ে যে-মানুষ অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে সে অভিশপ্ত। ভাগ্যের পরম দান শ্রীতি, কবির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাই। যে মানুষ কাজ দিয়ে থাকে খ্যাতি দিয়ে তার বেতন শোধ চলে, আনন্দ দেওয়াই যার কাজ শ্রীতি না হলে তার প্রাপ্য শোধ হয় না।

অনেক কীর্তি আছে যা মানুষকেই উপকরণ করে গড়ে তোলা, যেমন রাষ্ট্র। কর্মের বল সেখানে জনসংখ্যায়—তাই সেখানে মানুষকে দলে টানা নিয়ে কেবলই দ্বন্দ্ব চলে। বিস্তারিত খ্যাতির বেড়া জাল ফেলে মানুষ ধরা নিয়ে ব্যাপার। মনে করো, লয়েড জর্জ। তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর শক্তিকে অনেক লোকে যখন মানে তখনই তাঁর কাজ চলে। বিশ্বাস আলগা হলে বেড়া জাল গেল ছিঁড়ে, মানুষ-উপকরণ পুরোপুরি জোটে না।

অপর পক্ষে কবির পক্ষে সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করেনি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজারদরের ক্ষতি হয়, কিন্তু সত্য মূল্যের কমতি হয় না।

ফুল ফুটেছে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগল সেই জিতল, ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে

১৮৬০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

একটি রসময় রহস্যময় আয়তনের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঐদাসীন্ধ্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে, যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিন্তকে আলিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠছে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেছে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।

বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার, কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কঠে হালকা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্ত ধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলিনে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ঋবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্ষবান ও বিশুদ্ধ করে। ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাব্যের গভীরের মধ্যে বসে আছে ত্যাগের মানুষ আপন একতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমবায়ের রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও মানবজীবনেও। দূরকাল ও বহুজনকে যে সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়ীভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকোয় বা মাটির গামলায় তো তার বোঝাই সহিবে না। আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এ-সব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিলছে না—তা যদি হয় তা হলে সেই

অবতরণিকা

০ ১৫৮/০

আধুনিক কালটারই জন্তে পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে, সে চিরকালই আধুনিক থাকবে এত আয়ু তার নয়।

কবি যদি ক্লান্তমুনে এমন কথা মনে করে যে, কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিক কালে পুরোনো হয়ে গেছে তাহলে বুঝব আধুনিক কালটাই হয়েছে বুদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুভূতির রস পৌঁছচ্ছে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না। যে-কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনায় যার রুচি মরেছে চিরদিনের অন্তে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোনো একটা আজগরি অন্তেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

আজ সত্তর বছর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেছে। তাই আশা করি, যারা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত তাঁরা এ-কথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না। বিশ্বয়ের অন্ত পাইনি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোট্টো শ্রামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশদূতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনোদিন আলস্ত করিনি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্তে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয়-সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যার খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে, বলে উঠছে—

কোহোবাভ্যাং কঃ প্রাণ্যাং যদেষ আকাশ আনন্দো ন শ্রাং; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ ষাঁর মধ্যে; যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিद्यমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাঁগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে-মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ; আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চার দিকে, তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি থাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ করে দেয়, তাতে শ্রানি আসে ক্লাস্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিন্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী; রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্য প্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য সেই মহামানবের মধ্যে যিনি সদা

অবতরণিকা

২/০

জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তঁারই বেদীমূলে নিভূতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি জ্বালন করবার ছঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি প্রীতি কামনা করি আর কিছু নয়। এ-কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পেয়েছি সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ক্রটি সত্ত্বেও জেনেছেন সমস্ত জীবন আমি কী চেয়েছি, কী পেয়েছি, কী দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জীবনে অসমাপ্ত সাধনায় কী ইঙ্গিত আছে।

সাহিত্যে মানুষের অনুরাগ-সম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই আয়োজন। কেননা প্রীতিই সমগ্র করে দেখে। আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েছেন তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিড় সন্ধান বা ছিড় খনন করতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আজ পর্যন্ত অতিবড়ো সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মাননি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখবিকৃতি করা, যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা, যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়।

মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ দান এই প্রীতি আমি পেয়েছি এ-কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে—তাঁদের

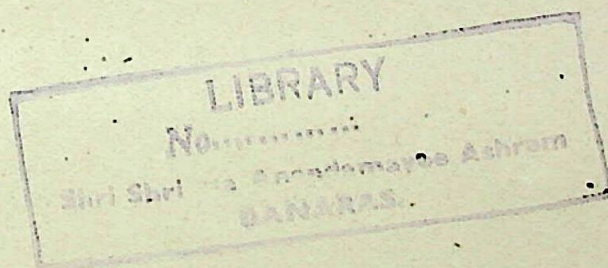
২৬০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কাছে কৃতজ্ঞতা নয় আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে—
আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক।

আর আমার স্বদেশের লোক যারা অতিনিকটের অতিপরিচয়ের
অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেছেন আজ এই
অনুষ্ঠানে তাঁদেরই বহুযত্নরচিত অর্থ্য সম্ভিত। তাঁদের সেই ভালোবাসা
হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।

কবিতা ও গান



नारि उ अलिक

संन्यासंगीत

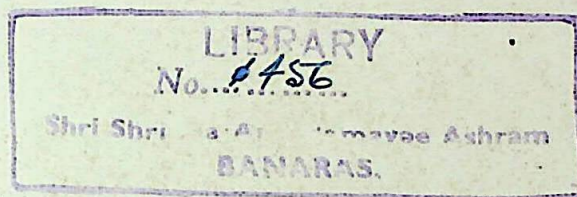
ब्रह्मसूत्रम्



সূচনা

এই গ্রন্থাবলীতে আমার কাব্যরচনার প্রথম পরিচয় নিয়ে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যাসংগীত। তার পূর্বেও অনেক লেখা লিখেছি কিন্তু সেগুলিকে লুপ্ত করবার চেষ্টা করেছি অনাদরে। হাতের অক্ষর পাকাবার যে খাতা ছিল বাল্যকালে সেগুলিকে যেমন অনাদরে রাখিনি, এও তেমনি। সেগুলি ছিল যাকে বলে কপিবুক, বাইরে থেকে মডেল লেখা নকল করবার সাধনায়। কাঁচা বয়সে পরের লেখা মক্শ করে আমরা অন্যর ছেঁদে থাকি বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার নিজের স্বাভাবিক ছাঁদ একটা প্রকাশ হতে থাকে। অবশেষে পরিণতিক্রমে সেইটেই বাইরের নকল খোলসটাকে বিদীর্ণ করে স্বরূপকে প্রকাশ করে দেয়। প্রথম বয়সের কবিতাগুলি সেইরকম কপিবুকের কবিতা।

সেই কপিবুক-যুগের চৌকাঠ পেরিয়েই প্রথম দেখা দিল সন্ধ্যাসংগীত। তাকে আমার বোলের সঙ্গে তুলনা করব না, করব কচি আমার গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্রামল রঙে। রস ধরেনি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অল্প সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলতি ছিল না।





রবীন্দ্রনাথ
বয়স ১২

সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধ্যা

অগ্নি সন্ধ্যো,

অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,

কেশ এলাইয়া

মৃদু মৃদু ও কী কথা কহিস আপন মনে

গান গেয়ে গেয়ে,

নিখিলের মুখপানে চেয়ে ।

প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর কথা

নারিনু বুঝিতে ।

প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর গান

নারিনু শিখিতে ।

চোখে লাগে ঘুমঘোর,

প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর ।

হৃদয়ের অতি দূর দূর দূরান্তরে

মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে

উদাসী প্রবাসী যেন

তোর সাথে তোরি গান করে ।

অগ্নি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী

তোরি যেন আপনার ভাই

প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া

বেড়ায় সদাই ।

শোনে যেন স্বদেশের গান,

দূর হতে কার পায় সাড়া

খুলে দেয় প্রাণ ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

যেন কী পুরানো স্মৃতি
জাগিয়া উঠে রে ওই গানে ।

ওই তারকার মাঝে যেন তার গৃহ ছিল,
হাসিত কাদিত ওইখানে ।
আর বার ফিরে যেতে চায়
পথ তবু খুঁজিয়া না পায় ।

কত না পুরানো কথা, কত না হারানো গান,
কত না প্রাণের দীর্ঘশ্বাস,
শরমের আধো হাসি, সোহাগের আধো বাণী,
প্রণয়ের আধো মৃদু ভাষ
সন্ধ্যা, তোর ওই অন্ধকারে
হারাইয়া গেছে একেবারে ।
পূর্ণ করি অন্ধকার তোর
তারা সবে ভাসিয়া বেড়ায়,
যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
ভাঙাচোরা জগতের প্রায় ।

যবে এই নদীতীরে বসি তোর পদতলে,
তারা সবে দলে দলে আসে,
প্রাণেরে ঘেরিয়া চারি পাশে ;
হয়তো একটি হাসি, একটি আধেক হাসি
সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়,
কতু ফোটে, কতু বা মিলায় ।

আজি আসিয়াছি সন্ধ্যা,—বসি তোর অন্ধকারে
মুদ্রিয়া নয়ান,
সাধ গেছে গাহিবারে—মৃদু স্বরে শুনাবারে
তু-চারিটি গান ।

যেথায় পুরানো গান যেথায় হারানো হাসি,
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেইখানে সযতনে রেখে দিস গানগুলি
রচে দিস সমাধি-শয়ন ।

সন্ধ্যাসংগীত

জানি সন্ধ্যা, জানি তোর স্নেহ,
 গোপনে ঢাকিবি তার দেহ,
 বসিয়া সমাধি পরে, নিষ্ঠুর কৌতুকভরে
 দেখিস হাসে না যেন কেহ ।
 ধীরে শুধু বারিবে শিশির,
 মৃদু শ্বাস ফেলিবে সমীর ।
 স্তব্ধতা কপোলে হাত দিয়ে
 একা সেথা রহিবে বসিয়া,
 মাঝে মাঝে দু-একটি তারা
 সেথা আসি পড়িবে খসিয়া ।

গান আরম্ভ

চারিদিকে খেলিতেছে মেঘ,
 বায়ু আসি করিছে চূষন,
 সীমাহারা নভস্থল দুই বাহু পসারিয়া
 হৃদয়ে করিছে আলিঙ্গন ।
 অনন্ত এ আকাশের কোলে
 টলমল মেঘের মাঝার,
 এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
 তোর তরে, কবিতা আমার ।

যবে আমি আসিব হেথায়
 মন্ত্র পড়ি ডাকিব তোমায় ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বাতাসে উড়িবে তোর বাস,
 ছড়ায়ে পড়িবে কেশপাশ,
 ঈষৎ মেলিয়া আঁখিপাতা
 মুছ হাসি পড়িবে ফুটিয়া,
 হৃদয়ের মৃদুল কিরণ
 অধরেতে পড়িবে লুটিয়া ।
 এলেথেলো কেশপাশ লয়ে
 বসে বসে খেলিবি হেথায়
 উবার অলক ঢুলাইয়া
 সমীরণ ঘেমন খেলায় ।
 চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব
 স্নানফুট' হাসির কুসুম,
 মুখ লয়ে বুকুর মাঝারে
 গান গেয়ে পাড়াইব ঘুম ।
 কোঁতুকে করিয়া কোলাকুলি
 আসিবে মেঘের শিশুগুলি,
 ঘিরিয়া দাঁড়াবে তারা সব
 অবাক হইয়া চেয়ে রবে ।

মেঘ হতে নেমে ধীরে ধীরে
 আয় লো কবিতা মোর বামে ।
 চম্পক-অঙ্গুলি দুটি দিয়ে
 অঙ্ককার ধীরে সরাইয়ে,
 ঘেমন করিয়া উষা নামে ।

বায়ু হতে আয় লো কবিতা,
 আসিয়া বসিবি মোর পাশে,
 কে জানে বনের কোথা হতে
 ভেসে ভেসে সমীরণ-শ্রোতে
 সৌরভ ঘেমন করে আসে ।

সন্ধ্যাসংগীত

৫

হৃদয়ের অন্তঃপুর হতে
 বধু মোর, ধীরে ধীরে আর।
 ভীকু প্রেম যেমন করিয়া
 ধীরে উঠে হৃদয় ধরিয়া,
 বঁধুর পায়ের কাছে গিয়ে
 অমনি মুরছি পড়ে যায়।

অথবা শিখিল কলেবরে
 এস তুমি, বসো মোর পাশে ;
 মরণ যেমন করে আসে,
 শিশির যেমন করে বারে ;
 পশ্চিমের আঁধার সাগরে
 তারাটি যেমন করে যায় ;
 অতি ধীরে যুহু হেসে, সিঁদুর সীমন্ত-দেশে
 দিবা সে যেমন করে আসে
 মরিবারে স্বামীর চিতায়,
 পশ্চিমের জলন্ত শিখায়।

পরবাসী স্মরণ-আয়ু

একটি মুম্বু'বায়ু

শেষ কথা বলিতে বলিতে
 তখনি যেমন মরে যায়,
 তেমনি, তেমনি করে এস,
 কবিতা রে, বধুটি আম্মার,
 ছুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস,
 ছুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
 বাহু ছুটি হৃদয়ে জড়াবে
 মরমে রাখিবি মুখখানি।

তারকার আত্মহত্যা

জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে

ঝাঁপিয়ে পড়িল এক তারা,

একেবারে উন্মাদের পারা ।

চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া

অবাক্ হইয়া—

এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে

মুহুর্তে সে গেল মিশাইয়া ।

যে সমুদ্রতলে

মনোহুখে আত্মঘাতী,

চির-নিৰ্বাপিত ভাতি —

শত মৃত তারকার

মৃতদেহ রয়েছে শয়ান,

সেথায় সে করেছে পয়ান ।

কেন গো কী হয়েছিল তার ।

একবার শুধালে না কেহ—

কী লাগি সে তেয়াগিল দেহ ।

যদি কেহ শুধাইত

আমি জানি কী যে সে কহিত ।

যতদিন বেঁচে ছিল

আমি জানি কী তারে দহিত ।

সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,

আর কিছু না !

জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড, ঢাকিতে আঁধার যদি

অনিবার হাসিতেই রহে

যত হাসে ততই সে দহে ।

সন্ধ্যাসংগীত

৭

তেমনি, তেমনি তারে হাসির অনল

দারুণ উজ্জ্বল—

দহিত, দহিত তারে, দহিত কেবল।

জ্যোতির্ময় তারাপূর্ণ বিজ্ঞন তেয়াগি,

তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে

আধারের তারাহীন বিজ্ঞনের লাগি।

কেন গো তোমরা যত তারা

উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা ?

তোমাদের হয়নি তো ক্ষতি,

যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে জ্যোতি।

সে কি কভু ভেবেছিল মনে—

(এত গর্ব আছিল কি তার ?

আপনারে নিবাইয়া তোমাদের করিবে আধার ?

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,

আধার সাগরে—

গভীর নিশীথে,

অতল আকাশে।

হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কি রে যায় তোর

ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে

ওই আধার সাগরে,

এই গভীর নিশীথে,

ওই অতল আকাশে।

আশার নৈরাশ্য

ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ ।
 নিরাশারি মতো যেন বিষণ্ণ বদন কেন ।
 যেন অতি সংগোপনে,
 যেন অতি সস্তর্পণে

অতি ভয়ে ভয়ে প্রাণে করিস প্রবেশ ।
 ফিরিবি কি প্রবেশিবি ভাবিয়া না পাস,
 কেন, আশা, কেন তোর কিসের তরাস ।

আজ আসিয়াছ দিতে যে সুখ-আশ্বাস,
 নিজে তাহা কর না বিশ্বাস,
 তাই হেন মৃদু গতি,
 তাই উঠিতেছে ধীরে দুখের নিশ্বাস ।
 বসিয়া মরম-স্থলে কহিছ চোখের জলে—

“বুঝি, হেন দিন রহিবে না,
 আজ যাবে, আসিবে তো কাল,
 দুঃখ যাবে ঘুচিবে যাতনা ।”
 কেন, আশা, মোরে কেন হেন প্রতারণা ।
 দুঃখক্লেশে আমি কি ভরাই,
 আমি কি তাদের চিনি নাই ।
 তারা সবে আমারি কি নয় ।
 তবে, আশা, কেন এত ভয় ।
 তবে কেন বসি মোর পাশ
 মোরে, আশা, দিতেছ আশ্বাস ।

বলো, আশা, বসি মোর চিতে,
 “আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
 হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
 আর যারে হত না সহিতে,

সন্ধ্যাসংগীত

৯

আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে ।”

করিয়ো না ভয়,
দুঃখ-জ্বালা আমারি কি নয় ?
তবে কেন হেন শ্রান মুখ,
তবে কেন হেন দীন বেশ ।
তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে
এ হৃদয়ে করিস প্রবেশ ।

পরিত্যক্ত

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার ।
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার ।
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার,
শুধু বলিতেছে
“চলে গেল সকলেই চলে গেল গো,
বুক শুধু ভেঙে গেল দ’লে গেল গো ।”

বসন্ত চলিয়া গেলে বর্ষা কেঁদে কেঁদে বলে,
“ফুল গেল, পাখি গেল
আমি শুধু রহিলাম, সবি গেল গো ।”
দিবস ফুরালে রাত্তি শুষ্ক হয়ে রহে,
শুধু কেঁদে কহে,
“দিন গেল, আলো গেল, রবি গেল গো,
কেবল একেলা আমি—সবি গেল গো ।”

রবীন্দ্র-রচনাবলী

উত্তর-বায়ুর সম প্রাণের বিজনে মম
কে যেন কাদিছে শুধু,
“চলে গেল, চলে গেল,
সকলেই চলে গেল গো।”

উৎসব ফুরায়ে গেলে ছিন্ন শুষ্ক মালা
পড়ে থাকে হেথায় হোথায়—
তৈলহীন শিখাহীন ভগ্ন দীপগুলি
ধুলায় লুটায়—
একবার ফিরে কেহ দেখে নাকো ভুলি
সুবে চলে যায়।

পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মতো
মোরে ফেলে গেল,
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত
সাথে না লইল।
তাই প্রাণ গাহে শুধু, কাদে শুধু, কহে শুধু,
“মোরে ফেলে গেল,
সকলেই মোরে ফেলে গেল
সকলেই চলে গেল গো।”

একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি ?
বুঝি চেয়েছিল।
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি ?
বুঝি কেঁদেছিল।
বুঝি ভেবেছিল—
লয়ে যাই—নিতান্ত কি একেলা কাদিবে ?
তাই বুঝি ভেবেছিল।
তাই চেয়েছিল।

সন্ধ্যাসংগীত

১১

তার পরে ? তার পরে !

তার পরে বুঝি হেসেছিল

একফোটা অশ্রুবারি

মুহুর্তেই শুকাইল ।

তার পরে ? তার পরে !

চলে গেল ।

তার পরে ? তার পরে !

ফুল গেল, পাখি গেল, আলো গেল, রবি গেল,

সবি গেল, সবি গেল গো—

হৃদয় নিশ্বাস ছাড়ি কাঁদিয়া কহিল,

“সকলেই চলে গেল গো,

আমারেই ফেলে গেল গো ।”

স্বখের বিলাপ

অবশ নয়ন নিম্নলিয়া

স্বখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া,

“এমন জোছনা স্বমধুর,

বাঁশরি বাজিছে দূর দূর,

যামিনীর হসিত নয়নে

লেগেছে মৃদুল সুমধোর ।

নদীতে উঠেছে মৃদু ঢেউ,

গাছেতে নড়িছে মৃদু পাতা ;

লতায় ফুটিয়া ফুল দুটি

পাতায় লুকায় তার মাথা ;

মলয় সুদূর বনভূমে

কাঁপায়ে গাছের ছায়াগুলি

লাজুক ফুলের মুখ হতে

ঘোমটা দিতেছে খুলি খুলি ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এমন মধুর রজনীতে
একেলা রয়েছে বসিয়া,
যামিনীর হৃদয় হইতে
জোছনা পড়িছে খসিয়া ।”

হৃদয়ে একেলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়,
“নিভান্ত একেলা আমি যে
কেহ, কেহ, কেহ নাই হার ।”
আমি তারে শুধাইছ গিয়া,
“কেন, সুখ, কার কর আশা ?”
সুখ শুধু কাদিয়া কহিল,
“ভালোবাসা, ভালোবাসা গো ।
সকলি, সকলি হেথা আছে
কুসুম ফুটেছে গাছে গাছে,
আকাশে তারকা রাশি রাশি,
জোছনা ঘুমায় হাসি হাসি,
সকলি, সকলি হেথা আছে,
সেই শুধু, সেই শুধু নাই,
ভালোবাসা নাই শুধু কাছে ।”

অবশ নয়ন নিম্নলিখিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া,
“এই তটিনীর ধারে, এই শুভ্র জোছনায়,
এই কুসুমিত বনে, এই বসন্তের বায়,
কেহ মোর নাই একেবারে,
তাই সাধ গেছে কাদিবারে ।
তাই সাধ যায় মনে মনে—
মিশাব এ যামিনীর সনে,
কিছুই হবে না আর প্রাতে,
শিশির রহিবে পাতে পাতে ।

সন্ধ্যাসংগীত

১৩

সাধ যায় মেঘটির মতো
 কাঁদিয়া মরিয়া গিয়া আজি
 অশ্রুজলে হই পরিণত ।”
 সুখ বলে, “এ জন্ম ঘুচায়ে
 সাধ যায় হইতে বিবাদ ।”
 “কেন সুখ, কেন হেন সাধ ?”
 “নিতান্ত একা যে আমি গো
 কেহ যে, কেহ যে নাই মোর ।”
 “সুখ, কারে চায় প্রাণ তোর ?
 সুখ, কার করিস রে আশা ?”
 সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে,
 “ভালোবাসা, ভালোবাসা গো ।”

হৃদয়ের গীতিধ্বনি

ও কী সুরে গান গাস হৃদয় আমার ?
 শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই,
 দিন নাই, রাত্রি নাই—
 অবিরাম অনিবার
 ও কী সুরে গান গাস হৃদয় আমার ?
 বিরলে বিজন বনে বসিয়া আপন মনে
 ভূমি পানে চেয়ে চেয়ে, একই গান গেয়ে গেয়ে—
 দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,
 তবু গান ফুরায় না আর ।
 মাথায় পড়িছে পাতা, পড়িছে শুকানো ফুল,
 পড়িছে শিশিরকণা, পড়িছে রবির কর,
 পড়িছে বরষা-জল বরষার বরষার,
 কেবলি মাথার 'পরে করিতেছে সমস্বরে
 বাতাসে শুকানো পাতা মরমর মরমর ;

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বসিয়া ধসিয়া সেথা, বিসীর্ণ মলিন প্রাণ
 গাহিতেছে একই গান একই গান একই গান ।
 পারিনে গুনিতে আর, একই গান একই গান ।

কখন থামিবি তুই, বল মোরে, বল প্রাণ ।

একেলা ঘুমায়ে আছি—

সহসা স্বপন টুটি,

সহসা জাগিয়া উঠি,

সহসা গুনিতে পাই

হৃদয়ের একধারে

সেই স্বর ফুটিতেছে,

সেই গান উঠিতেছে,

কেহ গুনিছে না যবে

চারিদিকে শুধু সবে

সেই স্বর, সেই গান

অবিরাম অবিশ্রাম

অচেতন আধারের শিরে শিরে চেতনা সঞ্চারে ।

দিবসে মগন কাজে, চারিদিকে দলবল,

চারিদিকে কোলাহল ।

সহসা পাতিলে কান, গুনিতে পাই সে গান,

নানাশব্দময় সেই জনকোলাহল ।

তাহারি প্রাণের মাঝে, একমাত্র শব্দ বাজে,

এক সুর, এক ধ্বনি, অবিরাম অবিরল ;

যেন সে কোলাহলের হৃদয়স্পন্দন-ধ্বনি—

সমস্ত ভুলিয়া যাই, বসে বসে তাই গনি ।

ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে

কে যেন বিষণ্ণ প্রাণী দিনরাত বসে আছে—

চিরদিন করিতেছে বাস,

তারি গুনিতেছি যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস ।

সন্ধ্যাসংগীত

১৫

এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
 ঘুঘু এক বসে বসে গায় একস্বরে,
 কে জানে কেন সে গান গায়।
 গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
 প্রতিধ্বনি করে হায় হায়।

হৃদয় রে, আর কিছু শিখিলিনে তুই,
 শুধু ওই গান।
 প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
 শুধু ওই তান।

তবে থাম্ থাম্ ওরে প্রাণ,
 পারিনে গুনিতে আর একই গান, একই গান।

দুঃখ-আবাহন

আয় দুঃখ, আয় তুই,
 তোর তরে পেতেছি আসন,
 হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
 বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
 বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস শোষণ ;
 জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ।
 হৃদয়ে আয় রে তুই হৃদয়ের ধন।

নিভৃতে ঘুমাবি তুই হৃদয়ের নীড়ে ;
 অতি গুরু তোর ভার,
 দু-একটি শিরা তাহে যাবে বুঝি ছিঁড়ে,
 যাক ছিঁড়ে।

জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন
 হর্বল বকের 'পরে করিব ধারণ,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

একেলা বসিয়া ঘরে অবিরল একস্বরে
 গাব তোর কানে কানে ঘুম পাড়াবার গান।
 মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত হৃ-নয়ান।
 প্রাণের ভিতর হতে উঠিয়া নিশ্বাস
 শ্রান্ত কপালেতে তোর করিবে বাতাস,
 তুই নীরবে ঘুমাস।

আয় দুঃখ আয় তুই, ব্যাকুল এ হিয়া।
 তুই হাতে মুখ চাপি হৃদয়ের ভূমি 'পরে
 পড় আছাড়িয়া।
 সমস্ত হৃদয় ব্যাপি' একবার উচ্চস্বরে
 অনাথ শিশুর মতো ওঠ রে কাঁদিয়া।
 প্রাণের মর্মের কাছে
 একটি যে ভাঙা বাণ আছে,
 তুই হাতে তুলে নে রে সবলে বাজায়ে দে রে,
 নিতান্ত উন্মাদ সম বন্ বন্ বন্ বন্।
 ভাঙে তো ভাঙিবে বাণ, ছেঁড়ে তো ছিঁড়িবে তন্ত্রী,
 নে রে তবে তুলে নে রে সবলে বাজায়ে দে রে,
 নিতান্ত উন্মাদ সম বন্ বন্ বন্ বন্।
 দারুণ আহত হয়ে দারুণ শব্দের ঘায়
 যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গনি
 একেবারে সমস্বরে
 কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়,
 দুঃখ তুই, আয় তুই আয়।

নিতান্ত একেলা এ হৃদয়।
 আর কিছু নয়,
 কাছে আয় একবার,—তুলে ধর মুখ তার,
 মুখে তার আঁখি দুটি রাখ্
 একদৃষ্টে চেয়ে শুধু থাক্।

সন্ধ্যাসংগীত

১৭

আর কিছু নয়,
 নিরালস্য এ হৃদয়
 শুধু এক সহচর চায়।
 তুই দুঃখ, তুই কাছে আয়।
 কথা না কহিস যদি বসে থাক্ নিরবধি
 হৃদয়ের পাশে দিনরাতি।
 যখনি খেলাতে চাস, হৃদয়ের কাছে যাস
 হৃদয় আমার চায় খেলাবার সাথি।

আর দুঃখ, হৃদয়ের ধন,
 এই হেথা পেতেছি আসন।
 প্রাণের মর্মেয় কাছে
 এখনো যা রক্ত আছে
 তাই তুই করিস শোষণ।

শান্তি-গীত

ঘুমা দুঃখ, হৃদয়ের ধন,
 ঘুমা তুই, ঘুমা রে এখন।
 সুখে সারা দিনমান শোণিত করিয়া পান
 এখন তো মিটেছে তিয়াষ ?
 দুঃখ তুই সুখেতে ঘুমা।

আজ জোছনার রাত্রে বসন্ত-পবনে,
 অতীতের পরলোক ত্যজি শূন্যমনে,
 বিগত দিবসগুলি শুধু একবার
 পুরানো খেলার ঠাঁই দেখিতে এসেছে
 এই হৃদয়ে আমার ;

রবীন্দ্র-রচনাবলী

যবে বেঁচেছিল তারা এই এ শ্মশানে
 দিন গেলে প্রতিদিন পুড়াত যেখানে
 একেকটি আশা আর একেকটি স্মৃতি,
 সেইখানে আসি তারা বসিয়া রয়েছে
 অতি স্নান মুখ ।

সেখানে বসিয়া তারা সকলে মিলিয়া
 অতি মৃদু স্বরে
 পুরানো কালের গীতি নবন মুদিয়া
 ধীরে গান করে ।

দুঃখ তুই ঘুমা ।
 ধীরে উঠিতেছে গান,
 ক্রমে ছাইতেছে প্রাণ,
 নীরবতা ছায় যথা সন্ধ্যার গগন ।
 গানের প্রাণের মাঝে, তোর তীব্র কণ্ঠস্বর
 ছুরির মতন ।
 তুই থাম্‌ দুঃখ থাম্‌,
 তুই ঘুমা দুঃখ ঘুমা ।

কাল উঠিস আবার,
 খেলিস দুরন্ত খেলা হৃদয়ে আমার ;
 হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর
 তাইতে রচিস তন্ত্রী বীণাটির তোর,
 সারাদিন বাজাস বসিয়া
 ধ্বনিয়া হৃদয় ।
 আজ রাত্রে রব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে
 আর কিছু নয় ।

অসহ ভালোবাসা

বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,
 কী ভাব তোমার মনে জাগে,
 বুকফাটা প্রাণফাটা মোর ভালোবাসা
 এত বুঝি ভালো নাহি লাগে ।
 এত ভালোবাসা বুঝি পার না সহিতে,
 এত বুঝি পার না বহিতে ।

যখনি গো নেহারি তোমায়—
 মুখ দিয়া, আঁখি দিয়া বাহিরিতে চায় ছিয়া,
 শিরার শৃঙ্খলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়,
 ওই মুখ বুক ঢাকে, ওই হাতে হাত রাখে,
 কী করিবে ভাবিয়া না পায়,
 যেন তুমি কোথা আছ খুঁজিয়া না পায় ।
 মন মোর পাগলের হেন প্রাণপণে শুধায় সে যেন,
 “প্রাণের প্রাণের মাঝে কি করিলে তোমারে গো পাই,
 যে ঠাই রয়েছে শূন্য, কী করিলে সে শূন্য পুরাই ।”

এইরূপে দেহের দুয়ারে
 মন যবে থাকে যুঝিবারে,
 তুমি চেয়ে দেখ মুখ-বাগে
 এত বুঝি ভালো নাহি লাগে ।
 তুমি চাও যবে মাঝে মাঝে
 অবসর পাবে তুমি কাছে
 আমারে ডাকিবে একবার
 কাছে গিয়া বসিব তোমার ।
 যত্ন যত্ন স্নমধুর বাণী
 কব তব কানে কানে রানী ।
 তুমিও কহিবে যত্ন ভাষ,
 তুমিও হাসিবে যত্ন হাস.

রবীন্দ্র-রচনাবলী

হৃদয়ের মৃদু খেলাখেলি ;
ফুলেতে ফুলেতে হেলাহেলি ।

চাও তুমি দুখহীন প্রেম,
ছুটে যেথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনা-লহরী,
বহে যেথা বসন্ত-বাতাস ।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম,
আছে যেথা অনন্ত পিরাস,
বহে যেথা চোখের সলিল,
উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস ।
প্রাণ যেথা কথা ভুলে যায়,
আপনারে ভুলে যায় হিয়া,
অচেতন চেতনা যেথায়
চরাচর ফেলে হারাইয়া ।

এমন কি কেহ নাই, বল মোরে বল আশা,
মার্জনা করিবে মোর অতি, অতি ভালোবাসা ।

ইলাহল

এমন ক-দিন কাটে আর ।
ললিত গলিত হাস, জাগরণ, দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়ন-সলিল-ধার,
মৃদু হাসি, মৃদু কথা—আদরের, উপেক্ষার ;
এই শুধু, এই শুধু, দিনরাত এই শুধু
এমন ক-দিন কাটে আর ।

কটাক্ষে মরিয়া যায়, কটাক্ষে বাঁচিয়া উঠে.
হাসিতে হৃদয় জুড়ে, হাসিতে হৃদয় টুটে,

সন্ধ্যাসংগীত

২১

ভীকর মতন আসে দাঁড়ারে শ্বহে গো পাশে,
 ভয়ে ভয়ে মুহু হাসে, ভয়ে ভয়ে মুখ ফুটে,
 একটু আদর পেলে অমনি চরণে লুটে,
 অমনি হাসিটি জাগে মলিন অধরপুটে ;
 একটু কটাক্ষ হেরি অমনি সরিয়া যায়,
 অমনি জগৎ যেন শূন্য মরুভূমি হেন,
 অমনি মরণ যেন প্রাণের অধিক ভায় ।

প্রণয় অমৃত এ কি ? এ যে ঘোর হলাহল—
 হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
 অবশ করে ছে দেহ শোণিত করেছে জল ।
 কাজ নাই, কর্ম নাই, বসে আছে এক ঠাই
 হাসি ও কটাক্ষ লয়ে খেলেনা গড়িছে যত,
 কতু ঢুলে-পড়া আঁখি, কতু অশ্রুভারে নত ।
 দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা,
 জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়-নাশা ।
 কোথায় প্রণয়ে মন যৌবনে ভরিয়া উঠে,
 জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে,
 চোখেতে সকলি ঠেকে বসন্ত-হিল্লোলময়—
 হৃদয়ের শিরে শিরে শোণিত সতেজে বয় ।
 তা নয়, এ কি এ হল, এ কি এ জর্জর মন,
 হাসিহীন দু-অধর, জ্যোতিহীন দু-নয়ন ।
 দূরে যাও, দূরে যাও, হৃদয় রে দূরে যাও—
 ভুলে যাও, ভুলে যাও, ছেলেখেলা ভুলে যাও ।
 দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা,
 জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়-নাশা ।

অনুগ্রহ

এই যে জগৎ হেরি আমি,
 মহাশক্তি জগতের স্বামী,
 এ কি হে তোমার অনুগ্রহ ?
 হে বিধাতা, কহ মোরে কহ ।
 ওই যে সম্মুখে সিদ্ধ, এ কি অনুগ্রহ-বিন্দু ?
 ওই যে আকাশে শোভে চন্দ্র সূর্য গ্রহ
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তব অনুগ্রহ ।
 ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র একজন,
 আমারে যে করেছ সৃজন,
 এ কি শুধু অনুগ্রহ ক'রে
 ঋণপাশে বাঁধিবারে মোরে ?
 করিতে করিতে যেন খেলা,
 কটাক্ষে করিয়া অবহেলা,
 হেসে ক্ষমতার হাসি, অসীম ক্ষমতা হতে
 ব্যয় করিয়াছ এক রতি,
 অনুগ্রহ ক'রে মোর প্রতি ?
 শুভ শুভ জু'ই দুটি ওই যে রয়েছে ফুটি
 ও কি তব অতি শুভ ভালোবাসা নয় ?
 বলো মোরে, মহাশক্তিময়,
 ওই যে জোছনা-হাসি, ওই যে তারকা-রাশি,
 আকাশে হাসিয়া ফুটে রয়,
 ও কি তব ভালোবাসা নয় ?
 ও কি তব অনুগ্রহ-হাসি
 কঠোর পাষণ লৌহময় ?
 তবে হে হৃদয়হীন দেব,
 জগতের রাজ-অধিরাজ,
 হানো তব হাসিময় বাজ,

সন্ধ্যাসংগীত

২৩

মহা অল্পগ্রহ হতে তব
মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহি না থাকিতে এ সংসারে ।

ভালোবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মতো,
স্নেহ করি আকাশের প্রায় ।
আপনারে দিইছি কেলিয়া,
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভালোবাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালোবাসা চায় ।

সাক্ষী আছ তুমি অন্তর্যামী
কতখানি ভালোবাসি আমি,
দেখি যবে তার মুখ, হৃদয়ে দারুণ স্মৃতি
ভেঙে ফেলে হৃদয়ের দ্বার,
বলে, “এ কী ঘোর কারাগার ।”

প্রাণ বলে, “পারিনে সহিতে,
এ দুঃস্বপ্ন স্মৃতিতে বহিতে ।”
আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথলি উঠি
দেয় যথা মহা পারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালোবাসে,
হৃদয়ের প্রতি চেউ উথলি গাহিয়া উঠে
আকাশ পুরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে ।
ভেঙে কেলি’ উপকূল পৃথিবী ডুবাতে চাহে
আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ,

রবীন্দ্র রচনাবলী

আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
 একটি জগত-ব্যাপী গান ।
 তাহারে কবির অশ্রু হাসি
 দিয়েছি কত না রাশি রাশি,
 তাহারি কিরণে ফুটিতেছে
 হৃদয়ের আশা ও ভরসা,
 তাহারি হাসি ও অশ্রুজল
 এ প্রাণের বসন্ত বরষা ।

ভালোবাসি, আর গান গাই—
 কবি-হৃদয়ে জন্মেছি ধরায়,
 রাত্রি এত ভালো নাহি বাসে,
 উষা এত গান নাহি গায় ।

ভালোবাসা স্বাধীন মহান,
 ভালোবাসা পর্বত-সমান ।
 ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
 পৃথিবীতে চাহে সে যখন ;
 সে চাহে উজ্জল করিবারে,
 সে চাহে উর্বর করিবারে ;
 জীবন করিতে প্রবাহিত
 কুসুম করিতে বিকশিত ।
 চাহে সে বাসিতে শুধু ভালো,
 চাহে সে করিতে শুধু আলো,
 স্বপ্নেও কি ভাবে কভু ধরা,
 তপনেরে অনুগ্রহ করা ?
 যবে আমি যাই তার কাছে
 সে কি মনে ভাবে গো তখন,
 অনুগ্রহ ভিক্ষা মাগিবারে
 এসেছে ভিক্ষুক একজন ?

সন্ধ্যাসংগীত

২৫

অল্পগ্রহ পাষণ-মমতা,
 করুণার কঙ্কাল কেবল,
 ভাবহীন বজ্রে গড়া হাসি—
 স্ফটিক-কঠিন অশ্রুজল ;
 অল্পগ্রহ বিলাসী গর্বিত,
 অল্পগ্রহ দয়ালু-কৃপণ—
 বহু কষ্টে অশ্রুবিन्दু দেয়
 শুষ্ক আঁখি করিয়া মম্বন ।
 নীচ হীন দীন অল্পগ্রহ
 কাছে যবে আসিবারে চায়,
 প্রণয় বিলাপ করি উঠে—
 গীত-গান ঘুণায় পলায় ।

হে দেবতা, অল্পগ্রহ হতে
 রক্ষা করে। অভাগা কবিরে,
 অপযশ, অপমান দাও
 দুঃখ-জ্বালা বহিব এ শিরে ।
 সম্পদের স্বর্ণ-কারাগারে,
 গরবের অন্ধকার মাঝ,
 অল্পগ্রহ রাজার মতন
 চিরকাল করুক বিরাজ ।
 সোনার শৃঙ্খল বাংকারিয়া,
 গরবের স্ফীত দেহ লয়ে,
 অল্পগ্রহ আসে নাকো যেন
 আমাদের স্বাধীন আলয়ে ।
 গান আসে ব'লে গান গাই,
 ভালোবাসি ব'লে ভালোবাসি,
 কেহ যেন মনে নাহি করে
 মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

না হয় শুনো না মোর গান,
ভালোবাসা ঢাকা রবে মনে ;
অনুগ্রহ করে এই কোরো
অনুগ্রহ কোরো না এ-জনে ।

আবার

তুমি কেন আসিলে হেথায়
এ আমার সাধের আবাসে ।
এ আলয়ে যে নিবাসী থাকে,
এ আলয়ে যে অতিথি আসে,
সবাই আমার সখা, সবাই আমার বন্ধু,
সবারেই আমি ভালোবাসি,
তারাও আমারে ভালোবাসে,
তুমি তবে কেন এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে ?

এ আমার প্রেমের আলয়,
এ মোর স্নেহের নিকেতন,
বেছে বেছে কুসুম তুলিয়া
রচিয়াছি কোমল আসন ।
কেহ হেথা নাইকো নিষ্ঠুর,
কিছু হেথা নাইকো কঠিন,
কবিতা আমার প্রণয়িনী
এইখানে আসে প্রতিদিন ।

সমীর কোমল-মন আসে হেথা অনুক্ষণ,
যখন সে পায় অবকাশ,
যখন প্রভাত ফুটে, যখন সে জেগে উঠে,
ছুটিয়া সে আসে মোর পাশ ;

সন্ধ্যাসংগীত

২৭

দুই বাহু প্রসারিয়া, আমারে বৃকেতে নিয়া,
 কত শত বারতা শুধায়,
 সখা মোর প্রভাতের বায় ।
 আকাশেতে তুলে আঁখি বাতায়নে বসে থাকি
 নিশি যবে পোহায়-পোহায় ;
 উষার আলোকে হারা সখী মোর শুকতারি
 আমার এ মুখপানে চায়,
 নীরবে চাহিয়া রহে, নীরব নয়নে কহে,
 “সখা, আজ বিদায়, বিদায় ।”
 ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
 প্রতিদিন আসে মোর পাশে ।
 দেখে, আমি বাতায়নে, অশ্রু বরে দু-নয়নে,
 ফেলিতেছি দুখের নিশ্বাস ;
 অতি ধীরে আলিঙ্গন করে,
 কথা কহে সক্রমণ স্বরে,
 কানে কানে বলে, “হায় হায় ।”
 কোমল কপোল দিয়া কপোল চুষন করি
 অশ্রুবিन्दু স্তম্ভীরে শুকাই ।
 সবাই আমার মন বুঝে,
 সবাই আমার দুঃখ জানে,
 সবাই করুণ আঁখি মেলি
 চেয়ে থাকে এই মুখপানে ।
 যে কেহ আমার ঘরে আসে
 সবাই আমারে ভালোবাসে,
 তবে কেন তুমি এলে হেথা,
 এ আমার সাধের আবাসে ।

ফেরো ফেরো, ও নয়ন রসহীন ও বয়ন
 আনিয়ো না এ মোর আলয়ে,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আমরা সখারা মিলি আছি হেথা নিরিবিলি

আপনার মনোহুঃখ লয়ে।

এমনি হয়েছে শান্ত মন,

ঘুচেছে দুঃখের কঠোরতা ;

ভালো লাগে বিহৃদের গান,

ভালো লাগে তটিনীর কথা।

ভালো লাগে কাননে দেখিতে

বসন্তের কুসুমের মেলা,

ভালো লাগে, সারাদিন বসে

দেখিতে মেঘের ছেলেখেলা।

এইরূপে সায়াহের কোলে

রচেছি গোখলি-নিকেতন,

দিবসের অবসান-কালে

পশে হেথা রবির কিরণ।

আসে হেথা অতি দূর হতে

পাখিদের বিরামের তান,

ত্রিয়মাণ সন্ধ্যা-বাতাসের

থেকে থেকে মরণের গান।

পরিশ্রান্ত অবশ পর্যানে

বসিয়া রয়েছি এইখানে।

যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিয়ো না নিয়ো না কেড়ে,

নিয়ো না, নিয়ো না মন মোর ;

সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিয়ো না মোরে,

ছিঁড়ো না এ প্রণয়ের ডোর।

আবার হারাই যদি এই গিরি, এই নদী,

মেঘ বায়ু কানন নির্বর,

আবার স্বপন ছুটে একেবারে যায় টুটে

এ আমার গোখলির ঘর,

আবার আশ্রয়হারা,
ঘুরে ঘুরে হই সারা,
বাটিকার মেঘখণ্ড সম,
দুঃখের বিছাৎ-কণা
পোষণ করিয়া বক্ষে মম,—
ভীষণ ভুজঙ্গ এক
তাহা হলে এ জনমে,
নিরাশ্রয় এ জীবনে .
ভাঙা ঘর আর গড়িবে না,
ভাঙা হৃদি আর জুড়িবে না ।
কাল সবে গড়েছি আলয়,
কাল সবে জুড়েছি হৃদয়.
আজি তা দিয়ো না যেন ভেঙে
রাখো তুমি রাখো এ বিনয় ।

ପାଠ୍ୟାଳୟ

জগতের বাতাস করুণা,
করুণা সে ববিশশিতারা,
জগতের শিশির করুণা,
জগতের বৃষ্টিবারিধারা ।
জননীর স্নেহধারাসম
এই যে জাহ্নবী বহিতেছে,
মধুরে তটের কানে কানে
আশ্বাস-বচন कहিতেছে—
এও সেই বিমল করুণা,
হৃদয় ঢালিয়া বহে যায়,
জগতের তৃষা নিবারিয়া
গান গাহে করুণ ভাষায় ।
কাননের ছায়া সে করুণা,
করুণা সে উষার কিরণ,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

করুণা সে জননীর আঁখি,
 করুণা সে প্রেমিকের মন ;
 এমন যে মধুর করুণা,
 এমন যে কোমল করুণা,
 জগতের হৃদয়-জুড়ানো
 এমন যে বিমল করুণা,—
 দিন দিন বুক ফেটে যায়,
 দিন দিন দেখিবারে পাই,
 যারে ভালোবাসি প্রাণপণে
 সে করুণা তার মনে নাই ।

পরের নয়ন-জলে তার না হৃদয় গলে,
 দুখে সে করে উপহাস,
 দুখে সে করে অবিশ্বাস ;
 দেখিয়া হৃদয় মোর তরাসে শিহরি উঠে,
 প্রেমের কোমল প্রাণে, শত শত শেল ফুটে,
 হৃদয় কাতর হয়ে নয়ন মুদ্রিতে চায়,
 কাদিয়া সে বলে, “হায় হায়,
 এ তো নহে আমার দেবতা,
 তবে কেন রয়েছে হেথায় ।”

তুমি নও, সে জন তো নও,
 তবে তুমি কোথা হতে এলে ।
 এলে যদি এস তবে কাছে,
 এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে—
 একবার সব দিই ঢেলে,
 তোমার সে কঠিন পরান
 যদি তাহে একতিল গলে,
 কোমল হইয়া আসে মন
 সিক্ত হয়ে অশ্রু জলে জলে ।
 কাদিবারে শিখাই তোমায়,

সন্ধ্যাসংগীত

৩১

পর-দুঃখে ফেলিতে নিশ্বাস,
 করুণার সৌন্দর্য অতুল
 ও নয়নে করে যেন বাস ।
 প্রতিদিন দেখিয়াছি আমি
 করুণারে কয়েছ পীড়ন,
 প্রতিদিন ওই মুখ হতে
 ভেঙে গেছে রূপের মোহন ।
 কুবলয়-আখির মাঝারে
 সৌন্দর্য পাই না দেখিবারে,
 হাসি তব আলোকের প্রায়
 কোমলতা নাহি যেন তায়,
 তাই মন প্রতিদিন কহে,
 “নহে নহে, এ জন সে নহে ।”

শোনো বঁধু শোনো, আমি করুণারে ভালোবাসি,
 সে যদি না থাকে তবে ধূলিময় রূপরাশি ।
 তোমাতে যে পূজা করি, তোমাতে যে দিই ফুল,
 ভালোবাসি বলে যেন কখনো কোরো না ভুল ।
 যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি.
 তুমি তো কেবল তাঁর পাষণ-প্রতিমাখানি ।
 তোমার হৃদয় নাই, চোখে নাই অশ্রুধার,
 কেবল রয়েছে তব, পাষণ-আকার তার ।

দু-দিন

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার-জাল,
 শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন ;
 মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে
 বিবাদে প্রকৃতিমাতা শুভ্র বাষ্পজালে গাঁথা
 কুজাট-বসনখানি দেছেন টানিয়া ;
 পশ্চিমে গিয়েছে রবি, শুক্ল সন্ধ্যাবেলা,
 বিদেশে আসিছে শ্রান্ত পথিক একেলা ।

রহিল দু-দিন ।

এখনো রয়েছে শীত বিহঙ্গ গাহে না গীত
 এখনো বরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন ।
 বসন্তের প্রাণভরা চুখন-পরশে
 সর্ব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে আকুল হিয়া
 মৃতশয্যা হতে ধরা জাগেনি হরষে ।
 এক দিন দুই দিন ফুরাইল শেষে,
 আবার উঠিতে হল চলিল বিদেশে ।

এই যে কিরান্ন মুখ চলিল পুরবে ;
 আর কি রে এ জীবনে কিরে আসা হবে ।
 কত মুখ দেখিয়াছি দেখিব না আর ।
 ঘটনা ঘটিবে কত, বরষ বরষ শত
 জীবনের 'পর দিয়া হয়ে যাবে পার ;
 হয়তো বা একদিন অতি দূর দেশে,
 আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে, বাতাস যেতেছে বয়ে,
 একেলা নদীর ধারে রহিয়াছি বসে,
 হু হু করে উঠিবেক সহসা এ হিয়া,
 সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্থিতি উজলিয়া

সন্ধ্যাসংগীত

৩৩

একটি অক্ষুট রেখা সহসা দিকে যে দেখা,
 একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,
 একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে,
 হু-একটি সুর তার উদিবে স্মরণে,
 অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
 বিশ্বতির বাঁধগুলি ভাঙিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
 সেদিনের কথাগুলি বহুতার মতন
 একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।

শতফুলদলে গড়া সেই মুখ তার,
 স্বপনেতে প্রতিনিধি হৃদয়ে উদিবে আসি,
 এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।
 সেই মুখ সদ্য মোর হইবে বিজনে,
 নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
 নক্ষত্র-গ্রহের মতো উঠিবেক ফুটে
 ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার,
 নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
 চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুমঘোরে,
 “যাবে তবে ? যাবে ?” সেই ভাঙা-ভাঙা স্বরে।

ফুরাল দু-দিন,
 শরতে যে শাখা হয়েছিল পত্রহীন
 এ দু-দিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া।
 অচল শিখর 'পরি' যে তুষার ছিল পড়ি
 এ দু-দিনে কণা তার বায়নি গলিয়া,
 কিন্তু এ দু-দিন তার শত বাহু দিয়া
 চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।
 দু-দিনের পদচিহ্ন চিরদিন তরে
 অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে।

পরাজয়-সংগীত

ভালো করে যুঝিলিনে, হল তোরি পরাজয়,
কী আর ভাবিতেছিস, ত্রিয়মাণ, হা হৃদয়।
কাঁদ তুই, কাঁদ, হেথা আয়,
একা বসে বিজনে বিদেশে।
জানিতাম জানিতাম হা রে
এমনি ঘটবে অবশেষে।

সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল
তোরি শুধু হল পরাজয়,
প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
জীবনের রাজ্য সমুদয়।
যতবার প্রতিজ্ঞা করিলি
ততবার পড়িল টুটিয়া,
ছিন্ন আশা বাঁধিয়া তুলিলি
বার বার পড়িল লুটিয়া।
সাস্থনা সাস্থনা করি ফিরি
সাস্থনা কি মিলিল রে মন ?
জুড়াইতে ক্ষত বক্ষঃস্থল
ছুরিয়ে করিলি আলিঙ্গন।
ইচ্ছা, সাধ, আশা যাহা ছিল
অদৃষ্ট সকলি লুটে নিল।

মন হইতেছে আজি, জীবন হারায়ে গেছে
মরণ হারায়ে গেছে হায়,
কে জানে এ কী এ ভাব ? শূন্যপানে চেয়ে আছি
মৃত্যুহীন মরণের প্রায়।

সন্ধ্যাসংগীত

৩৫

পরাজিত এ হৃদয়, জীবনের দুর্গ যম
মরণে করিল সমর্পণ,
তাই আজ জীবনে মরণ।

জাগ্ জাগ্ জাগ্ ওরে গ্রাসিতে এসেছে তোরে

নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,

আকাশ-গরাসী তার কায়।

গেল তোর চন্দ্র স্বর্ঘ, গেল তোর গ্রহ তারা,

গেল তোর আত্ম আর পর,

এইবেলা প্রাণপণ কর।

এইবেলা কিরে দাঁড়া তুই,

শ্রোতোমুখে ভাসিসনে আর।

যাহা পাস আঁকড়িয়া ধর

সম্মুখে অসৌম পারাবার।

সম্মুখেতে চির অমানিশি।

সম্মুখেতে মরণ বিনাশ।

গেল, গেল, বুঝি নিয়ে গেল

আবর্ত করিল বুঝি গ্রাস।

শিশির

শিশির কাদিয়া শুধু বলে,

“কেন মোর হেন ক্ষুদ্র প্রাণ ?

শিশুটির কল্পনার মতো।

জন্মি’ অমনি অবসান ?

ঘুম-ভাঙা উষা-মেয়েটির

একটি স্নেহের অশ্রু হায়,

হাসি তার ফুরাতে ফুরাতে

এ অশ্রুটি শুকাইয়া যায়।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

টুকটুকে মুখখানি নিয়ে
 গোলাপ হাসিছে মুচকিয়ে,
 বকুল প্রাণের সুখা দিয়ে,
 বায়ুরে মাতাল করি তুলে ;
 প্রজাপতি ভাবিয়া না পায়
 কাহারে তাহার প্রাণ চায়,
 তুলিয়া অলস পাখা দুটি
 ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে ।
 সেই হাসিরাশির মাঝারে
 আমি কেন থাকিতে না পাই ?
 যেহুনি নয়ন মেলি, হাস্য,
 সুখের নিমেষটির প্রায়,
 অতৃপ্ত হাসিটি মুখে লয়ে
 অমনি কেন গো মরে যাই ।”

শুয়ে শুয়ে অশোক-পাতায়
 মুমূর্ষু শিশির বলে, “হায়,
 কোনো সুখ ফুরায়নি যার
 তার কেন জীবন ফুরায় ।”

“আমি কেন হইনি শিশির ।”
 কহে কবি নিশ্বাস ফেলিয়া ।
 “প্রভাতেই যেতেম শুকায়ে
 প্রভাতেই নয়ন মেলিয়া ।
 হে বিধাতা, শিশিরের মতো
 গড়েছ আমার এই প্রাণ,
 শিশিরের মরণটি কেন
 আমারে করনি তবে দান ।”

সংগ্রাম-সংগীত

হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে করিব সংগ্রাম ।
এতদিন কিছু না করিছ,
এতদিন বসে রহিলাম,
আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম ।

বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার,
জগৎ করিছে ছারখার ।
গ্রাসিছে চাঁদের কায়্য ফেলিয়া আঁধার ছায়্য
সুবিশাল রাহুর আঁকার ।
মেলিয়া আঁধার গ্রাস দিনেরে দিতেছে ত্রাস,
মলিন করিছে মুখ তার ।
উষার মুখের হাসি লয়েছে কাড়িয়া,
গভীর বিরামময় সন্ধ্যার প্রাণের মাঝে
দুঃসন্ত অশান্তি এক দিয়াছে ছাড়িয়া ।
প্রাণ হতে মুছিতেছে অরুণের রাগ,
দিতেছে প্রাণের মাঝে কলঙ্কের দাগ ।
প্রাণের পাখির গান দিয়াছে থামায়,
বেড়াত যে সাধগুলি যেঘের দোলায় ছলি
তাদের দিয়াছে হায় ভূতলে নামায় ।
ক্রমশই বিছাইছে অন্ধকার পাখা,
আঁধারি হতে সব কিছু পড়িতেছে ঢাকা ।
ফুল ফুটে, আমি আর দেখিতে না পাই,
পাখি গাহে, মোর কাছে গাহে না সে আর ।
দিন হল, আলো হল, তবু দিন নাই,
আমি শুধু নেহারি পাখার অন্ধকার ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মিছা বসে রহিব না আর

চরাচর হারায় আমার ।

রাজ্যহারা ভিখারির সাজে,

দগ্ধ ধ্বংস ভস্ম 'পরি ভ্রমিব কি হাহা করি

জগতের মরুভূমি মাঝে ?

আজ তবে হৃদয়ের সাথে

একবার করিব সংগ্রাম ।

ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি

জগতের একেকটি গ্রাম ।

ফিরে নেব রবিশশিতারা,

ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা

পৃথিবীর শ্রামল ঘোঁবন,

কাননের ফুলময় ভূষা ।

ফিরে নেব হারানো সংগীত,

ফিরে নেব মৃতের জীবন,

জগতের ললাট হইতে

আঁধার করিব প্রক্ষালন ।

আমি হব সংগ্রামে বিজয়ী,

হৃদয়ের হবে পরাজয়,

জগতের দূর হবে ভয় ।

হৃদয়েরে রেখে দেব বেঁধে,

বিরলে মরিবে কেঁদে কেঁদে ।

দুঃখে বি'ধি' কষ্টে বি'ধি' অর্জব করিব হৃদি

বন্দী হয়ে কাটাবে দিবস,

অবশেষে হইবে সে বশ,

জগতে রটিবে মোর বশ ।

বিশ্বচরাচরময়

উচ্ছ্বসিবে জয় জয়

উল্লাসে পুরিবে চারিধার,

সন্ধ্যাসংগীত

৩৯

গাবে রবি, গাবে শশি, গাবে তারা শূন্যে বসি
 গাবে বায়ু শত শত বার ।
 চারিদিকে দিবে ছলুধ্বনি,
 বরষিবে কুসুম-আসার,
 বেঁধে দেব বিজয়ের মালা
 শান্তিময় ললাটে আমার ।

আমি-হার

হায় হায়,
 জীবনের তরুণ বেলায়,
 কে ছিল রে হৃদয়-মাঝারে,
 তুলিত রে অরুণ-দোলায় ।
 হাসি তার ললাটে ফুটিত,
 হাসি তার ভাসিত নয়নে,
 হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত
 সুকোমল অধর-শয়নে ।
 ঘুমাইলে, নন্দন-বালিকা
 গোধে দিত স্বপন-মালিকা ;
 জাগরণে, নয়নে তাহার
 ছায়াময় স্বপন জাগিত ;
 আশা তার পাখা প্রসারিয়া
 উড়ে যেত উধাও হইয়া,
 চাঁদের পায়ের কাছে গিয়ে
 জ্যোৎস্নাময় অমৃত মাগিত ।
 বনে সে তুলিত শুধু ফুল,
 শিশির করিত শুধু পান,
 প্রভাতের পাখিটির মতো
 হরষে করিত শুধু গান ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কেঁ গো সেই, কে গো হায় হায়,
 জীবনের তরুণ বেলায়
 খেলাইত হৃদয়-মাঝারে
 তুলিত রে অরুণ-দোলায়
 সচেতন অরুণ-কিরণ
 কে সে প্রাণে এসেছিল নামি ।
 সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
 সে আমার স্নকুমার আমি ।

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
 পথমাঝে উড়িল রে ধূলি,
 হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে
 দু-জনে আইল পথ ভুলি ।
 নয়নে পড়িছে তার রেণু,
 শাখা বাজে স্নকুমার কায়,
 ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস
 কাঁটা বিধে স্নকোমল গায় ।
 ধুলায় মলিন হল দেহ,
 সন্ডয়ে মলিন হল মুখ,
 কেঁদে সে চাহিল মুখপানে
 দেখে মোর কেটে গেল বুক ।

কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
 “ওগো মোরে আনিলে কোথায় ?
 পায় পায় বাজিতেছে বাধা,
 তরুশাখা লাগিছে মাথায় ।
 চারিদিকে মলিন, আঁধার,
 কিছু হেথা নাহি যে স্নন্দর,
 কোথা গো শিশির-মাথা ফুল,
 কোথা গো প্রভাত-রবিকর ?”

সন্ধ্যাসংগীত

৪১

কৈঁদে কৈঁদে সাথে সে চলিল;
 কহিল সে সন্ধ্যা স্বর,
 “কোথা গো শিশির-মাথা ফুল,
 কোথা গো প্রভাত-রবিকর।”
 প্রতিদিন বাড়িল আঁধার
 পথ হল পঙ্খিল মলিন,
 মুখে তার কথাটিও নাই,
 দেহ তার হল বলহীন।

অবশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে
 কিছুই যে জানিনে গো হায়,
 হারাইয়া গেল সে কোথায়।

রাখো দেব, রাখো, মোরে রাখো,
 তোমার স্নেহেতে মোরে ঢাকো,
 আজি চারিদিকে মোর এ কী অন্ধকার ঘোর,
 একবার নাম ধরে ডাকো।
 পারি না যে সামালিতে, কাঁদি গো আকুল চিতে,
 কত রব মৃত্তিকা বহিয়া।
 ধূলিময় দেহখানি ধুলায় আনিছে টানি
 ধুলায় দিতেছে ঢাকি’ হিয়া।

হারিয়েছি আমার আমারে,
 আজি আমি ভ্রমি অন্ধকারে।
 কখনো বা সন্ধ্যাবেলা, আমার পুরানো সাথী
 মুহূর্তের তরে আসে প্রাণে;
 চারিদিক নিরখে নয়ানে।
 প্রণয়ীর শ্মশানেতে একেলা বিরলে আসি
 প্রণয়ী যেমন কৈঁদে যায়,
 নিজের সমাধি ’পরে নিজে বসি উপছায়া
 যেমন নিশ্বাস ফেলে হায়,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
 জীবনের তরুণ বেলায়
 খেলাইত হৃদয়-মাঝারে
 তুলিত রে অরুণ-দোলায়
 সচেতন অরুণ-কিরণ
 কে সে প্রাণে এসেছিল নামি ।
 সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
 সে আমার সুকুমার আমি ।

প্রতিদিন বাড়িল আশার,
 পথমাঝে উড়িল রে ধূলি,
 হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে
 দু-জনে আইলু পথ তুলি ।
 নয়নে পড়িছে তার রেণু,
 শাখা বাজে সুকুমার কায়,
 ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস
 কাঁটা বিধে সুকোমল গায় ।
 ধূলায় মলিন হল দেহ,
 সভয়ে মলিন হল মুখ,
 কেঁদে সে চাহিল মুখপানে
 দেখে মোর ফেটে গেল দুক ।

কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
 “ওগো মোরে আনিলে কোথায় ?
 পায় পায় বাজিতেছে বাধা,
 তরুশাখা লাগিছে মাথায় ।
 চারিদিকে মলিন, আঁধার,
 কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
 কোথা গো শিশির-মাথা ফুল,
 কোথা গো প্রভাত-রবিকর ?”

সন্ধ্যাসংগীত

৪১

কৈঁদে কৈঁদে সাথে সে চলিল;
 কহিল সে সক্রুণ স্বর,
 “কোথা গো শিশির-মাথা ফুল,
 কোথা গো প্রভাত-রবিকর।”
 প্রতিদিন বাড়িল আঁধার
 পথ হল পঙ্খিল মলিন,
 মুখে তার কথাটিও নাই,
 দেহ তার হল বলহীন।

অর্বশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে
 কিছুই যে জানিনে গো হায়,
 হারাইয়া গেল সে কোথায়।

রাখো দেব, রাখো, মোরে রাখো,
 তোমার স্নেহেতে মোরে ঢাকো,
 আজি চারিদিকে মোর এ কী অন্ধকার ঘোর,
 একবার নাম ধরে ডাকো।
 পারি না যে সামালিতে, কাঁদি গো আকুল চিতে,
 কত রব মৃত্তিকা বহিয়া।
 ধূলিময় দেহখানি ধুলায় আনিছে টানি
 ধুলায় দিতেছে ঢাকি' হিয়া।

হারিয়েছি আমার আমারে,
 আজি আমি ভ্রমি অন্ধকারে।
 কখনো বা সন্ধ্যাবেলা, আমার পুরানো সাথী
 মুহূর্তের তরে আসে প্রাণে;
 চারিদিক নিরখে নয়ানে।
 প্রণয়ীর শ্মশানেতে একেলা বিরলে আসি
 প্রণয়ী যেমন কৈঁদে যায়,
 নিজের সমাধি 'পরে নিজে বসি উপছায়া
 যেমন নিশ্বাস ফেলে হায়,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কুসুম শুকায় গেলে যেমন সৌরভ তার
 কাছে কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়,
 সুখ ফুরাইয়া গেলে একটি মলিন হাসি
 অধরে বসিয়া কেঁদে চায়,
 তেমনি সে আসে প্রাণে, চায় চারিদিক পানে
 কাঁদে, আর কেঁদে চলে যায়।
 বলে শুধু, “কী ছিল, কী হল,
 সে সব কোথায় চলে গেল।”

বহুদিন দেখি নাই তারে,
 আসেনি এ হৃদয় মাঝারে।
 মনে করি মনে আনি তার সেই মুখখানি,
 ভালো করে মনে পড়িছে না,
 হৃদয়ে যে ছবি ছিল, ধুলায় মলিন হল,
 আর তাহা নাহি যায় চেনা।
 ভুলে গেছি কী খেলা খেলিত,
 ভুলে গেছি কী কথা বলিত।
 যে গান গাহিত সদা, স্মর তার মনে আছে,
 কথা তার নাহি পড়ে মনে।
 যে আশা হৃদয়ে লয়ে উড়িত সে মেঘ চেয়ে
 আর তাহা পড়ে না স্মরণে।
 শুধু যবে হৃদি মাঝে চাই
 মনে পড়ে— কী ছিল, কী নাই।

গান সূচাপন

জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর ।
 শুধু গাই গান ।
 স্নেহময়ী মার কাছে শৈশবে শিখিয়াছিল
 দু-একটি তান ।
 শুধু জানি তাই,
 দিবানিশি তাই শুধু গাই ।
 শতছিদ্রময় এই হৃদয়-বাশিটি লয়ে
 বাজাই সতত,
 দুঃখের কঠোর স্বর রাগিণী হইয়া য়ার
 মৃদুল নিশ্বাসে পরিণত ।
 আধার জলদ ঘেন ইন্দ্রধনু হয়ে যায়,
 ভুলে যাই সকল যাতনা ।
 ভালো যদি না লাগে সে গান,
 ভালো সখা, তাও গাহিব না ।

এমন পণ্ডিত কত
রয়েছেন শত শত
এ সংসার-তলে,
আকাশের দৈত্যবালা
উন্মাদিনী চপলারে
বৈধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে ।
আকাশ ধরিয়৷ হাতে
নক্ষত্র-অক্ষর দেখি'
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত
ছিন্ন করে দিতেছেন,
ভাঙি ফেলি' অতীতের কারা ।
আমি তার কিছুই করি না,
আমি তার কিছুই জানি না ।
এমন মহান্ এ সংসারে
জ্ঞান-রত্নরাশির-মাঝারে,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আমি দীন শুধু গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।
ভালো যদি না লাগে সে গান,
ভালো সখা, তাও গাহিব না।

বড়ো ভয় হয়, পাছে কেহই না দেখে তারে
যে জন কিছুই শেখে নাই।
ওগো সখা, ভয়ে ভয়ে তাই
যাহা জানি, সেই গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।

শ্রান্ত দেহ হীনবল নয়নে পড়িছে জল
রক্ত ঝরে চরণে আমার,
নিশ্বাস বহিছে বেগে, হৃদয়-বাঁশিটি মম
বাজে না বাজে না বুঝি আর।
দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, কেহ দেখিলে না চেয়ে
যত গান গাই।
বুঝি কারো অবসর নাই।
বুঝি কারো ভালো নাহি লাগে,
ভালো সখা, আর গাহিব না।

উপহার

ভুলে গেছি, কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
 মরমের কাছে এসেছিলে,
 স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি,
 একবার বুঝি হেসেছিলে ।
 বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে, শিখেছে সন্ধ্যার মায়ী .
 ওই আঁখি দুটি,
 চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
 তারা উঠে ফুটি ।
 আগে কে জানিত বলো কত ক্লী লুকানো ছিল
 হৃদয়-নিভূতে,
 তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
 পাইছু দেখিতে ।
 কখনো গাওনি তুমি, কেবল নীরবে রহি
 শিখায়েছ গান,
 স্বপ্নময় শান্তিময় পুরবী রাগিণী তানে
 বাঁধিয়াছ প্রাণ ।
 আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
 একেলা বসিয়া ।
 একে একে সুরগুলি, অনন্তে হারিয়ে যায়
 আঁধারে পশিয়া ।

বলো দেখি কতদিন আসনি এ শূন্য প্রাণে
 বলো দেখি কতদিন চাওনি হৃদয়পানে,
 বলো দেখি কতদিন শোননি এ মোর গান,
 তবে সখী গান-গাওয়া হল বুঝি অবসান ।

যে রাগ শিখায়েছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে ?
 তার সাথে মিলিছে না সুর ?

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তাই কি আস'না প্রাণে, তাই কি শোন না গান,

তাই সখী, রয়েছ কি দূর ।

ভালো সখী, আবার শিখাও,

আরবার মুখপানে চাও,

একবার ফেলো অশ্রুজল

আঁখিপানে দুটি আঁখি তুলি ।

তা হলে পুরানো স্মরণ আবার পড়িবে মনে,

আর কভু যাইব না তুলি ।

সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখী

উজলিয়া স্মৃতির মন্দির,

এই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখী

শূন্য আছে প্রাণের কুটির ।

নহিলে আঁধার মেঘরাশি

হৃদয়ের আলোক নিবাবে,

একে একে ভুলে যাব স্মরণ,

গান গাওয়া সাদৃশ্যে যাবে ।

প্রভাতসংগীত

श्री श्री आनंदमय



শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
প্রাণাধিকাস্থ

রবিকাকা



সূচনা

কড়ি ও কোমল রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয়নি। কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নূতনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে চাচ্ছে কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারত তারই অবস্থা তখন তরল ; এইজন্তে ওগুলো হয়েছে ঢেউওআলা জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মতো আঁকাবাঁকা ; ওরা মূর্ত হয়ে ওঠেনি সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারেনি। সেইজন্তে আমার মত এই যে, কড়ি ও কোমলের পর থেকেই আমার কাব্যরচনা ভালো মন্দ সব-কিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।

প্রভাতসংগীতে যে অবস্থায় আমার প্রথম বিকাশোন্মুখ মন অপরিণত ভাবনা নিয়ে অপরিষ্কৃত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তার কথা আজো আমার মনে আছে। তার পূর্বে সন্ধ্যাসংগীতের পর্বে আমার মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদগদভাষী আন্দোলন চলছিল। প্রভাত-সংগীতের স্বাতন্ত্র্যে আপনাআপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা-আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে, ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনাচাষের জমিতে। সেই সময়কার কথা মনে পড়ছে যখন কোথা থেকে কতকগুলো মত মনের অন্তরমহলে জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ওইগুলোর নাম, অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, প্রতিধ্বনি। অনন্ত জীবন বলতে আমার মনে এই একটা ভাব এসেছিল, বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মতো আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর-অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা। এই ভাবনাটা ভিতর

ভিতরে মনকে খুব দোঁলা দিয়েছিল। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে একটা ধারণা আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল যে, আমার প্রতিমুহূর্তের সমস্ত ভালোমন্দ, আমার প্রতিদিনের সুখদুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো অনবরত একটা সৃষ্টিরূপ ধরছে, প্রকাশ-অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে যে সৃষ্টির স্বরূপ। এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই মনে হল মৃত্যু তাহলে কী? একরকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে, জীবন সব-কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব-কিছুকে চালায়। প্রতিমুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, যেন আমার মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে, গাঁথা পড়ছে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। মুহূর্তকালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে মর্তজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবালদ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে—আমার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক-এক ফোঁড়ে এক-এক লোককে সম্বন্ধ-সূত্রে গাঁথবে। মনে আছে এই চিন্তায় আমার মনকে খুব আনন্দ দিয়েছিল। প্রতিধ্বনি কবিতা লিখেছিলুম যখন প্রথম গিয়েছিলুম দার্জিলিঙে। যে ভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে, বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে রূপ হয়ে ধ্বনি হয়ে। এই ভাবগুলো যদিও অস্পষ্ট তবু আমার মনের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল, মুখে মুখে কোনো কোনো বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাও করেছি। কিন্তু এ-সকল ভাবনা তখন কী গড়ে কী পড়ে আলোচনা করবার সময় হয়নি, তখনো পাইনি ভাষাভারতীর প্রসাদ। তাই ব'লে রাখছি প্রভাতসংগীতে এ-সমস্ত লেখার আর-কোনো মূল্য যদি থাকে, সে ষোলো আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়।

প্রভাতসংগীত

আহ্বানসংগীত

ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট,
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খসে,
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস বসে ।
মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়িয়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা ।
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস
হাহতাশ করে সারা,
কোণে বসে শুধু ফেলিস নিশাস,
ঢালিস বিষের ধারা ।

জগৎ যে তোর মুদিয়া আসিল,
ফুটিতে নারিল আর,
প্রভাত হইলে প্রাণের মাঝারে
বরে না শিশির-ধার ।
ফেলিস নিশাস, মরুর বাতাস,
জ্বলিস জ্বালাস কত,
আপন জগতে আপনি আছিস
একটি রোগের মতো ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

হৃদয়ের ভার বহিতে পার না,
 আছ মাথা নত করে,
 ফুটিবে না ফুল, ফলিবে না ফল,
 শুকায়ে পড়িবে মরে ।

রোদন, রোদন, কেবলি রোদন,
 কেবলি বিষাদশ্বাস,
 লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর শুটায়
 কেবলি কোটরে বাস ।
 নাই কোনো কাজ,—মাঝে মাঝে চাস
 মলিন আপনা পানে,
 আপনার স্নেহে কাতর বচন
 কহিস আপন কানে ।
 দিবস রজনী মরীচিকা-স্মরা
 কেবলি করিস পান ।
 বাড়িতেছে তৃষা, বিকারের তৃষা
 ছটকট করে প্রাণ ।
 দাও দাও বলে সকলি যে চাস
 জঠর জলিছে ভুখে,
 মুঠি মুঠি ধুলা তুলিয়া লইয়া
 কেবলি পুরিস মুখে ।
 নিজের নিশাসে কুয়াশা বনায়ে
 ঢেকেছে নিজের কায়া,
 পথ আধারিয়া পড়েছে সমুখে
 নিজের দেহের ছায়া ।
 ছায়ার মাঝারে দেখিতে না পাও,
 শব্দ শুনিলে ভরো—
 বাহু প্রসারিয়া চলিতে চলিতে
 নিজেরে আঁকড়ি ধর ।

প্রভাসংগীত

৫৫

চারিদিকে শুধু ক্ষুধা ছড়াইছে
 যেদিকে পড়িছে দিঠ,
 বিবেতে ভরিলি জগৎ, রে তুই
 কীটের অধম কীট ।

আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো
 বাহির হইয়া আয়,
 এমন প্রভাতে এমন কুন্মম
 কেন রে শুকায়ে যায় ।
 বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া
 কেবলি গাহিবি গান,
 তবে সে কুন্মম কহিবে রে কথা,
 তবে সে খুলিবে প্রাণ ।
 আকাশে হাসিবে তরুণ তপন,
 কাননে ছুটিবে বায়,
 চারিদিকে তোর প্রাণের লহরী
 উথলি উথলি যায় ।
 বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব
 মরমর মৃদু তান,
 চারিদিক হতে কিসের উল্লাসে
 পাখিতে গাহিবে গান ।
 নদীতে উঠিবে শত শত ঢেউ,
 গাবে তারা কল কল,
 আকাশে আকাশে উথলিবে শুধু
 হরষের কোলাহল ।
 কোথাও বা হাসি, কোথাও বা খেলা,
 কোথাও বা সুখগান,
 মাঝে বসে তুই বিভোর হইয়া,
 আকুল পরানে নয়ন মুদিয়া
 অচেতন স্নেহে চেতনা হারায়ে
 করিবি রে মধুপান ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই
 ভুলে যাবি তোর গান ।
 মোহ ছুটিবে রে নয়নেতে তোর,
 যেদিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর,
 বাহারে হেরিবি, তাহারে হেরিয়া
 মজিয়া রহিবে প্রাণ ।
 যুগের ঘোরেতে গাহিবে পাখি
 এখনো যে পাখি জাগেনি,
 ভোরের আকাশ ধনিয়া ধনিয়া
 উঠিবে বিভাস রাগিণী ।
 জগত-অতীত আকাশ হইতে
 বাজিয়া উঠিবে বাঁশি,
 প্রাণের বাসনা আকুল হইয়া
 কোথায় যাইবে ভাসি ।
 উদাসিনী আশা গৃহ তেয়াগিয়া
 অসীম পথের পথিক হইয়া
 সুদূর হইতে সুদূরে উঠিয়া
 আকুল হইয়া চায়,
 জোছনা-বিভোর চকোরের গান
 ভেদিয়া ভেদিয়া সুদূর বিমান,
 চাঁদের চরণে মরিতে গিয়া
 মেঘেতে হারায় যায় ।
 মৃদিত নয়ান, পরান বিভল,
 স্তবধ হইয়া শুনিবি কেবল,
 জগতেরে সদা ডুবায় দিতেছে
 জগত-অতীত গান ;
 তাই শুনি যেন জাগিতে চাহিছে
 যুগেতে মগন প্রাণ ।
 জগৎ-বাহিরে যমুনা-পুলিনে
 কে যেন বাজায় বাঁশি,

প্রভাতসংগীত

স্বপন সমান পশিতেছে কানে
 ভেদিয়া নিশীথরাশি ;
 এ গান শুনি নি এ আলো দেখিনি,
 এ মধু করিনি পান,
 এমন বাতাস পরান পুরিয়া
 করেনি রে স্নান দান,
 এমন প্রভাত-কিরণ-মাঝারে
 কখনো করিনি স্নান,
 বিফলে জগতে লভিলু জনম,
 বিফলে কাটিল প্রাণ ।
 দেখ্ রে সবাই চলেছে বাহিরে
 সবাই চলিয়া যায়,
 পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
 শোন্ রে কী গান গায় ।
 জগৎ ব্যাপিয়া, শোন্ রে, সবাই
 ডাকিতেছে, আয় আয়,
 কেহ বা আগেতে কেহ বা পিছায়,
 কেহ ডাক শুনে ধায় ।
 অসীম আকাশে, স্বাধীন পরানে
 প্রাণের আবেগে ছোটে,
 এ শোভা দেখিলে জড়ের শরীরে
 পরান নাচিয়া ওঠে ।
 তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
 গুমরি মরিতে চাস ।
 তুই শুধু ওরে করিস রোদন
 ফেলিস দুখের শ্বাস ।
 ভূমিতে পড়িয়া, আঁধারে বসিয়া
 আপনা লইয়া রত,
 আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
 সোহাগ করিস কত ।

৫৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আর কতদিন কাটিবে এমন

সময় যে চলে যায় । -

ওই শোন ওই ডাকিছে সবাই

বাহির হইয়া আয় ।

নিব্বারের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে প্রভাত-বিহগ

কী গান গাইল রে ।

অতিদূর দূর আকাশ হইতে

ভাসিয়া আইল রে ।

না জানি কেমনে পশিল হেথায়

পথহারা তার একটি তান,

আঁধার গুহার ভমিয়া ভমিয়া

গভীর গুহার নামিয়া নামিয়া,

আকুল হইয়া কাদিয়া কাদিয়া,

ছুঁয়েছে আমার প্রাণ ।

আজি এ প্রভাতে সহসা কেন রে

পথহারা রবিকর

আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে

আমার প্রাণের 'পর ।

বহুদিন পরে একটি কিরণ

গুহার দিয়েছে দেখা,

পড়েছে আমার আঁধার সলিলে

একটি কনকরেখা ।

প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি,

ধর ধর করি কাপিছে বারি,

প্রভাতসংগীত

৫৯

টলমল জল করে থল থল,
 কল কল করি ধরেছে তান ।
 আজি এ প্রভাতে কী জানি কেন রে
 জাগিয়া উঠেছে প্রাণ ।
 জাগিয়া দেখিছু চারিদিকে মোর
 পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর,
 বৃকের উপরে আধার বসিয়া
 করিছে নিজের ধ্যান ।
 না জানি কেন রে এতদিন পরে
 জাগিয়া উঠেছে প্রাণ ।

জাগিয়া দেখিছু আমি আধারে রয়েছি আধা,
 আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা ।
 রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
 ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ 'পরে ।
 দূর দূর দূর হতে ভেদিয়া আধার কারা,
 মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা ।
 তারি মুখ দেখে দেখে, আধার হাসিতে শেখে,
 তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান ;
 শিহরি উঠে রে বারি, দোলে রে দোলে রে প্রাণ,
 প্রাণের মাঝারে ভাসি, দোলে রে দোলে রে হাসি,
 দোলে রে প্রাণের 'পরে আশার স্বপন মম,
 দোলে রে তারার ছায়া স্নেহের আভাস সম ।

মাঝে মাঝে একদিন আকাশেতে নাই আলো,
 পড়িয়া মেঘের ছায়া কালো জল হয় কালো ।
 আধার সলিল 'পরে বর বর বারি বরে
 বর বর বর বর, দিবানিশি অবিরল,
 বরবার দুখ-কথা, বরষার আখিজল ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

শুয়ে শুয়ে আনমনে দিবানিশি তাই শুনি,
 'একটি একটি ক'রে দিবানিশি তাই শুনি,
 তারি সাথে মিলাইয়া কল কল গান গাই,
 বর বর কল কল দিন নাই, রাত নাই।
 এমনি নিজেরে লয়ে রয়েছি নিজের কাছে,
 আঁধার সলিল 'পরে আঁধার জাগিয়া আছে।
 এমনি নিজের কাছে খুলেছি নিজের প্রাণ,
 এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
 কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
 কেমনে পশিল গুহার আধারে
 প্রভাত-পাখির গান।
 না জানি কেন রে এতদিন পরে
 জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
 জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
 ওরে উথলি উঠেছে বারি,
 ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
 কুধিয়া রাখিতে নারি।
 থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
 শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
 ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
 গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
 হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
 ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
 বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়
 কোথায় কারার দ্বার।
 প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া
 আকাশেরে যেন ফেলিতে ছিঁড়িয়া
 উঠে শূন্যপানে, পড়ে আছাড়িয়া
 করে শেষে হাহাকার।

প্রভাতসংগীত

৬১

প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
 ভূখরের হিয়া টুটিতে চায়,
 আলিঙ্গন তরে উর্ধ্বে বাহু তুলি
 আকাশের পানে উঠিতে চায় ।
 প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
 জগৎ মাঝারে লুটিতে চায় ।
 কেন রে বিধাতা পাষণ হেন,
 চারিদিকে তার বাঁধন কেন ।
 ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন,
 সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
 লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
 আঘাতের পর আঘাত কর ;
 মাতিয়া যখন উঠেছে পরান,
 কিসের আঁধার, কিসের পাষণ,
 উখলি যখন উঠেছে বাসনা,
 জগতে তখন কিসের ডর ।

সহসা আজি এ জগতের মুখ
 নূতন করিয়া দেখিছ কেন ।
 একটি পাখির আখখানি তান
 জগতের গান গাহিল যেন ।
 জগৎ দেখিতে হইব বাহির,
 আজিকে করেছি মনে,
 দেখিব না আর নিজের স্বপন
 বসিয়া গুহার কোণে ।
 আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
 আমি ভাঙিব পাষণ-কারা,
 আমি জগৎ প্লাবিতা বেড়াব গাহিয়া
 আকুল পাগলপারা ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কৈশ এলাইয়া, ফুল ছুড়াইয়া
 রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
 রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
 দিব রে পরান ঢালি ।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
 ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
 হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
 তালে তালে দিব তালি ।

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া,
 যাইব বহিয়া, যাইব বহিয়া—
 হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
 গাহিয়া গাহিয়া গান,

যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
 ফুরাবে না আর প্রাণ ।

এত কথা আছে, এত গান আছে,
 এত প্রাণ আছে মোর,
 এত সুখ আছে, এত সাধ আছে,
 প্রাণ হয়ে আছে ভোর ।

এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা

এত খেলা কোথা আছে,

যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
 কে জানে কাহার কাছে ।

অগাধ বাসনা অসীম আশা,

অগং দেখিতে চাই ।

আগিয়াছে সাধ চরাচরময়

প্লাবিয়া বহিয়া যাই ।

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,

যত কাল আছে বহিতে পারি,

প্রভাতসংগীত

৬৩

যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরানের সাধ তাই।

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
পাষণ বাধন টুটি, ভিজায় কঠিন ধরা,
বনেরে শ্রামল করি, ফুলেরে ফুটায় ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়ায় জগৎ-হিয়া
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা।
আমি যাব, আমি যাব, কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা গান,
উদ্বৈগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর।
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এয়েছে রবির কর।

প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি ।
 জগৎ আসি সেবা করিছে কোলাকুলি ।
 ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
 আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি ।
 এসেছে সখা-সখী, বসিয়া চোখোচোখি,
 দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি ।
 এসেছে ভাই বোন, পুলকে ভরা মন,
 ডাকিছে “ভাই ভাই” আঁখিতে আঁখি তুলি ।
 সখারা এল ছুটে নয়নে তারা ফুটে,
 পরানে কথা উঠে, বচন গেল ভুলি ।
 সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে
 দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাতুলি ।
 শিশুরে লয়ে কোলে জননী এল চলে,
 বুকেতে চেপে ধরে বলিছে “যুমো যুমো ।”
 আনত হু-নয়ানে চাহিয়া মুখপানে
 বাছার চাঁদমুখে খেতেছে শত চুমো ।
 পুলকে পুরে প্রাণ, শিহরে কলেবর,
 থেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর
 এসেছে রবি শশী এসেছে কোটি তারা
 যুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা ।
 পরান পুরে গেল, হরষে হল ভোর,
 জগতে যারা আছে সবাই প্রাণে মোর ।

প্রভাত হল যেই কী জানি হল এ কী ।
 আকাশপানে চাই কী জানি কারে দেখি ।
 প্রভাত-বায়ু বহে কী জানি কী যে কহে,
 মরম মাঝে মোর কী জানি কী যে হয় ।

প্রভাতসংগীত

৬৫

এস হে এস কাছে সখা হে এস কাছে—
 এস হে ভাই এস, বসো হে প্রাণময় ।
 পুরব-মেঘ-মুখে পড়েছে রবি-রেখা,
 অরুণ-রথ-চূড়া আধেক যায় দেখা ।
 তরুণ আলো দেখে পাখির কলরব,
 মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব ।
 মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়,
 মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায় ।
 যেদিকে আঁখি চায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
 যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,
 নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
 হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে ।

আয় রে আয় বায়ু যা রে যা প্রাণ নিয়ে,
 জগত মাঝারেতে দে রে তা প্রসারিয়ে ।
 ভ্রমিবি বনে বনে যাইবি দিশে দিশে,
 সাগরপারে গিয়ে পুরবে যাবি মিশে ।
 লইবি পথ হতে পাখির কলতান,
 যুথীর মৃদুশাস মালতী-মৃদুবাস,
 অমনি তারে সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ ।
 পাখির গীতধার ফুলের বাসভার
 ছড়াবি পথে পথে হরষে হয়ে ভোর,
 অমনি তারি সাথে ছড়াবি প্রাণ মোর ।
 ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি বয়ে,
 ধরার চারিদিকে প্রাণেরে ছড়াইয়ে ।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
 কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আয় রে মেঘ আয় বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যা রে ।
কনক-পাল তুলে বাতাসে ছলে ছলে
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ-পারাবারে ।

আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি তো তোরি বুক আমি তো হেথা নাই ।
প্রভাত-আলো সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর ।

ওঠো হে ওঠো রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ-তরী তব পুরবে ছেড়ে দাও ।
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে
আমারে লও তবে, আমারে লও তবে ।

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ কী গান ।
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ ।
বারেক চেয়ে দেখো আমার মুখপানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে ।
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে ।
নিজের গলা হতে কিরণ-মালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি ।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি 'পরে,
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে ।

অনন্ত জীবন

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ
 জনমেছি দু-দিনের তরে,
 যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
 গান গাই আনন্দের ভরে ।
 এ আমার গানগুলি দু-দণ্ডের গান,
 রবে না রবে না চিরদিন,
 পূর্ব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
 পশ্চিমেতে হইবে বিলীন ।

তোরা ফুল, তোরা পাখি, তোরা খোলা প্রাণ,
 জগতের আনন্দ যে তোরা,
 জগতের বিষাদ-পাসরা ।
 পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ-লহরী
 তোরা তার একেকটি ডেউ,
 কখন উঠিলি আর কখন মিলালি
 জানিতেও পারিল না কেউ ।

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
 এ জগতে কিছুই মরে না ।
 নদীশ্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
 ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
 জান না কোথায় তারা যায় !
 একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
 রচিছে বিশাল মহাদেশ,
 না জানি করে তা হবে শেষ ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মুহুর্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
 জান না তো কোথায় তা যায়,
 আকাশের সাগর-সীমায় ।
 আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
 গীতরাজ্য হতেছে স্বজন,
 যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
 সেইখানে করিছে গমন ।
 আকাশ পুরিয়া যাবে শেষ,
 উঠিবে গানের মহাদেশ ।

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
 এ জগতে কিছুই মরে না ।
 কাল দেখেছিহু পথে হরষে খেলিতেছিল
 দুটি ভাই গলাগলি করি ;
 দেখেছিহু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল
 দুটি সখা হাতে হাতে ধরি,—
 দেখেছিহু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে গুয়ে
 ঘুমায়ে করিছে স্তন পান,
 ঘুমন্ত মুখের 'পরে বরষিছে স্নেহধারা
 স্নেহমাখা নত দু-নয়ন ;
 দেখেছিহু রাজপথে চলেছে বালক এক
 বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—
 কত কী যে দেখেছিহু হয়তো সে-সব ছবি
 আজ আমি গিয়েছি পাসরি ।
 তা বলে নাহি কি তাহা মনে ।
 ছবিগুলি মেশেনি জীবনে ?
 স্মৃতির কণিকা তারা স্মরণের তলে পশি
 রচিতোছে জীবন আমার—
 কোথা যে কে মিশাইল, কেবা গেল কার পাশে
 চিনিতে পারিনে তাহা আর ।

প্রভাতসংগীত

৬৯

হয়তো অনেকদিন দেখেছিছু ছবি, এক
 দুটি প্রাণী বাহর বাঁধনে—
 তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
 সখারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে।
 হয়তো অনেকদিন শুনেছিছু পাখি এক
 আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
 সহসা রে তাই আজ প্রভাতের মুখ দেখি
 প্রাণ মন উঠিছে উখুলি।
 সকলি মিশিছে আসি হেথা,
 জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
 এই যে যা-কিছু চেয়ে দেখি
 এ নহে কেবলি ছেলেখেলা।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
 নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
 চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
 জীবনের স্রোত মিশে আসি।
 সূর্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
 কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
 জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ
 ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে,
 মেশে আসি সেই সিন্ধু গগরে।
 পৃথ্বী হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
 সেই মহাসাগর-উদ্দেশে ;
 আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
 অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে,
 সাগরে পড়িব অবশেষে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
 রচিত হতেছে পলে পলে,
 অনন্ত-জীবন মহাদেশ,
 কে জানে হবে কি তাহা শেষ।

তাই বলি প্রাণ ওরে—গান গা পাখির মতো,
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
 তুই যাবি, গান যাবে, একসাথে ভেসে যাবে
 তুই, আর তোর গানগুলি।
 মিশিবি সে সিঁদুজলে অনন্ত সাগর-তলে,
 একসাথে গুয়ে রবি প্রাণ,
 তুই, আর তোর এই গান।

অনন্ত মরণ

কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে
 বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
 হাসে খেলে মৃত্যু চারিপাশে।
 এ ধরণী মরণের পথ,
 এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

যতটুকু বর্তমান, তারেই কি বল প্রাণ।
 সে তো শুধু পলক নিমেষ।
 অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার,
 না জানি কোথায় তার শেষ।

প্রভাতসংগীত

৭১

যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে' গেছি,
 মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
 জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি,
 জানিনে মরণ কারে বলে ।

একমুঠা মরণেরে জীবন বলে কি তবে,
 মরণের সমষ্টি কেবল ?
 একটি নিমেষ তুচ্ছ শত মরণের গুচ্ছ,
 নাম নিয়ে এত কোলাহল ।
 মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত,
 পলে পলে উঠিব আকাশে,
 নক্ষত্রের কিরণ-নিবাসে ।

মরণ বাড়িবে যত কোথায়, কোথায় যাব,
 বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
 বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
 হেথা হোথা করিবে বিহার ।
 উঠিবে জীবন মোর কত না আকাশ ছেয়ে
 চাকিয়া ফেলিবে রবি শশী,
 যুগ-যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
 নব নব তারায় প্রবেশি ।

কবে রে আসিবে সেই দিন
 উঠিব সে আকাশের পথে,
 আমার মরণ-ডোর দিয়ে
 বেঁধে দেব জগতে জগতে ।
 আমাদের মরণের জালে
 জগৎ ফেলিব আবরিয়া,
 এ অনন্ত আকাশ-সাগরে
 দশ দিক রহিব ঘেরিয়া ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

জয় হোক জয় হোক মরণের জয় হোক

আমাদের অনন্ত মরণ

মরণের হবে না মরণ ।

এ ধরায় মোরা সবে শতাব্দীর ক্ষুদ্র শিশু

লইলাম তোমার শরণ,

এস তুমি এস কাছে, মেহ-কোলে লও তুমি

পিয়াও তোমার মাতৃস্তন,

আমাদের করো হে পালন ।

আনন্দে পুরেছে প্রাণ, হেরিতেছি এ জগতে

মরণের অনন্ত উৎসব,

কার নিমন্ত্রণে মোরা, মহাযজ্ঞে এসেছি রে

উঠেছে বিপুল কলরব ।

যে ডাকিছে ভালোবেসে, তারে চিনিসনে শিশু ?

তার কাছে কেন তোর ভয়,

জীবন বাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,

মরণ তো নহে তোর পর ।

আয়, তারে আলিঙ্গন কর,

আয়, তার হাতখানি ধর ।

পুনর্মিলন

কিসের হরষ কোলাহল,

সুধাই তোদের, তোরা বল ।

আনন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,

আনন্দে হতেছে কতু লীন,

চাহিয়া ধরণীপানে নব আনন্দের গানে

মনে পড়ে আর এক দিন ।

প্রভাতসংগীত

৭৩

সে তখন ছেলেবেলা—রজনী প্রভাত হলে,
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতম চলে ;
সারি সারি নারিকেল বাগানের একপাশে,
বাতাস আকুল করে আশ্র-মুকুলের বাসে ।

পথপাশে দুই ধারে

বেল ফুল ভারে ভারে

ফুটে আছে, শিশুমুখে প্রথম হাসির প্রায়—

বাগানে পা দিতে দিতে

গন্ধ আসে আচম্বিতে,

নরগেশ কোথা ফুটে খুঁজে তারে পাওয়া দায় ।

মাঝেতে বাঁধানো বেদী, জুঁই গাছ চারিধারে ;—

সুখোদয় দেখা দিত প্রাচীরের পরপারে ।

নবীন রবির আলো,

সে যে কী লাগিত ভালো,

সর্বান্তে সুবর্ণ সুধা অজস্র পড়িত বারে,

প্রভাত ফুলের মতো ফুটায় তুলিত মোরে ।

এখনো সে মনে আছে

সেই জানালার কাছে

বসে থাকিতাম একা জনহীন দ্বিপ্রহরে ।

অনন্ত আকাশ নীল,

ডেকে চলে যেত চিল,

জানায়ে স্নাতীত তৃষা স্নাতীক করুণ স্বরে ।

পুকুর গলির ধারে,

বাঁধা ঘাট এক পারে,

কত লোক যায় আসে, স্নান করে, তোলে জল ।

রাজহাঁস তাঁরে তাঁরে

সারাদিন ভেসে ফিরে,

ডানা ছুটি ধুয়ে ধুয়ে করিতেছে নিরমল ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পূর্ব ধারে বৃদ্ধ বট
 মাথায় নিবিড় জট,
 ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্তময় ।
 আঁকড়ি শিকড় মূঠে
 প্রাচীর ফেলেছে টুটে,
 খোপেখোপে ঝোপেঝোপে কত না বিশ্বয় ভয় ।
 বসি শাখে পাখি ডাকে সারাদিন একতান,
 চারিদিক স্তব্ধ হেরি কী যেন করিত প্রাণ ।
 মৃদু তপ্ত সমীরণ গায়েতে লাগিত এসে,
 সেই সমীরণশ্রোতে কত কী আসিত ভেসে ।
 কোন্ সমুদ্রের কাছে
 মায়াময় রাজ্য আছে,
 সেথা হতে উড়ে আসে পাখির বাঁকের মতো
 কত মায়া, কত পরী, রূপকথা কত শত ।

আরেকটি ছোটো ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
 সম্মুখে পেয়ারাগাছ ভরে আছে ফলে ফুলে ।
 বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা,
 জাহ্নবী-প্রবাহপানে চেয়ে আছি সারাবেলা ।
 ছায়া কাঁপে আলো কাঁপে বুরু বুরু বহে বায় —
 বর বর মর মর পাতা বারে পড়ে যায় ।
 সাধ যেত বাই ভেসে
 কত রাজ্যে কত দেশে,
 ছলায়ে ছলায়ে চেউ নিয়ে যাবে কত দূর—
 কত ছোটো ছোটো গ্রাম
 নূতন নূতন নাম,
 অলভেদী শুভ সৌধ কত নব রাজপুর ।

প্রভাসংগীত

৭৫

কত গাছ, কত ছায়া, জটিল বটের মূল—
 তীরে বালুকার পরে,
 ছেলেমেয়ে খেলা করে,
 সন্ধ্যায় ভাসায় দীপ, প্রভাতে ভাসায় ফুল।
 ভাসিতে ভাসিতে শুধু দেখিতে দেখিতে যাব
 কত দেশ, কত মুখ, কত কী দেখিতে পাব।
 কোথা বালকের হাসি,
 কোথা রাখালের বাঁশি,
 সহসা স্তম্ভ হতে অচেনা পাখির গান।
 কোথাও বা দাঁড় বেয়ে
 মাঝি গেল গান গেয়ে,
 কোথাও বা তীরে বসে পথিক ধরিল তান।
 গুনিতে গুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আঁখি,
 আকাশেতে ভাসে মেঘ, আকাশেতে ওড়ে পাখি।
 হয়তো বরষা কাল—ঝর ঝর বারি বরে,
 পুলক-রোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে ;
 থেকে থেকে বান বান,
 ঘন বাজ বরিষন,
 থেকে থেকে বিজলীর চমকিত চকমকি।
 বহিছে পুরব বায়,
 শীতে শিহরিছে কায়,
 গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধারমুখী।

সেই, সেই ছেলেবেলা,
 আনন্দে করেছি খেলা,
 প্রকৃতি গো, জননী গো, কেবলি তোমারি কোলে।
 তার পরে কী যে হল—কোথা যে গেলেম চলে।

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
 দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
 তারি মাঝে হ'ল পথহারা।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সে বন আধারে ঢাকা
গাছের জটিল শাখা
সহস্র মেহের বাহু দিয়ে
আধার পালিছে বুকে নিয়ে।

নাহি রবি, নাহি শশী, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্দিগিক।
আমি শুধু একেলা পথিক।
তোমারে গেলেম ফেলে,
অরণ্যে গেলেম চলে,
কাটালেম কত শত দিন,
ত্রিয়মাণ, সুখশাস্তিহীন।

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে,
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিছু রবিকর,
সহসা শুনিছ কত গান।
সহসা পাইছ পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

দেখিছ ফুটিছে ফুল, দেখিছ উড়িছে পাখি,
আকাশ পুরেছে কলস্বরে।
জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারিদিকে,
রবিকর নাচে তার 'পরে।
চারিদিকে বহে বায়ু, চারিদিকে ফুটে আলো
চারিদিকে অনন্ত আকাশ,
চারিদিক পানে চাই, চারিদিকে প্রাণ ধায়,
জগতের অসীম বিকাশ।

প্রভাতসংগীত

৭৭

কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা বলে,
 কাছে এসে কেহ করে খেলা,
 কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ আসে, কেহ যায়,
 এ কী হেরি আনন্দের মেলা ।
 যুবক যুবতী হাসে, বালক বালিকা নাচে,
 দেখে যে রে জুড়ায় নয়ন ।
 ও কে হোথা গান গায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়,
 ও কী শুনি অমিয়-বচন ।

তাই আজি শুধাই তোমারে,
 কেন এ আনন্দ চারিধারে ।
 বুঝেছি গো বুঝেছি গো, এতদিন পরে বুঝি,
 ফিরে পেলো হারানো সন্তান ।
 তাই বুঝি দুই হাতে জুড়িয়ে লয়েছ বৃকে,
 তাই বুঝি গাহিতেছ গান ।

ভালোবাসা খুঁজিবারে গেছিছ অরণ্যমাবে
 হৃদয়ে হইছ পথহারা,
 বরষিছ অশ্রুবারিধারা ।
 ভ্রমিলাম দূরে দূরে—কে জানিত বন্দ্বে দেখি
 হেথা এত ভালোবাসা আছে ।
 যেদিকেই চেষ্টা দেখি সেইদিকে ভালোবাসা
 ভাসিতেছে নয়নের কাছে ।
 মা আমার, আজ আমি কত শত দিন পরে
 যখনি রে দাঁড়াই সম্মুখে,
 অমনি চুমিলি মুখ, কিছু নাই অভিমান,
 অমনি লইলি তুলে বৃকে ।
 ছাড়িব না তোর কোল, রব হেথা অবিরাম,
 তোর কাছে শিখিব রে স্নেহ,
 সবারে বাসিব ভালো, কেহ না নিরাশ হবে
 মোরে ভালো বাসিবে যে কেহ ।

প্রতিধ্বনি

অগ্নি প্রতিধ্বনি,

বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি,

বুঝি আর কারেও বাসি না ।

আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল,

তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা ।

তোর মুখে পাখিদের শুনিয়া সংগীত,

নির্ব্বারের শুনিয়া ঝড়ের,

গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,

বালকের মধুমাখা স্বর,

তোর মুখে জগতের সংগীত শুনিয়া,

তোরে আমি ভালোবাসিয়াছি ;

তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,

বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি ।

চিরকাল—চিরকাল—তুই কি রে চিরকাল

সেই দূরে রবি,

আখো সুরে গাবি শুধু গীতের আভাস,

তুই চির-কবি ।

দেখা তুই দিবি না কি ? না হয় না দিলি,

একটি কি পুরাবি না আশ,

কাছে হতে একবার শুনিলারে চাই

তোর গীতোচ্ছ্বাস ।

অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের গান,

বাটিকার বজ্রগীতস্বর,

দিবসের প্রদোষের রজনীর গীত

চেতনার নিদ্রার মর্ম্মর,

প্রভাতসংগীত

৭৯

বসন্তের বরষার শরতের গান,
 জীবনের মরণের স্বর,
 আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
 ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর,
 পৃথিবীর চন্দ্রমার গ্রহ-তপনের,
 কোটি কোটি তারার সংগীত,
 তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
 না জানি রে হতেছে মিলিত ।
 সেইখানে একবার বসাইবি মোরে ;
 সেই মহাআধার নিশায়,
 শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সংগীত,
 তোর মুখে কেমন শুনায় ।

জোছনায় ফুলরনে একাকী বসিয়া থাকি,
 আঁখি দিয়া অশ্রুবারি বারে,
 বল্ মোরে বল্ অগ্নি মোহিনী ছলনা,
 সে কি তোরি তরে ।

বিরামের গান গেয়ে সায়াক্ষের বায়
 কোথা বহে যায় ।
 তারি সাথে কেন মোর প্রাণ ছ ছ করে
 সে কি তোরি তরে ।

বাতাসে সৌরভ ভাসে, আধারে কত না তারা,
 আকাশে অসীম নীরবতা,
 তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়,
 সে কি তোরি কথা ।

ফুলের সৌরভগুলি আকাশে খেলাতে এসে
 বাতাসেতে হয় পথহারা,
 চারিদিকে ঘুরে হয় সারা,
 মার কোলে ফিরে যেতে চায়,
 ফুলে ফুলে খুঁজিয়া বেড়ায় ;

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি,
 ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়
 সে কি তোরে চায়।
 আঁধি যেন কার তরে পথপানে চেয়ে আছে,
 দিন গনি গনি,
 মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
 অভুল রূপের প্রতিধ্বনি ;
 কাছে গেলে মিলাইয়া যায়,
 নিরাশের হাসিটির প্রায়।
 সৌন্দর্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া।
 এ কি তোরি ছায়া।

জগতের গানগুলি দূর-দূরান্তর হতে
 দলে দলে তোর কাছে যায়,
 যেন তারা, বহি হেরি পতঙ্গের মতো,
 পদতলে মরিবারে চায়।
 জগতের মৃত গানগুলি
 তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ,
 সংগীতের পরলোক হতে
 গায় যেন দেহমুক্ত গান।
 তাই তার নব কর্ণধ্বনি
 প্রভাতের স্বপনের প্রায়,
 কুসুমের সৌরভের সাথে
 এমন সহজে মিশে যায়।
 আমি ভাবিতেছি বসে গানগুলি তোরে
 না জানি কেমনে খুঁজে পায়,
 না জানি কোথায় খুঁজে পায়।
 না জানি কী গুহার মাঝারে
 অক্ষুট মেঘের উপবনে,

প্রভাতসংগীত

৭৯

স্মৃতি ও আশায় বিজড়িত
 আলোক-ছায়ার সিংহাসনে,
 ছায়াময়ী মূর্তিখানি আপনে আপনি মিশি
 আপনি বিন্মিত আপনায়,
 কার পানে শূন্যপানে চায় ।
 সারাহে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘমাঝে
 পশ্চিমের সমুদ্রসীমায়,
 প্রভাতের জন্মভূমি শৈশব পূরব পানে
 যেমন আকুল নেত্রে চায়,
 পূরবের শূন্যপটে প্রভাতের স্মৃতিগুলি
 এখনো দেখিতে যেন পায়,
 তেমনি সে ছায়াময়ী কোথা যেন চেয়ে আছে
 কোথা হতে আসিতেছে গান,
 এলানো কুন্তলজালে সন্ধ্যার তারকাগুলি
 গান শুনে মুদ্বিছে নয়ান ।
 বিচিত্র সৌন্দর্য জগতের
 হেথা আসি হইতেছে লয় ।
 সংগীত, সৌরভ, শোভা জগতে যা কিছু আছে
 সবি হেথা প্রতিধ্বনিময় ।
 প্রতিধ্বনি, তব নিকেতন,
 তোমার সে সৌন্দর্য অতুল,
 প্রাণে জাগে ছায়ার মতন,
 ভাষা হয় আকুল ব্যাকুল ।

আমরণ চিরদিন কেবলি খুঁজিব তোরে
 কখনো কি পাব না সন্ধান ।
 কেবলি কি রবি দূরে অতি দূর হতে
 শুনিব রে ওই আধো-গান ।
 এই বিশ্বজগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
 বাজাইবি সৌন্দর্যের বাঁশি,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অনন্ত জীবনপথে খুঁজিয়া চলিব তোরে
 প্রাণমন হইবে উদাসী ।
 তপনেরে ঘিরি ঘিরি যেমন ঘুরিছে ধরা,
 ঘুরিব কি তোর চারিদিকে ।
 অনন্ত প্রাণের পথে বরষিবি গীতধারা
 চেয়ে আমি রব অনিমিখে ।
 তোরি মোহময় গান শুনিতেছি অবিরত
 তোরি রূপ কল্পনায় লিখা,
 করিস নে প্রবঞ্চনা সত্য করে বল্ দেখি
 তুই তো নহিস মরীচিকা ?
 কত বার আর্ত স্বরে, শুধায়ছি প্রাণপণে
 অগ্নি তুমি কোথায়—কোথায়—
 অমনি স্তূদূর হতে কেন তুমি বলিয়াছ
 “কে জানে কোথায় ।”
 আশাময়ী, ও কী কথা, তুমি কি আপনহারা—
 আপনি জান না আপনায় ?

মহাস্বপ্ন

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
 নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন ।
 বিশাল জগৎ এই
 প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
 হৃদয়-সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিশ্বের মতন ।
 উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য, উঠিতেছে আলোক আধার,
 উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার ।
 উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে,
 উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রি দিন, আকাশের তলে ।

প্রভাসংগীত

৮১

একা বসি মহাসিন্ধু চিরদিন গাইতেছে গান,
 ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।
 তটিনীর কলরব, লক্ষ নির্ব্বয়ের বার বার,
 সিন্ধুর গম্ভীর গীত মেঘের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ;
 বাটিকা করিছে হা হা আশ্রয় আলয় তার ছাড়ি,
 বাজায় অরণ্য-বীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি ;
 রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিম-রাশ,
 পর্বত-দৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস ;
 ধীরে ধীরে মহারণ্য নাড়িতেছে জটাময় মাথা,
 বার বার মর মর উঠিতেছে স্নগম্ভীর গাথা।
 চেতনার কোলাহলে দিবস পুরিছে দশ দিশি,
 ঝিল্লিরবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি,
 সমস্ত একত্রে মিলি ধনিয়া ধনিয়া চারি ভিত,
 উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপন-সংগীত।
 স্বপনের রাজ্য এই, স্বপন-রাজ্যের জীবগণ
 দেহ ধরিতেছে কত মুহুর্চ্ছ নূতন নূতন।
 ফুল হয়ে যায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় শেষে,
 নব নব বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে কানন-প্রদেশে।
 বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিবারিধারা,
 নির্ব্বর তটিনী হয়, ভাঙি ফেলে শিলাময় কারা।
 নিদাঘ মরিয়া যায়, বরষা শ্মশানে আসি তার,
 নিবায় জলন্ত চিতা বরষিয়া অশ্রুবারিধার।
 বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতকেশ শীত হয়ে যায়,
 ষষাতির মতো পুন বসন্ত-বোঁবন ফিরে পায়।
 এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন,
 এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।
 অপূর্ণ স্বপন-স্বপ্ত-মালুমেরা অভাবের দাস,
 জাগ্রত পূর্ণতা তরে পাইতেছে কত না প্রয়াস।
 চেতনা ছিঁড়িতে চাহে আধো-অচেতন আবরণ,
 দিনরাত্রি এই আশা, এই তার একমাত্র পণ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পূর্ণ আত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন ।
 অপূর্ণ জগৎ-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন ?
 চন্দ্র-সূর্য-তারকার অন্ধকার স্বপ্নময়ী ছায়া,
 জ্যোতির্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে মিলাইবে কায়া ।
 পৃথিবী ভাঙিয়া যাবে, একে একে গ্রহতারাগণ
 ভেঙে ভেঙে মিলে যাবে, একেকটি বিশ্বের মতন ।
 চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ চেয়ে জ্যোতির্ময় মহান্ বৃহৎ,
 জীব-আত্মা মিলাইবে একেকটি জলবিষুবৎ ।
 কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন-ভাঙা দিন,
 সত্যের সমুদ্র মাঝে আধো-সত্য হয়ে যাবে লীন ?
 আধেক প্রলয়-জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়,
 বলো, দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয় ।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতি-শূন্য, মহাশূন্য'পরি
 চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
 যহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া—
 কবে দেব খুলিবে নয়ান ।
 অনন্ত হৃদয় মাঝে আসন্ন জগৎ চরাচর
 দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নিশ্চল,
 অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান
 ধীরে ধীরে বিকাশিছে দল ।
 লেগেছে ভাবের ঘোর, মহানন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ
 নিজের হৃদয়পানে চাহি,
 নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দ পারাবার,
 কুল নাহি, দিগ্বিদিক নাহি ।

প্রভাতসংগীত

৮৩

পুলকে পূর্ণিত তাঁর প্রাণ,
 সহসা আনন্দ-সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
 আদিদেব খুলিলা নয়ান ;
 জনশূন্য জ্যোতি-শূন্য অন্ধতম অন্ধকার মাঝে
 উচ্ছ্বসি উঠিল বেদগান ।
 চারি মুখে বাহিরিল বাণী
 চারি দিকে করিল প্রয়াণ ।
 সীমাহারা মহা অন্ধকারে,
 সীমাশূন্য ব্যোম-পারাবারে,
 প্রাণপূর্ণ বাটিকার মতো,
 ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা সম,
 আশাপূর্ণ অভূতপূর্ণ প্রায়,
 সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা ।
 দূর দূর যত দূর যায়
 কিছুতেই অন্ত নাহি পায়,
 যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
 ভ্রমিতেছে আজিও সে বাণী,
 আজিও সে অন্ত নাহি পায় ।

ভাবের আনন্দে ভোর, গীতিকবি চারি মুখে
 করিতে লাগিলা বেদগান ।
 আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
 অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি ।
 জ্যোতির্ময় জটাজাল কোটিস্বর্ণপ্রভাসম,
 দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে ;
 মহান্ ললাটে তাঁর অযুত তড়িৎ-ক্ষুতি
 অবিরাম লাগিল খেলিতে ।
 অনন্ত ভাবের দল, হৃদয়-মাঝারে তাঁর
 হতেছিল আবুল ব্যাকুল ;
 মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

জগতের গন্ধোদ্রী শিখর হতে

শত শত শ্রোতে

উচ্ছসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,

বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী,

উচ্ছসিল বাষ্পময় ভাব।

উত্তরে দক্ষিণে গেল,

পূরবে পশ্চিমে গেল,

চারি দিকে ছুটিল তাহারা,

আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব উচ্ছ্বাসবেগে

নাচিতে লাগিল মহোল্লাসে।

শব্দশূন্য শূন্যমাবে, সহসা সহস্র স্বরে

জয়ধ্বনি উঠিল উৎসলি,

হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া,

স্তব্ধতার পাষণ-হৃদয়

শত ভাগে গেল রে ফাটিয়া,

শব্দশ্রোত বরিল চৌদিকে।

এক কালে সমস্তরে—

পূরবে উঠিল ধ্বনি পশ্চিমে উঠিল ধ্বনি,

ব্যাপ্ত হল উত্তরে দক্ষিণে।

অসংখ্য ভাবের দল খেলিতে লাগিল যত

উঠিল খেলার কোলাহল।

শূন্যে শূন্যে মাতিয়া বেড়ায়

হেথা ছোটে, হোথা ছুটে যায়।

কী করিবে আপনা লইয়া

যেন তাহা ভাবিয়া না পায়,

আনন্দে ভাঙিয়া যেতে চায়।

যে প্রাণ অনন্ত যুগ রবে

সেই প্রাণ পেয়েছে নূতন,

আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন

মুহূর্তে করিতে চায় ব্যয়।

প্রভাতসংগীত

৮৫

অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া
 পড়িল প্রেমের আকর্ষণ ।
 এ ধায় উহার পানে,
 এ চায় উহার মুখে,
 আগ্রহে ছুটিয়া কাছে আসে ।
 বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটছুটি,
 বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন ।
 অগ্নিময় কাতর হৃদয়
 অগ্নিময় হৃদয়ে মিশিছে ।
 জলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
 আধার হইতে চুর চুর ।
 অগ্নিময় মিলন হইতে
 জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান,
 অন্ধকার শূন্যমরুমাঝে
 শত শত অগ্নি-পরিবার
 দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ ।

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে,
 নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
 বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
 চারি দিকে উঠিছে নিনাদ,
 অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া,
 চারি দিকে চারি হাত দিয়া,
 বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
 বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্বাদ ।
 লইয়া মদলশব্দ করে,
 কাঁপায়ে জগৎ চরাচরে
 বিষ্ণু আসি কৈলা শব্দনাদ
 খেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
 নিবে এল জলন্ত উচ্ছ্বাস,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
 নিবাইল নিজের হতাশ।
 জগতের বাঁধিল সমাজ,
 জগতের বাঁধিল সংসার,
 বিবাহে বাহুতে বাহু বাঁধি
 জগৎ হইল পরিবার।

বিষ্ণু আসি মহাকাশে, লেখনী ধরিয়া করে
 মহান্ কালের পত্র খুলি
 ধরিয়া ব্রহ্মার ধ্যানগুলি,
 একমনে পরম যতনে,
 লিখি লিখি যুগ-যুগান্তর
 বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।
 জগতের মহা-বেদব্যাস
 গঠিলা নিখিল উপন্যাস,
 বিশ্বজ্ঞান বিশ্বগীতি লয়ে
 মহাকাব্য করিলা রচন।
 জগতের ফুলরাশি লয়ে
 গাঁথি মালা মনের মতন
 নিজ গলে কৈলা আরোপণ।

জগতের মালাধানি জগৎ-পতির গলে
 মরি কিবা সেজেছে অতুল,
 দেখিবারে হৃদয় আকুল।
 বিশ্বমালা অসীম অক্ষয়,
 কত চন্দ্র কত সূর্য, কত গ্রহ কত তারা,
 কত বর্ণ কত গীতময়।

নিজ নিজ পরিবার লয়ে
 ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে,
 বিষ্ণুদেব চক্রে হাতে লয়ে,
 চক্রে চক্রে বাঁধিলা জগতে।

প্রভাতসংগীত

৮৭

চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
 চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে,
 শাসনের গদা হস্তে লয়ে
 চরাচর রাখিলা নিয়মে ।
 দুঃস্থ প্রেমেরে মন্ত্র পড়ি
 বাধি দিলা বিবাহ-বন্ধনে ।
 মহাকায় শনিরে ঘেরিয়া,
 হাতে হাতে ধরিয়া ধরিয়া,
 নাচিতে লাগিল এক তালে
 সুধামুখ চাঁদ শত শত ।
 পৃথিবীর সমুদ্র-হৃদয়
 চন্দ্রে হেরি উঠে উথলিয়া ।
 পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে
 চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া ।
 মিলি যত গ্রহ ভাইবোন,
 এক অঙ্গে হইল পালিত,
 তারা-সহোদর যত ছিল
 এক সাথে হইল মিলিত ।
 কত কত শত বর্ষ ধরি,
 দূর পথ অতিক্রম করি,
 পাঠাইছে বিদেশ হইতে
 তারাগুলি, আলোকের দূত
 ক্ষুদ্র ওই দূরদেশবাসী
 পৃথিবীর বারতা লইতে ।
 রবি ধায় রবির চৌদিকে,
 গ্রহ ধায় রবিরে ঘেরিয়া,
 চাঁদ হাসে গ্রহ-মুখ চেয়ে
 তারা হাসে তারায় হেরিয়া ।
 মহাছন্দ মহা অনুপ্রাণ
 চরাচরে বিস্তারিল পাশ ।

৮৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পশিয়া মানস সরোবরে,
 স্বর্ণপদ্ম করিয়া চয়ন
 বিষ্ণুদেব প্রসন্ন আননে
 পদ্মপানে মেলিলা নয়ন।
 ফুটিয়া উঠিল শতদল,
 বাহিরিল কিরণ বিমল,
 মাতিল রে ছালোক ভুলোক
 আকাশে পুরিল পরিমল।
 চরাচরে উঠাইয়া গান,
 চরাচরে জাগাইয়া হাসি,
 কোমল কমলদল হতে
 উঠিল অতুল রূপরাশি।
 মেলি দুটি নয়ন-বিশ্বল,
 ত্যজিয়া সে শতদলদল
 ধীরে ধীরে জগৎ-মাঝারে
 লক্ষ্মী আসি ফেলিলা চরণ ;
 গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়
 ফুটিল রে বিচিত্র বরন।
 জগৎ মুখের পানে চায়,
 জগৎ পাগল হয়ে যায়,
 নাচিতে লাগিল চারি দিকে,
 আনন্দের অন্ত নাহি পায়।
 জগতের মুখপানে চেয়ে
 লক্ষ্মী যবে হাসিলেন হাসি,
 মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
 কাননে ফুটিল ফুলরাশি ;
 হাসি লয়ে করে কাড়াকাড়ি
 চন্দ্র সূর্য গ্রহ চারি ভিতে ;
 চাহে তাঁর চরণছায়ায়
 যৌবন-কুসুম ফুটাইতে।

প্রভাতসংগীত

৮৯

জগতের হৃদয়ের আশা,
 দশ দিকে আকুল হইয়া
 ফুল হয়ে পরিমল হয়ে
 গান হয়ে উঠিল ফুটিয়া ।
 এ কী হেরি যৌবন-উজ্জ্বল
 এ কী রে মোহন ইন্দ্রজাল,
 সৌন্দর্য-কুসুম গেল ঢেকে
 জগতের কঠিন কঙ্কাল ।
 হাসি হয়ে ভাঙিল আকাশে
 তারকার রক্তিম নয়ান,
 জগতের হর্ষ কোলাহল
 রাগিণীতে হল অবসান ।
 কোমলে কঠিন লুকাইল,
 শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি,
 প্রেমের হৃদয়ে মহা বল,
 অশনির মুখে দিল হাসি ।
 সকলি হইল মনোহর
 সাজিল জগৎ-চরাচর ।

মহাছন্দে বাঁধা হয়ে, যুগ যুগ যুগ যুগান্তর,
 পড়িল নিয়ম-পাঠশালে
 অসীম জগৎ-চরাচর ।
 শ্রাস্ত হয়ে এল কলেবর,
 নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
 আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
 উত্তাপ হতেছে একাকার ।
 জগতের প্রাণ হতে
 উঠিল রে বিলাপ-সংগীত,
 কাঁদিয়া উঠিল চারি ভিত ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পূরবে বিলাপ উঠে, পশ্চিমে বিলাপ উঠে,
কাঁদিল রে উত্তর দক্ষিণ,
কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা, শ্রান্তদেহে কাঁদে রবি,
জগৎ হইল শাস্তিহীন।

চারি দিক হতে উঠিতেছে
আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর ;—

“জাগো জাগো জাগো মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর।

অলজ্ব্য নিয়মপথে ভ্রমি

হয়েছে হে শ্রান্ত কলেবর ;

নিয়মের পাঠ সমাপিয়া

সাধ গেছে খেলা করিবারে,

এক বার ছেড়ে দাও দেব,

অনন্ত এ আকাশ মাঝারে।”

জগতের আত্মা কহে কাঁদি

“আমারে নূতন দেহ দাও ;

প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়,

প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,

প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,

প্রতিদিন ভাঙিতেছে বল।

গাও দেব মরণ-সংগীত

পাব মোরা নূতন জীবন।”

জগৎ কাঁদিল উচ্চরবে

জাগিয়া উঠিলা মহেশ্বর,

তিন কাল ত্রিনয়ন মেলি

হেরিলেন দিক্ দিগন্তর।

প্রলয়-পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,

পদতলে জগৎ চাপিয়া,

জগতের আদি অন্ত

ধরধর ধরধর

এক বার উঠিল কাপিয়া।

প্রভাতসংগীত

৯১

পিনাকিতে পুরিলা নিশ্বাস,

ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল

জগতের সমস্ত বাঁধন ।

উঠিল রে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া

ছন্দোমুক্ত জগতের উন্নত আনন্দ-কোলাহল ।

ছিঁড়ে গেল রবি শশী গ্রহ তারা ধূমকেতু,

কে কোথায় ছুটে গেল,

ভেঙে গেল টুটে গেল,

চন্দ্রে সূর্যে শু ডাইয়া

চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল ।

মহা অগ্নি জলিল রে,

আকাশের অনন্ত হৃদয়

অগ্নি, অগ্নি, শুধু অগ্নিময় ।

মহা অগ্নি উঠিল জলিয়া

জগতের মহা চিতানল ।

খণ্ড খণ্ড রবি শশী, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা

বিন্দু বিন্দু আধারের মতো

বরষিছে চারি দিক হৈতে,

অনলের তেজোময় গ্রাসে

নিমেষেতে যেতেছে মিশায়ে ।

সৃজনের আরম্ভ-সময়ে

আছিল অনাদি অন্ধকার,

সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে

রহিল অসীম হতাশন ।

অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল সমুদ্রমাঝে

মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান

করিতে লাগিলা মহাধ্যান ।

শ্রোত

জগৎ-শ্রোতে ভেসে চলো, যে যেথা আছ ভাই ।
 চলেছে যেথা রবি শশী চল রে সেথা যাই ।
 কোথায় চলে কে জানে তা, কোথায় যাবে শেষে,
 জগৎ-শ্রোত বহে গিয়ে কোন্ সাগরে মেশে ।
 অনাদি কাল চলে শ্রোত অসীম আকাশেতে,
 উঠেছে মহা কলরব অসীমে যেতে যেতে ।
 উঠিছে ঢেউ, পড়ে ঢেউ, গনিবে কেবা কত ।
 ভাসিছে শত গ্রহ তারা, ডুবিছে শত শত ।
 ঢেউয়ের পরে খেলা করে আলোকে আধারেতে,
 জলের কোলে লুকাচুরি জীবনে মরণেতে ।
 শতেক কোটি গ্রহ তারা যে শ্রোতে তৃপ্তপ্রায়,
 সে শ্রোত মাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়,
 অসীম কাল ভেসে যাব অসীম আকাশেতে,
 জগৎ কল-কলরব শুনিব কান পেতে ।
 দেখিব ঢেউ, উঠে ঢেউ, দেখিব মিশে যায়,
 জীবন মাঝে উঠে ঢেউ মরণ গান গায় ।
 দেখিব চেয়ে চারি দিকে, দেখিব তুলে মুখ,
 কত না আশা, কত হাসি, কত না সুখ দুখ,
 বিরাগ ঘেব ভালোবাসা, কত না হায়-হায়,
 তপন ভাসে, তারা ভাসে, তা'রাও ভেসে যায় ।
 কত না যায়, কত চায়, কত না কাঁদে হাসে,
 আমি তো শুধু ভেসে যাব দেখিব চারি পাশে ।

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস আমি আমি ।
 উজানে যেতে পারিবি কি সাগরপথগামী ।
 জগৎ-পানে যাবি নে রে, আপনা পানে যাবি,
 সে যে রে মহা মরুভূমি কী জানি কী যে পারি ।

প্রভাতসংগীত

৯৩

মাথায় ক'রে আপনারে, সুখ-দুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস প্রতিকূলে সে তো রে নহে সোজা।
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল, সঘনে বহে শ্বাস,
লইয়া তোর সুখ-দুখ এখনি পাবি নাশ।

জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ-দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।
তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে,—
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে গাহি গান সন্ধ্যার সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি আমার সাথে নাই,
জগৎ-শ্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

চেয়ে থাকা

মনেতে সাধ যেরদিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব।
দেখিব শুধু দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব।
পরানে শুধু জাগিবে প্রেম,
নয়নে লাগে ঘোর,
জগতে যেন ডুবিয়া রব
হইয়া রব ভোর।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তঁটিনী যায়, বহিয়া যায়,
 কে জানে কোথা যায় ;
 তীরেতে বসে রহিব চেয়ে,
 সারাটি দিন যায় ।
 সুদূর জলে ডুবিছে রবি
 সোনার লেখা লিখি,
 সাঁঝের আলো জলেতে শুয়ে
 করিছে ঝিকিমিকি ।
 সুধীর শ্রোতে তরঙ্গগুলি
 যেতেছে সারি সারি,
 বহিয়া যায়, ভাসিয়া যায়
 কত না নরনারী ;
 না জানি তারা কোথায় থাকে
 যেতেছে কোন্ দেশে ;
 সুদূর তীরে কোথায় গিয়ে
 থাকিবে অবশেষে ।
 কত কী আশা গড়িছে বসে
 তাদের মনখানি,
 কত কী সুখ, কত কী দুখ,
 কিছুই নাহি জানি ।

দেখিব পাখি আকাশে ওড়ে,
 সুদূরে উড়ে যায়,
 মিশায়ে যায় কিরণ মাঝে,
 আঁধার রেখাপ্রায় !
 তাহারি সাথে সারাটি দিন
 উড়িবে মোর প্রাণ ;
 নীরবে বসি তাহারি সাথে
 গাহিব তারি গান ।

প্রভাতসংগীত

৯৫

তাহারি মতো মেঘের মাঝে
 বাঁধিতে চাহি বাসা,
 তাহারি মতো চাঁদের কোলে
 গড়িতে চাহি আশা।
 তাহারি মতো আকাশে উঠে,
 ধরার পানে চেয়ে
 ধরায় যারে এসেছি ফেলে
 ডাকিব গান গেয়ে।
 তাহারি মতো, তাহারি সাথে
 উষার দ্বারে গিয়ে,
 ঘুমের বোর ভাঙিয়ে দিব
 উবারে জাগাইয়ে।

পথের ধারে বসিয়া রব
 বিজন তরুছায়,
 সমুখ দিয়ে পথিক যত
 কত না আসে যায়।
 ধুলায় বসে আপন মনে
 ছেলেরা খেলা করে
 মুখেতে হাসি সখারা মিলে
 যেতেছে ফিরে ঘরে।

পথের ধারে, ঘরের দ্বারে
 বালিকা এক মেয়ে,
 ছোটো ভায়ের পাড়ায় ঘুম
 কত কৌ গান গেয়ে।
 তাহার পানে চাহিয়া থাকি
 দিবস যায় চলে,
 স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি,
 হৃদয় যায় গলে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এতটুকু সে পরানটিতে
 এতটা সুধারামি।
 কাছেতে তাই দাঁড়ায়ে তারে
 দেখিতে ভালোবাসি।

কোথা বা শিশু কাঁদিছে পথে
 মায়েরে ডাকি ডাকি,
 আকুল হয়ে পথিক-মুখে
 চাহিছে থাকি থাকি।
 কাতর স্বর শুনিতে পেয়ে
 জননী ছুটে আসে,
 মায়ের বুক জড়ায়ে শিশু
 কাঁদিতে গিয়ে হাসে।
 অবাক হয়ে তাহাই দেখি
 নিমেষ ভুলে গিয়ে,
 দুইটি ফোঁটা বাহিরে জল
 দুইটি আঁধি দিয়ে।

যায় রে সাধ জগৎ-পানে
 কেবলি চেয়ে রই
 অবাক হয়ে, আপনা ভুলে,
 কথাটি নাহি কই।

সাধ

অরুণময়ী তরুণী উষা
 জাগায়ে দিল গান।
 পূরব মেঘে কনকমুখী
 বারেক শুধু মারিল উকি
 অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
 বিকশি উঠে প্রাণ।

প্রভাতসংগীত

৯৭

কাহার হাসি বহিয়া এনে
 করিলি সুখা দান ।
 ফুলেরা সব চাহিয়া আছে
 আকাশপানে মগন-মনা,
 মুখেতে যুঁহু বিমল হাসি
 নয়নে দুটি শিশির-কণা ।
 আকাশ-পারে কে যেন বসে,
 তাহারে যেন দেখিতে পায়,
 বাতাসে ছলে বাহুটি তুলে
 মায়ের কোলে কাঁপিতে যায় ।
 কী যেন দেখে, কী যেন শোনে,
 কে যেন ডাকে, কে যেন গায়,
 ফুলের সুখ, ফুলের হাসি
 দেখিবি তোরা আয় রে আয় ।

আ মরি মরি অমনি যদি
 ফুলের মতো চাহিতে পারি ।
 বিমল প্রাণে বিমল সুখে,
 বিমল প্রাতে বিমল মুখে,
 ফুলের মতো অমনি যদি
 বিমল হাসি হাসিতে পারি ।
 ছলিছে, মরি, হরষ-স্রোতে,
 অসীম স্নেহে আকাশ হতে
 কে যেন তারে খেতেছে চুম্বো
 কোলেতে তারি পড়িছে লুটে ।
 কে যেন তারি নামটি ধরে
 ডাকিছে তারে সোহাগ করে
 গুনিতে পেয়ে যুগের ঘোরে,
 মুখটি ফুটে হাসিটি ফোটে,
 শিশুর প্রাণে সুখের মতো
 সুবাসটুকু আগিয়া ওঠে ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আকাশপানে চাহিয়া থাকে
না জানি তাহে কী সুখ পায় ।
বলিতে যেন শেখেনি কিছু
কী যেন তবু বলিতে চায় ।

আধার কোণে থাকিস তোরা,
জানিস কি রে কত সে সুখ,
আকাশপানে চাহিলে পরে
আকাশপানে তুলিলে মুখ ।
সুদূর দূর, সুনীল নীল,
সুদূরে পাখি উড়িয়া যায় ।
সুনীল দূরে ফুটিছে তারা
সুদূর হতে আসিছে বায় ।
প্রভাত-করে করি রে স্নান,
সুমাই ফুল-বাসে,
পাখির গান লাগে রে যেন
দেহের চারি পাশে ।
বাতাস যেন প্রাণের সখা,
প্রবাসে ছিল, নতুন দেখা,
ছুটিয়া আসে বুকের কাছে
বারতা শুধাইতে ;
চাহিয়া আছে আমার মুখে,
কিরণময় আমারি সুখে
আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে ।
মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ-ভরা প্রাণ,
আমারি প্রাণ হাসিতে ছেয়ে
জাগিছে উষা তরুণ মেয়ে,
করুণ আঁখি করিছে প্রাণে
অরুণ-সুখা দান ।

প্রভাতসংগীত

৯৯

আমারি বুকে প্রভাতবেলা
 ফুলেরা মিলি করিছে খেলা,
 হেলিছে কত, ছলিছে কত,
 পুলকে ভরা মন,
 আমারি তোরা বালিকা মেয়ে
 আমারি স্নেহধন।
 আমারি মুখে চাহিয়া তোর
 আঁখিটি ফুটফুটি।
 আমারি বুকে আলয় পেয়ে
 হাসিয়া কুটকুটি।
 কেন রে বাছা কেন রে হেন
 আকুল কিলিবিলা,
 কী কথা যেন জানাতে চাস
 সবাই মিলি মিলি।
 হেথায় আমি রহিব বসে
 আজি সকালবেলা,
 নীরব হয়ে দেখিব চেয়ে
 ভাইবোনের খেলা।
 বুকের কাছে পড়িবি ঢলে
 চাহিবি ফিরে ফিরে,
 পরশি দেহে কোমল-দল
 স্নেহেতে চোখে আসিবে জল,
 শিশির সম তোদের 'পরে
 বরিবে ধীরে ধীরে।

হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
 তারার মতো উঠিতে চায়,
 আপন স্নুখে ফুলের মতো
 আকাশপানে ফুটিতে চায়।
 নিবিড় রাতে আকাশে উঠে

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চারি দিকে সে চাহিতে চায়,
 তারার মাঝে হারায় গিয়ে
 আপন মনে গাহিতে, চায় ।
 মেঘের মতো হারায় দিশা
 আকাশ মাঝে ভাসিতে চায় ;
 কোথায় যাবে কিনারা নাই,
 দিবসনিশি চলেছে তাই,
 বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
 জোছনা এসে পড়িছে পায়ে,
 উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখি,
 মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,
 আকাশ মাঝে মাথাটি থুয়ে
 আরামে যেন ভাসিয়া যায়,
 হৃদয় মোর মেঘের মতো
 আকাশ মাঝে ভাসিতে চায় ।
 ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
 উষার মতো হাসিতে চায় ।
 জগৎ মাঝে ফেলিতে পা
 চরণ যেন উঠিছে না,
 শরমে যেন হাসিছে মৃদু হাস,
 হাসিটি যেন নামিল ভূঁয়ে,
 জাগায়ে দিল ফুলেরে ছুঁয়ে,
 মালতী-বধু হাসিয়া তারে
 করিল পরিহাস ।
 মেঘেতে হাসি জড়ায় যায়,
 বাতাসে হাসি গড়ায় যায়,
 উষার হাসি, ফুলের হাসি
 কানন মাঝে ছড়ায় যায় ।
 হৃদয় মোর আকাশে উঠে
 উষার মতো হাসিতে চায় ।

সমাপন

আজ আমি কথা কহিব না।
 আর আমি গান গাহিব না।
 হেরো আজি ভোরবেলা এসেছে রে মেলা লোক,
 ঘিরে আছে চারিদিকে
 চেয়ে আছে অনিমিখে,
 হেরে মোর হাসিমুখ ভুলে গেছে দুঃখশোক।
 আজ আমি গান গাহিব না।

সকাতরে গান গেয়ে পথপানে চেয়ে চেয়ে
 এদের ডেকেছি দিবানিশি,
 ভেবেছিলাম মিছে আশা, বোঝে না আমার ভাষা,
 বিলাপ মিলায় দিশি দিশি।
 কাছে এরা আসিত না কোলে বসে হাসিত না,
 ধরিতে চকিতে হল লীন,
 মরমে বাজিত ব্যথা, সাধিলে না কহে কথা,
 সাধিতে শিথি নি এতদিন।
 দিত দেখা মারবে মারবে, দূরে যেন বাঁশি বাজে,
 আভাস গুলি যেন হয়।
 মেঘে কভু পড়ে রেখা, ফুলে কভু দেয় দেখা,
 প্রাণে কভু বহে চলে যায়।

আজ তারা এসেছে রে কাছে
 এর চেয়ে শোভা কিবা আছে।
 কেহ নাহি করে ডর, কেহ নাহি ভাবে পর,
 সবাই আমাকে ভালো বাসে,
 আগ্রহে ঘিরেছে চারি পাশে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এসেছিস তোরা যত জন।
 তোদের কাহিনী আজি শোনা।
 যার যত কথা আছে, খুলে বল মোর কাছে,
 আজ আমি কথা কহিব না।
 আর তুই কাছে আর, তোরে মোর প্রাণ চায়,
 তোর কাছে শুধু বসে রই।
 দেখি শুধু, কথা নাহি কই।
 ললিত পরশে তোর, পরানে লাগিছে ঘোর,
 চোখে তোর বাজে বেণুবীণা,
 তুই মোরে গান শুনাবি না ?
 জেগেছে নূতন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,
 ওই দেখ পোহায়েছে রাত।
 আমাদের বুকেতে নে রে, কাছে আর, আমি যে রে
 নিখিলের খেলাবার সাথী।

চারিদিকে সৌরভ, চারিদিকে গীতরব,
 চারিদিকে সুখ আর হাসি,
 চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধো আধো বুলি,
 চারিদিকে স্নেহপ্রেমরাশি।
 আমাদের ঘিরেছে কারা, স্নেহেতে করেছে সারা,
 জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা।
 আর আমি কথা কহিব না।
 আর আমি গান গাহিব না।

ছবি ও গান

मा ३ दिव



উৎসর্গ

গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার
বসন্তে মালা গাঁথিলাম।

যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি
একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত,
তাঁহারি চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।



সূচনা

ছবি ও গান নিয়ে আমার বলবার কথাটা বলে নিই। এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলছে। ভাবায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অনুদ্ভিষ্ট, সে যেম প্রলাপ বকে আপনাকে শাস্ত করতে চেয়েছে। এখন সেই বয়স যখন কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো-আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয় নি তো।

কবি সংসারের ভিতরে তখনো প্রবেশ করে নি, তখনো সে বাতায়ন-বাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়। এর কোনো-কোনোটা চোখে দেখা একটুকরো ছবি পেনসিলে আঁকা, রবারে ঘষে দেওয়া, আর কোনো-কোনোটা সম্পূর্ণ বানানো। মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্তে চলতি ভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে-সেখানে প্রবেশ করেছে। আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল। ছবি ও গান কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে।



ছবি ও গান

কে ?

আমার প্রাণের 'পরে' চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো ।
সে যে ছুঁয়ে গেল হুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত ।

সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কী যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
কুসুম বনেতে ।

সে ঢেউয়ের মতো ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে,
হাসি তার রেখে গেছে রে,
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে ।
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
ভাবতেছি তাই একলা বসে ।

সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোর ।

১০৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সে প্রাণের কোথা ছলিয়ে গেল
 ফুলের ডোর ।
 সে কুসুম-বনের উপর দিয়ে
 কী কথা যে বলে গেল,
 ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে
 সঙ্গে তারি চলে গেল ।
 হৃদয় আমার আকুল হল,
 নয়ন আমার মুদে এল,
 কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে ।

সুখস্বপ্ন

ওই জানালার কাছে বসে আছে
 করতলে রাখি মাথা ।
 তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে
 সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা ।
 শুধু বুরু বুরু বায়ু বহে যায়
 তার কানে কানে কী যে কহে যায়,
 তাই আধো গুয়ে আধো বসিয়ে
 কত ভাবিতেছে আনমনে ।
 উড়ে উড়ে যায় চুল,
 কোথা উড়ে উড়ে পড়ে ফুল,
 বুরু বুরু কাঁপে গাছপালা
 সমুখের উপবনে ।
 অধরের কোণে হাসিটি
 আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
 কাননের পানে চেয়ে আছে
 আধ-মুকুলিত আখিয়া ।

ছবি ও গান

১০৭

সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
 চোখে এসে যেন লাগিছে,
 ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
 প্রাণের কোথায় জাগিছে।
 চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
 উড়ে উড়ে যায় পাখি,
 সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
 বারে পড়ে থাকি থাকি।
 মধুর আলস, মধুর আবেশ,
 মধুর মুখের হাসিটি,
 মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
 বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

জাগ্রত স্বপ্ন

আজ একেলা বসিয়া, আকাশে চাহিয়া,
 কী সাধ যেতেছে, মন।
 বেলা চলে যায়—আছিস কোথায়?
 কোন্ স্বপনেতে নিমগন?
 বসন্ত-বাতাসে আঁখি মুদে আসে,
 মুছ মুছ বহে শ্বাস,
 গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
 কুসুমের মুছ বাস।
 যেন সুদূর নন্দন-কানন-বাসিনী,
 সুখ-ঘুম-ঘোরে মধুর-হাসিনী,
 অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ
 ভেসে ভেসে বহে যায়,
 অতি মুছ মুছ লাগে গায়।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বিশ্বরূপ-মোহে আঁধারে আলোকে
মনে পড়ে যেন তায়,
স্মৃতি-আশা-মাথা মূহু স্তখে হুখে
পুলকিয়া উঠে কায় ।

ভ্রমি আমি যেন সূদূর কাননে,
সূদূর আকাশতলে,
আনমনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সরস্বতী কলকলে ।
গহন বনের কোথা হতে শুনি
বাঁশির স্বর-আভাস,
বনের হৃদয় বাজাইছে যেন
মরমের অভিলাষ ।
বিভোর হৃদয়ে বুঝিতে পারি নে
কে গায় কিসের গান,
অজানা ফুলের স্মৃতি মাথানো
স্বরসুখা করি পান ।

যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালী,
কুসুম-শয়নে আধেক মগনা,
বাকল-বসনে আধেক নগনা,
সুখ দুখ গান গাহিছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা ।
ছায়ায় আলোকে, নিব্বরের ধারে,
কোথা কোন্ গুপ্ত গুহার মাঝারে,
যেন হেথা হোথা কে কোথায় আছে
এখনি দেখিতে পাব,
যেন রে তাদের চরণের কাছে
বাঁগা লয়ে গান গাব ।

ছবি ও গান

১০৯

শুনে শুনে তারা আনত নয়নে
 হাসিবে মুচুকি হাসি,
 শরমের আভা অধরে কপোলে
 বেড়াইবে ভাসি ভাসি ।

মাথায় বাঁধিয়া ফুলের মালা
 বেড়াইব বনে বনে ।
 উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,
 উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ,
 হাতে লয়ে বাঁশি, মুখে লয়ে হাসি,
 ভ্রমিতেছি আনমনে ।
 চারি দিকে মোর বসন্ত হসিত,
 ঘোবন কুসুম প্রাণে বিকশিত,
 কুসুমের 'পরে ফেলিব চরণ,
 ঘোবন-মাধুরী ভরে ।
 চারি দিকে মোর মাধবী মালতী
 সৌরভে আকুল করে ।

কেহ কি আমারে চাহিবে না ?
 কাছে এসে গান গাহিবে না ?
 পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে
 কবে না প্রাণের আশা ?
 চাঁদের আলোতে, দধিন বাতাসে,
 কুসুম-কাননে বাঁধি বাহুপাশে
 শরমে সোহাগে মুছ মধুহাসে
 জানাবে না ভালোবাসা ?
 আমার ঘোবন-কুসুম-কাননে
 ললিত চরণে বেড়াবে না ?
 আমার প্রাণের লতিকা-বাঁধন
 চরণে তাহার জড়াবে না ?

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আমার প্রাণের কুসুম গাঁথিয়া

কেহ পরিবে না গলে ?

তাই ভাবিতেছি আপনার মনে

বসিয়া তরুর তলে ।

দোলা

ঝিকিমিকি বেলা ;

গাছের ছায়া কাঁপে জলে,

সোনার কিরণ করে খেলা ।

ছুটিতে দোলার 'পরে দোলে রে,

দেখে রবির আঁখি ভোলে রে ।

গাছের ছায়া চারি দিকে আঁধার করে রেখেছে

লতাগুলি আঁচল দিয়ে ঢেকেছে ।

ফুল ধীরে ধীরে মাথায় পড়ে,

পায়ে পড়ে, গায়ে পড়ে,

থেকে থেকে বাতাসেতে বুরু বুরু পাতা নড়ে ।

নিরালা সকল ঠাই,

কোথাও সাড়া নাই,

শুধু নদীটি বহে যায় বনের ছায়া দিয়ে,

বাতাস ছুঁয়ে যায় লতাদে শিহরিয়ে ।

ছুটিতে বসে বসে দোলে,

বেলা কোথায় গেল চলে ।

হেরো, সুধামুখী মেয়ে

কী চাওয়া আছে চেয়ে

যু'খানি থুয়ে তার বুক ।

কী মায়া মাখা চাঁদমুখে ।

ছবি ও গান

১১১

হাতে তার কঁাকন ছ-গাছি,
 কানেতে তুলিছে তার তুল,
 হাসি-হাসি মুখখানি তার
 ফুটেছে সাঁঝের জুঁই ফুল।
 গলেতে বাছ বেঁধে
 ছ-জনে কাছাকাছি,
 তুলিছে এলো চুল
 তুলিছে মালাগাছি।
 আঁধার ঘনাইল,
 পাখিরা ঘুমাইল,
 সোনার রবি-আলো আকাশে মিলাইল।
 মেঘেরা কোথা গেল চলে,
 ছ-জনে বসে বসে দোলে।
 ঘেঁষে আসে বৃকে বৃকে,
 মিলায়ে মুখে মুখে
 বাহুতে বাঁধি বাহুপাশ,
 পৃথিবী বহিতেছে শ্বাস।
 মাঝে মাঝে থেকে থেকে
 আকাশেতে চেয়ে দেখে,
 গাছের আড়ালে দুটি তারা।
 প্রাণ কোথা উড়ে যায়,
 সেই তারা পানে ধায়,
 আকাশের মাঝে হয় হারা।
 পৃথিবী ছাড়িয়া যেন তা'রা
 দুটিতে হয়েছে দুটি তারা।

একাকিনী

একটি মেয়ে একেলা,
 সাঁঝের বেলা,
 মাঠ দিয়ে চলেছে।
 চারি দিকে সোনার ধান ফলেছে।
 ওর মুখেতে পড়েছে সাঁঝের আভা,
 চুলেতে করিছে ঝিকিঝিকি।
 কে জানে কী ভাবে মনে মনে
 আনমনে চলে ঝিকিঝিকি।
 পশ্চিমে সোনায় সোনাময়,
 এত সোনা কে কোথা দেখেছে।
 তারি মাঝে মলিন মেয়েটি
 কে যেন রে একে রেখেছে।
 মুখখানি কেন গো অমন ধারা,
 কোন্ খানে হয়েছে পথহারা,
 কারে যেন কী কথা শুধাবে,
 শুধাইতে ভয়ে হয় সারা।
 চরণ চলিতে বাধে বাধে
 শুধালে কথাটি নাহি কয়।
 বড়ো বড়ো আকুল নয়নে।
 শুধু মুখপানে চেয়ে রয়।
 নয়ন করিছে ছল ছল,
 এখনি পড়িবে যেন জল।
 সাঁঝেতে নিরালা সব ঠাঁই,
 মাঠে কোথাও জনপ্রাণী নাই—
 দূরে অতি দূরে দেখা যায়,
 মলিন সে সাঁঝের আলোতে

ছবি ও গান

১১৩

ছায়া ছায়া গাছপালাগুলি

মেশে মেশে মেঘের কোলেতে ।

বড়ো তোর বাজিতেছে পায়,

আয় রে আমার কোলে আয় ।

আ মরি জননী তোর কে,

বল্ রে কোথায় তোর ঘর ।

তরাসে চাহিস কেন রে,

আমারে বাসিস কেন পর ?

গ্রামে

নবীন প্রভাত-কনক-কিরণে,

নীরবে দাঁড়ায়ে গাছপালা,

কাঁপে মৃদু মৃদু কী যেন আরামে,

বায়ু বহে যায় সুখা-ঢালা ।

নীল আকাশেত নারিকেল-তরু,

ধীরে ধীরে তার পাতা নড়ে,

প্রভাত-আলোতে কুঁড়েঘরগুলি,

জলে ঢেউগুলি ওঠে পড়ে ।

দুয়ারে বসিয়া তপন-কিরণে

ছেলেরা মিলিয়া করে খেলা,

মনে হয় সবি কী যেন কাহিনী

শুনেছিহু কোন্ ছেলেবেলা ।

প্রভাতে যেন রে ঘরের বাহিরে

সে কালের পানে চেয়ে আছি,

পুরাতন দিন হোথা হতে এসে

উড়িয়ে বেড়ায় কাছাকাছি ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ঘর-দ্বার সব মায়া-ছায়া সম,
 কাহিনীতে গাঁথা খেলা-ধূলি ;
 মধুর তপন, মধুর পবন,
 ছবির মতন কুঁড়েগুলি ।
 কেহ বা দোলায় কেহ বা দোলে
 গাছতলে মিলে করে মেলা,
 ঝাঁশি হাতে নিয়ে রাখাল বালক
 কেহ নাচে গায়, করে খেলা ।
 এমনি যেন রে কেটে যায় দিন,
 কারো যেন কোনো কাজ নাই,
 অসম্ভব যেন সকলি সম্ভব,
 পেতেছে যেন রে যাহা চাই ।
 কেবলি যেন রে প্রভাত-তপনে,
 প্রভাত-পবনে, প্রভাত-স্বপনে,
 বিরামে কাটায় আরামে ঘুমায়
 গাছপালা, বন, কুঁড়েগুলি ।
 কাহিনীতে ঘেরা ছোটো গ্রামখানি,
 মায়াদেবীদের মায়া-রাজধানী,
 পৃথিবী-বাহিরে কলপনা-তীরে
 করিছে যেন রে খেলা-ধূলি ।

আদরিণী

একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ,
 একা একটি বনফুল ফোটে-ফোটে হয়েছে,
 কচি কচি পাতার মাঝে মাথা খুয়ে রয়েছে ।
 চার দিকে তার গাছের ছায়া, চার দিকে তার নিষুতি,
 চার দিকে তার ঝোপে-ঝোপে আশ্রয় দিয়ে ঢেকেছে,

ছবি ও গান

১১৫

বনের সে যে স্নেহের ধন আদরিণী মেয়ে,
তারে বুকের কাছে লুকিয়ে যেন রেখেছে ।

একটুখানি রূপের হাসি আধারেতে ঘুমিয়ে আলা,
বনের স্নেহ শিয়রেতে জেগে আছে ।
অকুমার প্রাণটুকু তার কিছু যেন জানে না,
চোখে শুধু অশ্রুর স্বপন লেগে আছে ।
একটি যেন রবির কিরণ ভোরের বেলা বনের মাঝে,
খেলাতেছিল নেচে নেচে,
নিরালাতে গাছের ছায়ে, আধারেতে শ্রান্তকায়
সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে ।
বনদেবী করুণ-হিয়ে তারে যেন কুড়িয়ে নিয়ে
যতন করে আপন ঘরেতে ।
থুয়ে কোমল পাতার 'পরে মায়ের মতো স্নেহভরে
ছোঁয় তারে কোমল করেতে ।
ধীরি ধীরি বাতাস গিয়ে আসে তারে দোলা দিয়ে,
চোখেতে চুমো খেয়ে যায় ।
ঘুরে ফিরে আশেপাশে বারবার ফিরে আসে,
হাতটি বুলিয়ে দেয় গায় ।

একলা পাখি গাছের শাখে কাছে তোর বসে থাকে,
সারা দুপুরবেলা শুধু ডাকে,
যেন তার আর কেহ নাই, সারা দিন একলাটি তাই
স্নেহভরে তোরে নিয়েই থাকে ।
ও পাখির নাম জানি নে, কোথায় ছিল কে তা জানে,
রাতের বেলায় কোথায় চলে যায় ।
দুপুরবেলা কাছে আসে, সারা দিন বসে পাশে
একটি শুধু আদরের গান গায় ।

রাত্রে কত তারা ওঠে, ভোরের বেলা চলে যায়,
তোরে তো কেউ দেখে না জানে না,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এক কালে তুই ছিলি যেন ওদেরি ঘরের মেয়ে,
 আজকে রে তুই অজানা অচেনা ।
 নিত্যি দেখি রাতের বেলা একটি শুধু জোনাই আসে,
 আলো দিয়ে মুখপানে তোর চায় ।
 কে জানে সে কী যে করে ! তারা-জন্মের কাহিনী তোর
 কানে বুঝি স্বপন দিয়ে যায় ।
 ভোরের বেলা আলো এল, ডাকছে রে তোর নামটি ধরে,
 আজকে তবে মুখখানি তোর তোল,
 আজকে তবে আঁখিটি তোর খোল,
 লতা জাগে, পাখি জাগে, গায়ের কাছে বাতাস লাগে,
 দেখি রে—ধীরে ধীরে দোল্ দোল্ দোল ।

খেলা

ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা,
 ঘাসের 'পরে সাঁঝের বেলা ।

ঘোর ঘোর গাছের তলে তলে,
 ফাঁকায় পড়েছে মলিন আলো,
 কোথাও যেন সোনার ছায়া ছায়া,
 কোথাও যেন আঁধার কালো কালো ।
 আকাশের ধারে ধারে ঘিরে,
 বসেছে রাঙা মেঘের মেলা,
 শ্রামল ঘাসের 'পরে, সাঁঝে
 আলো-আঁধারের মাঝে মাঝে,
 ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা ।

ছবি ও গান

১১৭

ওরা যে কেন হেসে সারা,
 কেন যে করে অমন খারা,
 কেন যে লুটোপুটি,
 কেন যে ছুটোছুটি,
 কেন যে আফ্লাদে কুটিকুটি ।
 কেহ বা ঘাসে গড়ায়,
 কেহ বা নেচে বেড়ায়
 সাঁঝের সোনা-আকাশে
 হাসির সোনা ছড়ায় ।
 আঁখি দুটি নৃত্য করে,
 নাচে চুল পিঠের 'পরে,
 হাসিগুলি চোখে মুখে লুকোচুরি খেলা করে ।
 যেন মেঘের কাছে ছুটি পেয়ে
 বিদ্যুতেরা এল ধয়ে,
 আনন্দে হল রে আপনহারা ।
 ওদের হাসি দেখে খেলা দেখে,
 আকাশের এক ধারে থেকে
 যত্ন যত্ন হাসছে একটি তারা ।

বাউগাছে পাতাটি নড়ে না,
 কামিনীর পাপড়িটি পড়ে না ।
 আঁধার কাকের দল
 সাজ করি কোলাহল,
 কালো কালো গাছের ছায়,
 কে কোথায় মিশায়ে যায়—
 আকাশেতে পাখিটি ওড়ে না ।
 সাড়াশব্দ কোথায় গেল,
 নিরুন্ম হয়ে এল এল
 গাছপালা বন গ্রামের আশেপাশে ।

১১৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

শুধু খেলার কোলাহল,
শিশুকণ্ঠের কলকল,
হাসির ধ্বনি উঠেছে আকাশে ।

কত আর খেলবি ও রে,
নেচে নেচে হাতে ধরে
যে যার ঘরে চল আয় বাই,
আধার হয়ে এল পথঘাট ।
সন্ধ্যাদীপ জ্বলল ঘরে
চেয়ে আছে তোদের তরে,
তোদের না হেরিলে মার কোলে,
ঘরের প্রাণ কীদে সন্ধ্যা হলে ।

ঘুম

ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি,
খেলাধুলা সব গেছে ভুলি ।

ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়,
ঘুম এনে দেয় আঁখিপাতে,
শয্যায় পায়ের কাছে খেলেনা ছড়ানো আছে,
ঘুমিয়েছে খেলাতে খেলাতে ।
এলিয়ে গিয়েছে দেহ, মুখে দেবতার স্নেহ
পড়েছে রে ছায়ার মতন,
কালো কালো চুল তার বাতাসেতে বার বার
উড়ে উড়ে ঢাকিছে বদন ।
তারার আলোর মতো হাসিগুলি আসে কত,
আধো-খোলা অধরেতে তার
চুমো খেয়ে যায় কত বার ।

ছবি ও গান

১১৯

সারা রাত স্নেহস্থখে তারাগুলি চায় মুখে,
 যেন তারা করি গলাগলি,
 কত কী যে করে বলাবলি।
 যেন তারা আঁচলেতে আঁধারে আলোতে গেঁথে
 হাসিমাখা স্নেহের স্বপন,
 ধীরে ধীরে স্নেহভরে শিশুর প্রাণের 'পরে
 একে একে করে বরিষন।

কাল যবে রবিকরে কাননেতে থরে থরে
 ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম,
 ওদেরো নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি,
 কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম।
 প্রভাতের আলো জাগি, যেন খেলাবার লাগি
 ওদের জাগায়ে দিতে চায়,
 আলোতে ছেলেতে ফুলে একসাথে আঁধি খুলে
 প্রভাতে পাখিতে গান গায়।

বিদায়

সে যখন বিদায় নিয়ে গেল,
 তখন নবমীর চাঁদ অস্তাচলে যায়।
 গভীর রাত্তি, নিশুম চারিদিক,
 আকাশেতে তারা অনিমিত্ত,
 ধরণী নীরবে ঘুমায়ে।

হাত দুটি তার ধরে দুই হাতে
 মুখের পানে চেয়ে সে রহিল,
 কাননে বকুল-তরুতলে
 একটিও সে কথা না কহিল।

১২০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অধরে প্রাণের মলিন ছায়া,
 চোখের জলে মলিন চাঁদের আলো,
 যাবার বেলা ছুটি কথা বলে
 বনপথ দিয়ে সে চলে গেল ।

ঘন গাছের পাতার মাঝে, আঁধার পাখি গুটিয়ে পাখা,
 তারি উপর চাঁদের আলো শুয়েছে,
 ছায়াগুলি এলিয়ে দেহ আঁচলখানি পেতে যেন
 গাছের তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে ।
 গভীর রাতে বাতাসটি নেই ; নিশীথে সরসীর জলে
 কীপে না বনের কালো ছায়া,
 ঘুম যেন ঘোমটা-পর্য্য বসে আছে ঝোপে-ঝোপে,
 পড়ছে বসে কী যেন এক মায়া ।

চুপ করে হেল'সে বকুলগাছে,
 রমণী একেলা দাঁড়ায়ে আছে ।

এলোথেলো চুলের মাঝে বিষাদমাখা সে মুখখানি
 চাঁদের আলো পড়েছে তার 'পরে,
 পথের পানে চেয়ে ছিল, পথের পানেই চেয়ে আছে,
 পলক নাহি তিলেক কালের তরে ।

গেল রে কে চলে গেল, ধীরে ধীরে চলে গেল
 কী কথা সে বলে গেল হায়,
 অতি দূর অশ্বথের ছায়ে মিশায়ে কে গেল রে,
 রমণী দাঁড়ায়ে জোছনায় ।

সীমাহীন জগতের মাঝে আশা তার হারিয়ে গেল,
 আজি এই গভীর নিশীথে,
 শূন্য অন্ধকারখানি, মলিন মুখশ্রী নিয়ে
 দাঁড়িয়ে রহিল একভিত্তে ।

পশ্চিমের আকাশ-সীমায়
 চাঁদখানি অস্তে যায় যায় ।

ছবি ও গান

১২১

ছোটো ছোটো মেঘগুলি, সাদা সাদা পাখা তুলি
 চলে যায় চাঁদের চুমো নিয়ে,
 আখার গাছের ছায় ডুবু ডুবু জোছনায়
 স্নানমুখী রমণী দাঁড়িয়ে ।

সুখের স্মৃতি

চেয়ে আছে আকাশের পানে
 জোছনায় আঁচলটি পেতে,
 যত আলো ছিল সে চাঁদের
 সব যেন পড়েছে মুখেতে ।
 মুখে যেন গলে পড়ে চাঁদ,
 চোখে যেন পড়িছে ঘুমিয়ে,
 সুকোমল শিথিল আঁচলে
 পড়ে আছে আরামে চুমিয়ে ।
 একটি যুগল-করে মাথা,
 আরেকটি পড়ে আছে বৃকে,
 বাতাসটি বহে গিয়ে গায়
 শিহরি উঠিছে অতি সুখে ।
 হেলে হেলে হুয়ে হুয়ে লতা
 বাতাসেতে পায়ে এসে পড়ে,
 বিশ্বয়ে মুখের পানে চেয়ে
 ফুলগুলি ছলে ছলে নড়ে ।
 অতি দূরে বাজে ধীরে বাঁশি,
 অতি সুখে পরান উদাসী,
 অধরেতে স্থলিতচরণা
 মদিরহিল্লোলময়ী হাসি ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কে যেন রে চুমো খেয়ে তারে
 চলে গেছে এই কিছু আগে ;
 চুমোটেরে বাঁধি ফুলহারে
 অথরেতে হাসির মাঝারে,
 চুমোতে চাঁদের চুমো দিয়ে
 রেখেছে রে যতনে সোহাগে ।
 তাই সেই চুমোটেরে ঘিরে
 হাসিগুলি সারা রাত আগে ।
 কে যেন রে বসে তার কাছে
 গুন গুন করে বলে গেছে
 মধুমাখা বাণী কানে কানে ।
 পরানের কুসুম কারায়,
 কথাগুলি উড়িয়ে বেড়ায়,
 বাহিরিতে পথ নাহি জানে ।
 অতি দূর বাঁশঝির গানে
 সে বাণী জড়িয়ে যেন গেছে,
 অবিরত স্বপনের মতো
 ঘুরিয়ে বেড়ায় কাছে কাছে ।
 মুখে নিয়ে সেই কথা ক-টি
 খেলা করে উলটি প্লালটি,
 আপনি আপন বাণী গুনে
 শরমে স্নেহেতে হয় সারা ।
 কার মুখ পড়ে তার মনে,
 কার হাসি লাগিছে নয়নে,
 স্মৃতির মধুর ফুলবনে
 কোথায় হয়েছে পথহারা ।
 চেয়ে তাই সুনীল আকাশে,
 মুখেতে চাঁদের আলো ভাসে,
 অবসান গান আশেপাশে
 ভ্রমে যেন ভ্রমরের পারা ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তেমনি কিরণ লুটে সন্ন্যাসীর জটাজুটে
 পূরব-আকাশ-সীমা হতে ।
 বিমল আলোক হেন ব্রহ্মলোক হতে যেন
 ঝরে তাঁর ললাটের কাছে,
 মর্ত্যের তামসী নিশি পশ্চাতে যেতেছে মিশি
 নীরবে নিস্তব্ধ চেয়ে আছে !
 সুদূর সমুদ্র-নীরে অসীম আঁধার-তীরে
 একটুকু কনকের রেখা,
 কী মহা রহস্যময়, সমুদ্রে অরুণোদয়
 আভাসের মতো যার দেখা ।
 চরাচর ব্যগ্র প্রাণে, পূরবের পথপানে
 নেহারিছে সমুদ্র অতল,
 দেখে চেয়ে মরি মরি, কিরণ-ঝুণাল 'পরি
 জ্যোতির্ময় কনক-কমল ।
 দেখে চেয়ে দেখে পূবে কিরণে গিয়েছে ডুবে
 -গগনের উদার ললাট,
 সহসা সে ঋষিবর আকাশে তুলিয়া কর
 গাহিয়া উঠিল বেদপাঠ ।

পাগল

আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে,
 গান কেউ শোনে, কেউ শোনে না ।
 ঘুরে বেড়ায় জগৎ-পানে চেয়ে
 তারে কেউ দেখে, কেউ দেখে না ।
 সে যেন গানের মতো প্রাণের মতো শুধু
 সৌরভের মতো উড়ছে বাতাসেতে,
 আপনারে আপনি সে জানে না,
 তবু আপনাতে আপনি আছে মেতে ।

ছবি ও গান

১২৫

হরষে তার পুলকিত গা,
 ভাবের ভরে টলমল পা,
 কে জানে কোথায় যে সে চায়
 আঁখি তার দেখে কি দেখে না।
 লতা তার গায়ে পড়ে,
 ফুল তার পায়ে পড়ে,
 নদীর মুখে কুলু কুলু রা'।
 গায়ের কাছে বাতাস করে বা'।
 সে শুধু চলে যায়,
 মুখে কী বলে যায়,
 বাতাস গলে যায় তা শুনে।
 স্তম্ভে আঁখি রেখে,
 চলেছে কোথা যে কে
 কিছু সে নাহি দেখে শোনে।

যেখান দিয়ে যায় সে চলে সেখায় যেন ঢেউ খেলে যায়,
 বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে,
 ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্রামল দেখে
 লতার যেন কুসুম কোটে কোটে।
 বসন্ত তার সাড়া পেয়ে সখা ব'লে আসে ধৈর্যে,
 বনে যেন দুইটি বসন্ত,
 দুই সখাতে ভেসে চলে ঘোবন-সাগরের জলে
 কোথাও যেন নাহি রে তার অন্ত।
 আকাশ বলে এস এস, কানন বলে ব'সো ব'সো,
 সবাই যেন নায় ধরে তা' ডাকে।
 হেসে যখন কয় সে কথা, মুছা যায় রে বনের লতা,
 লুটিয়ে ভুঁয়ে চূপ করে সে থাকে।
 বনের হরিণ কাছে আসে, সাথে সাথে কিরে পাশে
 স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায় দেহছায়।
 পায়ের কাছে পড়ে লুটি, বড়ো বড়ো নয়ন দুটি
 তুলে তুলে মুখের পানে চায়।

১২৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আপন-ভোলা সরল হাসি ঝরে পড়ছে রাশি রাশি,
 আপনি যেন জানতে নাহি পায় ।
 লতা তারে আঁটকে রেখে তারি কাছে হাসতে শেখে,
 হাসি যেন কুসুম হয়ে যায় ।
 গান গায় সে সীমের বেলা, মেঘগুলি তাই ভুলে খেলা
 নেমে আসতে চায় রে ধরাপানে,
 এক একে সীমের তারা গান শুনে তার অবাক পারা
 আর সবারে ডেকে ডেকে আনে ।
 আপনি মাতে আপন স্বরে আর সবারে পাগল করে,
 সাথে সাথে সবাই গাহে গান,
 জগতের যা কিছু আছে সব ফেলে দেয় পায়ের কাছে
 প্রাণের কাছে খুলে দেয় সে প্রাণ ।

তোরাই শুধু শুনলি নে রে, কোথায় বসে রইলি যে রে,
 ঘরের কাছে গেল গেয়ে গেয়ে,
 কেউ তাহারে দেখলি নে তো চেয়ে ।
 গাইতে গাইতে চলে গেল, কত দূর সে চলে গেল,
 গানগুলি তার হারিয়ে গেল বনে,
 ছায়ার দেওয়া তোদের পাষণ মনে ।

মাতাল

বুঝি রে,

তাঁদের কিরণ পান ক'রে ওর ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি,
 কাছে ওর যেয়ো না,
 কথাটি শুধায়ো না,
 কুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী ।

ছবি ও গান

১২৭

যুগের মতো মেয়েগুলি
 চোখের কাছে তুলি তুলি
 বেড়ায় শুধু নুপুর রনরনি।
 আধেক মুদি আঁখির পাতা,
 কার সাথে যে কচ্ছে কথা,
 শুনছে কাহার মৃদু মধুর ধ্বনি।
 অতি সুদূর পরীর দেশে—
 সেখান থেকে বাতাস এসে
 কানের কাছে কাহিনী শুনায়।
 কত কী যে মোহের মায়া,
 কত কী যে আলোক ছায়া,
 প্রাণের কাছে স্বপন ঘনায়।
 কাছে ওর যেয়ো না,
 কথাটি শুধায়ো না,
 যুগের মেয়ে তরাস পেয়ে যাবে,
 মৃদু প্রাণে প্রমাদ গনি,
 নুপুরগুলি রনরনি,
 চাঁদের আলোর কোথায় কে লুকাবে।

চলো দূরে নদীর তীরে,
 বসে সেখায় ধীরে ধীরে
 একটি শুধু বাঁশরি বাজাও।
 আকাশেতে হাসবে বিধু,
 মধু কর্ণে মৃদু মৃদু
 একটি শুধু সুরেরি গান গাও।
 দূর হতে আসিয়া কানে
 পশিবে সে প্রাণের প্রাণে
 স্বপনেতে স্বপন ঢালিয়ে।
 ছায়াময়ী মেয়েগুলি
 গানের স্রোতে তুলি তুলি,

১২৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বসে বসে গালে হাত দিয়ে ।

গাহিতে গাহিতে তুমি বালা

গেঁথে রাখো মালতীর মালা ।

ও যখন ঘুমাইবে, গলায় পরায় দিবে

স্বপনে মিশিবে ফুলবাস ।

ঘুমন্ত মুখের 'পরে চেয়ে থেকো প্রেমভরে

মুখেতে ফুটিবে মৃদু হাস ।

বাদল

একলা ঘরে বসে আছি, কেউ নেই কাছে,

সারাটা দিন মেঘ করে আছে ।

সারাদিন বাদল হল,

সারাদিন বৃষ্টি পড়ে,

'সারাদিন বইছে বাদল বায় ।

মেঘের ঘটা আকাশভরা,

চারিদিকে আধার-করা,

তড়িৎ-রেখা বলক মেরে যায় ।

শ্রামল বনের শ্রামল শিরে

মেঘের ছায়া নেমেছে রে,

মেঘের ছায়া কুঁড়েঘরের 'পরে,

ভাঙাচোরা পথের ধারে,

ঘন বাঁশের বনের ধারে,

মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ঘেন ধরে ।

বিজন ঘরে বাতায়নে,

সারাটা দিন আপন মনে,

বসে বসে বাইরে চেয়ে দেখি,

ছবি ও গান

১২৯

টুপুটুপু বৃষ্টি পড়ে,
 পাতা হতে পাতায় ঝরে,
 ডালে বসে ভেজে একটি পাখি ।
 তালপুকুরে, জলের 'পরে,
 বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায়,
 ছেলেরা মেতে বেড়ায় জলে ;
 মেয়েগুলি কলসী নিয়ে,
 চলে আসে পথ দিয়ে,
 আঁধারভরা গাছের তলে তলে ।

কে জানে কী মনেতে আশ,
 উঠছে ধীরে দীর্ঘ-নিশাস,
 বায়ু উঠে খসিয়া খসিয়া ।
 ডালপালা হাহা করে
 বৃষ্টিবিন্দু ঝরে পড়ে
 পাতা পড়ে খসিয়া খসিয়া ।

আত্মস্মরণ

শ্রাবণে গভীর নিশি দিগ্বিদিক আছে মিশি
 মেঘেতে মেঘেতে ঘন বাঁধা,
 কোথা শশী, কোথা তারা, মেঘাবরণে পথহারা
 আঁধারে আঁধারে সব আঁধা ।
 জলন্ত বিদ্যুৎ-অহি ক্ষণে ক্ষণে রহি রহি
 অন্ধকারে করিছে দংশন ।
 কুন্ডকর্ণ অন্ধকার নিদ্রা টুটি বার বার
 উঠিতেছে করিয়া গর্জন ।
 শূন্যে ঘন স্থান নাই, পরিপূর্ণ সব ঠাই,
 স্নকঠিন আঁধার চাপিয়া ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বাঁধ বহে, মনে হয়, ও যেন রে বাড় নয়,
 অন্ধকার ঢুলিছে কাঁপিয়া ।
 মাঝে মাঝে থরহর কোথা হতে মরমর
 কেঁদে কেঁদে উঠিছে অরণ্য ।
 নিশীথ-সমুদ্র মাঝে জলজন্তুসম রাজে
 নিশাচর যেন রে অগণ্য ।
 কে যেন রে মুহূর্ষ নিশ্বাস ফেলিছে হ হ,
 হ হ করে কেঁদে কেঁদে ওঠে,
 সুদূর অরণ্যতলে ডালপালা পায়ে দলে
 আর্তনাদ করে যেন ছোটে ।
 এ অনন্ত অন্ধকারে কে রে সে, খুঁজিছে কারে,
 তন্ন তন্ন আকাশ-গহ্বর ।
 তারে নাহি দেখে কেহ শুধু শিহরায় দেহ
 শুনি তার তীব্র কণ্ঠস্বর ।
 তুই কি রে নিশীথিনী অন্ধকারে অনাথিনী
 হারাইলি জগতেরে তোর ;
 অনন্ত আকাশ 'পরি ছুটিস রে হাহা করি,
 আলোড়িয়া অন্ধকার ঘোর ।
 তাই কি রে থেকে থেকে নাম ধরে ডেকে ডেকে
 জগতেরে করিস আহ্বান ।
 শুনি আজি তোর স্বর শিহরিত কলেবর
 কাঁদিয়া উঠিছে কার প্রাণ ।
 কে আজি রে তোর সাথে ধরি তোর হাতে হাতে
 খুঁজিতে চাহিছে যেন কারে ।
 মহাশূন্যে দাঁড়াইয়ে, প্রাপ্ত হতে প্রাপ্তে গিয়ে
 কে চাহে কাঁদিতে অন্ধকারে !
 আধারেতে আঁধি ফুটে বাটিকার 'পরে ছুটে
 তীক্ষ্ণশিখা বিদ্যুৎ মাড়ায়ে
 হ হ করি নিশ্বাসিয়া চলে যাবে উদাসিয়া
 কেশপাশ আকাশে ছড়ায়ে ।

ছবি ও গান

১৩১

উলঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝটিকার কণ্ঠ শ্রিনি
 তীব্র কণ্ঠে ডাকিবে তাহারে,
 সে বিলাপ কেঁপে কেঁপে বেড়াবে আকাশ ব্যোমে
 ধ্বনিয়া অনন্ত অন্ধকারে ।
 ছিঁড়ি ছিঁড়ি কেশপাশ কতু কান্না কতু হাস
 প্রাণ ভ'রে করিবে চীৎকার,
 বজ্র-আলিঙ্গন দিয়ে বুকে তোরে জড়াইয়ে
 ছুটিতে গিয়েছে সাধ তার ।

স্মৃতি-প্রতিমা

আজ কিছু করিব না আর,
 সমুখেতে চেয়ে চেয়ে গুন গুন গেয়ে গেয়ে
 বসে বসে ভাবি এক বার,
 আজি বহু দিন পরে যেন সেই দ্বিপ্রহরে
 সেদিনের বায়ু বহে যায়,
 হা রে হা শৈশব-মায়া, অতীত প্রাণের ছায়া,
 এখনো কি আছিস হেথায় ?
 এখনো কি থেকে থেকে উঠিস রে ডেকে ডেকে,
 সাড়া দিবে সে কি আর আছে ?
 যা ছিল তা আছে সেই, আমি যে সে আমি নেই
 কেন রে আসিস মোর কাছে ?
 কেন রে পুরানো স্নেহে পরানের শূন্য গেছে
 দাঁড়ায়ে মুখের পানে চাস ?
 অভিমানে ছল ছল নয়নে কী কথা বল,
 কেঁদে ওঠে হৃদয় উদাস ।
 আছিল যে আপনার সে বুঝি রে নাই আর,
 সে বুঝি রে হয়ে গেছে পর,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তবু সে কেমন আছে, শুধাতে আসিস কাছে,
 দাঁড়ায়ে কাঁপিস থর থর ।
 আয় রে আয় রে অয়ি, শৈশবের স্মৃতিময়ী,
 আয় তোর আপনার দেশে,
 যে প্রাণে আছিল তোরি তাহারি দুয়ার ধরি
 কেন আজ ভিখারিনী বেশে ।
 আশুসরি ধীরি ধীরি বার বার চাস ফিরি,
 সংশয়েতে চলে না চরণ,
 ভয়ে ভয়ে মুখপানে চাহিস আকুল প্রাণে,
 ম্লান মুখে না সরে বচন ।
 দেহে-যেন নাহি বল, চোখে পড়ে-পড়ে জল,
 এলো চুলে, মলিন বসনে ;
 ক্লথা কেহ বলে পাছে, ভয়ে না আসিস কাছে,
 চেয়ে রোস আকুল নয়নে ।
 সেই ঘর, সেই দ্বার, মনে পড়ে বার বার
 কত যে করিলি খেলাধূলি,
 খেলা ফেলে গেলি চলে, কথাটি না গেলি বলে,
 অভিমানে নয়ন আকুলি ।
 যেথা যা গেছিলি রেখে, ধুলায় গিয়েছে ঢেকে,
 দেখে রে তেমনি আছে পড়ি,
 সেই অশ্রু, সেই গান, সেই হাসি, অভিমান,
 ধুলায় যেতেছে গড়াগড়ি ।
 তবে রে বারেক আয়, ব'স হেথা পুনরায়,
 ধুলিমাখা অতীতের মাঝে,
 শূন্য গৃহ জনহীন পড়ে আছে কত দিন,
 আর হেথা বাঁশি নাহি বাজে ।
 কেন তবে আসিবি নে, কেন কাছে বসিবি নে
 এখনো বাসিস যদি ভালো,
 আয় রে ব্যাকুল প্রাণে চাই হুঁহু মুখপানে,
 গোধূলিতে নিব-নিব আলো ।

ছবি ও গান

১৩৩

নিবিছে সাঁবের ভাতি, আসিছে আঁধার রাত্তি,
 এখনি ছাইবে চারিভিত্তে,
 রজনীর অন্ধকারে, মরণ-সাগরপারে
 কেহ কারে নারিব দেখিতে।
 আকাশের পানে চাই, চন্দ্র নাই তারা নাই,
 একটু না বহিছে বাতাস,
 শুধু দীর্ঘ দীর্ঘ নিশি, দু-জনে আঁধারে মিশি—
 শুনিব দৌহার দীর্ঘশ্বাস।
 এক বার চেয়ে দেখি, কোন্‌খানে আছে যে কী,
 কোন্‌খানে করেছিল খেলা,
 শুকানো এ মালাগুলি, রাখি রে কণ্ঠেতে তুলি,
 কখন চলিয়া যাবে বেলা।
 আয় তবে আয় হেথা, কোলে তোর রাখি মাথা,
 কেশপাশে মুখ দে রে ঢেকে,
 বিন্দু বিন্দু ধীরে ধীরে অশ্রু পড়ে অশ্রুনারে,
 নিশ্বাস উঠিছে থেকে থেকে।
 সেই পুরাতন স্নেহে হাতটি বুলাও দেহে,
 মাথাটি বুকেতে তুলে রাখি,
 কথা কও নাহি কও, চোখে চোখে চেয়ে রও,
 আঁখিতে ডুবিয়া যাক আঁখি।

আবছায়া

তারা সেই, ধীরে ধীরে আসিত
 মৃদু মৃদু হাসিত,
 তাদের পড়েছে আজ মনে,
 তারা কথাটি কহিত না,
 কাছেতে রহিত না,
 চেয়ে রহিত নয়নে নয়নে।

তারা

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চলে যেত আনমনে,
 বেড়াইত বনে বনে,
 আনমনে গাহিত রে গান ।
 চুল থেকে ঝরে ঝরে
 ফুলগুলি যেত পড়ে,
 কেশপাশে ঢাকিত বয়ান ।
 কাছে আমি যাইতাম,
 গানগুলি গাইতাম,
 সাথে সাথে যাইতাম পিছু,
 তারা যেন আনমনা,
 গুনিত কি গুনিত না,
 বুঝিবারে নারিতাম কিছু ।
 কভু তারা থাকি থাকি
 আনমনে শূন্য আঁখি,
 চাহিয়া রহিত মুখপানে,
 ভালো তারা বাসিত কি,
 মুছ হাসি হাসিত কি,
 প্রাণে প্রাণ দিত কি, কে জানে ।
 গাঁথি ফুলে মালাগুলি,
 যেন তারা যেত ভুলি
 পরাইতে আমার গলায় ।
 যেন যেতে যেতে ধীরে
 চায় তারা কিরে কিরে
 বকুলের গাছের তলায় ।
 যেন তারা ভালোবেসে
 ডেকে যেত কাছে এসে
 চলে যেতে করিত রে মানা ।
 আমার তরুণ প্রাণে
 তাদের হৃদয়খানি
 আধো জানা, আধেক অজানা ।

ছবি ও গান

১৩৫

কোথা চলে গেল তারা,
কোথা যেন পথহারা,
তাদের দেখি নে কেন আর।
কোথা সেই ছায়া ছায়া
কিশোর-কল্লনা-মায়া,
মেঘ-মুখে হাসিটি উবার।
আলোতে ছায়াতে ঘেরা
জাগরণ স্বপনেরা
আশেপাশে করিত রে খেলা,
একে একে পলাইল,
শূন্যে যেন মিলাইল,
বাড়িতে লাগিল যত বেলা।

আচ্ছন্ন

লতার লাবণ্য যেন কচি কিশলয়ে ঘেরা,
সুকুমার প্রাণ তার মাধুরীতে ঢেকেছে,
কোমল মুকুলগুলি চারিদিকে আকুলিত
তারি মাঝে প্রাণ যেন লুকিয়ে রেখেছে।
ওরে যেন ভালো করে দেখা যায় না,
আঁখি যেন ডুবে গিয়ে কুল পায় না।
সাঁঝের আভা নেমে এল, জ্যোৎস্না পাশে ঘুমিয়ে প'ল,
ফুলের গন্ধ দেখতে এসেছে,
তারাগুলি ঘিরে বসেছে।
পুরবী রাগিণীগুলি দূর হতে চলে আসে
ছুঁতে তারে হয় নাকো ভরসা,
কাছে কাছে ফিরে ফিরে মুখপানে চায় তারা,
যেন তারা মধুময়ী দ্রাশা।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ঘুম প্রাণেরে ঘিরে স্বপ্নগুলি ঘুরে ফিরে
 গাঁথে যেন আলোকের কুয়াশা,
 ঢেকে তারে আছে কৃত, চারি দিকে শত শত
 অনিমিষ নয়নের পিয়াসা ।
 ওদের আড়াল থেকে আবছায়া দেখা যায়
 অতুলন প্রাণের বিকাশ,
 সোনার মেঘের মাঝে কচি উষা ফোটে ফোটে
 পুরবেতে তাহারি আভাস ।

আলোক-বসনা যেন আপনি সে ঢাকা আছে
 আপনার রূপের মাঝার,
 রেখা রেখা হাসিগুলি আশেপাশে চমকিয়ে
 রূপেতেই লুকায় আবার ।
 আঁখির আলোক-ছায়া আঁখিরে রয়েছে ঘিরে,
 তারি মাঝে দৃষ্টি পথহারি,
 যেথা চলে, স্বর্গ হতে অবিরাম পড়ে যেন
 লাবণ্যের পুষ্পবারিধারা ।
 ধরণীরে ছুঁয়ে যেন পা দুখানি ভেসে যায়,
 কুসুমের স্রোত বহে যায়,
 কুসুমেরে ফেলে রেখে খেলাধুলা ভুলে গিয়ে
 মায়ামুগ্ধ বসন্তের বায় ।

ওরে কিছু শুধাইলে বুঝি রে নয়ন মেলি
 ছ-দণ্ড নীরবে চেয়ে রবে,
 অতুল অধর দুটি ঈষৎ টুটিয়ে বুঝি
 অতি ধীরে দুটি কথা কবে ।
 আমি কি বুঝি সে ভাষা শুনিতে কি পাব বাণী
 সে যেন কিসের প্রতিধ্বনি,
 মধুর মোহের মতো যেমনি ছুঁইবে প্রাণ
 যুমায়ে সে পড়িবে অমনি ।

ছবি ও গান

১৩৭

হৃদয়ের দূর হতে সে যেন রে কথা কয়
 তাই তার অতি মৃদুস্বর,
 বায়ুর হিল্লোলে তাই আকুল কুমুদ সম
 কথাগুলি কাঁপে থর থর।

কে তুমি গো উষাময়ী, আপন কিরণ দিয়ে
 আপনারে করেছ গোপন,
 রূপের সাগর মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
 একাকিনী লক্ষ্মীর মতন।
 ধীরে ধীরে ওঠো দেখি, এক বার চেয়ে দেখি,
 স্বর্ণজ্যোতি কমল আসন,
 সুনীল সলিল হতে ধীরে ধীরে উঠে থাখা
 প্রভাতের বিমল কিরণ।
 সৌন্দর্য-কোরক টুটে এস গো বাহির হয়ে
 অল্পম সৌরভের প্রায়,
 আমি তাহে ডুবে যাব সাথে সাথে বহে যাব
 উদাসীন বসন্তের বায়।

স্নেহময়ী

হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসিমুখখানি,
 প্রভাতে ফুলের বনে দাঁড়িয়ে আপন মনে
 মরি মরি, মুখে নাই বাণী।
 প্রভাত-কিরণগুলি চৌদিকে যেতেছে খুলি
 যেন শুভ্র কমলের দল,
 আপন মহিমা লয়ে তারি মাঝে দাঁড়াইয়ে
 কে তুই, করুণাময়ী বল।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

নিশি ওই দু-নয়ানে চাহিলে মুখের পানে
 সুখাময়ী শান্তি প্রাণে জাগে,
 শুনি যেন স্নেহবাণী, কোমল ও হাতখানি
 প্রাণের গায়িতে যেন লাগে ।
 তোরে যেন চিনিতাম, তোর কাছে শুনিতাম
 কত কী কাহিনী, সন্ধ্যাবেলা,
 যেন মনে নাই, কবে কাছে বসি মোরা সবে
 তোর কাছে করিতাম খেলা ।
 অতি ধীরে তোর পাশে প্রভাতের বায়ু আসে,
 যেন ছোটো ভাইটির প্রায়,
 যেন তোর স্নেহ পেয়ে তোর মুখপানে চেয়ে
 আবার সে খেলাইতে যায় ।
 অমিয়-মাধুরী মাখি চেয়ে আছে দুটি আঁখি,
 জগতের প্রাণ জুড়াইছে,
 ফুলেরা আমোদে মেতে হলে দুলে বাতাসেতে
 আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে ।
 কী যেন জান গো ভাষা, কী যেন দিতেছ আশা,
 আঁখি দিয়ে পরান উথলে,
 চারিদিকে ফুলগুলি, কচি কচি বাহু তুলি,
 কোলে নাও, কোলে নাও বলে ।
 কারে যেন কাছে ডাক, যেথা তুমি বসে থাক
 তার চারিদিকে থাক তুমি,
 তোমার আপনা দিয়ে হাসিময়ী শান্তি দিয়ে,
 পূর্ণ কর চরাচরভূমি ।
 তোমাতে পুরেছে বন, পূর্ণ হল সমীরণ,
 তোমাতে পুরেছে লতাপাতা ।
 ফুল দূরে থেকে চায় তোমার পরশ পায়,
 লুটায় তোমার কোলে মাখা ।
 তোমার প্রাণের বিভা চৌদিকে তুলিছে কিবা
 প্রভাতের আলোক-হিল্লোলে,

ছবি ও গান

১৩৯

আজিকে প্রভাতে এ কী স্নেহের প্রতিমা দেখি,
 বসে আছি জগতের কোলে ।
 কেহ মুখে চেয়ে থাকে, কেহ তোরে কাছে ডাকে,
 কেহ তোর কোলে খেলা করে ।
 তুমি শুধু স্তব্ধ হয়ে একটি কথা না কয়ে
 চেয়ে আছি আনন্দের ভরে ।
 ওই যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়িয়ে আছে
 ওরা মোর আপনার লোক,
 ওরাও আমারি মতো তোর স্নেহে আছে রত,
 জুঁই বেলা বকুল অশোক ।
 বড়ো সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে,
 কাননে ফুলের সাথে মিশে,
 নয়ন-কিরণে তোর তুলিবে পরান ফোর,
 সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে ।
 তোমার হাসিটি লয়ে হরষে আকুল হয়ে
 খেলা করে প্রভাতের আলো,
 হাসিতে আলোটি পড়ে, আলোতে হাসিটি পড়ে,
 প্রভাত মধুর হয়ে গেল ।
 পরশি তোমার কায়, মধুর প্রভাত-বায়,
 মধুময় কুসুমের বাস,
 ওই দৃষ্টিসুধা দাও, এই দিক পানে চাও,
 প্রাণে হোক প্রভাত-বিকাশ ।

রাহুর প্রেম

জুনেছি আমারে ভালোই লাগে না,
 নাই বা লাগিল তোর,
 কঠিন বান্ধনে চরণ বড়িয়া,
 চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া,
 লৌহশৃঙ্খলের ডোর ।

তুই তো আমার বন্দী অভাগিনী,
 বাঁধিয়াছি কারাগারে,
 প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
 দেখি কে খুলিতে পারে ।

জগৎ মাঝারে, যেথায় বেড়াবি,
 যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
 কি বসন্ত শীতে, দিবসে নিশীথে
 সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
 এ পাষণ্ড প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
 চরণ জড়ায়ে ধরে,

এক বার তোরে দেখেছি যখন
 কেমনে এড়াবি মোরে ।

চাও নাই চাও, ডাক নাই ডাক,
 কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
 যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়,
 রব গায় গায় মিশি,

এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
 হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক,
 ভাঙা বাঁহু সম বাজিবে কেবল
 সাথে সাথে দিবানিশি ।

ছবি ও গান

১৪১

অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর
 আমি যে রে তোর ছায়া,
 কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,
 দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে,
 কখনো সমুখে কখনো পশ্চাতে,
 আমার আঁধার কায়া ।
 গভীর নিশীথে, একাকী যখন
 বসিয়া মলিন প্রাণে,
 চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে
 আমিও রয়েছি বসে তোর পাশে,
 চেয়ে তোর মুখ পানে ।
 যে দিকেই তুই ফিরাবি বয়ান,
 সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,
 যে দিকে চাহিবি, আকাশে আমার
 আঁধার মূরতি আঁকা,
 সকলি পড়িবে আমার আড়ালে,
 জগৎ পড়িবে ঢাকা ।
 দুঃস্বপ্নের মতো, দুর্ভাবনা সম,
 তোমায়ে রহিব ঘিরে,
 দিবস-রজনী এ-মুখ দেখিব
 তোমার নয়ন-নীরে ।
 বিশীর্ণ-কঙ্কাল চিরভিক্ষা সম
 দাঁড়ায়ে সমুখে তোর
 দাও দাও বলে কেবলি ডাকিব,
 ফেলিব নয়ন-লোর ।
 কেবলি সাধিব, কেবলি কাদিব
 কেবলি ফেলিব খাস,
 কানের কাছেতে, প্রাণের কাছেতে
 করিব রে হা-হতাশ ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মোর এক নাম কেবলি বসিয়া
জপিব কানেতে তব,
কাটার মতন দিবস রজনী
পায়েতে বিঁধিয়ে রব ।

পূর্বজনমের অভিশাপ সম,
রব আমি কাছে কাছে,
ভাবী জনমের অদৃষ্টের মতো
বেড়াইব পাছে পাছে ।

ঢালিয়া আমার প্রাণের আঁধার,
বেড়িয়া রাখিব তোর চারি ধার
নিশীথ রচনা করি ।

কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন,
শুধু ছুটি প্রাণী করিব যাপন
অনন্ত সে বিভাবরী ।

যেন রে অকুল সাগর মাঝারে
ডুবছে জগৎ-তরী ;
তারি মাঝে শুধু মোরা ছুটি প্রাণী,
রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
যুবিস ছাড়াতে ছাড়িব না তবু,
সে মহাসমুদ্র 'পরি,

পলে পলে তোর দেহ হয় ক্ষীণ,
পলে পলে তোর বাহু বলহীন,
তু-জনে অনন্তে ডুবি নিশিদিন,
তবু আছি তোরে ধরি ।

রোগের মতন বাঁধিব তোমারে
নিদারুণ আলিঙ্গনে,
মোর ষাতনায় হইবি অধীর,
আমারি অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর
কিছু না রহিবে মনে ।

ছবি ও গান

১৪৩

গভীর নিশীথে জাগিয়া উঠিয়া
 সহসা দেখিবি কাছে,
 আড়ষ্ট কঠিন মৃত দেহ মোর
 তোর পাশে শুয়ে আছে।
 ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি,
 কেবল দেখিবি মোরে,
 এই অনিমেষ তুষাতুর আঁখি
 চাহিয়া দেখিছে তোরে।
 নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই
 শুনিবি আঁধার ঘোরে,
 কোথা হতে এক কাতর উন্মাদ
 ডাকে তোর নাম ধরে।
 স্নবিজ্জন পথে চলিতে চলিতে
 সহসা সভয় গনি,
 সাঁঝের আঁধারে শুনিতে পাইবি
 আমার হাসির ধনি।

হেরো অন্ধকার মরুময়ী নিশা,
 আমার পরান হারিয়েছে দিশা,
 অনন্ত এ ক্ষুধা অনন্ত এ তৃষা,
 করিতেছে হাহাকার,
 আজিকে যখন পেয়েছি রে তোরে,
 এ চির-সামিনী ছাড়িব কী করে ?
 এ ঘোর পিপাসা যুগ-যুগান্তরে
 মিটিবে কি কভু আর ?
 বৃকের ভিতরে ছুরির মতন,
 মনের মাঝারে বিষের মতন,
 রোগের মতন, শোকের মতন
 রব আমি অনিবার।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে,
 আশার পশ্চাতে ভয়,
 ডাঁকিনীর মতো রক্তনী ভ্রমিছে
 চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
 সমস্ত ধরণীময় ।
 যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
 এই তো নিয়ম ভবে,
 ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
 এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে ।

মধ্যাহ্নে

হেরো ওই বাড়িতেছে বেলা,
 বসে আমি রয়েছি একেলা ।
 ওই হোথা যায় দেখা, স্নদুরে বনের রেখা
 মিশেছে আকাশ-নীলিমায় ।
 দিক হতে দিগন্তের মাঠ শুধু ধু ধু করে,
 বায়ু কোথা বহে চলে যায় ।
 স্নদুর মাঠের পারে গ্রামখানি এক ধারে
 গাছ দিয়ে ছায়া দিয়ে ঘেরা,
 কাননের গায়ে যেন ছায়াখানি বুলাইয়া
 ভেসে চলে কোথায় মেঘেরা ।
 মধুর উদাস প্রাণে চাই চারি দিক পানে,
 শুক সব ছবির মতন,
 সব যেন চারিধারে অবশ আলস-ভারে
 স্বর্ণময় মায়ায় মগন ।
 গ্রামখানি, মাঠখানি, উচুনিচু পথখানি,
 দু-একটি গাছ মাঝে মাঝে,
 আকাশ সমুদ্রে ঘেরা স্তবর্ণদীপের পারা
 কোথা যেন স্নদুরে বিরাজে ।

ছবি ও গান

১৪৫

কনক-লাবণ্য লয়ে যেন অভিভূত হয়ে
 আপনাতে আপনি ঘুমায়ে,
 নিরুন্ম পাদপ-লতা, শ্রান্তকার নীরবতা
 শুয়ে আছে গাছের ছায়ায় ।
 শুধু অতি মৃদু স্বরে গুন গুন গান করে
 যেন সব ঘুমন্ত ভ্রমর,
 যেন মধু খেতে খেতে ঘুমিয়েছে কুসুমেরে
 মরিয়া এসেছে কণ্ঠস্বর ।
 নীল শূন্যে ছবি জাঁকা, রবির কিরণ মাখা,
 সেখা যেন বাস করিতেছি,
 জীবনের আধখানি যেন ভুলে গেছি আমি,
 কোথা যেন ফেলিয়ে এসেছি ।
 আনমনে ধীরে ধীরে বেড়াতেছি কিরি কিরি
 ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়,
 কোথা যাব কোথা যাই সে-কথা যে মনে নাই,
 ভুলে আছি মধুর মায়ায় ।
 মধুর বাতাসে আজি যেন রে উঠিছে বাজি
 পরানের ঘুমন্ত বীণাটি,
 ভালোবাসা আজি কেন সঙ্গীহার পাখি যেন
 বসিয়া গাহিছে একেলাটি ।
 কে জানে কাহারে চায়, প্রাণ যেন উভরায়
 ডাকে কারে “এস এস” বলে,
 কাছে কারে পেতে চায়, সব তারে দিতে চায়,
 মাখাটি রাখিতে চায় কোলে ।
 স্তব্ধ তরুতলে গিয়া পা দুখানি ছড়াইয়া
 নিমগন মধুময় মোহে,
 আনমনে গান গেয়ে দূর শূন্যপানে চেয়ে
 ঘুমায়ে পড়িতে চায় দৌহে ।
 দূর মরীচিকা সম ওই বন-উপবন,
 ওরি মাঝে পরান উদাসী,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বিজন বকুলতলে পল্লবের মরমরে
 নাম ধরে বাজাইছে বাঁশি !
 সে যেন কোথায় আছে, স্তূর বনের পাছে,
 কত নদী-সমুদ্রের পারে,
 নিভৃত নির্ঝর-তীরে লতায় পাতায় ঘিরে
 বসে আছে নিকুঞ্জ-আধারে ।
 সাধ যায় বাঁশি-করে বন হতে বনান্তরে
 চলে যাই আপনার মনে,
 কুসুমিত নদীতীরে বেড়াইব ফিরে ফিরে
 কে জানে কাহার অন্বেষণে ।
 সহসা দেখিব তারে, নিমেষেই একেবারে
 প্রাণে প্রাণে হইবে মিলন,
 এই মরীচিকা-দেশে দু-জনে বাসর-বেশে
 ছায়ারাজ্যে করিব ভ্রমণ ।
 বাঁধিবে সে বাহুপাশে, চোখে তার স্বপ্ন ভাসে
 মুখে তার হাসির মুকুল,
 কে জানে বুকের কাছে আঁচল আছে না আছে
 পিঠেতে পড়েছে এলো চুল ।
 মুখে আধখানি কথা চোখে আধখানি কথা
 আধখানি হাসিতে জড়ানো,
 দু-জনেতে চলে যাই কে জানে কোথায় যাই
 পদতলে কুসুম ছড়ানো ।

বুঝি রে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
 তপোবনে ঋষি-বালিকারা,
 পরিয়া বাকল-বাস, মুখেতে বিমল হাস
 বনে বনে বেড়াইত তারা ।
 হরিণ-শিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁসে.
 মালিনী বহিত পদতলে,

ছবি ও গান

১৪৭

দু-চারি সখীতে মেলি কথা কয় হাসি খেলি
 তরুতলে বসি কুতূহলে ।
 কারো কোলে কারো মাথা, সরল প্রাণের কথা
 নিরালায় কহে প্রাণ খুলি,
 লুকিয়ে গাছের আঁড়ে সাধ যায় শুনিবারে
 কী কথা কহিছে মেয়েগুলি ।
 লতার পাতার মাঝে, ঘাসের ফুলের মাঝে
 হরিণ-শিশুর সাথে মিলি,
 অঙ্গে আভরণ নাই, বাকুল-বসন পরি
 রূপগুলি বেড়াইছে খেলি ।

ওই দূর বনছায়া ও যে কী জানে রে মায়া,
 ও যেন রে রেখেছে লুকায়ে,
 সেই স্নিগ্ধ তপোবন, চিরফুল তরুগণ,
 হরিণ-শাবক তরুছায়ে ।
 হোথায় মালিনী নদী বহে যেন নিরবধি,
 ঋষিকণ্ঠা কুটিরের মাঝে,
 কভু বসি তরুতলে স্নেহে তারে ভাই বলে,
 ফুলটি বারিলে ব্যথা বাজে ।
 কত ছবি মনে আসে, পুরানের আশেপাশে
 কল্পনা কত যে করে খেলা,
 বাতাস লাগায় গায়ে বসিয়া তরুর ছাঁয়ে
 কেমনে কাটিয়া যায় বেলা ।

পূর্ণিমায়

যাই যাই ডুবে যাই—
 আরো আরো ডুবে যাই,
 বিহ্বল অবশ অচেতন ।
 কোন্ থানে, কোন্ দূরে,
 নিশীথের কোন্ মাঝে,
 কোথা হয়ে যাই নিমগন ।
 হে ধরণী, পদতলে
 দিয়ো না দিয়ো না বাধা
 দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও,
 অনন্ত দিবস-নিশি,
 এমনি ডুবিতে থাকি
 তোমরা স্নদূরে চলে যাও ।
 এ' কী রে উদার জ্যোৎস্না,
 এ কী রে গভীর নিশি,
 দিশে দিশে স্তব্ধতা বিস্তারি ।
 আঁখি ছুটি মুদে গেছে
 কোথা আছি কোথা নামি
 কিছু যেন বুঝিতে না পারি ।
 দেখি দেখি আরো দেখি
 অসীম উদার শূণ্যে
 আরো দূরে আরো দূরে যাই,
 দেখি আজি এ অনন্তে
 আপনা হারিয়ে ফেলে
 আর যেন খুঁজিয়া না পাই ।
 তোমরা চাহিয়া থাক
 জোছন-অমৃত পানে
 বিহ্বল বিলীন তারাগুলি ।

ছবি ও গান

১৪৯

অপার দিগন্ত ওগো,
থাক এ মাথার 'পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি ।

গান নাই কথা নাই
শব্দ নাই স্পর্শ নাই
নাই ঘুম নাই জাগরণ ।
কোথা কিছু নাহি জাগে
সর্বদে জোছনা লাগে
সর্বদ পলকে অচেতন ।
অসীমে সুনীলে শূন্যে
বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
তারে যেন দেখা নাহি যায়—
নিশীথের মাঝে শুধু
মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায় ।
গাও বিশ্ব গাও তুমি
সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান—
শত লক্ষ যাত্রী লয়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান ।
অনন্ত রজনী শুধু
ডুবে যাই নিবে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে,
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিশায়েমিলায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে ।

পোড়ো বাড়ি

চারি দিকে কেহ নাই, একা ভাঙা বাড়ি
 সন্ধ্যাবেলা ছাদে বসে ডাকিতেছে কাক ।
 নিবিড় আঁধার, মুখ বাড়ায় রয়েছে,
 যেথা আছে ভাঙা ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক ।
 পড়েছে সন্ধ্যার ছায়া অশথের গাছে,
 থেকে থেকে শাখা তার উঠিছে নড়িয়া,
 ভয় শুষ্ক দীর্ঘ এক দেবদারু তরু
 হেলিয়া ভিত্তির 'পরে রয়েছে পড়িয়া ।
 আকাশেতে উঠিয়াছে আধখানি চাঁদ,
 তাকায় চাঁদের পানে গৃহের আঁধার,
 প্রাঙ্গণে করিয়া মেলা উর্ধ্বমুখ হয়ে
 চন্দ্রালোকে শৃগালেরা করিছে চীৎকার ।

শুধাই রে, ওই তোর ঘোর শুষ্ক ঘরে
 কখনো কি হয়েছিল বিবাহ-উৎসব ?
 কোনো রজনীতে কি রে ফুল দীর্পালোকে
 উঠেছিল প্রমোদের নৃত্যগীত-রব ?
 কোথায় কি প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়ে এলে
 তরুণীরা সন্ধ্যাদীপ জ্বলাইয়া দিত ?
 মায়ের কোলেতে শুয়ে চাঁদেরে দেখিয়া
 শিশুটি তুলিয়া হাত ধরিতে চাহিত ?
 বালকেরা বেড়াতে কি কোলাহল করি ?
 আড়িনায় খেলিত কি কোনো ভাইবোন ?
 মিলে মিশে স্নেহে প্রেমে আনন্দে উল্লাসে
 প্রতিদিবসের কাজ হত সমাপন ?
 কোন্ ঘরে কে ছিল রে ! সে কি মনে আছে ?
 কোথায় হাসিত বধু শরমের হাস,

ছবি ও গান

১৫১

বিরহিণী কোন্ ঘরে কোন্ বাতায়নে
 রজনীতে একা বসে ফেলিত নিশ্বাস ?
 যেদিন শিয়রে তোর অশথের গাছ
 নিশীথের বাতাসেতে করে মব্ মব্,
 ভাঙা জানালার কাছে পশে অতি ধীরে
 জাহ্নবীর তরঙ্গের দূর কলস্বর —
 সে-রাত্রে কি তাদের আবার পড়ে মনে
 সেই সব ছেলেদের সেই কচি মুখ,
 কত মেহময়ী মাতা তরুণ তরুণী
 কত নিমিষের কত ক্ষুদ্র সুখ-দুখ ?
 মনে পড়ে সেই সব হাসি আর গান,
 মনে পড়ে—কোথা তারা, সব অবসান ।

অভিমানিনী

ও আমার অভিমানী মেয়ে
 ওরে কেউ কিছু ব'লো না ।
 ও আমার কাছে এসেছে,
 ও আমার ভালো বেসেছে,
 ওরে কেউ কিছু ব'লো না ।

এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে
 ওই দেখো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
 নিমেষহারী আঁখির পাতা দুটি
 চোখের জলে ভরে এসেছে ।
 গ্রীবাধানি ঈষৎ বাকানো,
 দুটি হাতে মুঠি আছে চাপি,
 ছোটো ছোটো রাঙা রাঙা ঠোঁট
 ফুলে ফুলে উঠিতেছে কাঁপি ।

১৫২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সাধিলে ও কথা কবে না
 ডাকিলে ও আসিবে না কাছে,
 ও সবার 'পরে অভিমান করে
 আপনা নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে।

কী হয়েছে কী হয়েছে বলে
 বাতাস এসে চুলগুলি দোলায় ;
 রাঙা ওই কম্পোলখানিতে
 রবির হাসি হেসে চুমো খায় ।
 কচি হাতে ফুল দুখানি ছিল
 রাগ করে ঐ ফেলে দিয়েছে,
 পায়ের কাছে পড়ে পড়ে তারা
 মুখের পানে চেয়ে রয়েছে ।
 আয় বাছা, তুই কোলে বসে বল
 কী কথা তোর বলিবার আছে,
 অভিমানে রাঙা মুখখানি
 আন দেখি তুই এ বুকের কাছে ।
 ধীরে ধীরে আধো আধো বল
 কেঁদে কেঁদে ভাঙা ভাঙা কথা,
 আমার যদি না বলিবি তুই
 কে শুনিবে শিশু-প্রাণের ব্যথা ।

নিশীথ-জগৎ

জন্মেছি নিশীথে আমি, তাঁরার আলোকে,
 রয়েছে বসিয়া,
 চারিদিকে নিশীথিনী মাঝে মাঝে হু হু করি
 উঠিছে শসিয়া ।

ছবি ও গান

১৫৩

পশ্চিমে কঁরেছে মেঘ, নিবিড় মেঘের প্রান্তে
 ফুরিছে দামিনী,
 দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া যেন শিহরি মেলিছে আঁখি
 চকিত যামিনী ।
 আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদ্রিয়া
 করিতেছে ধ্যান,
 অসীম আঁধার নিশা আপনার পানে চেয়ে
 হারিয়েছে জ্ঞান ।
 মাথার উপর দিয়ে উড়িছে বাতুড়
 কাঁদিছে পেচক,
 একেলা রয়েছি বসি, চেয়ে শূন্যপানে
 না পড়ে পলক ।

আঁধারের প্রাণী যত ভূমিতলে হাত দিয়া
 ঘুরিয়া বেড়ায়,
 চোখে উড়ে পড়ে ধূলা, কোন্‌খানে কী যে আছে
 দেখিতে না পায় ।
 চরণে বাধিছে বাধা, পাষাণে বাজিছে মাথা,
 কাঁদিছে বসিয়া,
 অগ্নি-হাসি উপহাসি উজ্জ্বল-অভিশাপ-শিখা
 পড়িছে থসিয়া ।
 তাদের মাথার 'পরে সীমাহীন অন্ধকার
 স্তব্ধ গগনেতে,
 আঁধারের ভারে যেন হুইয়া পড়িছে মাথা
 মাটির পানেতে ।
 নড়িলে গাছের পাতা চকিতে চমকি উঠে,
 চায় চারিধারে,
 ঘোর আঁধারের মাঝে কোথা কী লুকায়ে আছে
 কে বলিতে পারে ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

গহন বনের মাঝে চলিয়াছে শিশু
 মার হাত ধরে,
 মুহূর্ত ছেড়েছে হাত, পড়েছে পিছায়
 খেলাবার তরে,
 অমনি হারান্নে পথ কেঁদে ওঠে শিশু
 ডাকে “মা মা” বলে,
 “আয় মা, আয় মা, আয়, কোথা চলে গেলি,
 মোরে নে মা কোলে।”
 মা অমনি চমকিয়া “বাছা বাছা” বলে ছোটে,
 দেখিতে না পায়,
 শুধু সেই অন্ধকারে মা মা ধ্বনি পশে কানে
 চারিদিকে চায়।

সহসা সমুখ দিয়া কে গেল ছায়ার মতো,
 লাগিল তরাস,
 কে জানে সহসা যেন কোথা কোন্ দিক হতে
 শুনি দীর্ঘশ্বাস।
 কে বসে রয়েছে পাশে? কে ছুঁইল দেহ মোর
 হিম-হস্তে তার।
 ও কী ও? এ কী রে শুনি! কোথা হতে উঠিল রে
 বোর হাহাকার?
 ও কী হোথা দেখা যায়—ওই দূরে অতি দূরে
 ও কিসের আলো?
 ও কী ও উড়িছে শূণ্যে দীর্ঘ নিশাচর পাখি?
 মেঘ কালো কালো?

এই আঁধারের মাঝে কত না অদৃশ্য প্রাণী
 কাঁদিছে বসিয়া,
 নীরবে টুটিছে প্রাণ, চাহিছে তারার পানে
 অরণ্যে পশিয়া।

ছবি ও গান

১৫৫

কেহ বা রয়েছে শুয়ে দক্ষ হৃদয়ের 'পরে
 স্মৃতিরে জড়ায়ে,
 কেহ না দেখিছে তারে, অন্ধকারে অশ্রুধারা
 পড়িছে গড়ায়ে।
 কেহ বা শুনিছে সাড়া, উর্ধ্বকণ্ঠে নাম ধরে
 ডাকিছে মরণে,
 পশিয়া হৃদয়মাবে আশার অন্ধুরগুলি
 দলিছে চরণে।
 ওদিকে আকাশ 'পরে মাবে মাবে থেকে থেকে
 উঠে অট্টহাস,
 ঘন ঘন করতালি, উনমাদ কণ্ঠস্বরে
 কাঁপিছে আকাশ।
 জালিয়া মশাল-আলো নাচিছে গাইছে তার!—
 ক্ষণিক উল্লাস,
 আঁধার মুহূর্ত তরে হাসে যথা প্রাণপনে
 আলেয়ার হাস।

অরণ্যের প্রান্তভাগে নদী এক চলিয়াছে
 ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া,
 শুষ্ক জল, শব্দ নাই—ফণী সম ফুঁসি উঠে
 থাকিয়া থাকিয়া।
 আধারে চলিতে পাছ দেখিতে না পায় কিছু
 জলে গিয়া পড়ে,
 মুহূর্তের হাহাকার মুহূর্তে ভাসিয়া যায়
 খরশ্রোতভরে।
 সখা তার তীরে বসি একেলা কাঁদিতে থাকে,
 ডাকে উর্ধ্বশ্বাসে,
 কাহারো না পেয়ে সাড়া শূন্যপ্রাণ প্রতিধ্বনি
 কেঁদে ফিরে আসে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

নিশীথের কারাগারে কে বেঁধে রেখেছে মোরে,
 রয়েছি পড়িয়া,
 কেবল রয়েছি বেঁচে স্বপন কুড়ায়ে লয়ে
 ভাঙিয়া গড়িয়া ।
 আধারে নিজের পানে চেয়ে দেখি, ভালো করে
 দেখিতে না পাই,
 হৃদয়ে অজানা দেশে পাখি গায় ফুল ফোটে
 পথ জানি নাই ।
 অন্ধকারে আপনারে দেখিতে না পাই যত
 তত ভালোবাসি,
 তত তারে বুকে করে বাহুতে বাঁধিয়া লয়ে
 হরষেতে ভাসি ।
 তত যেন মনে হয় পাছে রে চলিতে পথে
 তৃণ ফুটে পায়,
 যতনের ধন পাছে চমকি কাঁদিয়া ওঠে
 কুসুমের ঘায় ।
 সদা হয় অবিশ্বাস কারেও চিনি না হেথা,
 সবি অনুমান,
 ভালোবেসে কাছে গেলে দূরে চলে যায় সবে,
 ভয়ে কাঁপে প্রাণ ।
 গোপনেতে অশ্রু ফেলে মুছে ফেলে, পাছে কেহ
 দেখিবারে পায়,
 মরমের দীর্ঘশ্বাস মরমে রুধিয়া রাখে
 পাছে শোনা যায় ।
 সখারে কাঁদিয়া বলে—“বড়ো সাধ যায় সখা,
 দেখি ভালো করে,
 তুই শৈশবের বঁধু চিরজন্ম কেটে গেল
 দেখিছ না তোরে,
 বুঝি তুমি দূরে আছ, একবার কাছে এসে
 দেখাও তোমায় ।”

ছবি ও গান

১৫৭

সে অমনি কৈঁদে বলে—“আপনারে দেখি নাই
কী দেখাব হায়।”

অন্ধকার ভাগ করি, আঁধারের রাজ্য লয়ে
চলিছে বিবাদ,
সথারে বধিছে সখা সন্তানে হানিছে পিতা,
ঘোর পরমাদ।

মৃতদেহ পড়ে থাকে, শকুনি বিবাদ করে
কাছে ঘুরে ঘুরে,
মাংস লয়ে টানাটানি করিতেছে হানাহানি
শৃগালে কুকুরে।

অন্ধকার ভেদ করি অহরহ শুনা যায়,
আকুল বিলাপ,
আহতের আর্তস্বর, হিংসার উল্লাসধ্বনি
ঘোর অভিশাপ।

মাঝে মাঝে থেকে থেকে কোথা হতে ভেসে আসে
ফুলের সুবাস,
প্রাণ যেন কৈঁদে ওঠে, অশ্রুজলে ভাসে আঁখি
উঠে রে নিশ্বাস।

চারিদিক ভুলে যাই, প্রাণে যেন জেগে ওঠে
স্বপন-আবেশ,—
কোথা রে ফুটেছে ফুল, আঁধারের কোন্ তীরে
কোথা কোন্ দেশ।

রক্তপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রাণী, রক্ত প্রাণীদের সাথে
কত রে রহিব,
ছোটো ছোটো সুখ দুখ, ছোটো ছোটো আশাগুলি
পুষিয়া রাখিব।

১৫৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

নিভ্রাহীন আঁখি মেলি পুরব-আকাশ পানে
 রয়েছে চাহিয়া
 কবে রে প্রভাত হবে, আনন্দে বিহঙ্গগুলি
 উঠবে গাহিয়া ।

ওই যে পুরবে হেরি অরুণ-কিরণে সাজে
 মেঘ-মরীচিকা,
 না রে না কিছুই নয়—পুরব-আশানে উঠে
 চিতানলশিখা ।

নিশীথ-চেতনা

স্তব্ধ বাহুড়ের মতো জড়ায় অযুত শাখা
 দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা ।
 মাঝে মাঝে পা টিপিয়া বহিছে নিশীথ-বায়,
 গাছে নড়ে ওঠে পাতা, শব্দটুকু শোনা যায় ।

আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছে বসি,
 মাঝে মাঝে দু-একটি তারা পড়িতেছে খসি ।
 ঘুমাইছে পশুপাখি, বস্তুস্বরা অচেতনা,
 শুধু এবে দলে দলে আঁধারের তলে তলে
 আকাশ করিয়া পূর্ণ স্বপ্ন করে আনাগোনা ।

স্বপ্ন করে আনাগোনা ! কোথা দিয়ে আসে যায় !
 আঁধার আকাশ মাঝে আঁখি চারিদিকে চায় ।
 মনে হয় আসিতেছে শত স্বপ্ন নিশাচরী
 আকাশের পার হতে, আঁধার ফেলিছে ভরি ।

ছবি ও গান

১৫৯

চারি দিকে ভাসিতেছে চারি দিকে হাসিতেছে,
 এ উহারে ডাকিতেছে আকাশের পানে চেয়ে,
 বলিতেছে, “আয় বোন, আয় তোরা আয় ধৈয়ে।”
 হাতে হাতে ধরি ধরি, নাচে যত সহচরী,
 চমকি ছুটিয়া যায় চপলা মাঝার মেয়ে।
 যেন মোর কাছ দিয়ে এই তারা গেল চলে,
 কেহ বা মাথায় মোর, কেহ বা আমার কোলে।
 কেহ বা মারিছে উকি হৃদয়-মাঝারে পশি,
 আঁখির পাতার 'পরে কেহ বা তুলিছে বসি।
 মাথার উপর দিয়া কেহ বা উড়িয়া যায়,
 নয়নের পানে মোর কেহ বা ফিরিয়া চায়।
 এখনি শুনিব যেন অতি মৃদু পদধ্বনি,
 ছোটো ছোটো নুপুরের অতি মৃদু রনরনি।
 রয়েছে চকিত হয়ে আঁখির নিমেষ ভুলি—
 এখনি দেখিব যেন স্বপ্নমুখী ছায়াগুলি।

অগ্নি স্বপ্ন মোহময়ী, দেখা দাও একবার।
 কোথা দিয়ে আসিতেছ, কোথা দিয়ে চলিতেছ,
 কোথা গিয়ে পশিতেছ বড়ো সাধ দেখিবার।
 আঁখার পরানে পশি সারা রাত করি খেলা,
 কোন্‌খানে কোন্‌ দেশে পালাও সকালবেলা।
 অরুণের মুখ দেখে কেন এত হয় লাজ—
 সারা দিন কোথা বসে না জানি কী কর কাজ।
 ঘুমঘুম আঁখি মেলি তোমরা স্বপ্ন-বালা,
 নন্দনের ছায়ে বসি শুধু বুঝি গাঁথ মালা।
 শুধু বুঝি গুন গুন গুন গুন গান কর,
 আপনার গান শুনে আপনি ঘুমায়ে পড়।

আজি এই রজনীতে অচেতন চাঞ্চিধার।
 এই আবরণ ঘোর ভেদ করি মন মোর,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

স্বপনের রাজ্যমাঝে দাঁড়া দেখি একবার ।
 নিদ্রার সাগর-জলে মহা আঁধারের তলে,
 চারিদিকে প্রসারিত এ কী এ নূতন দেশ,
 একত্রে স্বরগ-মর্ত্য নাহিকো দিকের শেষ ।
 কী যে যায় কী যে আসে, চারিদিকে আশেপাশে ;
 কেহ কাদে কেহ হাসে, কেহ থাকে কেহ যায়,
 মিশিতেছে, ফুটিতেছে, গড়িতেছে, টুটিতেছে,
 অবিশ্রাম লুকাচুরি আঁখি না সন্ধান পায় ।
 কত আলো কত ছায়া, কত আশা কত মায়া,
 কত ভয় কত শোক, কত কী যে কোলাহল,
 কত পশু কত পাখি, কত মানুষের দল ।

ঊপরেতে চেয়ে দেখো কী প্রশান্ত বিভাবরী,
 নিশ্বাস পড়ে না যেন জগৎ রয়েছে মরি ।
 একবার করো মনে আঁধারের সংগোপনে
 কী গভীর কলরব, চেতনার ছেলেখেলা,
 সমস্ত জগৎ ব্যোপে স্বপনের মহামেলা ।
 মনে মনে ভাবি তাই এও কি নহে রে ভাই
 চৌদিকে যা কিছু দেখি জাগিয়া সকালবেলা
 এও কি নহে রে শুধু চেতনার ছেলেখেলা ।

স্বপ্ন, তুমি এস কাছে, মোর মুখপানে চাও,
 তোমার পাখার 'পরে মোরে তুলে লয়ে যাও ।
 হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ভ্রমি মোরা সারা নিশি,
 প্রাণে প্রাণে খেলাইয়া প্রভাতে যাইব মিশি ।
 ওই যে মায়ের কোলে মেয়েটি ঘুমায়ে আছে,
 একবার নিয়ে যাও ওদের প্রাণের কাছে ।
 দেখিব কোমল প্রাণে সুখের প্রভাত-হাসি
 সুখায় ভরিয়া প্রাণ কেমনে বেড়ায় ভাসি ।

ছবি ও গান

১৬১

ওই যে প্রেমিক দুটি কুসুম-কাননে শুয়ে,
 ঘুমাইছে মুখে মুখে চরণে চরণে থুয়ে ।
 ওদের প্রাণের ছায়ে বসিতে গিয়েছে সাধ,—
 মায়া করি ঘটাইব বিরহের পরমাদ ।
 ঘুমন্ত আঁখির কোণে দেখা দিবে আঁখিজল,
 বিরহ-বিলাপ গানে ছাইবে মরম-তল ।
 সহসা উঠিবে আগি, চমকি, শিহরি, কাঁপি,
 দ্বিগুণ আদরে পুন বুকতে ধরিবে চাপি ।
 ছোটো দুটি শিশু ভাই ঘুমাইছে গলাগলি,
 তাদের হৃদয়-মাঝে আমরা যাইব চলি ।
 কুসুম-কোমল হিয়া কভু বা ছলিবে ভয়ে,
 রবির কিরণে কভু হাসিবে আকুল হয়ে ।

আমি যদি হইতাম স্বপন-বাসনাময় ।
 কত বেশ ধরিতাম কত দেশ ভ্রমিতাম,
 বেড়াতেম সীতারিয়া ঘূমের সাগরময় ।
 নীরব চন্দ্রমা-তারা, নীরব আকাশ-ধরা,
 আমি শুধু চুপি চুপি ভ্রমিতাম বিশ্বময় ।
 প্রাণে প্রাণে রচিতাম কত আশা কত ভয় ।
 এমন করণ কথা প্রাণে আসিতাম কয়ে,
 প্রভাতে পূরবে চাহি ভাবিত তাহাই লয়ে ।
 জাগিয়া দেখিত যারে বুকতে ধরিত তারে,
 যতনে মুছায়ে দিত ব্যথিতের অশ্রুজল,
 মুমূর্ষু প্রেমের প্রাণ পাইত নূতন বল ।

ওরে স্বপ্ন, আমি যদি স্বপন হতেম হায়,
 যাইতাম তার প্রাণে, যে মোরে কিরে না চায় ।
 প্রাণে তার ভ্রমিতাম, প্রাণে তার গাহিতাম,
 প্রাণে তার খেলাতেম অবিরাম নিশি নিশি ।
 যেমনি প্রভাত হত আলোকে যেতাম নিশি ।

১৬২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দিবসে আমার কাছে কতু সে খোলে না প্রাণ,
শোনে না আমার কথা, বোঝে না আমার গান,
মায়ামগ্নে প্রাণ তার গোপনে দিতাম খুলি,
বুঝিয়ে দিতাম তারে এই মোর গানগুলি ।
পর দিন দিবসেতে যাইতাম কাছে তার,
তাহলে কি মুখপানে চাহিত না একবার ?

নাটক ও প্রহসন

नमो भगवते वासुदेवाय

প্রকৃতির প্রতিশোধ

आनन्दमयी ऋषि

উৎসর্গ

তোমাকে দিলাম

প্রাশস্তোত্র

উৎসর্গ

তোমাকে দিলাম

1909
1910

সূচনা

জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বন্ধবরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসংগীত এবং প্রভাতসংগীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত।

তার পরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখা দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে। তখনো বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি আবেগের বাষ্পপুঞ্জ থেকে। তবু ছঃস্বপ্নের মতো আপনার বাঁধন-জাল ছাড়াবার জন্যে জেগে উঠল বালকের আগ্রহ। এই সময়কার রচনা ছবি ও গান। লেখনীর সেই নূতন বহিমুখী প্রবৃত্তি তখন কেবল ভাবুকতার অস্পষ্টতার মধ্যে বন্ধন স্বীকার করলে না। বেদনার ভিতর দিয়ে ভাব-প্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথে সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল বাল্মীকি-প্রতিভায়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না। কিছুকাল পরে, তখন আমার বয়স বোধ হয় তেইশ কিংবা চব্বিশ হবে, কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ সে আত্মগত নয় সে কল্পনায় রূপায়িত। “হেদে গো নন্দরানী” গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরানীর কাছে এসেছে আবদার করতে, তারা শ্রামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের হাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা

তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্ম-
 কেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে নানা কোলাহলে
 মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা।
 এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের
 রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটা এই দাঁড়ান
 শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম
 প্রতিফলনে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই
 যথার্থ পায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রথম দৃশ্য

গুহা।

সন্ন্যাসী

কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস।
 অবিশ্রাম কালশ্রোত কোথায় বহিছে
 সৃষ্টি যেথা ভাসিতেছে তৃণপুঞ্জসম।
 আধারে গুহার মাঝে রয়েছে একাকী,
 আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।
 অনাদি কালের রাত্রি সমাধি-মগনা
 নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।
 শিলার ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু করি
 বারিয়া পড়িছে বারি আর্দ্র গুহাতলে।
 শুদ্ধ শীতজলে পড়ি অন্ধকারমাঝে
 প্রাচীন ভেকের দল রয়েছে ঘুমায়ে।
 বাছড় গুহায় পশি সুদূর হইতে
 অমানিশীথের বার্তা আনিছে বহিয়া।
 কখনো বা কোনো দিন কে জানে কেমনে
 একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
 দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
 একটুকু উঁকি মেয়ে যায় পলাইয়া।
 বসে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি,
 তিল তিল জগতেরে ধ্বংস করিতেছি,
 সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কী আনন্দ আজি।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

জগৎ-কুয়াশা মাঝে ছিন্ন মগ্ন হয়ে,
 অদৃশ্যে আধারে বসি স্মৃতীক্ষু কিরণে
 ছিঁড়িয়া ফেলেছি সেই মায়া-আবরণ,
 জগৎ চরণতলে গিয়াছে মিলায়ে—
 সহসা প্রকাশ পাই দীপ্ত মহিমায়।
 বসে বসে চক্ষু স্বর্ধ দিয়েছি নিবাসে,
 একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
 দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
 গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।
 কোটি কোটি যুগব্যাপী সাধনার পরে,
 যুগান্তের অবসানে, প্রলয়-সলিলে
 সৃষ্টির মলিন রেখা মুছি শূন্য হতে—
 ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পুরিয়া
 যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ,
 পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।
 জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া
 কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ,
 পলে পলে যুঝি যুঝি তিল তিল করি
 জগদ্বল সে পাষাণ ফেলেছি সরাসে,
 হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববর্ণ।

কী কষ্ট না দিয়েছিস রাক্ষসী প্রকৃতি
 অসহায় ছিন্ন যবে তোর মায়াফাঁদে।
 আমার হৃদয়-রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
 আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী।
 বিরাম বিশ্রাম নাই দিবস-রজনী
 সংগ্রাম বহিয়া বক্ষে বেড়াতেম ভ্রমি।
 কানেতে বাজিত সদা প্রাণের বিলাপ,
 হৃদয়ের রক্তপাতে বিশ্ব রক্তময়,
 রাঙা হয়ে উঠেছিল দিবসের আঁখি।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৬৫

বাসনার বহিময় কশাঘাতে হায়
 পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মতো ।
 নিজের ছায়াতে নিজে বক্ষে ধরিবারে
 দিনরাত্রি করিয়াছি নিফল প্রয়াস ।
 স্নুথের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত
 দুঃখের বনাক্কারে দেছিস কেলিয়া ।
 বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
 নিয়ে গিয়েছিস মহা দুর্ভিক্ষ মাঝারে ।
 খাত্ত বলে যাহা চায় ধূলিমুষ্টি হয় ।
 তৃষ্ণার সলিলরাশি যায় বাষ্প হয়ে ।
 প্রতিজ্ঞা করিঃ শেষে যন্ত্রণায় জলি
 এক দিন—এক দিন নেব প্রতিশোধ ।
 সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
 সাধিয়াছি মহা হত্যা আধারে বসিয়া ।
 আজ সে প্রতিজ্ঞা মোর হয়েছে সফল ।
 বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
 বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিত্তানলে ।
 সেই ভস্মমুষ্টি আজি মাখিয়া শরীরে
 গুহার আধার হতে হইব বাহির ।
 তোরি রক্তভূমিমধ্যে বেড়াব গাহিয়া
 অপার আনন্দময় প্রতিশোধ-গান ।
 দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
 এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
 তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
 শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
 প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায় ।

রুবীন্দ্র-রচনাবলী

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

সন্ন্যাসী

এ কী ক্ষুদ্র ধরা । এ কী বন্ধ চারি দিকে ।
 কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি গাছপালা গৃহ,
 চারি দিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
 গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে ।
 চরণ ফেলিতে যেন হতেছে সংকোচ,
 মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা ।
 এই কি নগর ! এই মহা রাজধানী !
 চারি দিকে ছোটো ছোটো গৃহগুহাগুলি,
 আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা ।

চারি দিকে দেখা যায় দিনের আলোক,
 চোখেতে ঠেকিছে যেন সৃষ্টির পঞ্জর ।
 আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
 বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর ।
 পদে পদে বাধা পেয়ে মন ফিরে আসে,
 কোথায় দাঁড়াবে গিয়া ভাবিয়া না পায় ।
 অন্ধকার স্বাধীনতা, শাস্তি অন্ধকার,
 অন্ধকার মানসের বিচরণ-ভূমি,
 অনন্তের প্রতিকল্প, বিশ্বামের ঠাই ।
 এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
 জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়,
 স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
 বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলে রে নিশ্বাস ।

পথ দিয়ে চলিতেছে এরা সব কারা !
 এদের চিনি নে আমি, বুঝিতে পারি নে,

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৬৭

কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
 কী চায়। কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা।
 এক কালে বিশ্ব যেন ছিল রে বৃহৎ,
 তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো,
 আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে।
 দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা।

কৃষকগণের প্রবেশ

গান

হেঁদে গো নন্দরানী,
 আমাদের শ্রামকে ছেড়ে দাও।
 আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
 আমাদের শ্রামকে দিয়ে যাও।
 হেরো গো প্রভাত হল সূর্য্য উঠে
 ফুল ফুটেছে বনে,
 আমরা শ্রামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
 আজ করেছি মনে।
 ওগো, পীতধড়া পরিয়ে তারে
 কোলে নিয়ে আয়।
 তার হাতে দিয়ো মোহন বেণু
 নুপুর দিয়ো পায়।
 রোদের বেলায় গাছের তলায়
 নাচব মোরা সবাই মিলে।
 বাজবে নুপুর কুমুদ
 বাজবে বাঁশি মধুর বোলে,
 বনফুলে গাঁথব মালা
 পরিয়ে দিব শ্রামের গলে।

[প্রস্থান

১৬৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বালক-পুত্র সমেত স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রীলোক। (ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি) ই্যাগা দাদাঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কখনে
চলেছ ?

ব্রাহ্মণ। আজ শিয়বাড়ি চলেছি নাতনি। অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে
সেঁরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ গা ?

স্ত্রীলোক। আমি ঠাকুরের পুজো দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি,
মিনসে আবার রাগ করবে। পথে ছ-দণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্গেসপড়া করব তার
জো নেই। বলি দাদাঠাকুর, আমাদের ওদিকে যে এক বার পায়ের ধুলো পড়ে না!

ব্রাহ্মণ। আর ভাই, বড়োমুড়ো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস, কী
জানি পছন্দ না হয়। বার দাঁত পড়ে গেছে, তার চালকড়াইভাজার দোকানে
না যাওয়াই ভালো।

স্ত্রীলোক। নাও, নাও, রক্ত রেখে দাও।

আর এক স্ত্রীলোক। এই যে ঠাকুর, আজকাল তুমি যে বড়ো মাগ্গি হয়েছ।

ব্রাহ্মণ। মাগ্গি আর হলেম কই। সন্ধ্যাবেলায় পথের মধ্যে তোরা পাঁচ জনে
মিলে আমাকে টানাছেঁড়া আরম্ভ করেছিস। তবু তো আমার সেকাল নেই।

প্রথম। আমি যাই ভাই ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়। তা এস।

প্রথম। (পুনর্বার কিরিয়া) ই্যালা অলঙ্গ, তোদের পাড়ায় সেই যে কথাটা
শুনেনিহলুম, সে কি সত্যি।

দ্বিতীয়। সে ভাই বেসুর কথা।

[সকলের চুপি চুপি কথোপকথন

আর কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

প্রথম। আমাকে অপমান! আমাকে চেনে না সে! তার কাঁধে কটা মাথা
আছে দেখতে হবে। তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয়। ঠিক কথা। তা না হলে তো সে জন্ম হবে না।

প্রথম। জন্ম বলে জন্ম! তাকে নাকের জলে চোখের জলে করব।

তৃতীয়। শাবাশ দাদা, একবার উঠে পড়ে লাগো তো।

চতুর্থ। লোকটার বড়ো বাড় বেড়েছে।

পঞ্চম। পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৬৯

দ্বিতীয়। অতি দর্পে হত লক্ষা।

চতুর্থ। আচ্ছা, তুমি কী করবে শুনি দাদা।

দ্বিতীয়। কী না করতে পারি! গাধার উপরে চড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢালিয়ে শহর ঘুরিয়ে বেড়াতে পারি। তার এক গালে চুন এক গালে কালি লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারি। তার ভিটের ঘুঘু চরাতে পারি।

[ক্রোধে প্রস্থান। হাসিতে হাসিতে অন্ত পথিকগণের অনুগমন

প্রথম স্ত্রী। মাইরি, দাদাঠাকুর, আর হাসতে পারি নে, তোমার রদ রেখে দাও। ওমা, বেলা হয়ে গেল। আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর-এক দিন আসতে হবে। (সক্রোধে) পোড়ার-মুখো ছেলে, তোর জন্তেই তো যাওয়া হল না, তুই আবার পথের মধ্যে খেলতে গিয়েছিলি কোথা।

ছেলে। কেন মা আমি তো এইখানেই ছিলেম।

স্ত্রী। ফের আবার নেই করছিস।

[প্রহার, ক্রন্দন ও প্রস্থান

তুই জন ব্রাহ্মণ-বটুর প্রবেশ

প্রথম। মাধব শাস্ত্রীরই জয়।

দ্বিতীয়। কখনো না, জনার্দন পণ্ডিতই জয়ী।

প্রথম। শাস্ত্রী বলেছেন স্থূল থেকে সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয়। গুরু জনার্দন বলেছেন, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উৎপন্ন হয়েছে।

প্রথম। সে যে অসম্ভব কথা।

দ্বিতীয়। সেই তো বেদবাক্য।

প্রথম। কেমন করে হবে। বৃক্ষ থেকে তো বীজ।

দ্বিতীয়। দূর মুগ, বীজ থেকেই তো বৃক্ষ।

প্রথম। আগে দিন না আগে রাত?

দ্বিতীয়। আগে রাত।

প্রথম। কেমন করে। দিন না গেলে তো রাত হবে না।

দ্বিতীয়। রাত না গেলে তো দিন হবে না।

প্রথম। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর, একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

সন্ন্যাসী। কী সংশয়?

১৭০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দ্বিতীয়। প্রভু, আমাদের দুই গুরু বিচার শুনে অবধি আমরা দুই জনে মিলে
তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত ভাবছি স্থূল হতে সূক্ষ্ম, না সূক্ষ্ম হতে স্থূল, কিছুতেই
নির্ণয় করতে পারছি নে।

সন্ন্যাসী। স্থূল কোথা। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ কিছু নাই,

নানারূপে ব্যক্ত হয় শক্তি প্রকৃতির।

সবি সূক্ষ্ম, সবি শক্তি, স্থূল সে তো ভ্রম।

প্রথম। আমিও তো তাই বলি। আমার মাধব গুরুও তো তাই বলেন।

দ্বিতীয়। আমারও তো ওই মত। আমার জনার্দন গুরুও তো ওই মত।

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) চললেম প্রভু।

[বিবাদ করিতে করিতে প্রস্থান]

সন্ন্যাসী। হা রে মুখ হুজেনেই বুঝিল না কিছু।

এক খণ্ড কথা পেয়ে লভিল সাস্থনা।

জ্ঞানরত্ন খুঁজে খুঁজে খনি খুঁড়ে মরে—

মূঠো মূঠো বাক্যধূলা আঁচল পুরিয়া,

আনন্দে অধীর হয়ে ঘরে নিয়ে যায়।

এক দল মালিনীর প্রবেশ

গান

বুঝি বেলা বহে যায়

কাননে আয়, তোরা আয়।

আলোতে ফুল উঠল ফুটে ছায়ায় বায়ে পড়ে যায়।

সাধ ছিল রে পরিণয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে,

কই সে হল মালা গাঁথা কই সে এল হায়,

যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে বেলা চলে যায়।

পথিক। কেন গো এত দুঃখ কিসের। মালা যদি থাকে তো গলাও জে
আছে।

মালিনী। হাড়কাঠও তো কম নেই।

দ্বিতীয় মালিনী। পোড়ার-মুখো মিনসে, গোকুবাছুর নিয়েই আছে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৭১

আমি যে গলা ভেঙে মরছি, আমার দিকে এক বার তাকালেও না ! (কাছে গিয়া
গা ধঁষিয়া) মর মিনসে গায়ের উপর পড়িস কেন ?

সেই লোক । গায়ে পড়ে বাগড়া কর কেন । আমি সাত হাত তফাতে
দাঁড়িয়ে ছিলুম ।

দ্বিতীয় মালিনী । কেনে গা । আমরা বাঘ না ভাবুক । না হয় একটু কাছেই
আসতে । খেয়ে তো ফেলতুম না ।

[হাসিতে হাসিতে সকলের প্রস্থান

একজন বুদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ

গান

ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে ।

দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে ।

লক্ষ্মী তোদের সদয় হন, ধনের উপর বাড়ুক ধন,

(আমি) একটি মুঠো অন্ন চাই গো তাও কেন পাই নে ।

ওই রে সূর্য উঠল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে,

পিপাসাতে কাটছে ছাতি চলতে আর যে পারি নে ।

ওরে তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে,

একটি মুঠো দিবি শুধু আর কিছু চাই নে ।

একদল সৈনিক । (ধাক্কা মারিয়া) সরে যা, সরে যা, পথ ছেড়ে দে । বেটা,
চোখ নেই ! দেখছিস নে মস্তীর পুত্র আসছেন ।

[বাঘ বাজাইয়া চতুর্দোলা চড়িয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান

সন্ন্যাসী ।

মধ্যাহ্ন আইল, অতি তীক্ষ্ণ রবিকর ।

শূন্য যেন তপ্ত তাম্র-কটাহের মতো ।

কাঁ কাঁ করে চারি দিক ; তপ্ত বায়ুভরে

থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে উড়িছে বালুকা ।

সকাল হইতে আছি, কী দেখিছ হেথা ।

এ দীর্ঘ পরান মোর সংকুচিত করে

পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার ।

কী ঘোর স্বাধীন আমি । কী মহা আশ্রয় ।

জগতের বাধা নাই—শূন্যে করি বাস ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তৃতীয় দৃশ্য

অপরান্ন

পথ

প্রথম পৃথিকণ। পাঙ্কগণ, সরে যাও। হেরো, আসিতেছে
ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর হুহিতা।

বালিকার প্রবেশ

প্রথম পৃথিক। ছুঁস নে ছুঁস নে মোরে—

দ্বিতীয় পৃথিক। সরে যা অশুচি।

তৃতীয় পৃথিক। হতভাগী জানিস নে রাজপথ দিয়ে
আনাগোনা করে যত নগরের লোক—
শ্লেচ্ছকণ্ঠা, তুই কেন চলিস এ পথে।

[বালিকার পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে সরিয়া যাওন

এক জন বৃদ্ধ। কে তুমি গা, কার বাছা, চোখে অশ্রুজল,
ভিখারিনী বেশে কেন রয়েছ দাঁড়ায়ে
এক পাশে।

বালিকা। (কাঁদিয়া উঠিয়া) জননী গো আমি অনাথিনী।

বৃদ্ধ। আহা মরে যাই।

পৃথিকগণ। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে—

কে গো তুমি, জান না কি অনাচারী রঘু—
তাহারি হুহিতা ও যে।

বৃদ্ধ। ছি ছি ছি, কী যুগা।

[প্রস্থান

বালিকা। (দেবীমন্দিরের কাছে গিয়া)

জগৎ-জননী মাগো, তুমিও কি মোরে
নেবে না? তুমিও কি মা ত্যেজিবে অনাথে?
যুগায় সবাই যারে দেয় দূর করে
সে কি মা তোমারো কোলে পায় না আশ্রয়?

মন্দিররক্ষক। দূর হ। দূর হ তুই অনাথা অশুচি।

কী সাহসে এসেছিস মন্দিরের মাঝে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৭৩

জননী ও দুহিতার প্রবেশ

- জননী । আরতির বেলা হল, আয় বাছা আয় ।
 আয় রে আয় রে মোর বুকচেরা ধন ।
 মন্দিরের দীপ হতে কাঁজল পরাব
 অকল্যাণ যত কিছু যাবে দূর হয়ে ।
- কন্যা । ও কে ও মা !
- জননী । ও কেউ না, সরে আয় বাছা । [প্রস্থান
- বালিকা । এ কি কেউ না মা ! এ কি নিতান্ত অনাথা !
 এর কি মা ছিল না গো ! ও মা, কোথা তুমি ।
 (সন্ন্যাসীকে দেখিয়া) প্রভু কাছে যাব আমি ?
- সন্ন্যাসী । এস বৎসে, এস ।
- বালিকা । অনার্থা অশুচি আমি ।
- সন্ন্যাসী । (হাসিয়া) সকলেই তাই ।
 সেই শুচি ধুয়েছে যে সংসারের ধুলা ।
 দূরে দাঁড়াইয়া কেন । ভয় নাই বাছা ।
- বালিকা । (চমকিয়া) ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি রঘুর দুহিতা ।
- সন্ন্যাসী । নাম কি তোমার বৎসে ?
- বালিকা । কেমনে বলিব ?
 কে আমারে নাম ধরে ডাকিবে প্রভু গো
 বাল্যে পিতৃমাতৃহীনা আমি ।
- সন্ন্যাসী । বসো হেথা ।
- বালিকা । (কাঁদিয়া উঠিয়া)
 প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুমি পিতা মাতা,
 এক বার কাছে তুমি ডেকেছ যখন
 আর মোরে দূর করে দিয়ে না কখনো ।
- সন্ন্যাসী । মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী ।
 নাইকো কাহারো 'পরে ঘৃণা-অনুরাগ ।
 যে আসে আশ্রুক কাছে, যায় থাক দূরে
 জেনো বৎসে মোর কাছে সকলি সমান ।

রনীন্দ্র-রচনাবলী

বালিকা। আমি প্রভু, দেব নর সবারি তাড়িত,
মোর কেহ নাই—

সন্ন্যাসী। আমারো তো কেহ নাই।
দেব নর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে।

বালিকা। তোমার কি মাতা নাই?

সন্ন্যাসী। নাই।

বালিকা। পিতা নাই?

সন্ন্যাসী। নাই বৎসে।

বালিকা। সখা কেহ নাই?

সন্ন্যাসী। কেহ নাই।

বালিকা। আমি তবে কাছে রব, ত্যেজিবে না মোরে?

সন্ন্যাসী। তুমি না ত্যেজিলে মোরে আমি ত্যেজিব না।

বালিকা। এখন সবাই এসে কহিবে তোমারে—

রঘুর ছহিতা, ওরে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,

অনার্য অন্তচি ও যে শ্লেচ্ছ ধর্মহীন—

তখনো কি ত্যেজিবে না? রাখিবে কি কাছে?

সন্ন্যাসী। ভয় নাই, চল বৎসে তোর গৃহ যৈশা।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পথপার্শ্বে

বালিকার ভগ্নকুটিরে

বালিকা। পিতা।

সন্ন্যাসী। আহা পিতা বলে কে ডাকিলি ওরে।

সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিল।

বালিকা। কী শিক্ষা দিতেছ প্রভু বুঝিতে পারি নে।

শুধু বলে দাও মোরে আশ্রয় কোথায়।

কে আমারে ডেকে নেবে, কাছে করে নেবে,

মুখ তুলে মুখপানে কে চাহিবে মোর।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৭৫

সন্ন্যাসী ।

আশ্রয় কোথায় পাবি এ সংসারমাঝে ।
 এ জগৎ অন্ধকার প্রকাণ্ড গহবর —
 আশ্রয় আশ্রয় বলে শত লক্ষ প্রাণী
 বিকট গ্রাসের মাঝে খেয়ে পড়ে গিয়া
 বিশাল ঈর্ষকুণ্ডে কোথা পায় লোপ ।
 মিথ্যা রাক্ষসীরা মিলে বাঁধিয়াছে হাট,
 মধুর দুর্ভিক্ষরাশি রেখেছে সাজায়ে,
 তাই চারি দিক হতে আসিছে অতিথি
 যত খায় ক্ষুধা জলে, বাড়ে অভিলাষ,
 অবশেষে সাধ যায় রাক্ষসের মতো
 জগৎ মূঠায় করে মুখেতে পুরিতে ।
 হেথা হতে চলে আয়—চলে আয় তোরা ।

বালিকা ।

এখানে তো সকলেই সুখে আছে পিতা ।
 দূরেতে দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি !

সন্ন্যাসী ।

হায় হায় ইহাদের বুঝাব কেমনে ।
 সুখ দুঃখ সে তো বাছা জগতের পীড়া ।
 জগৎ জীবন্ত মৃত্যু—অনন্ত যন্ত্রণা ;
 মরণ মরিতে চায় মরিছে না তবু
 চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া ।
 জগৎ মৃত্যুর নদী চিরকাল ধরে
 পড়িছে সমুদ্রমাঝে ফুরায় না তবু—
 প্রতি ঢেউ, প্রতি তৃণ, প্রতি জলকণা
 কিছুই থাকে না, তবু সে থাকে সমান ।
 বিশ্ব মহা মৃতদেহ তারি কীট তোরা
 মরণেরে খেয়ে খেয়ে রয়েছিস বেঁচে,
 হু-দণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলা করি
 আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া ।

বালিকা ।

কী কথা বলিছ পিতা ভয় হয় শুনে ।

পথিক ।

পথে এক জন ভিক্ষুক পথিকের প্রবেশ
 আশ্রয় কোথায় পাব ? আশ্রয় কোথায় ?

১৭৬

০ রবীন্দ্র-রচনাবলী

সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথাও নাই—কে চাহে আশ্রয় ?

আশ্রয় কেবল আছে আপনার মাঝে।

আমি ছাড়া যাহা কিছু সকলি সংশয়।

আপনারে খুঁজি লও ধরো তারে বুকে,

নহিলে ডুবিতে হবে সংশয়-পাথারে।

পথিক। আশ্রয় কে দেবে মোরে ? আশ্রয় কোথায় ?

বালিকা। (বাহিরে আসিয়া)

আহা, কে গো, আসিবে কি এ মোর কুটির ?

কাল প্রাতে চলে যেয়ো শ্রান্তি দূর করে।

একপাশে পর্ণশয্যা রেখেছি বিছায়ে,

এনে দেব ফলমূল নির্বরের জল।

পথিক। কে তুমি গো ?

বালিকা। তোমাদেরি এক জন আমি।

পথিক। পিতার কী নাম তব ? কে তুমি বালিকা ?

বালিকা। পরিচয় না পেলে কি আসিবে না ঘরে ?

তবে শুন পরিচয়—রঘু পিতা মম,

অনার্থা অন্তি আমি, বিশ্বের স্থণিত।

পথিক। (চমকিয়া) রঘুর হুহিতা তুমি ? স্নেহে থাকো বাছা।

কাজ আছে অন্তরে, দ্বরা যেতে হবে।

[প্রস্থান

একটা খাট মাথায় হাসিতে হাসিতে পথে

এক দল লোকের প্রবেশ

সকলে মিলিয়া। হরিবোল—হরিবোল।

প্রথম। বেটা এখনো জাগল না রে।

দ্বিতীয়। বিষম ভাবি।

এক জন পথিক। কে হে, কাকে নিয়ে যাও।

তৃতীয়। বিন্দে তাঁতি মড়ার মতো ঘুমোচ্ছিল, বেটাকে খাটসুদ্ধ উঠিয়ে এনেছি।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল।

দ্বিতীয়। আর ভাই বইতে পারি নে, একবার বাঁকা দাও, শালা জেগে উঠুক।

বিন্দে। (সহসা জাগিয়া উঠিয়া) অ্যা অ্যা উ উ।

তৃতীয়। ওরে, শব্দ করে কে রে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৭৭

বিন্দে। ওগো, ওগো, এ কী। আমি কোথায় যাচ্ছি।

সকলে। (খাট নামাইয়া) চূপ কর্বেটা।

দ্বিতীয়। শালা মরে গিয়েও কথা কয়।

চতুর্থ। তুই যে মরেছিস রে! হাত-পাগুলো সিধে করে চিত হয়ে পড়ে থাক।

বিন্দে। আমি মরি নি, আমি ঘুমোচ্ছিলুম।

পঞ্চম। মরেছিস তোর হাঁশ নেই, তুই তর্ক করতে বসলি! এমনি বেটার বুদ্ধি বটে!

ষষ্ঠ। ওর কথা শোন কেন। বিপদে পড়ে এখন মিথ্যে কথা বলছে।

সপ্তম। মিছে দেরি কর কেন? ও কি আর কবুল করবে? চলো ওকে পুড়িয়ে নিয়ে আসি গে।

বিন্দে। দোহাই বাবা, আমি মরি নি। তোদের পায়ে পড়ি বাবা আমি মরি নি।

প্রথম। আচ্ছা, আগে প্রমাণ কর তুই মরিস নি।

বিন্দে। হাঁ, আমি প্রমাণ করে দেব, আমার স্ত্রীর হাতে শাখা আছে দেখবে চলো।

দ্বিতীয়। না, তা না, ওকে মার, দেখি ওর লাগে কি না।

তৃতীয়। (মারিয়া) লাগছে?

বিন্দে। উঃ!

চতুর্থ। এটা কেমন লাগল?

বিন্দে। ও বাবা!

পঞ্চম। এটা কেমন?

বিন্দে। তুমি আমার ধর্মবাপ।

[সহসা ছুটিয়া পলায়ন ও হাসিতে হাসিতে সকলের অহুগমন]

সন্ন্যাসী।

আহা শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভুলে গেছে সংসারের অনাদর-জালা।

কঠিন মাটিতে গুয়ে শিরে হাত দিয়ে

ঘুমের মায়ের কোলে রয়েছে আরামে।

যেন এই বালিকার ছোটো হাত দুটি

হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেঁঠন।

পালা পালা এইবেলা, পালা এইবেলা।

১৭৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ঘুমিয়েছে, এইবেলা ওঠ, রে সন্ন্যাসী ।
 পলায়ন ! পলায়ন ! ছি ছি পলায়ন !
 অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে
 বালিকা দেখিয়া শেষে পালাইতে হবে !
 কখনো না, পালাব না, রহিব এমনি ।
 প্রকৃতি, এই কি তোর মায়াফাঁদ বত ।
 এ উর্ণাজালে তো শুধু পতঙ্গেরা পড়ে ।

বালিকা ।

(চমকিয়া জাগিয়া)

প্রভু চলে গেছ তুমি ! গেছ কি কেলিয়া !

সন্ন্যাসী ।

কেন যাব ! কার ভয়ে পলাইব আমি !

ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে,

তবুও রহিব আমি দূর হতে দূরে ।

বালিকা ।

ওই শোনো, রাজপথে মহা কোলাহল ।

সন্ন্যাসী ।

কোলাহল মাঝে আমি রচিব নির্জন,

নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর,

পাতিব প্রলয়ানন সৃষ্টির হৃদয়ে ।

এক দল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথম স্ত্রী । (কোনো পুরুষের প্রতি) যাও, যাও, আর মুখের ভালোবাসা
 দেখাতে হবে না !

প্রথম পুরুষ । কেন কী অপরাধ করলুম ?

স্ত্রী । জানি গো জানি, তোমরা পুরুষমানুষ, তোমাদের পাষণ প্রাণ ।

প্রথম পুরুষ । আচ্ছা, আমাদের পাষণ প্রাণই যদি হবে, তবে ফুলশরের
 কেন ডরাই ? (অগ্ন সকলের প্রতি) কী বল ভাই । যদি পাষণই হবে তবে কি
 আর ফুলশরের আঁচড় লাগে ।

দ্বিতীয় পুরুষ । বাহবা, বেশ বলেছ ।

তৃতীয় পুরুষ । শাবাশ, খুড়ো, শাবাশ ।

চতুর্থ পুরুষ । (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন ! এখন জবাব দাও !

প্রথম পুরুষ । না, তাই বলছি । তোমরা তো দশ জন আছ, তোমরাই বিচার
 করে বল না কেন, যদি পাষণ প্রাণই হবে, তবে—

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৭৯

প্রথম পুরুষ। ঠিক কথা বলেছ। তুমি না হলে আমাদের মুখরক্ষা করত কে।

দ্বিতীয় পুরুষ। খুড়ো এক-একটা কথা বড়ো সরেস বলে।

তৃতীয় পুরুষ। হাঁ: আমিও অমন বলতে পারতুম। ও কি আর নিজেকে বলে?
কোন এক পুঁথি থেকে পড়ে বলছে।

চতুর্থ পুরুষ (আসিয়া)। কী হে কী কথাটা হচ্ছে। কী কথাটা হচ্ছে।

প্রথম পুরুষ। শোনো, তোমার বুঝিয়ে বলি। এই উনি বলছিলেন, তোমরা
পুরুষ মানুষ, তোমাদের পাষণ প্রাণ। তাইতো আমি বললেম, আচ্ছা যদি পাষণ
প্রাণই হবে, তবে ফুলশরের আঁচড় লাগবে কী করে। বুঝেছ ভাবখানা! অর্থাৎ যদি—

অষ্টম পুরুষ। আমাকে আর বোঝাতে হবে না দাদা। আমি আর বুঝি নি!
আজ বাইশ বৎসর ধরে আমি নিজ শহরে, গুড়ের কারবার করে আসছি আর একটা
মানে বুঝতে পারব না এ কোন কথা।

প্রথম পুরুষ। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন, এখন একটা জবাব দাও।

সকল স্ত্রীলোক মিলিয়া গান

কথা:কোস নে লো রাই শ্রামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।

কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে।

গুধু ধীরে বাজার বাঁশি, গুধু হাসে মধুর হাসি,

গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে।

একজন পুরুষের গান

প্রিয়ে, তোমার টেকি হলে যেতেম বেঁচে,

রাঙা চরণতলে নেচে নেচে।

টিপটিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা,

কানের কাছে কচকচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে।

দ্বিতীয় পুরুষ। বাহবা দাদা, বেশ গেয়েছ।

তৃতীয় পুরুষ। বেশ, বেশ, শাবাশ।

সপ্তম পুরুষ। আরে দূর, ওকে কি আর গান বলে। গাইত বটে নিতাই;
যে হাঁ, শুনে চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়ত।

[প্রস্থান]

১৮০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পঞ্চম দৃশ্য

গুহাদ্বারে

বালিকা । না পিতা ও-সব কথা বলো না আমারে,
 শুনে ভয় করে শুধু বুঝিতে পারি নে ।

সন্ন্যাসী । তবে থাক্, তবে তুই কাছে আর মোর,
 দেখি তোর অতি মৃদু স্পর্শ স্নিকোমল ।
 আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন,
 সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে ।
 এ কি মায়া ? এ কি স্বপ্ন ? এ কি মোহ ঘোর ?
 জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে
 করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভান ?

(দূরে সরিয়া) বালিকা, এ-সব কথা না শুনিবি যদি
 সন্ন্যাসীর কাছে তবে এলি কী আশায় ?

বালিকা । আমি শুধু কাছে কাছে রহিব তোমার,
 মুখপানে চেয়ে রব বসি পদতলে ।
 নগরের পথে যবে হইবে বাহির
 ওই হাত ধরে আমি যাব সাথে সাথে ।

সন্ন্যাসী । পিঞ্জরের ছোটো পাখি আহা ক্ষীণ অতি,
 এরে কেন নিয়ে যাই অনন্তের মাঝে ।
 ডানা দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ে হল সারা
 আমার বুকের কাছে লুকাইতে চায় ।
 আহা, তবে নেবে আর । থাক্ মুখ ঢেকে ।
 বুকের মাঝেতে তবে থাক্ লুকাইয়া ।
 এ কি স্নেহ ? আমি কি রে স্নেহ করি এরে ?
 না না । স্নেহ কোথা মোর । কোথা দ্বৈষ স্বর্ণা ।
 কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে,
 দূরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে ।
 (প্রকাশ্যে) বাছা, এ আশারে তুই কেমনে রহিবি ?
 তোরা সব ছোটো ছোটো আলোকের প্রাণী

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) দিতে চাস যদি বাছা, দে তবে যা খুশি।

মোর কাছে কিছু নাই স্নানর কুৎসিত।

এক মুঠা ফুল যদি ভালো লাগে তোর

এক মুঠা ধূলা সেও কী করিল দোষ।

ভালো মন্দ কেন লাগে? সবি অর্থহীন।

আজ বৎসে, সারাদিন কাটালি কী করে?

বালিকা। ওই দেখো—চুপি চুপি এস এই দিকে।

সারাদিন মোর সাথে খেলা করে করে

সাঁঝেতে লতাটি মোর ঘুমিয়ে পড়েছে।

তুইয়ে পড়েছে ভুঁয়ে কচি ভালগুলি,

পাতাগুলি মুদে গেছে জড়াজড়ি করে।

এস পিতা, এইখানে বসো এর কাছে—

ধীরে ধীরে গায়ে দাও হাতটি বুলিয়ে।

সন্ন্যাসী। (স্বগত) এ কী রে মদিয়া আমি করিতেছি পান।

এ কী মধু অচেতনা পশিছে হৃদয়ে।

এ কী রে স্বপন-ঘোরে ছাইছে নয়ন।

আবেশে পরানে আসে গোখুলি ঘনায়।

পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ-আবরণ।

ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া

কেন রে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে।

(সহসা ফুল কল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ভূমিতে পদাঘাত করিয়া)

দূর হোক—এ সকল কিছু ভালো নয়—

বালিকা, বালিকা, তোর এ কী ছেলেখেলা।

আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নির্বিকার,

সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন সবল,

এ ধূলার ঢাকিবি কি আমার নয়ন?

(কিয়ৎক্ষণ থামিয়া)

বাছা রে, অমন করে চাহিয়া কেন রে।

কেন রে নয়ন দুটি করে ছল ছল।

জানিস নে তুই, মোরা সন্ন্যাসী বিরাগী

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৮৩

আমাদের এ সকল ভালো নাহি লাগে ।
 ছি, ছি, জনমিল প্রাণে এ কী এ বিকার ।
 সহসা কেন রে এত করিল চঞ্চল ।
 কোথা লুকাইয়া ছিল হৃদয়ের মাঝে
 ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট ।
 কোন্ অন্ধকার হতে উঠিল হুঁসিয়া ।
 এতদিন অনাহারে এখনো মরে নি ।
 হৃদয়ে লুকানো আছে এ কী বিভীষিকা ।
 কোথা যে কে আছে গুপ্ত কিছু তো' জানি নে ।
 হৃদয়-শ্মশান মাঝে মৃত প্রাণী যত
 প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ,
 কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর ।
 (প্রকাশ্যে) দাঁও বংসে এনে দাঁও ফলফুল, তব,
 দেখাও কোথায় বাছা লতাটি তোমার—
 না, না, আমি চলিলাম নগরে ভ্রমিতে ।
 দু-দণ্ড বসিয়া থাকো, আসিব এখনি ।

[প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

পর্বত-শিখরে

সন্ন্যাসী

পর্বত-পথে দুই জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গান

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
 মান করে থাকা আজ কি সাজে !
 মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
 চলো চলো কুঞ্জমাঝে ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু,

মুহুমুহু,

আজ, কাননে ঐ বাঁশি বাজে ।

মান করে থাকে আজ কি সাজে !

আজ মধুরে মিশাবি মধু,

পরান-বঁধু

চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে ।

মান করে থাকে আজ কি সাজে !

সন্ন্যাসী । সহসা পড়িল চোখে এ কী মায়াঘোর,

জগতের কেন আজ মনোহর হেরি !

পশ্চিমে কনক-সন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে

সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে ।

নিম্নে বনভূমি মাঝে ঘনায় আঁধার,

সন্ধ্যার সুবর্ণ-ছায়া উপরে পড়েছে ।

চারি দিকে শান্তিময়ী স্তব্ধতার মাঝে

সিদ্ধু শুধু গাহিতেছে অবিভ্রাম গান ।

বামে দূরে দেখা যায় শৈল-পদতলে

শ্রীমল তরুর মাঝে নগরের গৃহ ।

কোলাহল ধেমে গেছে, পথ জনহীন ।

দীপ জ্বলে উঠিতেছে দু-একটি করে,

সন্ধ্যার আরতি হয়, শব্দ-বণ্টা বাজে ।

প্রকৃতি, এমন তোরে দেখি নি কখনো ;

এমন মধুর যদি মায়ামূর্তি তোর,

দূর হতে বসে বসে দেখি না চাহিয়া !

হেথায় বসি না কেন রাজার মতন,

জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার !

আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,

মায়াবিনী দেখা তোর মায়া-অভিনয়,

দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল ।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৮৫

খেলা কর্ সমুখেতে চন্দ্রস্বর্ষ নিয়ে,
নীলাকাশ রাজছত্র ধর মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর মোরে পূজা।
উঠুক রে দিবানিশি সপ্তলোক হতে
বিচিত্র রাগিণীময়ী মায়াময়ী গাথা।

আর এক দল পশ্নিকের প্রবেশ

গান

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।
ভেবেছিলেম ঘরে রব কোথাও যাব না,
ওই যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি।
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে,
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস যদি (আমায়) পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।
দেখি গে তার মুখের হাসি,
(তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
(তারে) বলে আসি তোমার বাঁশি
(আমার) প্রাণে বেজেছে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।

সন্ন্যাসী। জগৎ সমুখে মোর সমুদ্রের মতো,
আমি তীরে বসে আছি পর্বত-শিখরে,
তরঙ্গেতে গ্রহতারা হতেছে আকুল,
ভাসিতেছে কোটি প্রাণী-জীব কাষ্ঠ ধরি।
আমি শুধু শুনিতেছি কলধ্বনি তার,
আমি শুধু দেখিতেছি তরঙ্গের খেলা।

১৮৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কিরণ-কুন্তল-জাল এলায়ে চৌদিকে
 রুদ্র তালে নৃত্য করে এ মহা প্রকৃতি ।
 আলোক আঁধার ছায়া জীবন মরণ,
 রাত্রি দিন, আশা ভয়, উত্থান পতন,
 এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার ।
 শত গ্রহ, শত তারা, শত কোটি প্রাণী
 প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে ।
 আমি তো ওদের মাঝে কেহ নই আর
 তবে কেন এই নৃত্য দেখি না বসিয়া !

এক জন পথিক

গান

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে ।
 বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ,
 নাচিছ দিক্-বসনে ।
 মহা আনন্দে পুলক-কায়
 গন্ধা উথলি উছলি যায়,
 ভালে শিশু-শশী হাসিয়া চায়,
 জটাজুট ছায় গগনে ।

[প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

গুহাদ্বারে

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী । আয় তোরা, কাছে আয় কে আসিবি আয়,
 সকলি সুন্দর হেরি এ বিশ্বজগতে ।
 বালিকা । আমিও কি কাছে যাব ! ডাকো পিতা, ডাকো,
 কী দোষ করিয়াছি বুলো বুঝাইয়া !

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৮৭

সন্ন্যাসী । কিছু ভয় করিস নে, কোনো দোষ নেই—
তোরে ফেলে আর কভু যাব না বালিকা ।

(গুহার কাছে গিয়া)

এ কী অন্ধকার হেথা । এ কী বন্ধ গুহা ।
আয়, বাছা, মোরা দৌহে বাহিরেতে যাই
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি এক বার ।

(বাহিরে আসিয়া)

আহা এ কী সুমধুর ! এ কী শান্তি-সুখা !
কী আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে !
মনে সাধ যায় ঐ তরু হয়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি ।
ধীরে ধীরে কত কী যে মনে আসিতেছে ।
অতীতের অতি দূর ফুলবন হতে
বায়ু যেন বহে আসে নিশ্বাসের মতো,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্মর বিলাপ,
মিলিত জড়িত শত পুষ্পগন্ধরাশি ।
এমনি জোছনা-রাত্রে কোন্‌খানে ছিছু,
কারা যেন চারি পাশে বসে ছিল মোর !
তোরি মতো দু-একটি মধুমাখা মুখ
চাঁদের আলোতে মিশে পড়িতেছে মনে ।
আর না রে, আর না রে, আর কিরিব না ।
তোদের অনেক দূরে ফেলিয়া এসেছি ।
অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী,
মাঝে মাঝে অতি দূরে রেখা দেখা যায়
তোদের সে মেঘময় মায়াদ্বীপগুলি ।
সেথা হতে কারা তোরা বাঁশিটি বাজায়ে
আজিও ডাকিস মোরে ! আমি কিরিব না ।
বন্দী করে রেখেছিলি মায়ামুগ্ধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন ।
তীরে বসে গা তোদের মায়াগানগুলি—

১৮৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অনন্তের পানে আমি চলেছি ভাসিয়া ।

বাছা, তুই কাছে আয়, দেখি তোরে আমি,

মুখেতে পড়েছে তোর চাঁদের কিরণ ।

বালিকা । (কাছে আসিয়া) গান পড়িতেছে মনে গাই বসে পিতা ।

গান

মেঘেরা চলে চলে যায়,

চাঁদেরে ডাকে “আয় আয়” ।

ঘুমঘোরে বলে চাঁদ, কোথায়—কোথায় !

না জানি কোথা চলিয়াছে,

কী জানি কী যে সেথা আছে,

আকাশের মাঝে চাঁদ চারি দিকে চায় ।

সুদূরে—অতি—অতি দূরে;

বুঝি যে কোন্‌ সুরপুরে

তারামূলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজায় ।

মেঘেরা তাই হেসে হেসে

আকাশে চলে ভেসে ভেসে,

লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায় ।

সন্ন্যাসী । এ কী রে চলেছি কোথা, এসেছি কোথায় ।

বুঝি আর আপনারে পারি নে রাখিতে ।

বুঝি মরি, ডুবি, বুঝি লুপ্ত হয়ে যাই ।

ওরে কোন্‌ অতলেতে যেতেছি তলায়ে,

সর্বান্তে চাপিছে ভার আঁখি মুদে আসে ।

চৌদিকে কী যেন তোঁরে আসিছে ঘিরিয়া,

কোথায় রাখিলি তোর পালাবার পথ ।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে রে যেতেছিস চলি

সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত

বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া ।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৮৯

এখনি ছিঁড়িয়া ফেল্ স্বপনের মায়া ।
 চল্ তোর নিজ রাজ্যে অনন্ত আধারে ।
 যত চন্দ্র স্বর্ষ সেথা ডুবে নিবে যাবে ।
 ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হুই দিশেহারী,
 আধার দেয় না কভু পথ ভুলাইয়া ।

নবম দৃশ্য

গুহায়

সন্ন্যাসী

আহা এ কী শাস্তি, এ কী গভীর বিরাম !
 অন্তর বাহির যাবে, যাবে দেশ-কাল,
 “আছি” মাত্র রবে শুধু আর কিছু নয় ।

দীপহস্তে বালিকার প্রবেশ

বালিকা । দুই দিন দুই রাত্রি চলে গেছে পিতা
 গুহার দুয়ারে আমি বসিয়া রয়েছি,
 তাই আজ এক বার এসেছি দেখিতে ।
 একটিও জনপ্রাণী আসে নি হেথায়,
 দীর্ঘ দীন, দীর্ঘ রাত্রি গিয়েছে কাটিয়া,
 কেন হেথা অন্ধকারে একা বসে আছ !
 কতক্ষণ বসে বসে গুনিছ সহসা
 তুমি যেন স্নেহবাক্যে ডাকিছ আমারে ।
 নিতান্ত একেলা তুমি রয়েছ যে পিতা
 তাই আর পারিছ না, আসিলাম কাছে ।
 ও কী প্রভু, কথা কেন কহিছ না তুমি,
 ও কী ভাবে চেয়ে আছ মোর মুখপানে !
 ভালো লাগিছে না পিতা ? যাব তবে চলে ?
 সন্ন্যাসী । না না, এলি যদি, তবে বাস নে চলিয়া ।
 আমি তো ডাকি নি তোরে, নিজে এসেছিস

রবীন্দ্র-রচনাবলী

একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভালো করে ।
 সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
 সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে ?
 সেখা হতে সাধে করে কেন নিয়ে এলি
 দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ সমীরণ !
 "কিবা তোর স্নানার্থ, মেহমাখা স্বর ।
 মরি কী অমিয়াময়ী লাবণ্যপ্রতিমা ।
 সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
 জগতের 'পরে মোর হতেছে বিশ্বাস ।
 তুই কি রে মিথ্যা মায়া, দু-দণ্ডের ভ্রম !
 জগতের কাছে তুই ফুটেছিস ফুল
 জগৎ কি তোরি মতো এত সত্য হবে !
 চল বাছা গুহা হতে বাহিরেতে যাই ।
 সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
 সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
 মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
 জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
 মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কুলে ।

[গ্রন্থান

দশম দৃশ্য

গুহার বাহিরে

সন্ন্যাসী । আহা এ কী চারিদিকে প্রভাত-বিকাশ ।
 এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
 মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে ।
 অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি ।
 যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অনন্ত সকলি,
 বালুকার কণা সেও অসীম অপার,

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৯১

তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
 কে আছে কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে ?
 বড়ো ছোটো কিছু নাই সকলি মহৎ ।
 আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে কেলিয়া
 অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিল !
 সীমা তো কোথাও নাই—সীমা সে তো ভ্রম ।
 ভালো করে পড়িব এ জগতের লেখা,
 শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা ।
 লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
 একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
 ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার ।
 বিশ্বের স্বার্থ রূপ কে পায় দেখিতে ।
 আঁখি মেলি চারি দিকে করিব ভ্রমণ
 ভালোবেসে চাহিব এ জগতের পানে
 তবে তো দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার ।

দুই জন পথিকের প্রবেশ

- প্রথম । আর কতদূরে যাবি, ফিরে যা রে ভাই ।
 আয় ভাই এইখানে কোলাকুলি করি ।
 দ্বিতীয় । কে জানে আবার কবে দেখা হবে ফিরে ।
 প্রথম । আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি ।
 দ্বিতীয় । যাবে যদি, এক বার দাঁড়াও হেথায় ।
 এক বার ফিরে চাও নগরের পানে ।
 ওই দেখো দূরে ওই গৃহটি তোমার,
 চারি দিকে রহিয়াছে লতিকার বেড়া,
 ওই সে অশোক গাছ বামে উঠিয়াছে,
 ওই তরুতলে বসে আমরা দু-জনে
 কত রাত্রি জোছনাতে কথা কহিয়াছি ।
 প্রথম । হৃদিনের এ বিরহ ভরায় ফুরাবে
 আনন্দের মাঝে পুন হইবে মিলন ।

১৯২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দ্বিতীয় । মনে যেন রেখো সখা স্নদূর প্রবাসে,
 পুরাতন এ বন্ধুরে ভুলিয়ে না যেন ।
 দেবতা রাখুন স্নেহে আর কী কহিব ।

[প্রস্থান

সন্ন্যাসী । • আহা যেতে যেতে দৌছে চায় ফিরে ফিরে,
 অশ্রুজলে ভালো করে দেখিতে না পায় ।
 বিপুল জগৎ মাঝে দিগন্তের পানে
 সখা ওর কোথা গেল, কে জানে কোথায় ।
 এ কী সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা
 চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিশ্চয় ।
 বারেক যে কাছ হতে দূরে চলে গেল,
 হয়তো সে কাছে ফিরে আর আসিবে না ।
 তাই সদা চোখে চোখে রেখে দিতে চাই,
 তাই সদা টেনে নিই বুকের মাঝেতে ।
 কোথা কে অদৃশ্য হয় চারি দিক হতে
 বাহা-কিছু বাকি থাকে ভয়ে তাহাদের
 আরো যেন দৃঢ় করে ধরি জড়াইয়া ।
 সবাই চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দিশে
 অসীম জগতে মোরা কে কোথায় থাকি,
 মাঝে লোক-লোকান্তের ব্যবধান পড়ে ।
 তবু কি গলায় দিবি মোহের বন্ধন,
 স্নেহ দুঃখ নিয়ে তবু করিবি কি খেলা,
 যে হবে না তবু তারে রাখিবারে চাস !
 ওরে, আমি প্রতিদিন দেখিতেছি যেন,
 কে আমারে অবিরত আনিতেছে টেনে ।
 প্রতিদিন যেন আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
 জগৎ-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে—
 চারি দিকে জড়াইছে অশ্রুর বাধন,
 প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল ।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৯৩

যাক্ ছিঁড়ে। গেল ছিঁড়ে। চল্ ছুটে চল্।
 চল্ দূরে—যত দূরে চলে রে চরণ।
 কে ও আসে অশ্রুনেত্রে শূন্য গুহা মাঝে,
 কে ও রে পশ্চাতে ডাকে পিতা পিতা বলে।
 ছিঁড়ে ফেল্—ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা—
 হেথা হতে চল্ ছুটে আর দেরি নয়।

একাদশ দৃশ্য

পথে

সন্ন্যাসী

এসেছি অনেক দূরে—আর ভয় নাই।
 পায়েতে জড়াল লতা, ছিন্ন হয়ে গেল।
 সেই মুখ বার বার জাগিতেছে মনে।
 সে যেন করুণ মুখে মনের দুয়ারে
 বসে বসে কাঁদিতেছে ডাকিতেছে সদা।
 যতই রাখিতে চাই দুয়ার রুখিয়া—
 কিছুতেই যাবে না সে, ফিরে ফিরে আসে,
 একটু মনের মাঝে স্থান পেতে চায়।
 নির্ভয়ে গা ঢেলে দিয়ে সংসারের শ্রোতে
 এরা সবে কী আরামে চলেছে ভাসিয়া।
 যে যাহার কাজ করে, গৃহে ফিরে যায়,
 ছোটো ছোটো স্নেহে দুঃখে দিন যায় কেটে।
 আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে
 যুঝিতেছি সংসারের শ্রোত-প্রতিকূলে।
 পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে!
 বিপরীতে মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি,
 উজানে যেতেছি বলে হইতেছে ভ্রম,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পশ্চাতে শ্রোতের টানে চলেছি ভাসিয়া,
সবাই চলেছে যেথা ছুটেছি সেথাই।

দরিদ্র বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওগো, দয়া করো মোরে আমি অনাধিনী।
সন্ন্যাসী। (সহসা চমকিয়া উঠিয়া)
কে রে তুই? কে রে বাছা? কোথা হতে এলি?
অনাধিনী? তুইও কি তারি মতো তবে?
তোরেও কি ফেলে কেউ গিয়েছে পলায়ে?
তারেই কি চারি দিকে খুঁজিয়া বেড়াস?
বৎসে, কাছে আয় তুই—দে রে পরিচয়।
বালিকা। ভিখারি বালিকা আমি, সন্ন্যাসী ঠাকুর,
অন্ধ বৃদ্ধ মাতা মোর রোগশয্যাশায়ী।
আসিয়াছি একমুঠা ভিক্ষার তরে।
সন্ন্যাসী। আহা বৎসে, নিয়ে চল কুটিরিতে তোর।
রূপ তোর জননীয়ে দেখে আসি আমি।

[প্রস্থান]

কণ্ডকগুলি সন্তান লইয়া এক জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। দেখ দেখি মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট! দেখলে দু-দণ্ড
চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে—আর এদের ছিরি দেখো না, যেন বুঝকাষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছে,
যেন সাত কুলে কেউ নেই, যেন সাত জন্মে খেতে পান না!

সন্তানগণ। তা আমরা কী করব মা। আমাদের দোষ কী?

মা। বললেম, বলি, রোজ সকালে ভালো করে হলুদ মেখে তেল মেখে গুন
কর,—খাত পোষ্টাই হবে, ছিরি কিরবে, তা তো কেউ শুনবে না! আহা ওদের দিকে
চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়, রং যেন দুখে আলতায়—

সন্তানগণ। আমাদের রং কালো তা আমরা কী করব?

মা। তোদের রং কালো কে বললে? তোদের রং মন্দ কী? তবে কেন
ওদের মতো দেখায় না?

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৯৫

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। কোথায় চলেছ বাছা।

স্ত্রী। প্রণাম ঠাকুর !

যেতে যেতেছি মোরা।

সন্ন্যাসী। সেথায় কে আছে ?

স্ত্রী। শাণ্ডী আছেন মোর, আছেন সোয়ামী,
শত্রু-মুখে ছাই দিয়ে ছুটি ছেলে আছে।

সন্ন্যাসী। কী কাজে কাটাও দিন বলো মোরে বাছা !

স্ত্রী। ঘরকন্না-কাজ আছে, ছেলপিলে আছে,
গোয়ালে তিনটি গোরু, তার করি সেবা,
বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটির নিয়ে।

সন্ন্যাসী। সুখেতে কি কাটে দিন ? দুঃখ কিছু নেই ?

স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা-বাপ,
কোনো দুঃখ নেই প্রভু রামরাজ্যে থাকি।

সন্ন্যাসী। এটি কি তোমারি মেয়ে বাছা !

স্ত্রী। হাঁ ঠাকুর।

(কন্ঠার প্রতি) যা না রে, প্রভুরে গিয়ে কর দণ্ডবৎ।

সন্ন্যাসী। আয় বৎসে কাছে আয় কোলে করি তোরে।

আসিবি নে ! তুই মোরে চিনেছিস বুঝি—

নিষ্ঠুর কঠিন আমি পাষণ-হৃদয়,
আমারে বিশ্বাস করে আসিস নে কাছে !

কন্ঠা। (মাকে টানিয়া) মা গো ঘরে চল।

স্ত্রী। তবে প্রণাম ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। যাও বাছা, সুখে থাকো আশীর্বাদ করি।

[সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

বসে বসে কী দেখি এ, এই কি রে সুখ।

লঘু সুখ লঘু আশা বাহিয়া বাহিয়া

সংসার-সাগরে এরা ভাসিয়া বেড়ায়,

তরঙ্গের নৃত্য সনে নৃত্য করিতেছে।

১৯৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দু-দিনেতে জীর্ণ হবে এ ক্ষুদ্র তরগী,
 আশ্রয়ের সাথে কোথা মজিবে পাথারে ।
 আমি তো পেয়েছি কুল অটল পর্বতে,
 নিত্য যাহা তারি মাঝে করিতেছি বাস ।
 আবার কেন রে হোথা সন্তরণ-সাধ !
 ওই অশ্রু-সাগরের তরঙ্গ-হিল্লোলে
 আবার কি দিবানিশি উঠিবি পড়িবি !
 (চক্ষু মুদিয়া) হৃদয় রে শান্ত হও, যাক সব দূরে ।
 যাক দূরে, যাক চলে মায়া-মরীচিকা ।
 এস এস অন্ধকার, প্রলয়-সমুদ্রে
 তপ্ত দীপ্ত দগ্ধ প্রাণ দাও ডুবাইয়া ।
 অকূল শুষ্কতা এস চারি দিকে ঘিরে
 কোলাহলে কর্ণ মোর হয়েছে বধির ।
 গেল, সব ডুবে গেল, হইল বিলীন,
 হৃদয়ের অগ্নিজালা সব নিবে গেল ।

বালিকার প্রবেশ

বালিকা । পিতা, পিতা, কোথা তুমি পিতা ।
 সন্ন্যাসী । (চমকিয়া) কে রে তুই !
 চিনি নে, চিনি নে তোরে, কোথা হতে এাল !
 বালিকা । আমি, পিতা, চাও পিতা, দেখো পিতা, আমি !
 সন্ন্যাসী । চিনি নে, চিনি নে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা ।
 আমি কারো কেহ নই আমি যে স্বাধীন ।
 বালিকা । (পায়ে পড়িয়া) আমারে ধৈর্য না ফেলে, আমি নিরাশ্রয়
 শুধায়ে শুধায়ে সবে তোমাংরে খুঁজিয়া
 বহু দূর হতে পিতা, এসেছি যে আমি ।
 সন্ন্যাসী । (সহসা ফিরিয়া আসিয়া, বৃকে টানিয়া)
 আয় বাছা, বৃকে আয়, ঢাল অশ্রুধারা,
 ভেঙে যাক এ পাষণ তোঁর অশ্রুশ্রোতে,
 আর তোরে কেলে আমি যাব না বালিকা,

প্রকৃতির প্রতিশোধ

১৯৭

তোরে নিয়ে যাব আমি নূতন জগতে ।
 পদাঘাতে ভেঙেছি জগৎ আমার—
 ছোটো এ বালিকা এর ছোটো ছুটি হাতে
 আবার ভাঙা জগৎ গড়িয়া তুলিল ।
 আহা, তোর মুখখানি শুকায়ে গিয়েছে,
 চরণ দাঁড়াতে যেন পারিছে না আর ।
 অনিদ্রায়, অনাহারে, মধ্যাহ্ন-তপনে
 তিন দিবসের পথ কেমনে এলি রে !
 আয় রে বালিকা তোরে বুকে করে নিয়ে
 যেথা ছিল ফিরে যাই সেই গুহামাঝে ।

[প্রস্থান

দ্বাদশ দৃশ্য

গুহার দ্বারে

সন্ন্যাসী । এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল !
 যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হব বলে
 আসন পাতিয়াছি বিশ্বের বাহিরে,
 আরম্ভ না হতে হতে ভেঙে গেল বুঝি ।
 তারি মুখ জাগে মনে সমাধিতে বসে,
 তারি মুখ হৃদয়ের প্রলয়-আধারে
 সহসা তারার মতো কোথা ফুটে ওঠে,
 সেই দিকে আঁখি যেন বন্ধ হয়ে থাকে,
 ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়,
 জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে—
 গাছপালা, সূর্যালোক, গৃহ, লোকজন
 কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে ।
 সদা মনে হয় বালা কোথায় না জানি,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

হয়তো সে গেছে চলে নগরে ভ্রমিতে,
হয়তো কে অনাদর করেছে তাহারে,
এসেছে সে কাঁদো-কাঁদো মুখখানি করে
আমার বুকের কাছে লুকাইতে মাথা ।

এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল ।
মিছে ধ্যান মিছে জ্ঞান মিছে আশা মোর ।
আকাশ-বিহারী পাখি উড়িত আকাশে—
মাটি হতে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ,
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া—
ক্রমেই দুর্বল দেহ শ্রান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে হুয়ে অভভেদী মাথা ।
ধূল্য, যত্নের মাঝে লুটাইতে হবে ।
লৌহপিঙ্গরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিশ্বাস ।

তবে কি রে আর কিছু নাইকো উপায় ।
বালিকা । দেখো পিতা, লতাটিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে,
প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফুটিয়া ।

[সন্ন্যাসী সবেগে গিয়া লতা ছিঁড়িয়া ফেলিল

বালিকা । ও কী হল ! ও কী হল ! কী করিলে পিতা ।

সন্ন্যাসী । রাক্ষসী, পিশাচী, ওরে, তুই মায়াবিনী—

দূর হ, এখনি তুই যা রে দূর হয়ে ।

এত বিষ ছিল তোমার ওইটুকু মাঝে

অনন্ত জীবন মোর ধ্বংস করে দিলি ।

ওরে তোরে চিনিয়াছি, আজ চিনিয়াছি—

প্রকৃতির গুপ্তচর তুই রে রাক্ষসী,

গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃঙ্খল ।

তুই রে আলেয়া-আলো, তুই মরীচিকা—

কোন পিপাসার মাঝে, দুর্ভিক্ষের মাঝে

প্রকৃতির প্রতিশোধ,

১৯৯

কোন মরুভূমি মাঝে, শ্মশানের পথে
কোন মরণের মুখে যেতেছিল নিয়ে ।
ওই যে দেখি রে তোর নিদারুণ হাসি,
প্রকৃতির হৃদিহীন উপহাস তুই—
শৃঙ্খলেতে বেঁধে ফেলে পরাজিত মোরে
হা হা করে হাসিতেছে প্রকৃতি রাক্ষসী ।
এখনো কি আশা তোর পুরে নি পাখী ?
এখনো করিবি মোরে আরো অপমান,
আরো ধুলা দিবি ফেলে এ মাথায় মোর,
আরো গহবরেতে মোরে টেনে নিয়ে যাবি ?
না রে না, তা হবে না রে, এখনো যুঝিব—
এখনো হইব জয়ী ছিঁড়িব শৃঙ্খল ।

[সন্ন্যাসীর সবেগে গুহা হইতে বহির্গমন ও মুছিত হইয়া বালিকার পতন]

ত্রয়োদশ দৃশ্য

অরণ্য

বাড়বৃষ্টি

রাত্রি

সন্ন্যাসী । কে ও রে করুণকণ্ঠে করে আর্তনাদ,
এখনো কানেতে কেন পশিছে আসিয়া !
প্রলয়ের শব্দে আজি কাঁপিছে ধরণী,
বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছুটিতেছে বাড়,
ক্ষুধ সমুদ্রের মতো আঁধার অরণ্য
তরুর তরঙ্গ লয়ে উঠিছে পড়িছে ।
তবুও বাটকা, তোর বজ্রগীত গেয়ে

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ক্ষুদ্র এক বালিকার ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি
 পারিলি নে ডুবাইতে ? এখনো শুনি যে ।
 ওই যে সে কাঁদিতেছে করুণ স্বরেতে
 নিশীথের বুক ফেটে উঠিছে সে ধ্বনি ।
 কোথা যাব, কোথা যাব, কোন্ অন্ধকারে—
 জগতের কোন্ প্রান্তে, নিশীথের বুক—
 ধরণীর কোন্ ঘোর, ঘোর গর্ভতলে—
 এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে !
 যাই ছুটে আরো, আরো অরণ্যের মাঝে—
 মহাকাব্য তরুণের জটিলতা মাঝে
 দ্বিধাদিক হারাইয়া মগ্ন হয়ে যাই ।

চতুর্দশ দৃশ্য

প্রভাত

সন্ন্যাসী । (অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া)
 যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত !
 (ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) দূর করো, ভেঙে ফেলো দণ্ড কমণ্ডলু !
 আজ হতে আমি আর নহি রে সন্ন্যাসী !
 পাষণ-সংকল্পভার দিয়ৈ বিসর্জন
 আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি এক বার ।
 হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
 আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
 একা আমি সীতারিয়া পারিব না যেতে ।
 কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া,
 আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে ।
 যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে,
 সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,

প্রকৃতির প্রতিশোধ

২০১

আপনারি ক্ষুদ্র এই খণ্ডোত-আলোকে
 কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে !
 জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারি নে যে যেতে,
 মহা আকর্ষণে সব বাঁধা আছি মোরা ।
 পাখি যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
 মনে করে, এন্ম বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া,
 যত ওড়ে—যত ওড়ে যত উর্ধ্বের যায়—
 কিছূতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে
 অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে ।

(চারিদিকে চাহিয়া)

আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময় !
 সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে ।
 নদী তরুলতা পাখি হাসিছে প্রভাতে ।
 উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
 হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে ।
 ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
 ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া ।
 ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
 ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার ।
 কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
 ছেলেরা ধুলায় বসে খেলা করিতেছে,
 সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা ।

আহা সে অনাথা বালা কোথায় না জানি !
 কে তারে আশ্রয় দেবে, কে তারে দেখিবে !
 ব্যথিত হৃদয় নিয়ে কার কাছে যাবে,
 কে তারে পিতার মতো বুকে নিয়ে তুলে
 নয়নের অশ্রুজল দিবে মুছাইয়া !
 কী করেছি, কী বলেছি, সব গেছি ভুলে,
 বিশ্বত দুঃস্বপ্ন শুধু চেপে আছে প্রাণে—
 একখানি মুখ শুধু মনে পড়িতেছে,

২০২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ছুটি আশি চেয়ে আছে করুণ বিশ্বয়ে ।
 আহা, কাছে যাই তার, বুকে নিয়ে তারে
 শুধাই গে কী হয়েছে কী করেছি আমি !
 একটি কুটির মোরা রহিব হৃ-জনে,
 রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী,
 সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে, শাস্ত্রকথা শুনে
 বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে ।

[প্রস্থান

পঞ্চদশ দৃশ্য

পথে

লোকারণ্য

প্রথম পুরুষ। ওরে আজ আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে ।

দ্বিতীয় পুরুষ। তা তো জানি ।

তৃতীয় পুরুষ। ছুটে চল, ছুটে চল, ছুটে চল ।

চতুর্থ পুরুষ। রাজার বাড়ি নবং বসেছে, কিন্তু ভাই আমাদের ডুগডুগি না
 বাজলে আমোদ হয় না । তাই কাল সারা রাত্রি মোধোকে আর হরেকে ডেকে ডি
 জনে মিলে কেবল ডুগডুগি বাজিয়েছি ।

স্ত্রীলোক। হাঁ গা, রাজপুত্রের বিয়ে হবে, তা মুড়িমুড়কি বিলোনো হবে না ?

প্রথম পুরুষ। দূর মাগি, রাজপুত্রের বিয়েতে কি মুড়িমুড়কি বিলোনো হয় !
 শুড়, ছোলা, চিনির পানা—

দ্বিতীয় পুরুষ। না রে না, খুড়ো আমার শহরে থাকে, তার কাছে গুনেছি, দূর
 দিয়ে ছাতু দিয়ে কলার হবে ।

অনেকে। ওরে তবে আজ আনন্দ করে নে রে, আনন্দ করে নে ।

প্রথম পুরুষ। ওরে ও সর্দারের পো, আজ আবার কাজ করতে বসেছি কেম
 ঘর থেকে বেরিয়ে আয় ।

দ্বিতীয় পুরুষ। আজ যে শালা কাজ করবে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব ।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

২০৩

তৃতীয় পুরুষ । না রে ভাই, বসে বসে মালা গাঁথছি, দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হবে ।
 স্ত্রীলোক । (রক্তমান সন্তানের প্রতি) চূপ কর, কাঁদিস নে, কাঁদিস নে, আজ
 রাজপুত্রের বিয়ে—আজ রাজবাড়িতে যাবি, মুঠো মুঠো চিনি খেতে পাবি ।

[কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান]

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী । জগতের মুখে আজি এ কী হাস্ত হেরি !
 আনন্দতরঙ্গ নাচে চন্দ্রস্বর্ষ বেরি ।
 আনন্দহিলোল কাঁপে লতায় পাতায়,
 আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখির গলায়,
 আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে ।

কতকগুলি পখিকের প্রবেশ

প্রথম পখিক । ঠাকুর প্রণাম হই ।
 দ্বিতীয় পখিক । প্রভু গো প্রণাম ।
 তৃতীয় পখিক । এই ছেলেটির মোর আশীর্বাদ করো ।
 চতুর্থ পখিক । পদধূলি দাও প্রভু নিয়ে যাই শিরে ।
 পঞ্চম পখিক । এনেছি চরণে দিতে গুটি দুই ফুল ।
 সন্ন্যাসী । কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম,
 আমি তো সন্ন্যাসী নই । ওঠো ভাই ওঠো—
 এস ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি ।
 আমিও যে এক জন তোমাদের মতো,
 তোমাদের গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে ।

জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার ?
 শুধাইতে কেন মোর করিতেছে ভয় ?
 তার ম্লান মুখ দেখে কেহ কি তোমরা
 ডেকে নিয়ে যাও নাই গৃহে তোমাদের !
 সে বালিকা কোথাও কি পায় নি আশ্রয় ?

২০৪

রুবীন্দ্র-রচনাবলী

ষোড়শ দৃশ্য

গুহায়ুথ

ধুলায় পতিত বালিকা

সন্ন্যাসীর দ্রুত প্রবেশ

সন্ন্যাসী। নয়ন-আনন্দ মোর, হৃদয়ের ধন,
 স্নেহের প্রতিমা, ওগো, মা, আমি এসেছি—
 ধুলায় পড়িয়া কেন,—ওঠ, মা, ওঠ, মা—
 পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস কেন ?
 আয় রে বুকের মাঝে—এও তো পাষাণ ।
 ও মা, এত অভিমান করেছিস কেন ।
 মুখখানি তুলে দেখ,—ছুটো কথা ক !—
 এ কী, এ যে হিম দেহ ।—না পড়ে নিশ্বাস—
 হৃদয় কেন রে শুষ্ক, বিবর্ণ মুখানি !

বাছা, বাছা, কোথা গেলি ! কী করিলি রে—
 হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ ।

বাল্মীকি-প্রতিভা



সূচনা

বাল্মীকি-প্রতিভায় একটি নাট্য-কথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল, মায়ার খেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ঝাঁকি মধ্য মধ্যে নাট্যের উকিঝুঁকি চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ি পার হয়ে সবে ভিতর-মহলে পা দিয়েছি; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জাল-বুনোনিটাই তখন বিশেষ করে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল। বাল্মীকি-প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা। এইটেই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে। প্রকৃতির প্রতিশোধেও এই দ্বন্দ্ব। সন্ন্যাসীর মধ্যে চিরকালের যে মানুষ প্রচ্ছন্ন ছিল তার বাঁধন ছিঁড়ল। কবির মনের মধ্যে বাজছিল মানুষের জয়গান। মায়ার খেলায় গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারে নি অহংকারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা, ভাঙল মিথ্যে অহংকার, প্রকাশ পেল সত্যকার নারী। মায়াকুমারীদের কাছ থেকে এই ভৎসনা কানে এল :

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,

শুধু সুখ চলে যায়,

এমনি মায়ার ছলনা।





‘বাল্মীকি-প্রতিভা’ অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

বাল্মীকি-প্রতিভা

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য

বনদেবীগণ

সহে না সহে না কঁাদে পরান ।
 সাধের অরণ্য হল ঋশান ।
 দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ,
 ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান ।
 আকুল কানন, কঁাদে সমীরণ,
 চকিত মৃগ, পাখি গাহে না গান ।
 শ্রামল ভৃগদল, শোণিতে ভাসিল,
 কাতর রোদন-রবে ফাটে পাষণ ।
 দেবি ছুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে,
 রাখো অধীনী জনে, করো শান্তি দান ।

[প্রস্থান

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

আঃ বেঁচেছি এখন ।

শর্মা ওদিকে আর নন ।

গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন ।

লার্টালাঠি কাটাকাটি, ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি,

(তাই) মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন ।

আনুক তারা আনুক আগে, ছনোছনি নেব ভাগে,

শ্রান্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন ।

২০৮

ব্রবীন্দ্র-রচনাবলী

শুধু মুখের জোরে গলার চোটে, লুট-করা ধন নেব লুটে,
শুধু হুলিয়ে ভুড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম।

লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার।
করেছি ছারখার।

কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে করেছি একাকার।

প্রথম দস্যু। আজকে তবে মিলে হবে করব লুটের ভাগ,
এ সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করলুম যজ্ঞ-যাগ।

দ্বিতীয় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে (আরে দাদা)।

প্রথম দস্যু। এত বড়ো আশ্রমার্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কী হাসি-তামাশা।
এখনি মৃগ করিব খণ্ড খবরদার রে খবরদার।

দ্বিতীয় দস্যু। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নশ্ত, এমনি যে আকার।

তৃতীয় দস্যু। এমনি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ,
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ।

প্রথম দস্যু। আর যে এ-সব সহ্য না প্রাণে,
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়ী?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ
কোথা রে লাঠি কোথা রে ঢাল?

সকলে। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো এ কী ব্যাপার।
আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নশ্ত, এমনি যে আকার।

বাল্মীকির প্রবেশ

সকলে। এক ভোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোরা কী জানি?

বালাকি-প্রতিভা

২০৯

প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী।

রাজা প্রজা, উচু নিচু, কিছু না গনি।

ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়।

প্রথম দম্ভ্য। (বালাকির প্রতি) এখন করব কী বল।

সকলে। এখন করব কী বল।

প্রথম দম্ভ্য। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল।

সকলে। বল রাজা, করব কী বল, এখন করব কী বল।

প্রথম দম্ভ্য। পেলো মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা।

করে দিই রসাতল।

সকলে। করে দিই রসাতল !

সকলে। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল,

বল রাজা, করব কী বল, এখন করব কী বল ?

বালাকি। শোন্ তোরা তবে শোন্।

অমানিশা আজিকে, পূজা দেব কালীকে,

ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা,

বলি নিয়ে আয়।

[বালাকির প্রস্থান]

সকলে। ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,

মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয় !

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,

তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্।

দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক,

কে বা কঁাদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ।

তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,

তবে আন্ বরশা আন্ আন্ দেখি ঢাল।

প্রথম দম্ভ্য। আগে পেটে কিছু ঢাল, পরে পিঠে নিবি ঢাল।

হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সকলে । (উঠিয়া) কালী কালী কালী বলো রে আজ
 বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো,
 নামের জোরে সাধিব কাজ,
 বলো হো, হো, বলো হো, বলো হো !
 ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে,
 ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্রামারে,
 ওই লটু পটু কেশ, অটু অটু হাসে রে ;
 হাহা হাহাহা হাহাহা !
 আরে বল রে শ্রামা মায়ের জয়, জয় জয়,
 জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয় ।
 আরে বল রে শ্রামা মায়ের জয়, জয় জয়,
 আরে বল রে শ্রামা মায়ের জয় । [গমনোত্তম

একটি বালিকার প্রবেশ

বালিকা । ওই মেঘ করে বুঝি গগনে ।
 আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
 ঘরে ফিরে যাব কেমনে ।
 চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
 সারা দিবস বন ভ্রমণে ।
 ঘরে ফিরে যাব কেমনে ।

বালিকা । এঁ কী এ ঘোর বন । এন্ম কোথায় ।
 পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না ।
 কী করি এ আঁধার রাতে ।
 কী হবে মোর হায় ।
 ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
 চকিত চপলা চমকে সঘনে,
 একেলা বালিকা
 তরাসে কাঁপে কায় ।

বাল্মীকি-প্রতিভা .

২১১

প্রথম দৃশ্য । (বালিকার প্রতি)
পথ ভুলেছিস সত্যি বটে ? সিধে রাস্তা দেখতে চাস ?
এমন জয়গায় পাঠিয়ে দেব. স্নেহে থাকবি বারো মাস ।

সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ !

দ্বিতীয় দৃশ্য । (প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই ?
কেমন সে ঠাই ?

প্রথম দৃশ্য । মন্দ নহে বড়ো,
এক দিন না এক দিন সবাই সেখায় হব জড়ো ।

সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ ।

তৃতীয় দৃশ্য । আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে,
আয় তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে ।

সকলে । হাঃ হাঃ হাঃ ।

[সকলের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায় ।
আহা ঐ করুণ চোখে ও কাহার পানে চায় ।
বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে, এ কী দশা হায় ।
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে,
কে ওরে বাঁচায় ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্যে কালী-প্রতিমা

বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাল্মীকি । রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণতি গো ভবদারা ।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা ।
স্বরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব করো,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোর উন্মাদিনী পারা ।
 বলসিরে দিশি দিশি; ঘুরাও তড়িৎ অসি,
 ছুটাও শোণিত-শ্রোত ভাসাও বিপুল ধরা ।
 উরো কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
 লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাংপর ।

বালিকাকে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ । দেখো, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা ।
 বড়ো সরেস, পেয়েছি বলি সরেস,
 এমন সরেস মহলি রাজা, জ্বালে না পড়ে ধরা ।
 দেরি কেন ঠাকুর সেরে ফেলো স্বরা !

বাল্মীকি । নিয়ে আয় রূপাণ, রয়েছে ত্বষিতা শ্রামা মা,
 শোণিত পিয়াও, যা স্বরায় ।

লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িৎ খেলে চোখে,
 করিয়ে খণ্ড দিগ্দিগন্ত, ঘোর দস্ত ভায় ।

বালিকা । কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায় ।
 পথহারা একাকিনী বনে অসহায়—
 রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায় ।
 দয়া করো অনাথারে, কে আমার আছে,
 বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যথায় ।

বনদেবী । (নেপথ্যে) দয়া করো অনাথারে, দয়া করো গো,
 বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যথায় ।

বাল্মীকি । এ কেমন হল মন আমার ।
 কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে ।
 পাষাণ হৃদয়ো গলিল কেন রে,
 কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে !
 কী মায়া এ জানে গো,
 পাষণের বাঁধ এ যে টুটিল,

সব ভেসে গেল গো - সব ভেসে গেল গো—
 মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে !

বাল্মীকি-প্রতিভা

২১৩

প্রথম দম্ভ্য । আরে, কী এত ভাবনা কিছু তো বুঝি না ।
 দ্বিতীয় দম্ভ্য । সময় বহে যায় যে ।
 তৃতীয় দম্ভ্য । কখন এনেছি মোরা এখনো তো হল না ।
 চতুর্থ দম্ভ্য । এ কেমন রীতি তব, বাহ্ রে ।
 বাল্মীকি । না না হবে না, এ বলি হবে না,
 অগ্নি বলির তরে, যা রে যা ।
 প্রথম দম্ভ্য । অগ্নি বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব ?
 দ্বিতীয় দম্ভ্য । এ কেমন কথা কও, বাহ্ রে ।
 বাল্মীকি । শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,
 কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে ।
 বাঁধন করু ছিন্ন,
 মুক্ত করু এখনি রে ।

[যথাদৃষ্ট কৃত

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বাল্মীকি

বাল্মীকি । ব্যাকুল হয়ে বনে বনে,
 ভ্রমি একেলা শূন্যমনে ।
 কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ,
 জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষনে ।

[প্রস্থান

দম্ভ্যগণ বালিকাকে পুনর্বীর ধরিয়া আনিয়া

ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই,

এমন শিকার ছাড়ব না ।

হাতের কাছে অম্নি এল, অম্নি যাবে !

অম্নি যেতে দেবে কে রে ।

রাজাটা খেপেছে রে, তার কথা আর মানব না ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আজ রাতে ধুম হবে ভারি,
 নিয়ে আয় কারণ বারি,
 জেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পুজো দেব—
 নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেছে রে,
 তার কথা আর মানব না।

প্রথম দম্পত্য। রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।

তুমি উজীর, কোতোয়াল তুমি,
 ওই ছোড়াগুলো বরকন্দাজ।
 যত সব কুঁড়ে আছে ঠাই জুড়ে
 কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে।
 পা ধোবার জল নিয়ে আয় বাট,
 কর তোরা সব যে যার কাজ।

দ্বিতীয় দম্পত্য। আছে তোমার বিত্তে-সাধি জানা।

রাজত্ব করা এ কি তামাশা পেয়েছ।

প্রথম দম্পত্য। জানিস না কেটা আমি।

দ্বিতীয় দম্পত্য। ঢের ঢের জানি—ঢের ঢের জানি—

প্রথম দম্পত্য। হাসিস নে হাসিস নে মিছে, যা যা—

সব আপন কাজে যা যা।

যা আপন কাজে।

দ্বিতীয় দম্পত্য। খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা।

নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে।

তৃতীয় দম্পত্য। আঃ, কাজ কী গোলমালে,

না হয় রাজাই সাজালে।

মরবার বেলায় মরবে ওটাই, থাকব ফাঁকতালে।

প্রথম দম্পত্য। রাম রাম হরি হরি, ওরা থাকতে আমি মরি!

তেমন তেমন দেখলে বাবা ঢুকব আড়ালে।

সকলে। ওরে চল্ তবে শিগগিরি,

আনি পুজোর সামিগুগিরি।

কথায় কথায় রাত পোহাল, এমনি কাজের ছিরি।

[প্রস্থান]

বাল্মীকি-প্রতিভা

২১৫

বালিকা । হা কী দশা হল আমার !
কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো !
মৃত্তকের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে ;
জনমের মত বিদায় !

পূজার উপকরণ লইয়া দম্ভ্যগণের প্রবেশ
ও কালী-প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য

এত রত্ন শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী ।
তোমার নৃত্য দেখে চিন্তা কাঁপে চমকে ধরণী ।
ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ মা সন্তানের মিনতি ।
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা ত্রিনয়নী ।

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি । অহো আত্মপর্ধা এ কী তোদের নরাধম ।
তোদের কারেও চাহি নে আর, আর আর না রে—
দূর দূর দূর, আমারে আর ছুঁ'স নে ।
এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িছ !

প্রথম দম্ভ্য । দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানি নে রাজা ।
এরাই তো যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে বোঝাই বোঝে না ।
কী করি, দেখো বিচারি ।

দ্বিতীয় দম্ভ্য । বাঃ—এও তো বড়ো মজা, বাহবা !
যত কুয়ের গোড়া ওই তো, আরে বল না রে ।

প্রথম দম্ভ্য । দূর দূর দূর, নির্লজ্জ আর বকিস নে !

বাল্মীকি । তফাতে সব সরে যা । এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িছ ।

[দম্ভ্যগণের গ্রস্থান]

২১৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বান্ধীকি । আর মা আমার সাথে কোনো ভয় নাহি আর ।
কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার ।
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি ।
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার ।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বনদেবীগণের প্রবেশ

রিম্-ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে ।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে ।
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে ।

[প্রস্থান

বান্ধীকির প্রবেশ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাই—

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে ।

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,

ভুলি সব জালা, বনে বনে ছুটিয়ে —

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে ।

আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে,

কেমনে যাবে বেদনা ।



নিক্তীয়া সুরেন্দ্র অরুণেন্দ্র বনেন্দ্র যশঃপ্রকাশ হিতেন্দ্র গগনেন্দ্র ঋতেন্দ্র 'বান্দীকি-প্রতিভা' অভিনয় অবনীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ





‘দানীকি-প্রতিভা’ অভিনয়

রবীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্র

ঋতেন্দ্র

গগনেন্দ্র

হিতেন্দ্র

বশঃপ্রকাশ

বলেন্দ্র

অরুণেন্দ্র

সুহরেন্দ্র

কিতীন্দ্র



বাল্মীকি-প্রতিভা

২১৭

ধরি ধলু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব ।

কেন প্রাণ কেন কঁাদে রে ।

শৃঙ্গধ্বনিপূর্বক দস্যুগণকে আহ্বান
দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যু । কেন রাজা ডাকিস কেন, এসেছি সবে ।

বুঝি আবার শ্রামা মায়ের পুজো হবে ।

বাল্মীকি । শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে !

প্রথম দস্যু । ওরে, রাজা কী বলছে শোন ।

সকলে । শিকারে চল তবে ।

সবারে আন ডেকে যত দলবল সবে ।

[বাল্মীকির প্রস্থান

এই বেলা সবে মিলে চল হো, চল হো

ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়,

এমন রজনী বহে যায় যে,

ধলুবাণ লয়ে হাতে, আয় আয় আয় আয় ।

বাজা শিক্কা ঘন ঘন, শব্দে কাঁপিবে বন,

আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখি সবে,

ছুটে যাবে কাননে কাননে, চারি দিকে ঘিরে

যাবে পিছে পিছে, হো হো হো হো ।

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি । গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে ।

তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী বরাহ খোজ্ গে,

এই বেলা যা রে ।

নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে,

ধলুবাণ নে রে হাতে, চল ত্বরা চল ।

জালায়ে মশাল-আলো, এই বেলা আয় রে ।

[প্রস্থান

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম দম্ভ্য । চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই !

দ্বিতীয় দম্ভ্য । প্রাণপণ খোঁজ্ এ বন সে বন,
চল্ মোরা ক-জন ওদিকে যাই ।

প্রথম দম্ভ্য । না না ভাই, কাজ নাই
হোথা কিছু নাই, কিছু নাই
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই ।

দ্বিতীয় দম্ভ্য । বরা বরা—

প্রথম দম্ভ্য । আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে ফসকাবে শিকার,
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয় অশথতলায়,
এবার ঠিকঠাক হয়ে সব থাক্,
সাবধান ধরু বাণ, সাবধান ছাড়্ বাণ,
গেল গেল, ঐ ঐ, পালায় পালায়, চল্ চল্ ।
ছোট্ট রে পিছে আয় রে ত্বরা যাই ।

বনদেবীগণের প্রবেশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে,

সাধের কাননে শাস্তি নাশিতে ।

মত্ত করী যত পদ্মবন দলে,

বিমল সরোবর মস্থিয়া,

ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে,

সুধনে খর শর সজ্জিয়া ।

তরাসে চমকিয়ে হরিণ-হরিণী

শ্বলিত চরণে ছুটিছে ।

শ্বলিত চরণে ছুটিছে কাননে,

কল্পন নয়নে চাহিছে—

আকুল সরসী, সারস-সারসী

শর-বনে পশি কাঁদিছে ।

তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী

বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—

বাল্মীকি-প্রতিভা

২১৯

কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া ।

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

প্রথম দস্যু । প্রাণ নিয়ে ত সটকেছি রে করবি এখন কী ।
ওরে বরা করবি এখন কী ।
বাবা রে, আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি ।
এই মরদের মুরদখানা, দেখেও কি রে ভড়কালি না,
বাহবা শাবাশ তোরে, শাবাশ রে তোঁর ভরসা দেখি ।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর এক জন

দস্যুর প্রবেশ

অন্য দস্যু । বলব কী আর বলব খুড়ো—উ উ ।
আমার যা হয়েছে, বলি কার কাছে—
একটা বুড়ো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে হুঁ ।
প্রথম দস্যু । তখন যে ভারি ছিল জারিজুরি,
এখন কেন করছ বাপু উ উ উ—
কোনখানে লেগেছে বাবা, দিই একটু হুঁ ।

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ । সদীর মশায় দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই বসে ।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধো কষে ।
বনবাদাড় সব ঝেঁটে খুঁটে,
আমরা মরব্ খেটে খুঁটে,
তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে ।

প্রথম দস্যু । কাজ কী খেয়ে তোফা আছি,
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি,
শিকার করতে যায় কে মরতে,

২২০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দুসিয়ে দেবে বরা মোবে ।
 ছুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না—
 সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে ।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ

বান্ধীকির দ্রুতপ্রবেশ

বান্ধীকি ।

রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু ছাড়িস নে বাণ ।
 হরিণ-শাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
 চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান ।
 কোনো দোষ করে নি তো স্নহুমার কলেবর,
 কেমনে কোমল দেহে বিধিবি কঠিন শর ।
 থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্.,
 আজ হতে বিসর্জিহু এ ছার ধনুক বাণ ।

[প্রস্থান

দম্ভ্যগণের প্রবেশ

দম্ভ্যগণ ।

আর না আর না, এখানে আর না,
 আয়রে সকলে চলিয়া যাই ।
 ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
 এখানে কেমনে থাকিব ভাই ।
 চল্ চল্ চল্ এখনি যাই ।

বান্ধীকির প্রবেশ

দম্ভ্যগণ ।

তো'র দশা, রাজা, ভালো তো নয়,
 রক্তপাতে পাস রে ভয়,
 লাজে মোরা মরে যাই ।
 পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
 না জানি কে তোরে করিল গুণ,
 হেন কভু দেখি নাই ।

[দম্ভ্যগণের প্রস্থান

বান্ধীকি-প্রতিভা

২২১

পঞ্চম দৃশ্য

বান্ধীকি । জীবনের কিছু হল না হায়—
 হল না গো হল না হায় হায় ।
 গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আধারে ।
 শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
 পারি না গো পারি না আর ।
 কী লয়ে এখন ধরিব জীবন, দিবস-রজনী চলিয়া যায় -
 দিবস-রজনী চলিয়া যায়,
 কত কী করিব বলি কত উঠে বাসনা,
 কী করিব জানি না গো ।
 সহচর ছিল যারা, ত্যজিয়া গেল তারা ; ধন্বর্ষণ ত্যজেছি,
 কোনো আর নাহি কাজ—
 কী করি কী করি বলি, হাহা করি ভ্রমি গো—
 কী করিব জানি না যে ।

ব্যাধগণের প্রবেশ

প্রথম ব্যাধ । দেখ দেখ, ছোটো পাখি বসেছে গাছে ।
 দ্বিতীয় ব্যাধ । আয় দেখি চুপি চুপি আয় রে কাছে ।
 প্রথম ব্যাধ । আরে বাট করে এই বারে ছেড়ে দে রে বাণ ।
 দ্বিতীয় ব্যাধ । রোস রোস আগে আমি করি রে সন্ধান ।
 বান্ধীকি । থাম্ থাম্, কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ ।
 ছুটিতে রয়েছে স্নেহে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান ।
 প্রথম ব্যাধ । রাখো মিছে ও-সব কথা,
 কাছে মোদের এস নাকো হেথা,
 চাই নে ও-সব-শাস্তর কথা, সময় বহে যায় যে ।
 বান্ধীকি । শোনো শোনো মিছে রোষ ক'রো না ।
 ব্যাধ । থামো থামো ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ ।
 একটি ক্রোড়কে বধ

২২২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বান্ধীকি । মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ভ্রমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ,
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমধীঃ কামমোহিতম্ ।

কী বলিছ আমি ! এ কী সুললিত বাণী রে ।
কিছু না জানি কেমন যে আমি, প্রকাশিছ দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিছ রে ।
পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কী ! হৃদয়ে এ কী এ দেখি ।—
ঘোর অন্ধকার মাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়,
অবাক্ !—করণা এ কার !

সরস্বতীর আবির্ভাব

বান্ধীকি । এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা ।
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা ।
কী প্রতিমা দেখি এ,
জোছনা মাথিয়ে,
কে রেখেছে আঁকিয়ে,
আ মরি কমল-পুতলা ।

[ব্যাধগণের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বনদেবী । নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে
পুণ্য হল বনভূমি, ধন্ত হল প্রাণ ।
বান্ধীকি । পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা,
ধন্ত হল দম্ভ্যপতি, গলিল পাষণ ।
বনদেবী । কঠিন ধরাভূমি-এ, কমলালয়া তুমি যে,
হৃদয়-কমলে চরণ-কমল করো দান ।
বান্ধীকি । তব কমল-পরিমলে রাখো হৃদি ভরিয়ে
চিরদিবস করিব তব চরণ-সুধা পান ।

[দেবীগণের অন্তর্ধান

বান্ধীকি প্রতিভা

২২৩

কালী-প্রতিমার প্রতি বান্ধীকি

শ্রামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা ।

পাষণের মেয়ে পাষণী, না বুঝে মা বলেছি মা ।

এত দিন কী ছল করে তুই, পাষণ করে রেখেছিলি,

(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন-জলে গলেছি মা ।

কালো দেখে তুলি নে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন,

আমায় তুমি ছলেছিলে, (এবার) আমি তোমায় ছলেছি মা ।

মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বান্ধীকি । কোথা লুকাইলে ?

সব আশা নিবিল, দশদিশি অন্ধকার,

সবে গেছে চলে ত্যজিয়ে আমারে,

তুমিও কি তেয়াগিলে ?

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

লক্ষ্মী । কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল হু-নয়নে

কিসের হুখে ?

কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক তবে হাসি

মলিন মুখে ।

কমলা যারে চায়, বলো সে কী না পায়, হুখের এ ধরায়

থাকে সে স্মৃথে ।

ত্যজিয়া কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে

হেরো গো চোখে ।

বান্ধীকি । কোথায় সে উন্মায়ী প্রতিমা ।

তুমি তো নহ সে দেবী, কমলাসনা,

ক'রো না আমারে ছলনা ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কী এনেছ ধন মান ! তাহা যে চাহে না প্রাণ ।
 দেবী গো, চাহি না চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,
 তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
 আমি, দেবী, সে সুখ চাহি না ।

যাও লক্ষ্মী অলকার, যাও লক্ষ্মী অমরায়,

এ বনে এসো না এসো না,

এসো না এ দীনজন-কুটিরে ।

যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,

আর কিছু চাহি না চাহি না ।

[লক্ষ্মীর অন্তর্ধান, বাল্মীকির প্রশ্নান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী ।

অঙ্কজনে নয়ন দিয়ে অঙ্ককারে ফেলিলে,

দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অগ্নি ।

স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,

চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম-বেদনা,

তোমারে চাহি ফিরিছে হেরো কাননে কাননে ওই ।

[বনদেবীগণের প্রশ্নান

বাল্মীকির প্রবেশ

সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি । এই যে হেরি গো দেবী আমারি ।

সব কবিতাময় জগত চরাচর,

সব শোভাময় নেহারি ।

হৃন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, হৃন্দে কনক-রবি উদিতছে,

হৃন্দে জগ-মণ্ডল চলিতছে,

অলস্ত কবিতা তারকা সবে ;

বাল্মীকি-প্রতিভা

২২৫

এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী

আলোকে আলো আঁধারি ।

আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কী গীত গাহিছে,

ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,

নব রাগ-রাগিণী উছাসিছে,

এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি ।

তুমিই কি দেবী ভারতী, কৃপাশুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,

উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,

প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে !

তুমি ধন্ত গো,

রব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি ।

সরস্বতী ।

দীনহীন বালিকার সাজে,

এসেছিছ ঘোর বনমাঝে,

গলাতে পাষণ তোর মন,—

কেন বৎস, শোন, তাহা শোন ।

আমি বোণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,

তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষণ-প্রাণ ।

যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন,

যে রাগিণী তোরি কঠে বাজিবে রে অনুরূপ ।

অধীর হইয়া সিদ্ধু কাঁদিলে চরণ-তলে,

চারি দিকে দিক-বধু আকুল নয়ন-জলে ।

মাথার উপরে তোর কাঁদিলে সহস্র তারা,

অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা ।

যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,

শত-শ্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময় ।

ষেখায় হিমাদ্রি আছে সেখা তোর নাম রবে,

ষেখায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্যশ্রোত ববে ।

সে জাহ্নবী বহিবেক অমৃত হৃদয় দিয়া,

শশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিয়া ।

মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,

২২৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর !
বসি তোর পদতলে কবি-বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সংগীত কত ।
এই নে আমার বীণা, দিহু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার ।

মায়ার খেলা



প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

সখীসমিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি-কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প।

মাননীয় শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহার স্বরূপে সমর্পণ করিলাম।

ইহার আখ্যানভাগ কোনো সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে। সংগীতের কল্পরাজ্যে সমাজনিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীত ভাবে ভরসা করি এই গ্রন্থে সাধারণ মানব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু নাই।

আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গল্প নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধন-স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

এই গ্রন্থের তিনটি গান ইতিপূর্বে আমার অন্য কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠক ও দর্শকদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অত্যাশ্রিত পাত্রগণের দৃষ্টি বা জ্ঞতি গোচর নহে।

এই নাট্যকাব্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা পরপৃষ্ঠায় বিবৃত হইল। নতুবা বিচ্ছিন্ন গানের মধ্য হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুঃস্বপ্ন বোধ হইতে পারে।

২২৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যে মায়াকুমারীগণের আবির্ভাব। মায়াকুমারীগণ কুহকশক্তিপ্রভাবে মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়ার সৃজন করে। হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এই সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা। এক দিন নব বসন্তের রাত্রে তাহার স্থির করিল, প্রমোদপুরের যুবক-যুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া তাহার মায়ার খেলা খেলিবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নবযৌবন বিকাশে গ্রন্থের নায়ক অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ণ আকাজ্জনা অনুভব করিতেছে। সে উদাসভাবে জগতে আপন মানসী মূর্তির অমররূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে। এদিকে শান্তা আপন প্রাণমন অমরকেই সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে শান্তার প্রতি অমরের প্রেম জন্মিতে অবসর পায় নাই। অমর শান্তার হৃদয়ের ভাব না বুঝিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ পরিহাসচ্ছলে গাহিল—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,

কাহার সন্ধানে দূরে যাও !

তৃতীয় দৃশ্য

প্রমদার কুমারী-হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই। সে কেবল মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সখীরা ভালোবাসার কথা বলিলে সে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। অশোক ও কুমার তাহার নিকটে আপন প্রেম ব্যক্ত করে, কিন্তু সে তাহাতে লক্ষ্যপ করে না। মায়াকুমারীগণ হাসিয়া বলিল; তোমার এ গর্ব চিরদিন থাকিবে না।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।

গরব সব হায়, কখন টুটে যায়,

সলিল বহে যায় নয়নে।

চতুর্থ দৃশ্য

অমর পৃথিবী খুঁজিয়া কাহারো সন্ধান পাইল না। অবশেষে প্রমদার ক্রীড়াকাননে আসিয়া দেখিল, প্রমদার প্রেমলাভে অকৃতার্থ হইয়া অশোক আপন মর্মব্যথা পোষণ করিতেছে। অমর বলিল, যদি ভালোবাসিয়া কেবল কষ্টই সার জন্মে

মায়ার খেলা

২২৯

ভালোবাসিবার প্রয়োজন কী? কেন যে লোকে সাধ করিয়া ভালোবাসে অমর
বুঝিতেই পারিল না। এমন সময়ে সখীদের লইয়া প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল।
প্রমদাকে দেখিয়া অমরের মনে সহসা এক নূতন আনন্দ নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল।
প্রমদা দেখিল আর সকলেই তৃষিত ভ্রমরের তায় তাহার চারিদিকে কিরিতেছে,
কেবল অমর একজন অপরিচিত যুবক দূরে দাঁড়াইয়া আছে। সে আকৃষ্ট হৃদয়ে
স্বীদগিকে বলিল, “উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আয় ও কী চায়?” সখীদের
প্রেরণ উত্তরে অমরের অনতিশ্রুত হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইল না। সখীরা কিছু
বুঝিল না। কেবল মায়া কুমারীগণ বুঝিল এবং গাহিল—

প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে,
দেখো দেখো সখী চাহিয়া।
ছুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

পঞ্চম দৃশ্য

অমরের মনে ক্রমে প্রমদার প্রতি প্রেম প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমদারও
হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, বাহিরের চঞ্চলতা দূর হইয়া গেল। সখীরা প্রমদার
অবস্থা বুঝিতে পারিল। কিন্তু পূর্বদৃশ্যে অমরের অস্পষ্ট উত্তর এবং ভাবগতিক
দেখিয়া অমরের প্রতি সখীদের বিশ্বাস নাই। এবং সখীদের নিকট হইতে সখীর হৃদয়
হরণ করিয়া লইতেছে জানিয়া অমরের প্রতি হয়তো অলঙ্ঘ্য তাহাদের ঈর্ষা মৃদু
বিশ্লেষণের ভাবও জন্মিয়াছে। অমর যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করিল
প্রমদা কিছু বলিতে না বলিতে সখীরা তাড়াতাড়ি আসিয়া অমরকে প্রচুর ভৎসনা
করিল। সরলহৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা কিছু না বুঝিয়া হতাশাস হইয়া ফিরিয়া গেল।
ব্যাকুলহৃদয় প্রমদা লজ্জায় বাধা দিবার অবসর পাইল না। মায়া কুমারীগণ গাহিল—

নিমেষের তরে শরমে বাধিল
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল হৃদয়-বেদনা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অমরের অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয় সহজেই শান্তার প্রতি ফিরিল। এই
দীর্ঘ বিরহে এবং অন্ত সকলের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমর শান্তার প্রতি নিজের

২৩০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এবং নিজের প্রতি শাস্তার অচ্ছেদ্য গৃহ বন্ধন অল্পভব করিবার অবসর পাইল। শাস্তার নিকটে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল। এদিকে প্রমদার সখীরা দেখিল অমর আর ফিরে না, তাহারি প্রত্যাশা করিয়াছিল বাধা পাইয়া অমরের প্রেমানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। তাহাতে নিরাশ হইয়া তাহার নানা কথার ছলে অমরকে আহ্বান করিতে লাগিল—অমর ফিরিল না; সখীদের ইন্দ্রিত বুঝিডেই পারিল না। ভয়হৃদয়া প্রমদা অমরের প্রেমের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিল।

মায়াকুমারীগণ গাহিল—

বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,

এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

সপ্তম দৃশ্য

শাস্তা ও অমরের মিলনোৎসবে পুরনারীগণ কাননে সমাগত হইয়া আনন্দ-গান গাহিতেছে। অমর যখন পুষ্পমালা লইয়া শাস্তার গলে আরোপণ করিতে যাইতেছে এমন সময় স্নান ছায়ার ন্যায় প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। সহ্যা অনপেক্ষিত ভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদপ্রতিমা প্রমদার নিতান্ত করুণ দীন ভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিস্মৃত অমরের হস্ত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শাস্তা ও আর সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শাস্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল, “আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন! এখন এ মালা তোমরা পরো, তোমরা সুখে থাকো।” অমর শাস্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, “আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি এখন আমার এই ভগ্ন সুখ এই স্নান মালা কাহাকে দিব, কে লইবে?” শাস্তা ধীরে ধীরে কহিল, “আমি লইব। তোমার দুঃখের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল প্রেমের মোহ দূর হইয়া জীবনের সুখ-নিশা অবসান হইয়াছে—এই ভুলভাড়া দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমাকে শুনাইব।” অমর ও শাস্তার এইরূপে মিলন হইল। প্রমদা শূন্য হৃদয় লইয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না,

শুধু সুখ চলে যায়,

এমনি মায়ার ছলনা।

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

সকলে । (মোরা) জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি ।

প্রথমা । (মোরা) স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি ।

দ্বিতীয়া । গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি ।

তৃতীয়া । (মোরা) মদির-তরঙ্গ তুলি বসন্ত-সমীরে !

প্রথমা । হুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে, আধো-তানে ভাঙা গানে,

ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাতি !

সকলে । মোরা মায়াজাল গাঁথি ।

দ্বিতীয়া । নরনারী-হিয়া মোরা বাধি মায়াপাশে ।

তৃতীয়া । কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে ।

প্রথমা । মায়াকরে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,

আনি মান-অভিমান ।

দ্বিতীয়া । বিরহী স্বপনে:পায় মিলনের সাধি ।

সকলে । মোরা মায়াজাল গাঁথি ।

প্রথমা । চলো সখী, চলো ।

কুহক-স্বপন-খেলা খেলাবে চলো ।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া । নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম-ছল,

প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাত্তি ।

সকলে । মোরা মায়াজাল গাঁথি ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর । শান্তার প্রবেশ

শান্তা । পথহারা তুমি পথিক যেন গো স্মৃতির কাননে,

ওগো যাও, কোথা যাও ।

স্মৃতি চল চল বিবশ বিভল পাগল নয়নে

তুমি চাও, করে চাও ।

কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,

কোথা পড়ে আছে ধরণী ।

মায়ায় তরণী বাহিরা যেন গো

মায়াপুরী পানে ধাও ।

কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও !

অমর । জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত ।

নবীন বাসনাভরে হৃদয় কেমন করে,

নবীন জীবনে হল জীবন্ত ।

স্মৃতিভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,

কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে ।

তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত ।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে । কাছে কাছে দেখিতে না পাও,

তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও ।

অমর । (শান্তার প্রতি) যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে,

কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে ।

তেমনি আমিও সখী যাব,

না জানি কোথায় দেখা পাব ।

কার স্মৃতিস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে,

প্রভাত জাগিছে কার নয়নে ।

মায়ার খেলা

২৩৩

কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত ।
 তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত । [গ্রন্থান
 মায়া কুমারীগণ । মনের মতো কারে খুঁজে মর,
 সে কি আছে ভুবনে,
 সে তো রয়েছে মনে ।
 ওগো, মনের মতো সেই তো হবে,
 তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও ।
 শাস্তা । (নেপথ্যে চাহিয়া)
 আমার পরান যাহা চায়,
 তুমি তাই, তুমি তাই গো ।
 তোমা ছাড়া আর এ জগতে
 মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো ।
 তুমি স্মৃতি যদি নাহি পাও,
 যাও, স্মৃতির সন্ধানে যাও,
 আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
 আর কিছু নাহি চাই গো ।
 আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
 তোমাতে করিব বাস,
 দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,
 দীর্ঘ বরষা মাস ।
 যদি আর কারে ভালবাস,
 যদি আর ফিরে নাহি আস,
 তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
 আমি যত দুখ পাই গো ।
 মায়া কুমারীগণ । (নেপথ্যে চাহিয়া)
 কাছে আছে দেখিতে না পাও,
 তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও ।
 প্রথম । মনের মতো কারে খুঁজে মর,
 দ্বিতীয় । সে কি আছে ভুবনে,
 সে যে রয়েছে মনে ।

২৩৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তৃতীয়া । ওগো, মনের মতো সেই তো হবে,
 তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও ।
 প্রথমা । তোমার আপনার যে জন, দেখিলে না তারে ।
 দ্বিতীয়া । তুমি যাবে কার দ্বারে ।
 তৃতীয়া । যারে চাবে তারে পাবে না,
 যে মন তোমার আছে, যাবে তাও ।

তৃতীয় দৃশ্য

কানন

প্রমদার সখীগণ

প্রথমা । সখী, সে গেল কোথায়,
 তারে ডেকে নিয়ে আয় ।
 সকলে । দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায় ।
 প্রথমা । আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে,
 হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তার ।
 দ্বিতীয়া । আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
 পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে ।
 প্রথমা । আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে,
 সকলে । লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায় !

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা । দে লো সখী দে পরাইয়ে গলে,
 সাধের বকুলফুলহার ।
 আধকোটা জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি,
 গাঁধি গাঁধি সাজিয়ে-দে মোরে
 কবরী ভরিয়ে ফুলভার ।

মায়ার খেলা

২৩৫

তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল

কপোলে পড়িছে বারেবার ।

প্রথম । আজি এত শোভা কেন, আনন্দে বিবশা যেন ।

দ্বিতীয়া । বিদ্বাধরে হাসি নাহি ধরে,

লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে !

প্রথম । সখী তোরা দেখে যা, দেখে যা,

তরুণ তনু, এত রূপরাসি

বহিতে পারে না বুঝি আর !

তৃতীয়া । সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা,

এ কি আর ভালো লাগে !

আকুল তিয়াঁষ, প্রেমের পিয়াঁস,

প্রাণে কেন নাহি জাগে ।

কবে আর হবে থাকিতে জীবন

আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,

মধুর হতাশে মধুর দহন,

নিত-নব অনুরাগে ।

তরল কোমল নয়নের জল

নয়নে উঠিবে ভাসি ।

সে বিষাদ-নীরে নিবে যাবে ধীরে

প্রথর চপল হাসি ।

উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,

আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে,

মরমের আলো কপোলে ফুটিবে,

শরম-অরুণ-রাগে ।

প্রমদা । ওলো রেখে দে, সখী, রেখে দে,

মিছে কথা ভালোবাসা ।

স্বপ্নের বেদনা, সোহাগ যাতনা,

বুঝিতে পারি না ভাষা ।

ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,

পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

লহ লহ বলে পরে আরাধন.

পরের চরণে আশা ।

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,

বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,

পরের মুখের হাসির লাগিয়া

অশ্রু-সাগরে ভাসা ।

জীবনের স্মৃতি খুঁজিবারে গিয়া

জীবনের স্মৃতি নাশা ।

মায়া কুমারীগণ । প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,

কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে ।

গরব সব হার কখন টুটে যায়,

সলিল বহে যায় নয়নে ।

কুমারের প্রবেশ

কুমার । (প্রমদার প্রতি) যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে,

দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে ।

চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন,

কুসুমে কুসুম, কাননে কাননে ।

তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে,

তুমি গঠিত যেন স্বপনে,

এস হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,

ধরিয়ে রাখি যতনে ।

প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,

ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,

তুমি দিবস-নিশি রহিবে মিশি

কোমল প্রেম-শয়নে ।

প্রমদা ।

কে ডাকে ! আমি কতু ফিরে নাছি চাই ।

কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,

আমি শুধু বহে চলে যাই ।

পরশ পুলক-রস-ভরা রেখে যাই, নাছি দিই ধরা ।

মায়ার খেলা

২৩৭

উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে খাস,
বনে বনে উঠে হা-হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চলে যাই।
আমি কতু ফিরে নাহি চাই।

অশোকের প্রবেশ

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি,
যারে ভালো বেসেছি !
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায় বাজে,
রেখো রেখো চরণ হৃদি-মাঝে,
না হয় দলে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে,
আমি তো ভেসেছি, অকুলে ভেসেছি।

প্রমদা। ওকে বলো সখী বলো কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন, সখী, মিছে আখিজল !
জানি নে প্রেমের ধারা, ভরে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুখ কোথা হলাহল।
সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে কল।
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল সখী, চল।

[প্রস্থান

মায়াবুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।
এ সুখ-ধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে,
জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি, কখন যাবে চলি।

২৩৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বরিবে সাধ করি বেদনা ।
কখন বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি,
পরান পড়ে আসি বাঁধনে ।

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

অমর, কুমার ও অশোক

অমর । মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে ।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে, চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে ।
এত লোক আছে কেহ কাছে না ভাকে ।

অশোক । তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ । (খুলে গো)
কেন বুঝাতে পারি নে হৃদয়-বেদনা ।
কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে কিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান ।
এত ব্যথাভরা ভালোবাসা, কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল ।
এ প্রেম কুসুম যদি হত, প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান,
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান ।

কুমার । সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি.
পরের মন নিয়ে কী হবে ।

মায়া'র খেলা

২৩৯

- আপন মন যদি বুঝিতে নারি,
পরের মন বুঝে কে কবে ।
- অমর । অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হা হা রবে,
এ মন দিতে চাও দিয়ে কেলো
কেন গো নিতে চাও মন তবে ।
- স্বপন সম সব জানিয়ে মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে ;
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে ।
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শাস্তি পাও ।
- কুমার । তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে,
থাক সে আপনার গরবে ।
- অশোক । আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান ।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ ।
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজালা নীরবে সহি,
তবু পারি নে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লই গো বুক পেতে অনল-বাণ ।
যতই হাসি দিয়ে দহন করে,
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃত-ধারা ততই ষাচি,
যতই করে প্রাণে অশনি দান ।
- অমর । ভালোবেসে যদি স্মৃথ নাহি
তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা ।
- অশোক । মন দিয়ে মন পেতে চাহি ।
- অমর ও কুমার । ওগো কেন,
ওগো কেন এ মিছে দুঃখাশা ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অশোক । হৃদয়ে জালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে ঘুরি মরুভূমে ।

অমর ও কুমার । ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা ।

অমর । আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কী অভাব আছে ।
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিল কুজিত কুঞ্জ ।

অশোক । বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়
এ কী ঘোর প্রেম অন্ধ রাহপ্রায় ।
জীবন যৌবন গ্রাসে ।

অমর ও কুমার । তবে কেন,
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা ।

মায়া কুমারীগণ । দেখো চেয়ে, দেখো ঐ কে আসিছে ।
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে ।
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে ।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

প্রমদা । সুখে আছি, সুখে আছি (সখা, আপন মনে ।)

প্রমদা ও সখীগণ । কিছু চেয়ে না, দূরে যেয়ে না,
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ।

প্রমদা । সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ,
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান ।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি ।

প্রমদা ও সখীগণ । মন চেয়ে না, শুধু চেয়ে থাকো,
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ।

প্রমদা । মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়-বায় ।
এই মাধুরী-ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায় ।

মায়ার খেলা

২৪১

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা,
 যেন আপনার মন, আপনার প্রাণ, আপনারে সঁপিরাছি।
 অশোক। ভালোবেসে দুখ সে-ও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।
 প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলি নে ছলনাতে।
 কুমার। মন দাও দাও দাও সখী দাও পরের হাতে।
 প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
 অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো,
 আনো, সজল বিমল প্রেম ছল ছল নলিন নয়ন-পাতে।
 প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
 কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
 সুখ পায় তায় সে।

চির-কলিকা-জনম, কে করে বহন চির-শিশির রাতে।
 প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
 অমর। ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে।
 গোপন হৃদয় তলে কী জানি কিসের ছলে
 আলোক হানে।

এ প্রাণ নূতন করে কে যেন দেখালে মোরে,
 বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে।
 এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল,
 তুষা-ভরা তুষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল।
 কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখি গান গাহে,
 কোন্ সমীরণ বহে লতাবিতানে।

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে,
 কেন আসে না কাছে।
 যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে,
 ঐ আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

সখীগণ। ছি, ওলো ছি, হল কী, ওলো সখী।

প্রমদা। লাজ-বঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে শরম টুটিল!

তৃতীয়া। কেমনে যাব, কী শুধাব।

প্রমদা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রমদা । যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে,
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে ।

মায়াকুমারীগণ । প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দু-জনে,
দেখো দেখো সখী চাহিয়া ।

দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া ।

সখীগণ । (অমরের প্রতি) ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর ।

অমর । আমি কী যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর ।
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর ।

সখীগণ । ছি ছি ছি ।

অমর । সখী, ক্ষতি কী ।
(এ ভবে) কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন,
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,
কাহারো নয়নে লোর ।
আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর ।

সখীগণ । সখা, কেন গো অচলপ্রায়
হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায় ।

অমর । অবশ হৃদয়ভারে, চরণ
চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায় ।

সখীগণ । ছি ছি ছি ।

অমর । সখী, ক্ষতি কী ।
(এ ভবে) কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো
চরণে পড়েছে ভোর ।
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর ।

মায়ার খেলা

২৪৩

সখীগণ ।

ওকে বোঝা গেল না—চলে আয় চলে আয় ।

ও কী কথা যে বলে সখী, কী চোখে যে চায় ।

চলে আয়, চলে আয় ।

লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,

মিছে কাজে,

ধরা দিবে না যে, বলো কে পারে তায় ।

আপনি সে জানে তার মন কোথায় ।

চলে আয়, চলে আয় ।

[গ্রহান

মায়াকুমারীগণ ।

প্রেম-পাশে ধরা পড়েছে দু-জনে,

দেখো দেখো সখী চাহিয়া ।

দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই,

প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া ।

টাদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,

আধো ঘুমঘোর, আধো জাগরণ,

চোখাচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ,

কুহস্বরে পিক গাহিয়া,

দেখো দেখো সখী চাহিয়া ।

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

অমর ।

দিবস রজনী, আমি যেন কার

আশায় আশায় থাকি ।

(তাই) চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,

তুষিত আকুল আঁধি ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
 সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
 “কে আসিছে” বলে চমকিয়ে চা
 কাননে ডাকিলে পাখি ।
 জাগরণে তারে না দেখিতে পাই,
 থাকি স্বপনের আশে,
 ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়,
 বাধিব স্বপনপাশে ।
 এত ভালোবাসি, এত যারে চাই,
 মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই,
 যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে,
 তাহারে আনিবে ডাকি ।

প্রমদা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার । সখী, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব ।
 সখীগণ । আহা মরি মরি সাধের ভিখারি,
 তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন ।
 কুমার । দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব ;
 সখী । দেয় যদি কাঁটা ।
 কুমার । তাও সহিব ।
 সখীগণ । আহা মরি মরি সাধের ভিখারি,
 তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন ।
 কুমার । যদি এক বার চাও সখী মধুর নয়ানে,
 ওই আঁখি-সুধাপানে,
 চিরজীবন মাতি রহিব ।
 সখীগণ । যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে ।
 কুমার । তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব ।
 সখীগণ । আহা মরি মরি সাধের ভিখারি,
 তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন ।

মায়ার খেলা

২৪৫

প্রমদা । আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
 শুধাইল না কেহ ।

সে তো এল না, যারে সঁপিলাম
 এই প্রাণ মন দেহ ।

সে কি মোর তরে পথ চাহে,
 সে কি বিরহ-গীত গাহে,

যার বাঁশরি-ধ্বনি শুনিয়ে
 আমি ত্যজিলাম গেহ ।

মায়াকুমারীগণ । নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
 মরমের কথা হল না ।

জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
 রহিল মরম-বেদনা ।

অশোক । (প্রমদার প্রতি)

ওগো সখী, দেখি, দেখি, মন কোথা আছে ।

সখীগণ । কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে, হেরো কারে বাচে ।

অশোক । কী মধু কী সুধা কী সৌরভ,
 কী রূপ রেখেছ লুকায়ে ।

সখীগণ । কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে
 দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে ।

অশোক । সে যদি না আসে এ জীবনে,
 এ কাননে পথ না পায় !

সখীগণ । যারা এসেছে তারা বসন্তে ফুরালে
 নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে !

প্রমদা । এ তো খেলা নয়, খেলা নয় ।

এ যে হৃদয়-দহন-জ্বালা, সখী ।

এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
 গোপন মর্মের ব্যথা,

এ যে, কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কে যেন সতত মোরে
 ডাকিয়ে আকুল করে,
 যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে।
 যে-কথা বলিতে চাহি,
 তা বুঝি বলিতে নাহি,
 কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা।
 যতনে গাঁথিয়ে শেষে, পরাতে পারি নে মালা।
 প্রথম সখী। সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে,
 আমাদের সখী যারে মনপ্রাণ ঈপেছে।
 দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে।
 প্রথম। ওই যে তরুতলে, বিনোদ-মালা গলে,
 না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে।
 দ্বিতীয়া। সখী কী হবে,
 ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা কবে।
 তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ও কি বাঁধন মানে?
 ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে।
 দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়,
 যেন কী পথ ভুলে এল কোথায়। (ওগো)
 তৃতীয়া। যেন কী গানের স্বরে, শ্রবণ আছে ভরে,
 যেন কোন্ টাঁদের আলোর মগ্ন হয়েছে।
 অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে।
 ভুলিব না এ জীবনে,
 কী স্বপনে কী জাগরণে।
 তুমি জান, বা না জান
 মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে,
 হৃদয়ে সদা আছে ব'লে।
 আমি প্রকাশিতে পারি নে,
 শুধু চাহি কাতর নয়নে।
 সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে।
 প্রথম। তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে।

মায়ার খেলা

২৪৭

দ্বিতীয়া । যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে ।

তৃতীয়া । কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে ।

সকলে । কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না ।

কথা कहিলে তো কেহ কথা কহে না ।

প্রথমা । হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায় ।

দ্বিতীয়া । হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে ।

অমর । (নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি)

সকল হৃদয় দিয়ে ভালো বেসেছি যারে,

সে কি ফিরাতে পারে, সখী ।

সংসার-বাহিরে থাকি

জানি নে কী ঘটে সংসারে ।

কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,

তারে পায় কি না পায়, (জানি নে)

ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো,

অজানা হৃদয়-দ্বারে ।

তোমার সকলি ভালোবাসি,

ওই রূপরাশি,

ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি ।

ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,

কোথায় তোমার সীমা, ভুবন-মাঝারে ।

সখীগণ । তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা ।

দ্বিতীয়া । কে জানিতে চায়, তুমি ভালোবাসো, কি ভালোবাস না ।

প্রথমা । হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল ফুঙ্ককানন,

হাসে হৃদয়-বসন্তে বিকচ যৌবন ।

তুমি কেন ফেল স্বাস, তুমি কেন হাস না ।

সকলে । এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা,

সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা ।

দ্বিতীয়া । আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও ।

প্রথমা । জীবনের আনন্দ-পথ ছেড়ে দাঁড়াও ।

তৃতীয়া । দূর হতে করো পূজা হৃদয়-কমল-আসনা ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অমর । তবে স্মৃথে থাকো, স্মৃথে থাকো,—আমি যাই—যাই ।
 প্রমদা । সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই ।
 সখীগণ । অধীর হ'য়ো না, সখী,
 আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
 আশ রাখিলে ফেরে ।

অমর । ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
 এসেছি এ কোথায় ।
 হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই ।
 যদি সেই বিরাম-ভবন ফিরে পাই ।

[প্রস্থান

প্রমদা । সখী, ওরে ডাকো ফিরে ।
 মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই ।
 সখীগণ । অধীরা হ'য়ো না, সখী,
 আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
 আশ রাখিলে ফেরে ।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ । নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
 মরমের কথা হল না ।
 জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
 রহিল মরম-বেদনা ।
 চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
 পলক পড়িল, ঘটিল বিবাদ,
 মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন,
 এমনি প্রেমের ছলনা ।

মায়া'র খেলা

২৪৯

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৃহ

শান্তা।। অমরের প্রবেশ

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল।
সেই রবি শশী তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যা-সমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন।
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ।
(শান্তার প্রতি) এসেছি কিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—

শীতল স্নেহস্বধা করো দান,
দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নূতন জীবন।
মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এস কাছে।
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে।
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পার নি ভালো,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জলিয়াছে!

শান্তা। দেখো সখা ভুল করে ভালোবেসো না।
আমি ভালোবাসি বলে কাছে এসো না।
তুমি যাহে স্মৃতি হও তাই করো সখা,
আমি স্মৃতি হব বলে যেন হেসো না।
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো,
কী হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো।
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট-স্রোতে তুমি ভেসো না।

অমর। ভুল করেছিল ভুল ভেঙেছে।
এবার জেগেছি, জেনেছি,
এবার আর ভুল নয় ভুল নয়।
ফিরেছি মায়া'র পিছে পিছে,

২৫০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

জেনেছি স্বপন সব মিছে ।

বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে,

এ তো ফুল নয় ফুল নয় !

পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না,

খেলা করিব না লয়ে মন ।

ওই প্রেমময় প্রাণে, লইব আশ্রয় সখী,

অভল সাগর এ সংসার,

এ তো কুল নয় কুল নয় !

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

সখীগণ । (দূর হইতে) অলি বার বার ফিরে যায়,

অলি বার বার ফিরে আসে ।

তবে তো ফুল বিকাশে ।

প্রথম । কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে ত্রাসে ।

ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ, নিশি দিন রহ পাশে ।

দ্বিতীয়া । ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,

হৃদয়-রতন আশে ।

সকলে । ফিরে এস ফিরে এস, বন মোদিত ফুলবাসে ।

আজি বিরহ-রজনী ফুল কুসুম শিশির-সলিলে ভাসে ।

অমর । ঐ কে আমার ফিরে ডাকে ।

ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে ।

মায়াকুমারীগণ । বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,

এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে ।

আজি মধু সমীরণে, নিশীথে কুসুম-বনে,

তারে কি পড়েছে মনে বকুল-তলে ?

এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে ।

অমর । আমি চলে এলু বলে কার বাজে ব্যথা ।

কাহার মনের কথা মনেই থাকে ।

আমি শুধু বুঝি সখী, সরল ভাষা,

সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা ।

মায়ার খেলা

২৫১

তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে।

মাঝাকুমারীগণ। সেদিনো তো মধুনিশি, প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে।

ছুটি সোহাগের বাণী, যদি হত কানাকানি
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে।

এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

শান্তা। (অমরের প্রতি)

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।

ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরান জলে।

পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,

বোঝ নি কাহার মরমের আশা,

দেখ নি ফিরে,

কার ব্যাকুল প্রাণের সাথ এসেছ দলে।

অমর। আমি কারেও বুঝি নে শুধু বুঝেছি তোমারে।

তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে।

ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাই নি তো কারো মন,

গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।

এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,

আজিও বুঝিতে নারি ভয়ে ভয়ে থাকি।

কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,

তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে।

[প্রস্থান

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,

বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল বুঝে।

জ্ঞান শশী অন্ত গেল জ্ঞান হাসি মিলাইল

কাদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে।

২৫২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা । চল্ সখী চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
 যাক ভেসে স্নান আঁখি নয়ন-নীরে ।
 যাক কেটে শূন্য প্রাণ, হোক আশা অবসান,
 হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে ।

[প্রস্থান

মাঝাকুমারীগণ । মধুনিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে বার বার,
 সে জন ফেরে না আর, যে গেছে চলে ।
 ছিল তিথি অল্পকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
 চিরদিন তৃষাকূল পরান জলে ।
 এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে ।

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর, শান্তা, অত্যা ত পুরনারী ও পৌরজন

স্ত্রীগণ । এস এস বসন্ত ধরাতলে ।
 আনো কুছতান, প্রেমগান,
 আনো গন্ধমদভরে অলস সমীরণ ;
 আনো নবযৌবন-হিলোল, নব প্রাণ,
 প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে ।
 পুরুষগণ । এস ধরধর-কম্পিত, মর্মর-মুখরিত,
 নব-পল্লব-পুলকিত
 ফুল-আকুল মালতী-বল্লি-বিতানে,
 সুখছায়ে মধুবায়ে, এস এস ।

মায়ার খেলা

২৫৩

- এস অরুণ-চরণ কমল-বরন তরুণ উষার কোলে ।
 এস জ্যোৎস্না-বিবশ নিশীথে,
 কল-কল্লোল তটিনী-তীরে,
 সুখসুপ্ত সরসী-নীরে; এস এস ।
- স্ত্রীগণ । এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে,
 এস মিলন-সুখালস নয়নে,
 এস মধুর শরম মাঝারে,
 দাও বাহতে বাছ বাঁধি,
 নবীন কুসুম পাশে রচি দাও নবীন মিলন-বাঁধন ।
- অমর । (শান্তার প্রতি) মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে ।
 মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে ।
 কুহক লেখনী ছুটায় কুসুম তুলিছে ফুটায়,
 লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরন-ছটাতে ।
- হেরো যেন পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্রামল-বরনী,
 যৌবন-প্রবাহ ছুটিছে কালের শাসন টুটাতে ;
 পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
 নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে ।
- স্ত্রীগণ । আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে,
 মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মুরতি ।
- পুরুষগণ । ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
 নিকুঞ্জ প্রাবিত চন্দ্রকরে ;
- স্ত্রীগণ । তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মুরতি ।
 আনো আনো ফুলমালা, দাও দৌহে বাঁধিয়ে ।
- পুরুষগণ । হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন ।
- স্ত্রীগণ । চিরদিন হেরিব হে
 মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মুরতি ।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

- অমর । এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়ী !
 এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

শান্তা । (প্রমদার প্রতি) আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে,
 আধ-নিমীলিত নলিন-নয়নে,
 যেন আপনারি হৃদয়-শয়নে
 আপনি রয়েছ লীন ।

পুরুষগণ । তোমা তরে সবে রয়েছে চাহিয়া,
 তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
 ভিখারি সমীর কানন বাহিয়া
 কিরিতেছে সারা দিন ।

অমর । এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
 এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

শান্তা । যেন শরতের মেঘখানি ভেসে,
 চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছ এসে,
 এখনি মিলাবে স্নান হাসি হেসে,
 কাঁদিয়া পড়িবে বরি ।

পুরুষগণ । জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
 কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
 হাসিটি কখন ফুটিবে অধরে
 রয়েছি তিয়াষ ধরি ।

অমর । এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
 এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

সখীগণ । আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
 এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়,
 সখীর হৃদয় কুসুম-কোমল—
 কার অনাদরে আজি বারে যায় ।
 কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
 কাছে যে আসিত সে তো আসিতে না চায় ।
 সুখে আছে যারা, সুখে থাক্ তারা,
 সুখের বসন্ত সুখে হোক সারা,
 দুখিনী নারীর নয়নের নীর

মায়ার খেলা

২৫৫

সুখী জনে যেন দেখিতে না পায় ।

তারা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বোঝে না,
তারা ফিরেও না চায় ।

শান্তা । আমি তো বুঝেছি সব, যে বোঝে না বোঝে,
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোজে ।

আপনি বিরহ গড়ি, আপনি রয়েছ পড়ি,
বাসনা কাঁদিছে বসি হৃদয়-সরোজে ।

আমি কেন মাঝে থেকে, দু-জনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে ।

অশোক । (প্রমদার প্রতি) এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে,
ভালো যারে বাস তারে আনিব ফিরে ।

হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা,
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ন-নীরে ।

শান্তা ও স্ত্রীগণ । চাঁদ, হাসো, হাসো ।
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে ।

পুরুষ । কত দুখে কত দুঃখে, আঁধার সাগর ঘুরে,
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে ।
মিলন দেখিবে বলে, ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারি ধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে ।

সকলে । চাঁদ, হাসো, হাসো ।
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে ।

প্রমদা । আর কেন, আর কেন,
দলিত কুসুমের বহে বসন্ত-সমীরণ ।
ফুরিয়ে গিয়াছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জলে অকারণ ।

সখীগণ । অশ্রু যবে ফুরিয়েছে তখন মুছাতে এলে,
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে ।

প্রমদা । এই লও, এই ধরো, এ মালা তোমরা পরো,
এ খেলা তোমরা খেলো, সুখে থাকো অম্লক্ষণ ।

অমর । এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়ন-জলে,

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এ মলিন মালা কে লইবে ।
 গ্লান আলো গ্লান আশা হৃদয়-তলে,
 এ চির বিষাদ কে বহিবে ।
 স্মৃতিশিখা অবসান, গেছে হাসি গেছে গান,
 এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে
 নীরব নিরাশা কে সহিবে ।

শান্তা । যদি কেহ নাহি চায়, আমি লইব,
 তোমার সকল দুখ আমি সহিব ।
 আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জন,
 তোমার হৃদয়-ভার আমি বহিব ।
 ভুল-ভাঙা দিবালোকে, চাহিব তোমার চোখে,
 প্রশান্ত স্মৃতির কথা আমি कहিব ।

[অমর ও শান্তার প্রস্থান]

মায়াকুমারীগণ । দুখের মিলন টুটিবার নয় ।
 নাহি আর ভয় নাহি সংশয় ।
 নয়ন-সলিলে যে হাসি ফুটে গো,
 রয় তাহা রয় চিরদিন রয় ।

প্রমদা । কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে ।
 কেন সংসারেতে উঁকি মেয়ে চলে গেলি নে ।

সখীগণ । সংসার কঠিন বড়ো কারেও সে ডাকে না,
 কারেও সে ধরে রাখে না ।
 যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
 কারো তরে ফিরেও না চায় ।

প্রমদা । হায় হায়, এ সংসারে যদি না পুরিল
 আজন্মের প্রাণের বাঁসনা,
 চলে যাও গ্লান মুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
 থেকে যেতে কেহ বলিবে না ।
 তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
 আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না ।

[প্রস্থান]

1. S. Oms
February 1880

द्वितीय अंक -

क्रीडाकानन ! नमिनी उम्रि। नमः ॥

नमिनी - अम्ब; अमर-चिह्न, विमान, माला
अथवा गान्धर्व मलय नः।

मरु! मरुत, नमि उ मरुती मरुत,
मरु! विचित्र नमि मरुत;
नमि! विचित्र नमि मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
अथवा मरुत मरुत नः।

मरुत - मरुती, मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत

First issue
of series

मरुत - मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत
मरुत मरुत मरुत मरुत

মায়ার খেলা

২৫৭

মায়াকুমারীগণ

সকলে । এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,

প্রথমা । শুধু সুখ চলে যায় ।

দ্বিতীয়া । এমনি মায়ার ছলনা ।

তৃতীয়া । এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায় ।

সকলে । তাই কেঁদে কাঁটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,

তাঁই মান অভিমান,

প্রথমা । তাই এত হায় হায় ।

দ্বিতীয়া । প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায় ।

সকলে । সখী চলো, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল,

মিছে আর কেন বল ।

প্রথমা । শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অন্তাচল ।

সকলে । সখী চলো ।

প্রথমা । প্রেমের কাহিনী গান, হয়ে গেল অবসান ।

দ্বিতীয়া । এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল ।

রাজা ও রানী

विष्णु चरित



উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়দাদা মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে

এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হইল



সূচনা

একদিন বড়ো আকারে দেখা দিল একটি নাটক—রাজা ও রানী। এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ঐ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শৌচনীয়রূপে অসংগত। এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখা দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হয়েছে দুর্দান্ত হিংস্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী।

প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্ভূত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,

শুধু সুখ চলে যায়

এমনি মায়া'র ছলনা ॥

নাটকের পাত্রগণ

বিক্রমদেব	জালন্ধরের রাজা
দেবদত্ত	রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ
ত্রিবেদী	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
জয়সেন, যুধাজিৎ	রাজ্যের প্রধান নায়ক
মিহিরগুপ্ত	জয়সেনের অমাত্য
চন্দ্রসেন	কাশ্মীরের রাজা
কুমার	কাশ্মীরের যুবরাজ । চন্দ্রসেনের ভ্রাতৃপুত্র
শংকর	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য
অমররাজ	ত্রিচূড়ের রাজা
অমিত্রা	জালন্ধরের মহিষী । কুমারের ভগিনী
নারায়ণী	দেবদত্তের স্ত্রী
রেবতী	চন্দ্রসেনের মহিষী
ইলা	অমরর কন্যা । কুমারের সহিত বিবাহপাশে বদ্ধ



রাজা ও রানী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর

প্রাসাদের এক কক্ষ

বিক্রমদেব ও দেবদত্ত

দেবদত্ত । মহারাজ, এ কী উপদ্রব !

বিক্রমদেব । হয়েছে কী !

দেবদত্ত । আমাকে বরিবে নাকি পুরোহিত-পদে ?
কী দোষ করেছি প্রভো ? কবে শুনিয়াছ
ত্রিষ্টুভ অল্পষ্টুভ এই পাপমুখে ?
তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজ্ঞবিধি । আমি পুরোহিত ?
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিশ্বতির জলে ।
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি,
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে ।
স্বন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা
তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলশ ।

বিক্রমদেব । তাই তো নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমাতে
পৌরোহিত্য-ভার । শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোনো ব্রহ্মণ্য-বালাই ।

২৬২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দেবদত্ত ।

তুমি চাও

নখদন্তভাঙা এক পোষা পুরোহিত ।

বিক্রমদেব ।

পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন ।

একে তো আহাৰ করে রাজস্বন্ধে চেপে

সুখে বারো মাস, তার পরে দিনরাত

অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিবেদ, বিধান,

অনুযোগ—অনুস্বর-বিসর্গের ঘট—

দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্বাদ ।

দেবদত্ত ।

শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি,

আছেন ত্রিবেদী ; অতিশয় সাধুলোক ;

সর্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে

ক্রিয়াকর্ম নিয়ে ; শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে

লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্মজ্ঞান ।

বিক্রমদেব ।

অতি ভয়ানক । সখা, শাস্ত্র-নাই যার

শাস্ত্রের উপদ্রব তার চতুর্গুণ ।

নাই যার বেদবিত্তা, ব্যাকরণ-বিদ্যি,

নাই তার বাধাবিঘ্ন,—শুধু বুলি ছোট্টে

পশ্চাতে কেলিয়া রেখে তদ্বিত প্রত্যয়

অমর পাণিনি । একসঙ্গে নাহি সয়

রাজা আর ব্যাকরণ দৌহারে পীড়ন ।

দেবদত্ত ।

আমি পুরোহিত ? মহারাজ, এ সংবাদে

ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন

যতেক চিক্ণ মাথা ; অমঙ্গল স্মরি

রাজ্যের টিকি যত হবে কটকিত ।

বিক্রমদেব ।

কেন অমঙ্গলশঙ্কা ?

দেবদত্ত ।

কর্মকাণ্ডহীন

এ দীন বিপ্রে'র দোষে কুলদেবতার

রোষ-হতাশন—

বিক্রমদেব ।

রেখে দাও বিভীষিকা ।

কুলদেবতার রোষ নতশির পাতি

রাজা ও রানী

২৬৩

সহিতে প্রস্তুত আছি ;—সহে না কেবল
কুলপুরোহিত-আক্ষালন । জান সখা,
দীপ্ত স্বর্ষ সহ হয় তপ্ত বালি চেয়ে ।
দূর করো মিছে তর্ক যত । এস করি
কাব্য-আলোচনা । কাল বলেছিলে তুমি
পুরাতন কবি-বাক্য—“নাহিকো বিশ্বাস
রমণীরে”—আর বার বলো শুনি ।

দেবদত্ত ।

“শাস্ত্রঃ—”

বিক্রমদেব । রক্ষা করো—ছেড়ে দাও অলুস্বরঙুলো ।

দেবদত্ত । অলুস্বর ধনুঃশর নহে, মহারাজ,
কেবল টংকারমাত্র । হে বীরপুরুষ,
ভয় নাই । ভালো, আমি ভাষায় বলিব ।
“যত চিন্তা কর শাস্ত্র চিন্তা আরো বাড়ে,
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে ।
কোলে থাকিলেও নারী রেখে সাবধানে,
শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে ।”

বিক্রমদেব । বশ নাহি মানে ! দিক স্পর্ধা কবি তব !
চাহে কে করিতে বশ ? বিদ্রোহী সে জন ।
বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী ।

দেবদত্ত । তা বটে । পুরুষ রবে রমণীর বশে ।

বিক্রমদেব । রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে ?
বিধির বিধান সম অস্ত্রেয়—তা বলে
অবিশ্বাস জন্মে যদি বিধির বিধানে,
রমণীর প্রেমে.—আশ্রয় কোথায় পাবে ?
নদী ধায়, বায়ু বহে কেমনে কে জানে ।
সেই নদী দেশের কল্যাণ-প্রবাহিণী,
সেই বায়ু জীবের জীবন ।

দেবদত্ত । বন্থা আনে

সেই নদী ; সেই বায়ু বন্থা নিয়ে আসে ।

বিক্রমদেব । প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়, লই শিরে তুলি ;

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তাই বলে কোন্ মূৰ্খ চাহে তাহাদের
বশ করিবারে। বন্ধ নদী, বন্ধ রায়
রোগ-শোক-মৃত্যুর নিদান। হে ব্রাহ্মণ,
নারীর কী জান তুমি ?

দেবদত্ত।

কিছু না রাজন্।

ছলাম উজ্জল করে পিতৃমাতৃকুল
ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে। তিন সন্ধ্যা ছিল
আহ্নিক তর্পণ ;—শেষে তোমারি সংসর্গে
বিসর্জন করিয়াছি সকল দেবতা,
কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।
ভুলেছি মহিম্মন্তব—শিখেছি গাহিতে
নারীর মহিমা ; সে বিছাও পুঁথিগত
তার পরে মাঝে মাঝে চক্ষু রাঙাইলে
সে বিছাও ছুটে যায় স্বপ্নের মতন !

বিক্রমদেব। না না ভয় নাই সখা, যৌন রহিলাম ;
তোমার নূতন বিছা বলে যাও তুমি।

দেবদত্ত। শুন তবে—বলিছেন কবি ভট্টহরি,—
“নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল,
অধরে পিয়ায় সুখা, চিন্তে জ্বালে দাবানল।”

বিক্রমদেব। সেই পুরাতন কথা !

দেবদত্ত।

সত্য পুরাতন।

কী করিব মহারাজ, যত পুঁথি খুলি
ওই এক কথা। যত প্রাচীন পণ্ডিত
প্রায়সীরে ঘরে নিয়ে এক দণ্ড কভু
ছিল না স্তম্ভির। আমি শুধু ভাবি, যার
ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে পরের সন্ধানে,
সে কেমনে কাব্য লেখে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
পরম নিশ্চিন্ত মনে ?

বিক্রমদেব।

মিথ্যা অবিশ্বাস !

ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা।

রাজা ও রানী

২৬৫

ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসে
 হয়ে আসে মৃত জড়বৎ—তাই তারে
 জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।
 হেরো ওই আসিছেন মন্ত্রী, স্তূপাকার
 রাজ্যভার স্বন্ধে নিয়ে। পলায়ন করি।
 দেবদত্ত। রানীর রাজত্বে তুমি লও গে আশ্রয়!
 ধাও অন্তঃপুরে। অসম্পূর্ণ রাজকাৰ্য
 দুয়ার-বাহিরে পড়ে থাক; ক্ষীত হোক
 যত যায় দিন। তোমার দুয়ার ছাড়ি
 ক্রমে উঠিবে সে উর্ধ্বদিকে,—দেবতার
 বিচার-আসন পানে।

বিক্রমদেব। এ কি উপদেশ?
 দেবদত্ত। না রাজন্! প্রলাপ-বচন! যাও তুমি,
 কাল নষ্ট হয়!

[বিক্রমদেবের প্রস্থান]

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। ছিলেন না মহারাজ?
 দেবদত্ত। করেছেন অন্তর্ধান অন্তঃপুর পানে।
 মন্ত্রী। (বসিয়া পড়িয়া)
 হা বিধাতঃ, এ রাজ্যের কী দশা করিলে?
 কোথা রাজা, কোথা দণ্ড, কোথা সিংহাসন!
 শ্মশানভূমির মতো বিষন্ন বিশাল
 রাজ্যের বক্ষে 'পরে সগর্বে দাঁড়ায়ে
 বধির পাষণ্ড রুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর।
 রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে
 কাঁদে হাহাকার রবে।

দেবদত্ত। দেখে হাসি আসে।

রাজা করে পলায়ন—রাজ্য ধায় পিছে;
 হল ভালো মন্ত্রিবর, অহর্নিশি যেন
 রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা।

২৬৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মন্ত্রী ।

দেবদত্ত ।

এ কি হাসিবার কথা ব্রাহ্মণ ঠাকুর ?
না হাসিয়া করিব কী । অরণ্যে ক্রন্দন
সে তো বালকের কাজ । দিবস-রজনী
বিলাপ না হয় সহ্য তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মতো তুষার-কঠিন ।
কী ঘটেছে বলো শুনি ।

মন্ত্রী ।

জান তো সকলি ।

রানীর কুটুম্ব যত বিদেশী কান্দারী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে । রাজার প্রতাপ
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন যত সতীদেহ সম ।
বিদেশীর অত্যাচারে জজ্বর কাতর
কাঁদে প্রজা । অরাজক রাজসভামাঝে
মিলায় ক্রন্দন । বিদেশী অমাত্য যত
বসে বসে হাসে । শূন্য সিংহাসন-পার্শ্বে
বিদীর্ণ-হৃদয় মন্ত্রী বসি নতশিরে ।

দেবদত্ত ।

বহে ঝড়, ভোবে তরী, কাঁদে যাত্রী যত,
ব্রিজহস্ত কর্ণধার উচ্ছে একা বসি
বলে 'কর্ণ কোথা গেল ।' মিছে খুঁজে মর,
রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণখানা,
বাহিছে প্রেমের তরী লীলা-সরোবরে
বসন্ত-পবনে । রাজ্যের বোঝাই নিয়ে
মন্ত্রীটা মরুক ডুবে অকুল পাথারে ।

মন্ত্রী ।

হেসো না ঠাকুর । ছি ছি, শোকের সময়ে
হাসি অকল্যাণ ।

দেবদত্ত ।

আমি বলি মন্ত্রিবর,
রাজ্যে ডিঙায়ে, একেবারে পড়ো গিয়ে
রানীর চরণে ।

মন্ত্রী ।

আমি পারিব না তাহা ।

রাজা ও রানী

২৬৭

আপন আত্মীয়-জনে করিবে বিচার
 রমণী, এমন কথা শুনি নাই কভু।
 দেবদত্ত। শুধু শাস্ত্র জ্ঞান মন্ত্রী, চেন না মানুষ।
 বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
 দণ্ড দিতে পারে নারী ; পারে না সহিতে
 পরের বিচার।

মন্ত্রী। ওই শোনো কোলাহল।
 দেবদত্ত। এ কি প্রজার বিদ্রোহ ?
 মন্ত্রী। চলো দেখে আসি।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

লোকারণ্য

কিছু নাপিত। ওরে ভাই কান্নার দিন নয়। অনেক কৈঁদেছি তাতে কিছু
 হল কি ?

মনস্থ চাষা। ঠিক বলেছিস রে, সাহসে সব কাজ হয়,—ওই যে কথায় বলে
 “আছে যার বুকের পাটা, যমরাজকে সে দেখায় বাঁটা।”

হুঞ্জরলাল কামার। ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুট করব।

কিছু নাপিত। ভিক্ষেং নৈম নৈমচং। কী বল খুড়ো, তুমি তো স্মার্ত ব্রাহ্মণের
 ছেলে, লুটপাটে দোষ আছে কি ?

নন্দলাল। কিছু না, থিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা। জানিস তো অগ্নিকে
 বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া তো আর অগ্নি নেই।

অনেকে। আগুন। তা ঠিক বলেছ। বেঁচে থাকো ঠাকুর। তবে তাই হবে।
 তা আমরা আগুনই লাগিয়ে দেব। ওরে আগুনে পাপ নেই রে। এবার ওঁদের
 বড়ো বড়ো ভিটেতে ঘুষু চরাব।

হুঞ্জর। আমার তিনটে সড়কি আছে।

২৬৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মনস্বখ । আমার একগাছা লালল আছে, এবার তাজপরা মাথাগুলো মাটির
ঢেলার মতো চষে ফেলব ।

শ্রীহর কলু । আমার একগাছ বড়ো কুড়ুল আছে, কিন্তু পালাবার সময় সেটা
বাড়িতে ফেলে এসেছি ।

হরিদীন কুমোর । ওরে তোরা মরতে বসেছিস না কি ? বলিস কী রে । আগে
রাজাকে জানা, তার পরে যদি না শোনে, তখন অন্ত পরামর্শ হবে ।

কিছু নাপিত । আমিও তো সেই কথা বলি ।

কুঞ্জর । আমিও তো তাই ঠাওরাচ্ছি ।

শ্রীহর । আমি বরাবর বলে আসছি, ঐ কায়স্থর পোকে বলতে দাও । আচ্ছা,
দাদা, তুমি রাজাকে ভয় করবে না ?

মন্নরাম কায়স্থ । ভয় আমি কাউকে করি নে । তোরা লুট করতে যাচ্ছিস,
আর আমি দুটো কথা বলতে পারি নে ?

মনস্বখ । দাঙ্গা করা এক, আর কথা বলা এক । এই তো বরাবর দেখে আসছি,
হাত চলে, কিন্তু মুখ চলে না ।

কিছু । মুখের কোনো কাজটাই হয় না—অন্নও জোটে না, কথাও ফোটে না ।

কুঞ্জর । আচ্ছা, তুমি কী বলবে বলো ।

মন্নরাম । আমি ভয় করে বলব না ; আমি প্রথমেই শাস্ত্র বলব ।

শ্রীহর । বল কী ? তোমার শাস্ত্রর জানা আছে ? আমি তো তাই গোড়াগুড়ি
বলছিলুম কায়স্থর পোকে বলতে দাও—ও জানে শোনে ।

মন্নরাম । আমি প্রথমেই বলব—

অতিদর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কৌরবাস :

অতিদানে বলির্বন্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্ ।

হরিদীন । হাঁ, এ শাস্ত্র বটে ।

কিছু । (ব্রাহ্মণের প্রতি) কেমন খুড়ো, তুমি তো ব্রাহ্মণের ছেলে, এ শাস্ত্র কি
না ? তুমি তো এ সমস্তই বোঝ ।

নন্দ । হাঁ—তা—ইয়ে—ওর নাম কী—তা বুঝি বই কি । কিন্তু রাজা যদি না
বোঝে, তুমি কী করে বুঝিয়ে দেবে, বলো তো শুনি ।

মন্নরাম । অর্থাৎ বাড়াবাড়িটে কিছু নয় ।

জওহর তাঁতি । ওই অতবড়ো কথাটার এইটুকু মানে হল ?

শ্রীহর । তা না হলে আর শাস্ত্রর কিসের ।

রাজা ও রানী

২৬৯

নন্দ। চাষাভুষ্যের মুখে যে-কথাটা ছোট, বড়োলোকের মুখে সেইটেই কত বড়ো শোনার।

মনসুখ। কিন্তু কথাটা ভালো, “বাড়াবাড়ি কিছু নয়” শুনে রাজার চোখ ফুটেবে।

জওহর। কিন্তু ওই একটাতে হবে না, আরও শাস্তর চাই।

মন্নুরাম। তা আমার পুঁজি আছে, আমি বলব—

“লালনে বহবো দোষান্তাড়নে বহবো গুণাঃ

তন্মাং মিত্রঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েৎ ন তু লালয়েৎ।”

তা আমরা কি পুত্র নই? হে মহারাজ, আমাদের তাড়না করবে না—ওইটে ভালো নয়।

হরিদীন। এ ভালো কথা, মস্ত কথা, ওই যে কী বললে, ও কথাগুলো শোনাচ্ছে ভালো।

শ্রীহর। কিন্তু কেবল শাস্তর বললে তো চলবে না—আমার ঘানির কথাটা কখন আসবে? অমনি ওই সঙ্গে জুড়ে দিলে হয় না?

নন্দ। বেটা তুমি ঘানির সঙ্গে শাস্তর জুড়বে? এ কি তোমার গোন্ধ পেয়েছ?

জওহর। কলুর ছেলে, ওর আর কত বুদ্ধি হবে?

কুঞ্জর। হু যা না পিঠে পড়লে ওর শিক্ষা হবে না। কিন্তু আমার কথাটা কখন পাড়বে? মনে থাকবে তো? আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাজিলাল নয়—সে আমার ভাইপো, সে বুধকোটে থাকে—সে যখন সবে তিন বছর তখন তাকে—

হরিদীন। সব বুঝলুম, কিন্তু যে-রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে।

কুঞ্জর। তখন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অন্তর ধরব।

কিহু। শাবাশ বলেছ, শাস্তর ছেড়ে অন্তর।

মনসুখ। কে বললে হে? কথাটা কে বললে?

কুঞ্জর। (সগর্বে) আমি বলেছি। আমার নাম কুঞ্জরলাল, কাজিলাল আমার ভাইপো।

কিহু। তা ঠিক বলেছ ভাই—শাস্তর আর অন্তর—কখনো শাস্তর কখনো অন্তর—আবার কখনো অন্তর কখনো শাস্তর।

জওহর। কিন্তু বড়ো গোলমাল হচ্ছে। কথাটা কী যে স্থির হল বুঝতে পারছি নে। শাস্তর না অন্তর?

শ্রীহর। বেটা তাঁতি কি না, এইটে আর বুঝতে পারলি নে? তবে এতক্ষণ ধরে কথাটা হল কী? স্থির হল যে শাস্ত্রের মহিমা বুঝতে ঢের দেবি হয়, কিন্তু, অন্তরের মহিমা খুব চটপট বোঝা যায়।

অনেকে। (উচ্চস্বরে) তবে শাস্ত্র চুলোয় যাক—অন্তর ধরো।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত। বেশি ব্যস্ত হবার দরকার করে না; চুলোতেই যাবে শিগগির, তার আয়োজন হচ্ছে। বেটা তোরা কী বলছিলি রে?

শ্রীহর। আমরা ওই ভদ্রলোকের ছেলেটির কাছে শাস্ত্র গুনছিলুম ঠাকুর।

দেবদত্ত। এমনি মন দিয়েই শাস্ত্র শোনে বটে। চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তাল ধরিয়ে দিলে। যেন ধোবাপাড়ায় আগুন লেগেছে।

কিছু। তোমার কী ঠাকুর। তুমি তো রাজবাড়ির সিঁথে খেয়ে খেয়ে ফুলছ—আমাদের পেটে নাড়ীগুলো জলে জলে ম'ল—আমরা কি বড়ো সুখে চৈঁচাচ্ছি।

মনসুখ। আজকালের দিনে আস্তে বললে শোনে কে? এখন চৈঁচিয়ে কথা কইতে হয়।

কুঞ্জর। কান্নাকাটি ঢের হয়েছে, এখন দেখছি অন্য উপায় আছে কি না।

দেবদত্ত। কী বলিস রে। তোদের বড়ো আত্মপার্থা হয়েছে। তবে গুনবি? তবে বলব?

“ন সমানসমানসমানসমাগম্যাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।

ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ।”

হরিন্দীন। ও বাবা, শাপ দিচ্ছে নাকি?

দেবদত্ত। (মন্থুর প্রতি) তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে, তুমি তো শাস্ত্র বোঝ—কেমন, এ ঠিক কথা কি না? “নস মানস মানস মানসং।”

মন্থুরাম। আহা ঠিক। শাস্ত্র যদি চাও তো এই বটে। তা আমিও তো ঠিক ওই কথাটাই বোঝাচ্ছিলুম।

দেবদত্ত। (নন্দের প্রতি) নমস্কার। তুমি তো ব্রাহ্মণ দেখছি। কী বল ঠাকুর, পরিণামে এই সব মুর্থরা “ভ্রমদভ্রমদভ্রমদং” হয়ে মরবে না?

নন্দ। বরাবর তাই বলছি, কিন্তু বোঝে কে? ছোটলোক কিনা।

দেবদত্ত। (মন্থুকের প্রতি) তোমাকে এর মধ্যে বুদ্ধিমানের মতো দেখাচ্ছে আচ্ছা তুমি বলো দেখি, কথাগুলো কি ভালো হচ্ছিল? (কুঞ্জরের প্রতি) আর তোমাকেও তো বেশ ভালোমাত্র দেখছি হে, তোমার নাম কী?

রাজা ও রানী

২৭১

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল—কাজিলাল আমার ভাইপোর নাম।

দেবদত্ত। ও—তোমারই ভাইপোর নাম কাজিলাল বটে? তা আমি রাজার কাছে বিশেষ করে তোমাদের নাম করব।

হরিদীন। আর আমাদের কী হবে?

দেবদত্ত। তা আমি বলতে পারি নে বাপু। এখন তো তোরা কান্না ধরেছিস—এই একটু আগে আর-এক স্তর বের করেছিলি। সে-কথাগুলো কি রাজা শোনে নি? রাজা সব শুনতে পায়।

অনেকে। দোহাই ঠাকুর, আমরা কিছু বলি নি, ওই কাজিলাল না মাঞ্জিলাল অন্তরের কথা পেড়েছিল।

কুঞ্জর। চূপ কর। আমার নাম খারাপ করিস নে। আমার নাম কুঞ্জরলাল, তা মিছে কথা বলব না—আমি বলছিলুম, “যেমন শাস্ত্র আছে, তেমনি অন্তরও আছে,—রাজা যদি শাস্ত্রের দোহাই না মানে, তখন অন্তর আছে।” কেমন বলেছি ঠাকুর?

দেবদত্ত। ঠিক বলেছ—তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। অন্তর কী? না, বল। তা তোমাদের বল কী? না, “দুর্বলস্ত বলং রাজা।”—কি না, রাজাই দুর্বলের বল। আবার “বালানাং রোদনং বলং”—রাজার কাছে তোমরা বালক বই নও। অতএব এখানে কান্নাই তোমাদের অন্তর। অতএব শাস্ত্র যদি না খাটে তো তোমাদের অন্তর আছে কান্না। বড়ো বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ—প্রথমে আমাকেই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। তোমার নামটা মনে রাখতে হবে। কী হে তোমার নাম কী।

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাজিলাল আমার ভাইপো।

অন্ত সকলে। ঠাকুর, আমাদের মাপ করো, ঠাকুর মাপ করো—

দেবদত্ত। আমি মাপ করবার কে? তবে দেখো কান্নাকাটি করে দেখো, রাজা যদি মাপ করে।

[প্রস্থান

অন্তঃপুর

প্রমোদ-কানন

বিক্রমদেব ও সুমিত্রা

ସୁମିତ୍ରା ।

নিতাস্ত তোমারি আমি

সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহকাজে—জেনো নাথ, তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ।

বিক্রমদেব ।

ଥାକୁ ଗୃହ, ଗୃହକାଞ୍ଚ ।

সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি ;
 অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই—
 বাহিরে কাঁদুক পড়ে বাহিরের কাজ ।

ସୁମିତ୍ରା ।

কেবল অন্তরে তব ? নহে, নাথ, নহে ;
রাজন, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে ।
অন্তরে প্রেয়সী তব বাহিরে মহিষী ।

রাজা ও রানী

২৭৩

বিক্রমদেব ।

হায়, প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হয়
 সে স্নেহের দিন ? সেই প্রথম মিলন—
 প্রথম প্রেমের ছটা ; দেখিতে দেখিতে
 সমস্ত হৃদয়ে দেহে যৌবন-বিকাশ ;
 সেই নিশি-সমাগমে হুরুহুরু হিরা ;—
 নয়ন-পল্লবে লজ্জা, ফুলদলপ্রান্তে
 শিশির-বিন্দুর মতো ; অথরের হাসি
 নিমেষে আগিয়া ওঠে, নিমেষে মিলায়,
 সন্ধ্যার বাতাস লেগে কাতর কল্পিত
 দীপশিখাসম ; নয়নে নয়নে হয়ে
 ফিরে আসে আঁখি ; বেধে যায় হৃদয়ের
 কথা ; হাসে চাঁদ কোঁতুকে আকাশে ; চাহে
 নিশীথের তারা, লুকায়ে জানালা পাশে ;
 সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল,
 সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন ;
 তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদয় ।
 কোথা ছিল গৃহকাজ । কোথা ছিল, প্রিয়ে,
 সংসার-ভাবনা ।

সুমিত্রা ।

তখন ছিলাম শুধু
 ছোট ছোট বালক বালিকা ; আজি মোরা
 রাজা রানী ।

বিক্রমদেব ।

রাজা রানী । কে রাজা ? কে রানী ?
 নহি আমি রাজা । শূন্য সিংহাসন কান্দে ।
 জীর্ণ রাজকাঁর্বরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
 তোমার চরণতলে ধুলির মাঝারে ।

সুমিত্রা ।

শুনিয়া লজ্জায় মরি । ছি ছি মহারাজ,
 এ কি ভালোবাসা ? এ যে মেঘের মতন
 রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন-আকাশে
 উজ্জল প্রতাপ তব । শোনো প্রিয়তম,
 আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,

তুমি স্বামী—আমি শুধু অল্পগত ছায়া,
তার বেশি নই ;—আমারে দিয়ো না লাজ,
আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে ।
বিক্রমদেব । চাহ না আমার প্রেম ?

সুমিত্রা । কিছু চাই নাথ ;

সব নহে । স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে ।

বিক্রমদেব । আজো রমণীর মন নারিলু বৃথিতে ।

সুমিত্রা । তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার 'পরে
স্বতন্ত্র উন্নত ; তবে তো আশ্রয় পাব
আমরা লতার মতো তোমাদের শাথে ।
তোমরা সকল মন দিয়ে ফেল যদি
কে রহিবে আমাদের ভালোবাসা নিতে,
কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার ?
তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন ; কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত ;
সহস্র পাখির গৃহ, পাখের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয় ।

বিক্রমদেব । কথা দূর করো প্রিয়ে ; হেরো সন্ধ্যাবেলা
মৌন-প্রেমসুখে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়,
নীরব কাকলি ! তবে মোরা কেন দৌহে
কথার উপরে কথা করি বরিষন ?
অধর অধরে বসি প্রহরীর মতো
চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিরা ।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী । এখনি দর্শনপ্রার্থী মন্ত্রী মহাশয়,
গুরুতর রাজকার্য, বিলম্ব সহে না ।

রাজা ও রানী

২৭৫

বিক্রমদেব । ধিক্ তুমি । ধিক্ মন্ত্রী । ধিক্ রাজকার্য ।
রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে ।

[কঙ্কুর প্রস্থান

সুমিত্রা । যাও, নাথ, যাও ।

বিক্রমদেব ।

বার বার এক কথা ।

নির্মম, নিষ্ঠুর । কাজ, কাজ, যাও যাও ।
যেতে কি পারি নে আমি ? কে চাহে থাকিতে ?
সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার
সম্বন্ধে ওজন-করা বিন্দু বিন্দু কৃপা ?
এখনি চলিছ ।

অরি হৃদিলগ্না লতা,
ক্ষমো মোরে, ক্ষমো অপরাধ ; মোছো আঁখি,
গ্লান মুখে হাসি আনো, অথবা জ্রুটি ;
দাও শান্তি, করো তিরস্কার ।

সুমিত্রা ।

মহারাজ,

এখন সময় নয়,—আসিয়ো না কাছে ;
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে ।

বিক্রমদেব ।

হায় নারী, কী কঠিন হৃদয় তোমার !
কোনো কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব ।
খাত্তপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য চলিছে অবাদে ; এ কেবল
সামান্য কী বিষ নিরে, তুচ্ছ কথা তুলে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যের অতি সাবধান ।

সুমিত্রা ।

ওই শোনো ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আহ্বান । ওরে বৎস, মাতৃহীন
নস তোরা কেহ, আমি আছি—আমি আছি
আমি এ রাজ্যের রানী, জননী তোদের ।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুরের কক্ষ

সুমিত্রা

সুমিত্রা । এখনো এল না কেন ? কোথায় ব্রাহ্মণ ?
ওই ক্রমে বেড়ে ওঠে ক্রন্দনের ধ্বনি ।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত । জয় হোক ।

সুমিত্রা । ঠাকুর, কিসের কোলাহল ?

দেবদত্ত । শোন কেন মাতঃ । গুনিলেই কোলাহল ।
সুখে থাকো, রুদ্ধ করো কান । অন্তঃপুরে,
সেখাও কি পশে কোলাহল ? শাস্তি নেই
সেখানেও ? বল তো এখনি সৈন্ত লয়ে
তাড়া করে নিরে যাই পথ হতে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল ।

সুমিত্রা । বলো শীঘ্র কী হয়েছে ।

দেবদত্ত । কিছু না, কিছু না ।

গুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা ।
অভদ্র অসভ্য যত বর্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায় । রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাতিয়া যত ।

সুমিত্রা । আহা কে ক্ষুধিত ?

দেবদত্ত । অভাগ্যের দুর্দৃষ্ট । দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য ।

রাজা ও রানী

২৭৭

সুমিত্রা ।

হে ঠাকুর, এ কী শুনি ।

ধান্তপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কীদে
অনাহারে ?

দেবদত্ত ।

ধান্ত তার বসুন্ধরা যার ।

দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা । এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুকুরের মতো লোলজিহ্ব
একপাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কতু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো । বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে তো কীদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে ।

সুমিত্রা ।

কী বলিলে,

রাজা কি নির্দয় তবে ? দেশ অরাজক ?

দেবদত্ত ।

অরাজক কে বলিবে । সহস্ররাজক ।

সুমিত্রা ।

রাজকার্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি ?

দেবদত্ত ।

দৃষ্টি নাই ? সে কী কথা । বিলক্ষণ আছে ।

গৃহপতি নিজাগত, তা বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই ? সে যে শনিদৃষ্টি ।

তাদের কী দোষ ? এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্বাদ করিবারে দুই হাত ভুলে ?

সুমিত্রা ।

বিদেশী ? কে তারা ? তবে আমার আত্মীয় ?

দেবদত্ত ।

রানীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমি ।

সুমিত্রা ।

জয়সেন ?

দেবদত্ত ।

ব্যস্ত তিনি প্রজা-সুশাসনে ।

প্রাণ শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে

যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি

সব গেছে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম ।

সুমিত্রা ।

শিলাদিত্য ?

দেবদত্ত ।

তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি ।

২৭৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্বন্ধে করেন বহন ।

সুমিত্রা ।

যুধাজিৎ ?

দেবদত্ত ।

নিতান্তই ভদ্রলোক, অতি মিষ্টভাবী ।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
বাপু বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে ;
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি ।

সুমিত্রা ।

এ কী লজ্জা । এ কী পাপ । আমার আত্মীয় ।
পিতৃকুল-অপযশ । ছি ছি এ কলঙ্ক
করিব মোচন । তিলেক বিলম্ব নহে ।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

দেবদত্তের গৃহ

নারায়ণী গৃহকার্ষে নিযুক্ত

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত । প্রিয়ে, বলি ঘরে কিছু আছে কি ?

নারায়ণী । তোমার থাকার মধ্যে আছি আমি । তাও না থাকলেই আপন
চোকে ।

দেবদত্ত । ও আবার কী কথা ।

নারায়ণী । তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুক জুটিয়ে আন,
ঘরে খুদকুঁড়ো আর বাকি রইল না । খেটে খেটে আমার শরীরও আর থাকে না ।

দেবদত্ত । আমি সাথে আনি ? হাতে কাজ থাকলে তুমি থাক ভালো, সুতরাং
আমিও ভালো থাকি । আর কিছু না হোক তোমার ওই মুখখানি বন্ধ থাকে ।

নারায়ণী । বটে ? তা আমি এই চূপ করলুম । আমার কথা যে তোমার
অসহ্য হয়ে উঠেছে তা কে জানত । তা কে বলে আমার কথা শুনতে—

রাজা ও রানী

২৭৯

দেবদত্ত। তুমিই বল, আবার কে বলবে? এক কথা না শুনলে দশ কথা
শুনিয়ে দাও।

নারায়ণী। বটে। আমি দশ কথা শোনাই? তা আমি এই চূপ করলুম।
আমি একেবারে থামলেই তুমি বাঁচ। এখন কি আর সেদিন আছে—সেদিন
গেছে। এখন আবার নতুন মুখের নতুন কথা শুনতে সাধ গিয়েছে—এখন আমার
কথা পুরোনো হয়ে গেছে।

দেবদত্ত। বাপ রে। আবার নতুন মুখের নতুন কথা। শুনলে আতঙ্ক হয়।
তবু পুরোনো কথাগুলো অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে।

নারায়ণী। আচ্ছা বেশ। এতই জ্বালাতন হয়ে থাক তো আমি এই চূপ
করলুম। আমি আর একটি কথাও কব না। আগে বললেই হত—আমি তো
জানতুম না। জানলে কে.তোমাকে—

দেবদত্ত। আগে বলি নি? কত বার বলেছি। কই, কিছু হল না তো।

নারায়ণী। বটে। তা বেশ, আজ থেকে তবে এই চূপ করলুম। তুমিও স্নেহ
থাকবে, আমিও স্নেহ থাকব। আমি সাথে বকি? তোমার রকম দেখে—

দেবদত্ত। এই বুঝি তোমার চূপ করা।

নারায়ণী। আচ্ছা। [বিমুখ

দেবদত্ত। প্রিয়ে! প্রেয়সী! মধুরভাষিনী! কোকিলগঞ্জিনী!

নারায়ণী। চূপ করো।

দেবদত্ত। রাগ করো না প্রিয়ে—কোকিলের মতো রং বলছি নে, কোকিলের
মতো পঞ্চমস্বর।

নারায়ণী। যাও যাও ব'কো না। কিন্তু তা বলছি, তুমি যদি আরো ভিখিরি
জুটিয়ে আন তাহলে হয় তাদের ঝোঁটিয়ে বিদেয় করব, নয় নিজে বনবাসিনী হয়ে
বেড়িয়ে যাব।

দেবদত্ত। তাহলে আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাব—এবং ভিক্ষুকগুলোও
যাবে।

নারায়ণী। মিছে না। টেকির স্বর্গেও স্নেহ নেই।

[নারায়ণীর প্রস্থান

ত্রিবেদীর মালা জপিতে জপিতে প্রবেশ

ত্রিবেদী। শিব শিব শিব। তুমি রাজপুরোহিত হয়েছ?

দেবদত্ত। তা হয়েছি। কিন্তু রাগ কেন ঠাকুর? কোনো দোষ ছিল না। মালিও
জপি নে, ভগবানের নামও করি নে। রাজার মরজি।

ত্রিবেদী। পিপীলিকার পক্ষচ্ছেদ হয়েছে। শ্রীহরি।

দেবদত্ত। আমার উপর রাগ করে শব্দশাস্ত্রের প্রতি উপদ্রব কেন? পক্ষচ্ছেদ
নয়, পক্ষোদ্বেদ।

ত্রিবেদী। তা ও একই কথা। ছেদও বা ভেদও তা। কথায় বলে ছেদভেদে।
হে ভবকাণ্ডারী। যা হোক তোমার ষতদূর বার্থক্য হবার তা হয়েছে।

দেবদত্ত। ব্রাহ্মণী সাক্ষী এখনো আমার যৌবন পেরোয় নি।

ত্রিবেদী। আমিও তাই বলছি। যৌবনের দর্পেই তোমার এতটা বার্থক্য হয়েছে।
তা তুমি মরবে। হরি হে দীনবন্ধু।

দেবদত্ত। ব্রাহ্মণবাক্য মিথ্যে হবে না—তা আমি মরব। কিন্তু সেজন্তে তোমার
বিশেষ আয়োজন করতে হবে না; স্বয়ং যম রয়েছে। ঠাকুর, তোমার চেয়ে আমার
সঙ্গে যে তাঁর বেশি কুটুম্বিতা তা নয়—সকলেরই প্রতি তাঁর সমান নজর।

ত্রিবেদী। তোমার সময় নিতান্ত এগিয়ে এসেছে। দয়াময় হরি।

দেবদত্ত। তা কী করে জানব? দেখেছি বটে আজকাল মরে ঢের লোক—কেউ
বা গলায় দড়ি দিয়ে মরে, কেউ বা গলায় কলসী বেঁধে মরে, আবার সর্পাঘাতেও মরে,
কিন্তু ব্রহ্মশাপে মরে না। ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরেছে শুনেছি কিন্তু ব্রাহ্মণের
কথায় কেউ মরে না। অতএব যদি শীঘ্র না মরে উঠতে পারি তো রাগ করো না
ঠাকুর—সে আমার দোষ নয়, সে কালের দোষ।

ত্রিবেদী। প্রণিপাত। শিব শিব শিব।

দেবদত্ত। আর কিছু প্রয়োজন আছে?

ত্রিবেদী। না। কেবল এই খবরটা দিতে এলুম। দয়াময়। তা তোমার
চালে যদি দু-একটা বেশি কুমড়ো ফলে থাকে তো দিতে পার—আমার দরকার
আছে।

দেবদত্ত। এনে দিচ্ছি।

[প্রবন্ধ]

রাজা ও রানী

২৮১

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুর

পুষ্পোত্তান

বিক্রমদেব ও রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য

বিক্রমদেব । শুনো না অলীক কথা, মিথ্যা অভিযোগ ;
 যুধাজিৎ, জয়সেন, উদয়ভাস্কর,
 সুরোগ্য সৃজন । একমাত্র অপরাধ
 বিদেশী তাহারা—তাই এ রাজ্যের মনে
 বিদ্বেষ-অনল উদ্দগারিছে কৃষ্ণ ধূম
 নিন্দা রাশি রাশি ।

অমাত্য । সহস্র প্রমাণ আছে,
 বিচার করিয়া দেখো ।

বিক্রমদেব । কী হবে প্রমাণ ?
 চলিছে বিশাল রাজ্য বিশ্বাসের বলে ;
 যার 'পরে রয়েছে যে ভার, সম্বতনে
 তাই সে পালিছে । প্রতিদিন তাহাদের
 বিচার করিতে হবে নিন্দাবাক্য শুনে,
 নহে ইহা রাজধর্ম । আর্থ, যাও ঘরে
 করিয়ো না বিশ্রামে ব্যাধাত ।

অমাত্য । পাঠায়েছে
 মন্ত্রী মোরে ; সাহুনেরে করিছে প্রার্থনা
 দর্শন তোমার, গুরু রাজকার্য তরে ।

বিক্রমদেব । চিরকাল আছে রাজ্য, আছে রাজকার্য ;
 স্নমধুর অবসর শুধু মাঝে মাঝে
 দেখা দেয়, অতি ভীক, অতি স্নকুমার ;
 ফুটে ওঠে পুষ্পটির মতো, টুটে যায়
 বেলা না ফুরাতে ; কে তারে ভাঙিতে চাহে

অকালে চিন্তার ভারে? বিশ্রামের জেনো
কর্তব্য কাজের অঙ্গ।

যাই মহারাজ । [প্রস্থান
অমাত্য ।

রানীর আত্মীয় অমাত্যের প্রবেশ

অমাত্য । বিচারের আজ্ঞা হোক ।

বিজ্ঞানদেব ।

কিসের বিচার ?

অমাত্য। শুনি নাকি, মহারাজ, নির্দোষীর নামে
মিথ্যা অভিযোগ—

বিক্রমদেব । সত্য হবে ! কিন্তু যতক্ষণ

বিশ্বাস রেখেছি আমি তোমাদের 'পরে
ততক্ষণ থাকো যৌন হয়ে। এ বিশ্বাস
ভাঙিবে যখন, তখন আপনি আমি
সত্য মিথ্যা করিব বিচার। যাও চলে।

[অমাত্যের প্রশ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

রাজা ও রানী

২৮৩

সুমিত্রার প্রবেশ

এসেছ পাষণী ! দয়া হয়েছে কি মনে ?
 হল সারা সংসারের যত কাজ ছিল ?
 মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
 সংসারের সব শেষে ? জান না কি, প্রিয়ে,
 সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর ।
 প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্তব্য ।
 হায়, ধিক মোরে । কেমনে বোঝাব, নাথ,
 তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে ।
 মহারাজ, অধীনার শোনো নিবেদন—
 এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি । প্রভু,
 পারি নে শুনিতে আর কাতর অভাগা
 সন্তানের করুণ ক্রন্দন । রক্ষা করো
 পীড়িত প্রজারে ।

বিজয়দেব । কী করিতে চাহ রানী ?

সুমিত্রা । আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন
 রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের ।

বিজয়দেব । কে তাহারা জান ?

সুমিত্রা । জানি ।

বিজয়দেব । তোমার আত্মীয় !

সুমিত্রা । নহে মহারাজ । আমার সন্তান চেয়ে
 নহে তারা অধিক আত্মীয় । এ রাজ্যের
 অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
 তারাই আমার আপনার । সিংহাসন
 রাজচ্ছত্রছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
 শিকার-সন্ধানে—তারা দস্যু, তারা চোর ।

বিজয়দেব । যুধাজিৎ, শিলাদিত্য, জয়সেন তারা ।

সুমিত্রা । এই দণ্ডে তাহাদের দাও দূর করে ।

বিজয়দেব । আরামে রয়েছে তারা, যুদ্ধ ছাড়া কভু
 নড়িবে না এক পদ ।

সুমিত্রা ।

তবে যুদ্ধ করো ।

বিক্রমদেব ।

যুদ্ধ করো ! হায় নারী, তুমি কি রমণী ?
 ভালো, যুদ্ধে যাব আমি । কিন্তু তার আগে
 তুমি মানো অধীনতা, তুমি দাও ধরা ;
 ধর্মধর্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ
 সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল ।
 তবেই ফুরাবে কাজ,—তৃপ্তমন হয়ে
 বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে ।
 অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতদিন তুমি
 তোমার অদৃষ্ট সম রব তব সাথে ।

সুমিত্রা । আশ্রয় করো মহারাজ, মহিষী হইয়া
 আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ ।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব ।

এমনি করেই মোরে করেছ বিকল ।
 আছ তুমি আপনার মহত্বশিখরে
 বসি একাকিনী ; আমি পাই নে তোমারে ।
 দিবানিশি চাহি তাই । তুমি যাও কাজে,
 আমি কিরি তোমারে চাহিয়া । হায় হায়,
 তোমার আমার কতু হবে কি মিলন ?

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত ।

জয় হোক মহারানী—কোথা মহারানী,
 একা তুমি মহারাজ ?

বিক্রমদেব ।

তুমি কেন হেথা ?

ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র অন্তঃপুরমাঝে ?
 কে দিয়েছে মহিষীরে রাজ্যের সংবাদ ?

দেবদত্ত ।

রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনি দিয়েছে ।
 উর্ধ্বস্বরে কেঁদে মরে রাজ্য উৎপীড়িত
 নিতান্ত প্রাণের দায়ে—সে কি ভাবে কতু
 পাছে তব বিশ্বাসের হয় কোনো ক্ষতি ?

রাজা ও রানী

২৮৫

ভয় নাই, মহারাজ, এসেছি কিষ্কিৎ
ভিক্ষা মাগিবার তরে রানীমার কাছে।
ব্রাহ্মণী বড়োই রক্ষ, গৃহে অন্ন নাই,
অথচ ক্ষুধার কিছু নাই অগ্রতুল।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব। সুখী হোক, সুখে থাক এ রাজ্যের সবে।
কেন দুঃখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্রন্দন ?
অত্যাচার, উৎপীড়ন, অত্যাচার বিচার,
কেন এ সকল ? কেন মানুষের 'পরে
মানুষের এত উপদ্রব ? দুর্বলের
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার 'পরে
সবলের এখনদৃষ্টি কেন ? যাই, দেখি,
যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায়।

সপ্তম দৃশ্য

মন্ত্রগৃহ

বিক্রমদেব ও মন্ত্রী

বিক্রমদেব। এই দণ্ডে রাজ্য হতে দাও দূর করে
যত সব বিদেশী দস্যুরে। সদা দুঃখ,
সদা ভয়, রাজ্য জুড়ে কেবল ক্রন্দন।
আর যেন এক দিন না শুনিতে হয়
পীড়িত প্রজার এই নিত্য কোলাহল।
মন্ত্রী। মহারাজ, ধৈর্য চাই। কিছুদিন ধরে
রাজার নিয়ত দৃষ্টি পড়ুক সর্বত্র,
ভয় শোক বিশৃঙ্খলা তবে দূর হবে।

২৮৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে
অমঙ্গল—একদিনে কী করিবে তার ?
বিক্রমদেব । একদিনে চাহি তারে সমূলে নাশিতে ।
শত বরষের শাল যেমন সবলে
একদিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাং ।

মন্ত্রী । অস্ত্র চাই, লোক চাই—
বিক্রমদেব । সেনাপতি কোথা ?
মন্ত্রী । সেনাপতি নিজেই বিদেশী ।
বিক্রমদেব । বিড়ম্বনা !

তবে ডেকে নিয়ে এস দীন প্রজাদের,
খাণ্ড দিয়ে তাহাদের বন্ধ করো মুখ,
অর্থ দিয়ে করহ বিদায় । রাজ্য ছেড়ে
যাক চলে, যেথা গিয়ে স্থখী হয় তারা ।

[প্রস্থান

দেবদত্তের সহিত স্মিত্রার প্রবেশ

স্মিত্রা । আমি এ রাজ্যের রানী—তুমি মন্ত্রী বুঝি ?
মন্ত্রী । প্রণাম জননী । দাস আমি । কেন মাতঃ,
অস্তঃপুর ছেড়ে আজ মন্ত্রগৃহে কেন ।
স্মিত্রা । প্রজার ক্রন্দন শুনে পারি নে তিষ্ঠিতে
অস্তঃপুরে । এসেছি করিতে প্রতিকার ।
মন্ত্রী । কী আদেশ মাতঃ ।

স্মিত্রা । বিদেশী নায়ক
এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহ্বান
মোর নামে ত্বর করি ।

মন্ত্রী । সহসা আহ্বানে
সংশয় জন্মিবে মনে, কেহ আসিবে না ।

স্মিত্রা । মানিবে না রানীর আদেশ ?

দেবদত্ত । রাজা রানী
ভুলে গেছে সবে । কদাচিৎ জনশ্রুতি
শোনা যায় ।

রাজা ও রানী

২৮৭

সুমিত্রা । কালভৈরবের পূজোৎসবে
করো নিমন্ত্রণ । সেদিন বিচার হবে ।
গর্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার
সৈন্তবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত । [প্রস্থান
দেবদত্ত । কাহারে পাঠাবে দূত ?
মন্ত্রী । ত্রিবেদী ঠাকুরে ।
নির্বোধ সরলমন ধার্মিক ব্রাহ্মণ,
তার 'পরে কারো আর সন্দেহ হবে না ।
দেবদত্ত । ত্রিবেদী সরল ? নিবুদ্ভিই বুদ্ধি তার,
সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড ।

অষ্টম দৃশ্য

ত্রিবেদীর কুটির

মন্ত্রী ও ত্রিবেদী

মন্ত্রী । বুঝেছ ঠাকুর, এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না ।
ত্রিবেদী । তা বুঝছি । হরি হে । কিন্তু মন্ত্রী, কাজের সময় আমাকে তাক, আর
পৈরহিত্যের বেলার দেবদত্তের খোঁজ পড়ে ।
মন্ত্রী । তুমি তো জান ঠাকুর, দেবদত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গুঁকে দিয়ে আর তো কোনো
কাজ হয় না । উনি কেবল মন্ত্র পড়তে আর ঘণ্টা নাড়তে পারেন ।
ত্রিবেদী । কেন, আমার কি বেদের উপর কম ভক্তি ? আমি বেদ পূজো করি, তাই
বেদ পাঠ করবার সুবিধে হয়ে ওঠে না । চন্দনে আর সিঁদুরে আমার বেদের একটা
অক্ষরও দেখবার জো নেই । আজই আমি যাব । হে মধুসূদন ।
মন্ত্রী । কী বলবে ?
ত্রিবেদী । তা আমি বলব কালভৈরবের পূজো, তাই রাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ
করেছেন - আমি খুব বড়োরকম সালাংকার দিয়েই বলব সব কথা এখন মনে আসছে
না - পথে যেতে যেতে ভেবে নেব । হরি হে তুমিই সত্য ।
মন্ত্রী । যাবার আগে একবার দেখা করে যেরো ঠাকুর । [প্রস্থান

২৮৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ত্রিবেদী। আমি নির্বোধ, আমি শিশু, আমি সরল, আমি তোমাদের কাজ উদ্ধার
করবার গোক ! পিঠে বস্তা, নাকে দড়ি, কিছু বুঝব না, শুধু লেজে মোড়া খেয়ে চলব—
আর সন্ধ্যাবেলার ছুটিখানি শুকনো বিচিলি খেতে দেবে ! হরি হে তোমারি ইচ্ছে।
দেখা যাবে কে কতখানি বোঝে। ওরে এখনো পুজোর সামগ্রী দিলি নে ? বেনা
যায় যে। নারায়ণ। নারায়ণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিংহগড়

জয়সেনের প্রাসাদ

জয়সেন, ত্রিবেদী ও মিহিরগুপ্ত

ত্রিবেদী। তা বাপু, তুমি যদি চক্ষু অমন রক্তবর্ণ কর তাহলে আমার আশুবিধতি
হবে। ভক্তবৎসল হরি। দেবদত্ত আর মন্ত্রী আমাকে অনেক করে শিখিয়ে
দিয়েছে—কী বলছিলেম ভালো ? আমাদের রাজা কালভৈরবের পুজো নামক একটা
উপলক্ষ করে—

জয়সেন। উপলক্ষ করে ?

ত্রিবেদী। হাঁ, তা নয় উপলক্ষই হল, তাতে দোষ হয়েছে কী ? যথুন্দন। তা
তোমার চিন্তা হতে পারে বটে। উপলক্ষ শব্দটা কিঞ্চিৎ কাঠিন্যরসাসক্ত হয়ে পড়েছে
—ওর যা যথার্থ অর্থ সেটা নিরাকার করতে অনেকেরই গোল ঠেকে দেখেছি।

জয়সেন। তাই তো ঠাকুর, ওর যথার্থ অর্থটাই ঠাওরাচ্ছি।

ত্রিবেদী। রাম নাম সত্য। তা না হয় উপলক্ষ না বলে উপসর্গ বলা গেল।
শব্দের অভাব কী বাপু ? শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম। অতএব উপলক্ষই বল আর উপসর্গই
বল অর্থ সমানই রইল।

জয়সেন। তা বটে। রাজা যে আমাদের আহ্বান করেছেন তার উপলক্ষ এক
উপসর্গ পর্যন্ত বোঝা গেল—কিন্তু তার যথার্থ কারণটা কী খুলে বলো দেখি।

রাজা ও রানী

২৮৯

ত্রিবেদী। ওইটে বলতে পারলুম না বাপু ওইটে আমার কেউ বুঝিয়ে বলে নি।

হরি হে।

জয়সেন। ব্রাহ্মণ, তুমি বড়ো কঠিন স্থানে এসেছ, কথা গোপন কর তো বিপদে পড়বে।

ত্রিবেদী। হে ভগবান। হ্যাঁ দেখো বাপু তুমি রাগ করো না, তোমার স্বভাবটা নিতান্ত যে মধুমত্ত মধুকরের মতো তা বোধ হচ্ছে না।

জয়সেন। বেশি ব'কো না ঠাকুর, যথার্থ কারণ যা জান বলে ফেলো।

ত্রিবেদী। বাসুদেব। সকল জিনিসেরই কি যথার্থ কারণ থাকে। যদি বা থাকে তো সকল লোকে কি টের পায়? যারা গোপনে পরামর্শ করেছে তারা ই জানে। মন্ত্রী জানে, দেবদত্ত জানে। তা বাপু, তুমি অধিক ভেবো না, বোধ করি সেখানে যাবামাত্রই যথার্থ কারণ অবিলম্বে টের পাবে।

জয়সেন। মন্ত্রী তোমাকে আর কিছুই বলে নি?

ত্রিবেদী। নারায়ণ, নারায়ণ। তোমার দিবা, কিছু বলে নি। মন্ত্রী বললে—“ঠাকুর, যা বললুম তা ছাড়া একটি কথা ব'লো না। দেখো, তোমাকে যেন একটুও সন্দেহ না করে।” আমি বললুম, “হে রাম। সন্দেহ কেন করবে? তবে বলা যায় না। আমি তো সরলচিত্তে বলে যাব, যিনি সন্দেহ হবেন তিনি হবেন।” হরি হে তুমিই সত্য।

জয়সেন। পূজো উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, এ তো সামান্য কথা,—এতে সন্দেহ হবার কী কারণ থাকতে পারে?

ত্রিবেদী। তোমরা বড়োলোক, তোমাদের এইরকমই হয়। নইলে “ধর্মস্তা স্মৃদ্ধা গতি” বলবে কেন? যদি তোমাদের কেউ এসে বলে, “আর তো রে পাষণ্ড তোর মুণ্ডটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলি” অমনি তোমাদের উপলব্ধ হয় যে, আর যাই হোক লোকটা প্রবঞ্চনা করছে না, মুণ্ডটার উপরে বাস্তবিক তার নজর আছে বটে। কিন্তু যদি কেউ বলে, “এস তো বাপখন, আস্তে আস্তে তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিই,” অমনি তোমাদের সন্দেহ হয়। যেন আস্ত মুণ্ডটা ধরে টান মারার চেয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ। হে ভগবান, যদি রাজা স্পষ্ট করেই বলত—একবার হাতের কাছে এস তো, তোমাদের একেকটাকেকে ধরে রাজ্য থেকে নির্বসন করে পাঠাই—তাহলে এটা কখনও সন্দেহ করতে না যে, হয়তো বা রাজকন্য়ার সঙ্গে পরিণাম-বন্ধন করবার জন্তেই রাজা ডেকে থাকবেন। কিন্তু রাজা বলছেন নাকি, “হে বন্ধু সকল, রাজ্যধারে শাসনে চ যন্তিষ্ঠতি স বাঙ্কব, অতএব তোমরা পূজো উপলক্ষে এখানে

২৯০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এসে কিঞ্চিৎ ফলাহার করবে”—অমনি তোমাদের সন্দেহ হয়েছে সে ফলাহারটা কী রকমের না জানি। 'হে মধুসূদন। তা এমনি হয় বটে। বড়োলোকের সামান্য কথায় সন্দেহ হয়, আবার সামান্য লোকের বড়ো কথায় সন্দেহ হয়।

জয়সেন। ঠাকুর, তুমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। আমার যেটুকু বা সন্দেহ ছিল, তোমার কথায় সমস্ত ভেঙে গেছে।

জিবেদী। তা লেখ কথা বলেছ। আমি তোমাদের মতো বুদ্ধিমান নই—সকল কথা তলিয়ে বুঝতে পারি নে—কিন্তু, বাবা, সরল—পুরাণ-সংহিতায় যাকে বলে, অন্তে পরে কা কথা অর্থাৎ অন্তের কথা নিয়ে কখনো থাকি নে।

জয়সেন। আর কাকে কাকে তুমি নিমজ্ঞণ করতে বেরিয়েছ?

জিবেদী। তোমাদের পোড়া নাম আমার মনে থাকে না। তোমাদের কান্নারী স্বভাব যেমন তোমাদের নামগুলোও ঠিক তেমনি শ্রুতিপৌরুষ। তা এ-রাজ্যে তোমাদের গুপ্তির যেখানে যে আছে সকলকেই ডাক পড়েছে। শূলপাণি। কেউ বাদ যাবে না।

জয়সেন। যাও, ঠাকুর, এখন বিশ্রাম করো গে।

জিবেদী। যা হোক, তোমার মন থেকে যে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে মন্ত্রী এ-কথা শুনে ভাবি খুশি হবে। মুকুন্দ মুরহর মুরারে। [প্রস্থান]

জয়সেন। মিহিরগুপ্ত, সমস্ত অবস্থা বুঝলে তো? এখন গৌরসেন যুদ্ধার্থে উদয়ভাস্কর ওদের কাছে গীত্র লোক পাঠাও। বলো, অবিলম্বে সকলে একত্র মিলে একটা পরামর্শ করা আবশ্যক।

মিহিরগুপ্ত। যে আজ্ঞা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

বিক্রমদেব ও রানীর আত্মীয় সভাসদ

সভাসদ। ধন্য মহারাজ।

বিক্রমদেব। কেন এত ধন্যবাদ।

সভাসদ। মহেশ্বর এই তো লক্ষণ দৃষ্টি তার

সকলের 'পরে। ক্ষুদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্র জনে

রাজা ও রানী

২৯১

পায় না দেখিতে । প্রবাসে পড়িয়া আছে
সেবক যাহারা, জয়সেন, যুধাজিৎ—
মহোৎসবে তাহাদের করেছ স্মরণ ।
আনন্দে বিহ্বল তারা । সত্বর আসিছে
দলবল নিয়ে ।

বিক্রমদেব ।

যাও, যাও । তুচ্ছ কথা,

তার লাগি এত যশোগান । জানিও নে
আহুত হয়েছে কারা পূজার উৎসবে ।

সভাসদ ।

রবির উদয়মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেষ্টা, নাহি পরিশ্রম,
নাহি তাহে ক্ষতিবৃদ্ধি তার । জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তার কনক-কিরণে ।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয় ।

বিক্রমদেব ।

থামো থামো যথেষ্ট হয়েছে ।

আমি যত অবহেলে কৃপাবৃষ্টি করি
তার চেয়ে অবহেলে সভাসদগণ
করে স্তুতিবৃষ্টি । বলা তো হয়েছে শেষ
যত কথা করেছ রচনা । যাও এবে ।

[সভাসদের প্রস্থান]

সুমিত্রার প্রবেশ

কোথা যাও, একবার ফিরে চাও রানী ।
রাজা আমি পৃথিবীর কাছে, তুমি শুধু
জান মোরে দীন বলে । ঐশ্বর্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত—শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার কাঁড়াল বাসনা ।
তাই কি যুগার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারানী, রাজরাজেশ্বরী ।

২৯২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মহারাজ,

সুমিত্রা ।

বিক্রমদেব ।

যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু ।
অপদার্থ আমি ! দীন কাপুরুষ আমি !
কর্তব্যবিমূখ আমি, অন্তঃপুরচারী !
কিন্তু মহারানী, সে কি স্বভাব আমার ?
আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহীয়সী ? তুমি উচ্চে,
আমি ধূলিমাঝে ? নহে তাহা । জানি আমি
আপন ক্ষমতা । রয়েছে দুর্জয় শক্তি
এ হৃদয় মাঝে, প্রেমের আকারে তাহা
দিয়াছি তোমারে । বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি
বিদ্যাতের মালা, পরায়েছি কণ্ঠে তব ।

সুমিত্রা ।

বিক্রমদেব ।

স্বণা করো মহারাজ, স্বণা করো মোরে
সেও ভালো—একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়—ক্ষুদ্র এ নারীর 'পরে
করিয়ো না বিসর্জন সমস্ত পৌরুষ ।

এত প্রেম, হয় তার এত অনাদর ।
চাহ না এ প্রেম ? না চাহিয়া দস্যুসম
নিতেছ কাড়িয়া । উপেক্ষার ছুরি দিয়া
কাটিয়া তুলিছ, রক্তসিক্ত তপ্ত প্রেম
মর্ষ বিদ্ধ করি । ধূলিতে দিতেছ ফেলি
নির্মম নিষ্ঠুর । পাবাণ-প্রতিমা তুমি,
যত বক্ষে চেপে ধরি অম্বরাগভরে,
তত বাজে বুক ।

সুমিত্রা ।

চরণে পতিত দাসী,

কী করিতে চাও করো । কেন তিরস্কার ?
নাথ, কেন আজি এত কঠিন বচন ।
কত অপরাধ তুমি করেছ মার্জনা,
কেন রোষ বিনা অপরাধে ।

বিক্রমদেব ।

প্রিয়তমে,

রাজা ও রানী

২৯৩

উঠ উঠ, এস বুকে—দ্বিধা আলিঙ্গনে
এ দীপ্ত হৃদয়জালা করহ নির্বাণ।
কত সুখা, কত ক্ষমা ওই অশ্রুজলে,
অগ্নি প্রিয়ে, কত প্রেম, কতই নির্ভর।
কোমল হৃদয়তলে তীক্ষ্ণ কথা বিধে
প্রেম-উৎস ছুটে—অর্জুনের শরাঘাতে
মর্মান্বিত ধরণীর ভোগবতী সম।

নেপথ্যে।

মহারানী!

সুমিত্রা।

(অশ্রু মুছিয়া) দেবদত্ত। আর্হ, কী সংবাদ?

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত।

রাজ্যের নায়কগণ রাজ-নিমন্ত্রণ
করিয়াছে অবহেলা, বিদ্রোহের তরে
হয়েছে প্রস্তুত।

সুমিত্রা।

গুনিতেছ মহারাজ?

বিক্রমদেব।

দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ।

দেবদত্ত।

মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে
তাই সেখা নুপতির পাই নে দর্শন।

সুমিত্রা।

স্পর্ধিত কুকুর যত বর্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অঙ্গে। রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে। এ কী অহংকার।
মহারাজ, মন্ত্রণার আছে কি সময়।
মন্ত্রণার কী আছে বিষয়। সৈন্য লয়ে
যাও অবিলম্বে, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেলো চরণের তলে।

বিক্রমদেব।

সেনাপতি শত্রুপক্ষ—

সুমিত্রা।

নিজে যাও তুমি।

-বিক্রমদেব।

আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিলাপ,
দুঃস্বপ্ন, দুঃস্বপন, করলম কাঁটা?
হেথা হতে এক পদ নড়িব না, রানী,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব। কে ঘটালে

২৯৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

স্বমিত্রা ।

এই উপজীব । ব্রাহ্মণে নারীতে মিলে
 বিবরের সুপ্তসর্প জাগাইয়া তুলি
 এ কী খেলা । আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা
 নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ ।
 ধিক এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা ।
 ধিক আমি, এ রাজ্যের রানী ।

[প্রস্থান

বিজয়দেব ।

দেবদত্ত,

বন্ধুত্বের এই পুরস্কার ? বুধা আশা ।
 রাজার অদৃষ্টে বিধি লেখে নি প্রণয় ;
 ছায়াহীন সঙ্গীহীন পর্বতের মতো
 একা মহাশূন্যমাঝে দগ্ধ উচ্চ শিরে
 প্রেমহীন নীরস মহিমা ; ঝঙ্কারবায়ু
 করে আক্রমণ, বজ্র এসে বিঁধে, স্বর্ষ
 রক্তনেত্রে চাহে ; ধরণী পড়িয়া থাকে
 চরণ ধরিয়া । কিন্তু ভালোবাসা কোথা ।
 রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে
 কাঁদে । হায় বন্ধু, মানবজীবন লয়ে
 রাজত্বের ভান করা শুধু বিভ্রম ।
 দগ্ধ-উচ্চ সিংহাসন চূর্ণ হয়ে গিয়ে
 ধরা সাধে হোক সমতল, একবার
 হৃদয়ের কাছাকাছি পাই তোমাদের ।
 বাল্যসখা, রাজা বলে ভুলে যাও মোরে,
 একবার ভালো করে করো অনুভব
 বান্ধব-হৃদয়-ব্যথা বান্ধব-হৃদয়ে ।
 সখা, এ হৃদয় মোর জানিয়ে তোমার ।
 কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
 সেও আমি সব অকাতরে, রোমানল
 লব বন্ধু পাতি,—যেমন অগাধ সিদ্ধু
 আকাশের বজ্র লয় বৃকে ।

দেবদত্ত ।

রাজা ও রানী

২৯৫

বিক্রমদেব ।

দেবদত্ত,

সুখনীড় মাঝে কেন হানিছ বিরহ ।

সুখস্বর্গ মাঝে কেন আনিছ বহিরা

হাহাধ্বনি ।

দেবদত্ত ।

সখা, আশুন লেগেছে ঘরে

আমি শুধু এনেছি সংবাদ । সুখনিদ্রা

দিয়েছি ভাঙায় ।

বিক্রমদেব ।

এর চেয়ে সুখস্বপ্নে

মৃত্যু ছিল ভালো ।

দেবদত্ত ।

ধিক লজ্জা মহারাজ,

রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ স্বপ্নসুখ

বেশি হল ?

বিক্রমদেব ।

যোগাসনে লীন যোগিবর

তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয় ।

স্বপ্ন এ সংসার । অর্ধশত বর্ষপরে

আজিকার সুখদুঃখ কার মনে রবে ?

যাও যাও, দেবদত্ত, যেথা ইচ্ছা তব ।

আপন সাস্থনা আছে আপনার কাছে ।

দেখে আসি ঘৃণাভরে কোথা গেল রানী ।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

পুরুষবেশে রানী সুমিত্রা, বাহিরে অনুচর

সুমিত্রা

জগৎ-জননী মাতা, দুর্বল-হৃদয়

তনয়ায়ে করিয়ো মার্জনা । আজ সব

পূজা ব্যর্থ হল—শুধু সে সুন্দর মুখ

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পড়ে মনে, সেই প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুটি,
 সেই শয্যা 'পরে একা সুপ্ত মহারাজ ।
 হায় মা, নারীর প্রাণ এত কি কঠিন ।
 দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি সতী,
 প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর
 আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
 বলে নি কি কিরে যেতে পতিগৃহপানে ।
 সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না
 ও রাঙা চরণ । মা গো, সেদিনের কথা
 দেখ্ মনে করে । জননী, এসেছি আমি
 রমণী-হৃদয় বলি দিতে, রমণীর
 ভালোবাসা ছিন্ন শতদল সম, দিতে
 পদতলে । নারী তুমি, নারীর হৃদয়
 জান তুমি, বল দাও জননী আমারে ।
 থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হতে
 “ফিরে এস, ফিরে এস রানী,” প্রেমপূর্ণ
 পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর । খড়্গ নিয়ে
 তুমি এস, দাঁড়াও রুধিরা পথ, বলো,
 “তুমি যাও, রাজধর্ম উঠুক জাগিয়া,
 ধন্য হোক রাজা, প্রজা হোক সুখী, রাজ্যে
 ফিরে আসুক কল্যাণ, দূর হোক যত
 অত্যাচার, ভূপতির ষশোরশ্মি হতে
 ঘুচে যাক কলঙ্ককালিমা । তুমি নারী
 ধরাপ্রান্তে যেথা স্থান পাও—একাকিনী
 বসে বসে নিজ দুঃখে মরো বুক ফেটে ।”
 পিতৃসত্য পালনের তরে রামচন্দ্র
 গিয়াছেন বনে, পতিসত্য পালনের
 লাগি আমি যাব । যে সত্যে আছেন বাঁধা
 মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী কাছে—কভু তাহা
 সামান্য নারীর তরে ব্যর্থ হইবে না ।

রাজা ও রানী

২৯৭

বাহিরে একজন পুরুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ

অতুচর। কে তোরা। দাঁড়া এইখানে।

পুরুষ। কেন বাবা। এখানেও কি স্থান নেই।

স্ত্রী। মা গো। এখানেও সেই সিপাই।

সুমিত্রার বাহিরে আগমন

সুমিত্রা। তোমরা কে গো।

পুরুষ। মিহিরগুপ্ত আমাদের ছেলেটিকে ধরে রেখে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের চাল নেই, চুলো নেই, মরবার জায়গাটুকু নেই—তাই আমরা মন্দিরে এসেছি। মার কাছে হত্যা দিয়ে পড়ব—দেখি তিনি আমাদের কী গতি করেন।

স্ত্রী। তা হাঁ গো, এখানেও তোমরা সিপাই রেখেছ? রাজার দরজা বন্ধ, আবার মায়ের দরজাও আগলে দাঁড়িয়েছ?

সুমিত্রা। না বাছা, এস তোমরা। এখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই। কে তোমাদের উপর দৌরাখ্য করেছে।

পুরুষ। এই জয়সেন। আমরা রাজার কাছে দুঃখু জানাতে গিয়েছিলেম, রাজদর্শন পেলেম না। কিরে এসে দেখি আমাদের ঘরদোর জালিয়ে দিয়েছে, আমাদের ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

সুমিত্রা। (স্ত্রীলোকের প্রতি) হাঁ গো, তা তুমি রানীকে গিয়ে জানালে না কেন।

স্ত্রী। ওগো রানীই তো রাজাকে জাহ্ন করে রেখেছে। আমাদের রাজা ভালো, রাজার দোষ নেই—ওই বিদেশ থেকে এক রানী এসেছে, সে আপন হুঁতুদের রাজ্য জুড়ে বসিয়েছে। প্রজার বুকের রক্ত গুবে খাচ্ছে গো।

পুরুষ। চুপ কর মাগী। তুই রানীর কী জানিস? যে-কথা জানিস নে, তা মুখে আনিস নে।

স্ত্রী। জানি গো জানি। ওই রানীই তো বসে বসে রাজার কাছে আমাদের নামে যত কথা লাগায়।

সুমিত্রা। ঠিক বলেছ বাছা। ওই রানী সর্বনাশীই তো যত নষ্টের মূল। তা সে আর বেশি দিন থাকবে না, তার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এই নাও, আমার গাধামত কিছু দিলাম, সব দুঃখ দূর করতে পারি নে।

২৯৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পুরুষ। আহা তুমি কোনো রাজ্য ছেলে হবে—তোমার জয় হোক।
 স্ত্রীমিত্র। আর বিলম্ব নয়, এখনি যাব।

[প্রস্থান]

ত্রিবেদীর প্রবেশ

ত্রিবেদী। হে হরি কী দেখলুম। পুরুষমূর্তি ধরে রানী স্ত্রীমিত্রা ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। মন্দিরে দেবপুজোর ছলে এসে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। আমাকে দেখে বড়ো খুশি। মধুসূদন। ভাবলে ব্রাহ্মণ বড়ো সরল-হৃদয়, মাথার তেলোয় যেমন এক-গাছি চুল দেখা যায় না, তলায় তেমনি বুদ্ধির লেশমাত্র নেই। একে দিয়ে একটা কাছ করিয়ে নেওয়া যাক। এর মুখ দিয়ে রাজ্যকে ছোটো মিষ্টি কথা পাঠিয়ে দেওয়া যাক। বাবা তোমরা কেঁচে থাকো। যখন তোমাদের কিছু দরকার পড়বে বড়ো ত্রিবেদীকে ডেকে, আর দান-দক্ষিণের বেলায় দেবদত্ত আছেন। দয়াময়। তা বলব। খুব মিষ্টি মিষ্টি করেই বলব। আমার মুখে মিষ্টি কথা আরো বেশি মিষ্টি হয়ে ওঠে। কমললোচন। রাজা কী খুশিই হবে। কথাগুলো যত বড়ো বড়ো করে বলব রাজার মুখের হাঁ তত বেড়ে যাবে। দেখেছি, আমার মুখে বড়ো কথাগুলো শোনার ভালো। লোকের বিশেষ আমোদ বোধ হয়। বলে, ব্রাহ্মণ বড়ো সরল। পতিতপাবন। এবারে কতটা আমোদ হবে বলতে পারি নে। কিন্তু শব্দশায় একেবারে উলটপালট করে দেব। আঃ কী দুর্ভোগ। আজ সমস্ত দিন দেবপুজো হয় নি, এইবার একটু পুজো-অর্চনায় মন দেওয়া যাক। দীনবন্ধু ভক্তবৎসল।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ

বিক্রমদেব, মন্ত্রী ও দেবদত্ত

বিক্রমদেব। পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন! এ-রাজ্যেতে
 যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
 যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
 পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়বলে
 ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়। এই রাজ্য

রাজা ও রানী

২৯৯

এই কি মহিমা তার। বৃহৎ প্রতাপ,
লোকবল অর্থবল নিয়ে, পড়ে থাকে
শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মতো, ক্ষুদ্র পাখি
উড়ে চলে যায়।

মন্ত্রী।

হায় হায়, মহারাজ,
লোকনিন্দা, ভগ্নবান্ধ জলশ্রোত সম,
ছুটে চারিদিক হতে।

বিক্রমদেব।

চূপ করো মন্ত্রী।
লোকনিন্দা, লোকনিন্দা সদা! নিন্দাভারে
রসনা খসিয়া যাক অলস লোকের।
দিবা যদি গেল, উঠুক না চুপি চুপি
ক্ষুদ্র পঙ্কজ হতে ছুট বাষ্পরাশি,
অমার আঁধার তাহে বাড়িবে না কিছু।
লোকনিন্দা!

দেবদত্ত।

মন্ত্রী, পরিপূর্ণ সূর্যপানে
কে পারে তাকাতে। তাই গ্রহণের বেলা
ছুটে আসে যত মর্ত্যলোক, দীননেত্রে
চেয়ে দেখে দুর্দিনের দিনপতি পানে,
আপনার কালিমাখা কাচখণ্ড দিয়ে
কালো দেখে গগনের আলো। মহারানী
মা জননী, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার?
তব নাম ধুলায় লুটায়? তব নাম
ফিরে মুখে মুখে? এ কী এ দুর্দিন আজি।
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী, এরা সব
পথের কাঙাল।

বিক্রমদেব।

ত্রিবেদী কোথায় গেল?
মন্ত্রী, ডেকে আনো তারে। শোনা হয় নাই
তার সব কথা, ছিছ অশ্রুমনে।

মন্ত্রী।

যাই

ডেকে আনি তারে।

[প্রস্থান

রবীন্দ্র-রচনাবলী

৩০০

বিক্রমদেব ।

এখনো সময় আছে,
এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান ।
আবার সন্ধান ? এমন কি চিরদিন
কাটিবে জীবন । সে দিবে না ধরা, আমি
ফিরিব পশ্চাতে ? প্রেমের শৃঙ্খল হাতে
রাজ্য রাজকর্ম ফেলে শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব ?
পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত
করো-পলায়ন ; গৃহহীন প্রেমহীন
বিশ্রামবিহীন অনাবৃত পৃথিবীমাঝে
কে বল পশ্চাতে লয়ে আপনার ছায়া ।

ত্রিবেদীর প্রবেশ

চলে যাও, দূর হও, কে ডাকে তোমারে ?
বার বার তার কথা কে চাহে গুনিতে
প্রগল্ভ ব্রাহ্মণ, মূর্খ ।

ত্রিবেদী ।

হে মধুসূদন ।

[প্রস্থানোত্তম

বিক্রমদেব ।

শোনো, শোনো, দুটো কথা শুধাবার আছে ।
চোখে অশ্রু ছিল ?

ত্রিবেদী ।

চিন্তা নেই বাপু । অশ্রু

দেখি নাই ।

বিক্রমদেব ।

মিথ্যা করে বলো । অতি ক্ষুদ্র
সকলুণ দুটি মিথ্যে কথা । হে ব্রাহ্মণ,
বুদ্ধ তুমি ক্ষৌণ্ডদৃষ্টি কী করে জানিলে
চোখে তার অশ্রু ছিল কি না ? বেশি নয়,
এক বিন্দু জল । নহে তো নয়ন-প্রান্তে
ছল ছল ভাব, কম্পিত কাতর কণ্ঠে
অশ্রুবদ্ধ বাণী ? তাও নয় ? সত্য বলো,
মিথ্যা বলো । ব'লো না, ব'লো না, চলে যাও ।

রাজা ও রানী

৩০১

ত্রিবেদী।

হরি হে তুমিই সত্য।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব।

অস্তুর্যামী দেব,

তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ

তারে ভালোবাসা ; পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল.

রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল।

তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্তধর্ম মোর ;

রাজধর্ম ফিরে দাও ; পুরুষ-হৃদয়

মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরুদ্ধমাঝে।

কোথা কর্মক্ষেত্র। কোথা জনশ্রোত। কোথা

জীবন-মরণ। কোথা সেই মানবের

অবিশ্রাম স্মৃতিদুঃখ, বিপদ-সম্পদ,

তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস।

মন্ত্রী প্রবেশ

মন্ত্রী।

মহারাজ, অশ্বারোহী

পাঠিয়েছি চারিদিকে রাজ্যের সন্ধানে।

বিক্রমদেব।

ফিরাও ফিরাও মন্ত্রী। স্বপ্ন ছুটে গেছে,

অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া।

সৈন্যদল করহ প্রস্তুত, যুদ্ধে যাব,

নাশিব বিদ্রোহ।

মন্ত্রী।

যে আদেশ মহারাজ।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব।

দেবদত্ত, কেন নত মুখ, নান দৃষ্টি ?

ক্ষুদ্র সাঙ্ঘন্য কথ্য ব'লো না ব্রাহ্মণ।

আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর,

আপনারে পেয়েছি কুড়িয়ে। আজি সখা,

আনন্দের দিন। এস আলিঙ্গনপাশে।

(আলিঙ্গন করিয়া)

বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভান।

থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে বিংশিছে

মর্মে। এস এস, একবার অশ্রুজল

ফেলি বন্ধুর হৃদয়ে। মেঘ যাক কেটে।

৩০২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশ্মীর

প্রাসাদ-সম্মুখে রাজপথ

দ্বারে শংকর

শংকর। এতটুকু ছিল, আমার কোলে খেলা করত। যখন কেবল চারটি স্নাত উঠেছে তখন সে আমাকে সংকল দাড়া বলত। এখন বড়ো হয়ে উঠেছে, এখন সংকল দাড়ার কোলে আর ধরে না, এখন সিংহাসন চাই। স্বর্গীয় মহারাজ মরবার সময় তোদের দুটি ভাইবোনকে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিল। বোনটি তো দুদিন বামে স্বামীর কোলে গেল। মনে করেছিলুম কুমারসেনকে আমার কোল থেকে একেবারে সিংহাসনে উঠিয়ে দেব। কিন্তু খুড়ো-মহারাজ আর সিংহাসন থেকে নাবেন না। শুভলগ্ন কতবার হল, কিন্তু আজ কাল করে আর সময় হল না। কত ওজর কত আপত্তি। আরে ভাই সংকলের কোল এক, আর সিংহাসন এক। বড়ো হয়ে গেলুম—তাকে কি আর রাজ্যসনে দেখে যেতে পারব।

দুই জন সৈনিকের প্রবেশ

প্রথম সৈনিক। আমাদের যুবরাজ কবে রাজ্য হবে রে ভাই? সেদিন আমি তোদের সকলকে মহড়া খাওয়াব।

দ্বিতীয় সৈনিক। আরে, তুই তো মহড়া খাওয়াবি—আমি জান দেব, আমি লড়াই করে করে বেড়াব, আমি পাঁচটা গাঁ লুট করে আনব। আমি আমার মহাজন বেটার মাথা ভেঙে দেব। বলিস তো, আমি খুশি হয়ে যুবরাজের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমনি মরে পড়ে যাব।

প্রথম সৈনিক। তা কি আমি পারি নে। মরবার কথা কী বলিস। আমার যদি সওয়া-শ বরষ পরমাযু থাকে আমি যুবরাজের জন্তে রোজ নিয়মিত দু-সন্ধ্যো দু-বার করে মরতে পারি। তা ছাড়া উপরি আছে।

দ্বিতীয় সৈনিক। ওরে যুবরাজ তো আমাদেরই। স্বর্গীয় মহারাজ তাকে আমাদেরই হাতে দিয়ে গেছেন। আমরা তাকে কাঁধে করে ঢাক বাজিয়ে রাধা করে দেব। তা কাউকে ভয় করব না—

রাজা ও রাণী

৩০৩

প্রথম সৈনিক। খুড়ো-মহারাজকে গিয়ে বলব, তুমি নেমে এস; আমরা রাজপুত্রকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ করতে চাই।

দ্বিতীয় সৈনিক। শুনেছিস, পূর্ণিমা তিথিতে যুবরাজের বিয়ে।

প্রথম সৈনিক। সে তো পাঁচ বৎসর ধরে শুনে এসেছি।

দ্বিতীয় সৈনিক। এইবার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। জিচুড়ের রাজবংশে নিয়ম চল-আসছে যে, পাঁচ বৎসর রাজকন্টার অধীন হয়ে থাকতে হবে। তার পর তার হুকুম হলে বিয়ে হবে।

প্রথম সৈনিক। বাবা, এ আবার কী নিয়ম। আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের চিরকাল চল আসছে শ্বশুরের গালে চড় মেয়ে মেয়েটার খুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসি—ঘন্টা দুয়ের মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। তার পরে দশটা বিয়ে করবার ফুরসৎ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সৈনিক। যোধমল, সেদিন কী করবি বল দেখি?

প্রথম সৈনিক। সেদিন আমিও আরেকটা বিয়ে করে কেলব।

দ্বিতীয় সৈনিক। শাবাশ বলেছিস রে ভাই।

প্রথম সৈনিক। মহিষ্ঠাদের মেয়ে! খাসা দেখতে ভাই। কী চোখ রে। সে দিন বিতস্তার জল আনতে যাচ্ছিল, ছোটো কথা বলতে গেলুম, কক্ষণ তুলে মারতে এল। দেখলুম চোখের চেয়ে তার কক্ষণ ভয়ানক। চটপট সরে পড়তে হল।

গান

ঐ আখি রে।

ফিরে ফিরে চেয়ো না চেয়ো না, ফিরে যাও

কী আর রেখেছ বাকি রে।

মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ

কী স্থখে পরান আর রাখি রে।

দ্বিতীয় সৈনিক। শাবাশ ভাই।

প্রথম সৈনিক। ওই দেখ্ শংকরদাদা। যুবরাজ এখানে নেই—তবু বুড়ো সাজসজ্জা করে সেই ছয়োরে বসে আছে। পৃথিবী যদি উলটপালট হয়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ক্রটি হবে না।

দ্বিতীয় সৈনিক। আর ভাই ওকে যুবরাজের ছোটো কথা জিজ্ঞাসা করা যাক।

৩০৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম সৈনিক। জিজ্ঞাসা করলে ও কি উত্তর দেবে ? ও তেমন বুড়ো নয়। যেন
ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতোজোড়াটার মতো পড়ে আছে। মুখে কথাটি নেই।

দ্বিতীয় সৈনিক। (শংকরের নিকটে গিয়া) হাঁ দাদা, বলো না দাদা, যুবরাজ
রাজা হবে কবে ?

শংকর। তোদের সে খবরে কাজ কী।

প্রথম সৈনিক। না না, বলছি আমাদের যুবরাজের বয়স হয়েছে, এখন খুড়ো-রাজা
নাওছে না কেন ?

শংকর। তাতে দোষ হয়েছে কী। হাজার হোক, খুড়ো তো বটে।

দ্বিতীয় সৈনিক। তা তো বটেই। কিন্তু যে-দেশের যেমন নিয়ম—আমাদের
নিয়ম আছে যে—

শংকর। নিয়ম তোরা মানবি, আমরা মানব, বড়োলোকের আবার নিয়ম কী।
সবাই যদি নিয়ম মানবে তবে নিয়ম গড়বে কে।

প্রথম সৈনিক। আচ্ছা, দাদা, তা যেন হল—কিন্তু এই পাঁচ বছর ধরে বিয়ে করা
এ কেমন নিয়ম দাদা। আমি তো বলি, বিয়ে করা বাণ খাওয়ার মতো—চট করে
লাগল তীর, তার পরে ইহজন্মের মতো বিঁধে রইল। আর ভাবনা রইল না। কিন্তু
দাদা, পাঁচ বৎসর ধরে এ কী রকম কারখানা।

শংকর। তোদের আশ্চর্য ঠেকবে বলে কি যে-দেশের যা নিয়ম তা উলটে যাবে ?
নিয়ম তো কারো ছাড়বার জো নেই। এ সংসার নিয়মেই চলছে। যা যা আর
বকিস নে যা। এ সকল কথা তোদের মুখে ভালো শোনায় না।

প্রথম সৈনিক। তা চললুম। আজকাল আমাদের দাদার মেজাজ ভালো নেই।
একেবারে শুকিয়ে যেন খড়খড় করছে। [সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান]

পুরুষবেশী সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা। ভূমি কি শংকরদাদা।

শংকর। কে ভূমি ডাকিলে

পুরাতন পরিচিত স্নেহভরা সুরে।

কে ভূমি পথিক।

সুমিত্রা। এসেছি বিদেশ হতে।

শংকর। এ কি স্বপ্ন দেখি আমি ? কী মন্ত্র-কুহকে

কুমার আবার এল বালক হইয়া

শংকরের কাছে। যেন সেই সন্ধ্যাবেলা

রাজা ও রানী

৩০৫

খেলাশ্রান্ত সুকুমার বাল্যতত্ত্বখানি,
চরণকমল ক্লিষ্ট, বিবর্ণ কপোল,
ক্লান্ত শিশু-হিয়া, বৃদ্ধ শংকরের বৃকে
বিশ্রাম মাগিছে।

সুমিত্রা।

জালন্ধর হতে আমি

এসেছি সংবাদ লয়ে কুমারের কাছে।

শংকর।

কুমারের বাল্যকাল এসেছে আপনি
কুমারের কাছে। শৈশবের খেলাধুলা
মনে করে দিতে, ছোটো বোন পাঠিয়েছে
তারে। দূত তুমি এ মূর্তি কোথায় পেলে।
মিছে বকিতেছি কত। ক্ষমা করো মোরে।

বলো বলো কী সংবাদ। রানী দিদি মোর
ভালো আছে, সুখে আছে, পতির সোহাগে,
মহিষী-গোঁরবে? সুখে প্রজাগণ তারে
মা বলিয়া করে আশীর্বাদ? রাজলক্ষ্মী
অন্নপূর্ণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ?

মিক মোরে, শ্রান্ত তুমি পথশ্রমে, চলো
গৃহে চলো। বিশ্রামের পরে একে একে
ব'লো তুমি সকল সংবাদ। গৃহে চলো।

সুমিত্রা।

শংকর, মনে কি আছে এখনো রানীরে।

শংকর।

সেই কণ্ঠস্বর। সেই গভীর গভীর
দৃষ্টি স্নেহভরনত। এ কি মর্যাদিকা?
এনেছ কি চুরি করে মোর সুমিত্রার
ছায়াখানি? মনে নাই তারে? তুমি বুঝি
তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হতে আমারে ছলিতে?
বার্ধক্যের মুখরতা ক্ষমা করো যুবা।
বহুদিন মৌন ছিলাম—আজ কত কথা
আসে মুখে, চোখে আসে জল। নাহি জানি
কেন এত স্নেহ আসে মনে, তোমা'পরে।

৩০৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

যেন তুমি চিরপরিচিত। যেন তুমি
চিরজীবনের মোর আদরের ধন।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ত্রিচূড়.

ক্রীড়াকানন

কুমারসেন, ইলা ও সখীগণ

ইলা।

যেতে হবে? কেন যেতে হবে যুবরাজ।
ইলারে লাগে না ভালো দু-দণ্ডের বেশি,
ছি ছি চঞ্চল হৃদয়!

কুমারসেন।

প্রজাগণ সবে—

ইলা।

তারা কি আমার চেয়ে হয় স্মিয়মাণ
তব অদর্শনে। রাজ্যে তুমি চলে গেলে
মনে হয়, আর আমি নেই। যতক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি। রাজ্যে তব
কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্যভার,
কত রাজ-আড়ম্বর; আর সব আছে,
শুধু সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই।

কুমারসেন।

সব আছে

তবু কিছু নাই, তুমি না থেকেও আছ
প্রাণতমে।

ইলা।

মিছে কথা ব'লো না কুমার।
তুমি রাজা আপন রাজত্বে, এ অরণ্যে
আমি রানী, তুমি প্রজা মোর। কোথা যাবে?

রাজা ও রানী

৩০৭

যেতে আমি দিব না তোমায়ে । সখী, তোরা
আয় । এরে বাঁধ্ ফুলপাশে, কর্ গান,
কেড়ে নে সকলে মিলি রাজ্যের ভাবনা ।

সখীদের গান

যদি আসে তবে কেন যেতে চায় ।

দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ।

চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল বায় বলে এসে ভেসে যাই ।

ধরে রাখো, ধরে রাখো, সুখপাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায় ।

পথিকের বেশে সুখনিশি এসে বলে হেসে হেসে, মিশে যাই ।

জেগে থাকো, জেগে থাকো, বরষের সাধ নিমেষে মিলায় ।

কুমারসেন । আমারে কী করেছিস, অয়ি কুহকিনী ।

নির্বাণিত আমি । সমস্ত জীবন মন

নয়ন বচন ধাইছে তোমার পানে

কেবল বাসনাময় হয়ে । যেন আমি

আমারে ভাঙিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাব

তোমার মাঝারে প্রিয়ে । যেন মিশে রব

সুখস্বপ্ন হয়ে ওই নয়নপল্লবে ।

হাসি হয়ে ভাসিব অধরে । বাছ দুটি

ললিত লাবণ্যসম রহিব বেড়িয়া,

মিলন-সুখের মতো কোমল হৃদয়ে

রহিব মিলায়ে ।

ইলা ।

তার পরে অবশেষে

সহসা টুটিবে স্বপ্নজাল, আপনারে

পড়িবে স্মরণে । গীতহীনা বাঁগাসম

আমি পড়ে রব ভূমে, তুমি চলে যাবে

গুনগুন গাহি অন্তমনে । না না সখা,

স্বপ্ন নয়, মোহ নয়, এ মিলন-পাশ

কখন বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে,

চোখে চোখে, মর্মে মর্মে, জীবনে জীবনে ।

৩০৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কুমারসেন ।

সে তো আর দেখি নাই—আজি সপ্তমীর
 অর্ধ চাঁদ ক্রমে ক্রমে পূর্ণ শশী হয়ে
 দেখিবেক আমাদের পূর্ণ সে মিলন ।
 ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধা মাঝখানে রেখে
 কম্পিত আগ্রহবেগে মিলনের সুখ—
 আজি তার শেষ । দূরে থেকে কাছাকাছি,
 কাছে থেকে তবু দূর, আজি তার শেষ ।
 সহসা সাক্ষাৎ, সহসা বিশ্বয়রাশি,
 সহসা মিলন, সহসা বিরহবাধা—
 বনপথ দিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া
 শূন্য গৃহপানে সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে,
 প্রতি কথা, প্রতি হাসিটুকু শতবার
 উলটি পালটি মনে, আজি তার শেষ ।
 মৌন লজ্জা প্রতিবার প্রথম মিলনে,
 অশ্রুজল প্রতিবারে বিদায়ের বেলা—
 আজি তার শেষ ।

ইলা ।

আহা তাই যেন হয় ।

সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভালো, দুঃখ
 সেও ভালো । তৃষ্ণা ভালো মরীচিকা চেয়ে ।
 কখন তোমারে পাব, কখন পাব না,
 তাই সদা মনে হয়—কখন হারাব ।
 একা বসে বসে ভাবি, কোথা আছ তুমি,
 কী করিছ । কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে আসে
 অরণ্যের প্রান্ত হতে । বনের বাহিরে
 তোমারে জানি নে আর, পাই নে সন্ধান ।
 সমস্ত ভুবনে তব রহিব সর্বদা,
 কিছুই হবে না আর অচেনা, অজানা,
 অন্ধকার । ধরা দিতে চাহ না কি নাথ ?

কুমারসেন ।

ধরা তো দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়,
 তবু কেন বন্ধনের পাশ । বলো দেখি

রাজা ও রানী

৩০৯

ইলা ।

কী তুমি পাও নি, কোথা রয়েছে অভাব ।
 যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা
 শুনি বসে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে ।
 মনে হয় সে যেন আমার ফাঁকি দিয়ে
 চুরি করে রাখিয়াছে শৈশব তোমার
 গোপনে আপন কাছে । কভু মনে হয়
 যদি সে ফিরিয়া আসে, বাল্য-সহচরী
 ডেকে নিয়ে যায় সেই সুখশৈশবের
 খেলাঘরে, সেখা তারি তুমি । সেখা মোর
 নাই অধিকার । মাঝে মাঝে সাধ যায়,
 তোমার সে সুমিত্রারে দেখি একবার ।
 সে যদি আসিত, আহা, কত সুখ হত ।
 উৎসবের আনন্দ-কিরণখানি হয়ে
 দীপ্তি পেত পিতৃগৃহে শৈশব-ভবনে ।
 অলংকারে সাজাত তোমারে, বাহুপাশে
 বাঁধিত সাদরে, চুরি করে হাসিমুখে
 দেখিত মিলন । আর কি সে মনে করে
 আমাদের । পরগৃহে পর হয়ে আছে ।

কুমারসেন ।

ইলার গান

এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর,
 বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর ।
 ভালোবাসে সুখে দুখে,
 ব্যথা সহে হাসিমুখে,
 মরণেরে করে চির জীবন-নির্ভর ॥

কুমারসেন ।

কেন এ করুণ সুর । কেন দুঃখগান ।
 বিষন্ন নয়ন কেন ।

ইলা ।

এ কি দুঃখগান ।
 শোনায় গভীর সুখ দুঃখের মতন

রবীন্দ্র-রচনাবলী

উদার উদাস। সুখদুঃখ ছেড়ে দিয়ে
 আত্মবিসর্জন করি রমণীর সুখ।
 পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
 আনন্দে জীবন যোর উঠে উচ্ছ্বসিয়া
 বিশ্বমাঝে। শ্রান্তিহীন কর্মসুখতরে
 ধায় হিয়া। চিরকীর্তি করিয়া অর্জন
 তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
 বিরলে বিলাসে বসে এ অগাধ প্রেম
 পারি নে করিতে ভোগ অলসের মতো।
 ওই দেখো রাশি রাশি মেঘ উঠে আসে
 উপত্যকা হতে, ঘিরিতে পর্বতশৃঙ্গ,—
 সৃষ্টির বিচিত্র লেখা মুছিয়া ফেলিতে।
 দক্ষিণে চাহিয়া দেখো—অন্তরবিকরে
 সুবর্ণ-সমুদ্র সম সমতলভূমি
 গেছে চলে নিরুদ্ধে কোন্ বিশ্বপানে।
 শস্তক্ষেত্র, বনরাজি, নদী, লোকালয়
 অম্পষ্ট সকলি—যেন স্বর্ণ-চিত্রপটে
 শুধু নানা বর্ণসমাবেশ, চিত্ররেখা
 এখনো কোটে নি। যেন আকাজক্ষা আমারি
 শৈল-অন্তরাল ছেড়ে ধরণীর পানে
 চলেছে বিস্তৃত হয়ে হৃদয়ে বহিয়া
 কল্পনার স্বর্ণলেখা ছায়াস্ফুট ছবি।
 আহা হোথা কত দেশ, নব দৃশ্য কত,
 কত নব কীর্তি, কত নব রঙ্গভূমি।
 অনন্তের মূর্তি ধরে ওই মেঘ আসে
 মোদের করিতে গ্রাস। নাথ কাছে এস।
 আহা যদি চিরকাল এই মেঘমাঝে
 লুপ্ত বিশ্বে থাকিতাম তোমাতে আমাতে,
 ছুটি পাখি একমাত্র মহামেষনীড়ে।
 পারিতে থাকিতে ভূমি? মেঘ-আবরণ

রাজা ও রানী

৩১১

ভেদ করে কোথা হতে পশিত শব্দে
ধরার আহ্বান ; তুমি ছুটে চলে যেতে
আমারে ফেলিয়া রেখে প্রলয়ের মাঝে ।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা । কাশ্মীরে এসেছে দূত জালন্ধর হতে
গোপন সংবাদ লয়ে ।

কুমারসেন ।

তবে যাই, প্রিয়ে,

আবার আসিব কিরে পূর্ণিমার রাতে

নিয়ে যাব হৃদয়ের চিরপূর্ণিমারে—

হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে ।

[প্রস্থান

ইলা ।

যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব

তোমারে রাখিতে ধরে । হায়, কত ক্ষুদ্র,

কত ক্ষুদ্র আমি । কী বৃহৎ এ সংসার,

কী উদ্ধাম তোমার হৃদয় । কে জানিবে

আমার বিরহ । কে গনিবে অশ্রু মোর ।

কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে

শুভ্রহিয়া বালিকার মর্মকাতরতা ।

তৃতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর

যুবরাজের প্রাসাদ

কুমারসেন ও ছদ্মবেশী স্মিত্রা

কুমারসেন ।

কত যে আগ্রহ মোর কেমনে দেখাব

তোমারে ভগিনী । আমারে ব্যথিছে যেন

প্রত্যেক নিমেষ পল,—যেতে চাই আমি

৩১২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এখনি লইয়া সৈন্ত—দুর্বিনীত সেই
 দস্যুদের করিতে দমন, কাশ্মীরের
 কলঙ্ক করিতে দূর। কিন্তু পিতৃব্যের
 পাই নে আদেশ। ছদ্মবেশ দূর করে।
 বোন। চলো মোরা যাই দৌহে,—পড়ি গিয়ে
 রাজ্যের চরণে।

সুমিত্রা।

সে কী কথা, ভাই। আমি
 এসেছি তোমার কাছে, জানাতে তোমারে
 ভগিনীর মনোবাথা। আমি কি এসেছি
 জালন্ধর রাজ্য হতে ভিখারিনী রানী
 ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে?
 ছদ্মবেশ দিচ্ছে হৃদয়। আপনার
 পিতৃগৃহে আসিলাম এতদিন পরে
 আপনারে করিয়া গোপন! কতবার
 বৃদ্ধ শংকরের কাছে কণ্ঠ রুদ্ধ হল
 অশ্রুভরে,—কতবার মনে করেছিছু
 কাঁদিয়া তাহারে বলি—“শংকর, শংকর,
 তোদের সুমিত্রা সেই কিরিয়া এসেছে
 দেখিতে তোদের।” হায় বৃদ্ধ, কত অশ্রু
 ঝেলে গিয়েছিছু সেই বিদায়ের দিনে,
 মিলনের অশ্রুজল নারিলাম দিতে।
 শুধু আমি নহি আর কণ্ঠা কাশ্মীরের
 আজ আমি জালন্ধর-রানী।

হুমায়ুন।

বুঝিয়াছি

বোন। যাই দেখি, অল্প কী উপায় আছে।

রাজা ও রানী

৩১৩

চতুর্থ দৃশ্য

কাশ্মীর-প্রাসাদ

অন্তঃপুর

রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী ।

যেতে দাও মহারাজ । কা ভাবিছ বসি ?
 ভাবিছ কী লাগি ? যাক যুদ্ধে,—তার পরে
 দেবতা-রূপায়, আর যেন নাহি আসে
 কিরে ।

চন্দ্রসেন ।

ধীরে রানী, ধীরে ।

রেবতী ।

ক্ষুধিত মার্জার

বসে ছিলে এতদিন সময় চাহিয়া,
 আজ তো সময় এল—তবু আজো কেন
 সেই বসে আছ ।

চন্দ্রসেন ।

কে বসিয়া ছিল, রানী,
 কিসের লাগিয়া ।

রেবতী ।

ছি ছি, আবার ছলনা !

লুকাবে আমার কাছে ? কোন্ অভিপ্রায়ে
 এতদিন কুমারের দাও নি বিবাহ ।
 কেন বা সম্মতি দিলে ত্রিচূড়-রাজ্যের
 এই অনার্য প্রথায় । পঞ্চবর্ষ ধরে
 কষ্টার সাধনা ।

চন্দ্রসেন ।

ধিক্ । চূপ করো রানী—

কে বোঝে কাহার অভিপ্রায় ?

রেবতী ।

তবে, বুঝে

দেখো ভালো করে । যে কাজ করিতে চাও
 জেনে শুনে করো । আপনার কাছ হতে
 রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন ।
 দেবতা তোমার হয়ে অলক্ষ্য-সন্ধানে

৩১৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

করিবে না তব লক্ষ্যভেদ । নিজ হাতে
উপায় রচনা করো অবসর বুঝে ।
বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়,
তার পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ ।
কুমারে পাঠাও যুদ্ধে ।

চন্দ্রসেন ।

বাহিরে রয়েছে

কাশ্মীরের যত উপদ্রব । পর-রাজ্যে
আপনার বিষদন্ত করিতেছে ক্ষয় ।

বেবতী ।

ফিরিয়ে আনিতে চাও তাদের আবার ?
অনেক সময় আছে সে-কথা ভাবিতে ।
আপাতত পাঠাও কুমারে । প্রজাগণ
ব্যগ্র অতি যৌবরাজ্য-অভিষেক তরে,
তাদের খামাও কিছুদিন । ইতিমধ্যে
কত কী ঘটতে পারে পরে ভেবে দেখো ।

কুমারের প্রবেশ

বেবতী ।

(কুমারের প্রতি) যাও যুদ্ধে, পিতৃব্যের হয়েছে আদেশ
বিলম্ব ক'রো না আর, বিবাহ-উৎসব
পরে হবে । দীপ্ত যৌবনের তেজ ক্ষয়
করিয়ে না, গৃহে বসে আলস্ত-উৎসবে ।

কুমারসেন ।

জয় হোক, জয় হোক জননী তোমার ।
এ কী আনন্দ-সংবাদ । নিজমুখে তাত,
করহ আদেশ ।

চন্দ্রসেন ।

যাও তবে । দেখো বৎস,
থেকো সাবধানে । দর্পমদে ইচ্ছা করে
বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ । আশীর্বাদ করি
কিরে এসো জয়গর্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃসিংহাসন 'পরে ।

কুমারসেন ।

মাগি জননীর

আশীর্বাদ ।

রাজা ও রানী

৩১৫

রেবতী।

কী হইবে মিথ্যা আশীর্বাদে।

আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহ।

পঞ্চম দৃশ্য

ত্রিচূড়

ক্রীড়া-কানন

ইলার সখীগণ

প্রথম সখী। আলো কোথায় কোথায় দেবে ভাই?

দ্বিতীয় সখী। আলোর জন্তে ভাবি নে। আলো তো কেবল এক রাত্রি জলবে।

কিন্তু বাঁশি এখনো এল না কেন? বাঁশি না বাজলে আমোদ নেই ভাই।

তৃতীয় সখী। বাঁশি কাশ্মীর থেকে আনতে গেছে, এতক্ষণে এল বোধ হয়।
কখন বাজবে ভাই?

প্রথম সখী। বাজবে লো বাজবে। তোর অদৃষ্টেও একদিন বাজবে।

তৃতীয় সখী। পোড়াকপাল আর কি! আমি সেইজন্তেই ভেবে মরছি।

প্রথম সখীর গান

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে।

হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।

বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,

অধরে লাজ-হাসি সাজিবে।

নয়নে আঁখিজল করিবে ছল ছল,

সুখবেদনা মনে বাজিবে।

মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া

সেই চরণযুগ-রাজীবে।

দ্বিতীয় সখী। তোর গান রেখে দে। এক-এক বার মন কেমন হু হু করে
উঠছে। মনে পড়ছে কেবল একটি রাত আলো হাসি বাঁশি আর গান। তার
পরদিন থেকে সমস্ত অন্ধকার।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

৩১৬

প্রথম সখী। কাদবার সময় ঢের আছে বোন। এই দুটো দিন একটু হেসে আমোদ করে নে। ফুল যদি না শুকোত তাহলে আমি আজ থেকেই মালা গাঁথতে বসতুম।

দ্বিতীয় সখী। আমি বাসরঘর সাজাব।

প্রথম সখী। আমি সখীকে সাজিয়ে দেব।

তৃতীয় সখী। আর আমি কী করব ?

প্রথম সখী। ওলো, তুই আপনি সাজিস। দেখিস যদি যুবরাজের মন ভোলাতে পারিস।

তৃতীয় সখী। তুই তো ভাই চেষ্টা করতে ছাড়িস নি। তা তুই যখন পারবি নে তখন কি আর আমি পারব। ওলো, আমাদের সখীকে যে একবার দেখেছে তার মন কি আর অমনি পথেঘাটে চুরি যায়। ওই বাঁশি এসেছে। ওই শোন বেজে উঠেছে।

প্রথম সখীর গান

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে।

বনমাঝে, কি মনমাঝে ?

বসন্ত-বায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল !

বল গো সজ্জনী, এ সুখরঞ্জনী কোন্‌খানে উদিয়াছে,

বনমাঝে, কি মনমাঝে ?

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা মিছে মরি লোকলাজে।

কে জানে কোথা সে বিরহ-হৃতাশে ফিরে অভিসার-সাজে,

বনমাঝে, কি মনমাঝে ?

দ্বিতীয় সখী। ওলো থাম্—ওই দেখ্ যুবরাজ কুমারসেন এসেছেন।

তৃতীয় সখী। চল্ চল্ ভাই, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়াই গে। তোর পারিস, কিন্তু কে জানে ভাই, যুবরাজের সামনে যেতে আমার কেমন করে।

দ্বিতীয় সখী। কিন্তু কুমার আজ হঠাৎ অসময়ে এলেন কেন।

প্রথম সখী। ওলো এর কি আর সময়-অসময় আছে। রাজার ছেলে বলে কি পঞ্চশর ওকে ছেড়ে কথা কয়। থাকতে পারবে কেন।

তৃতীয় সখী। চল্ ভাই আড়ালে চল্।

[অন্তরালে গমন]

রাজা ও রানী

৩১৭

কুমারসেন ও ইলার প্রবেশ

ইলা ।

থাক নাথ, আর বেশি ব'লো না আমারে ।
কাজ আছে, যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে, তাই
বিবাহ স্থগিত হবে কিছুকাল। এর
বেশি কী আর শুনিব ।

কুমারসেন ।

এমন বিশ্বাস

মোর 'পরে রেখো চিরদিন । মন দিয়ে
মন বোঝা যায় ; গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে ।
প্রবাসীরা মনে ক'রো এই উপবনে,
এই নির্বারিণী-তীরে, এই লতাগৃহে,
এই সন্ধ্যালোকে, পশ্চিম-গগনপ্রান্তে
ওই সন্ধ্যাতারা পানে চেয়ে । মনে ক'রো,
আমিও প্রদোবে, প্রবাসে তরুর তলে
একেলা বসিয়া ওই তারকার 'পরে
তোমারি আঁখির তারা পেতেছি দেখিতে ।
মনে ক'রো মিশিতেছে এই নীলাকাশে
পুষ্পের সৌরভ সম তোমার আমার
প্রেম । এক চন্দ্র উঠিয়াছে উভয়ের
বিরহরজনী 'পরে ।

ইলা ।

জানি, জানি, নাথ,

জানি আমি তোমার হৃদয় ।

কুমারসেন ।

যাই তবে,

অগ্নি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের
মর্মস্বরূপিণী অগ্নি সবার অধিক ।

[প্রস্থান

সখীগণের প্রবেশ

দ্বিতীয় সখী । হায় এ কী শুনি ।

তৃতীয় সখী । সখী, কেন যেতে দিলে ।

প্রথম সখী । ভালোই করেছ । স্বচ্ছা না দিলে ছাড়ি

৩১৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বাধন ছিঁড়িয়া যায় চিরদিন তরে !
হায় সখী, হায় শেষে নিবাতে হল কি
উৎসবের দীপ ?

ইলা ।

সখী, তোরা চূপ কর,
টুটিছে হৃদয় । ভেঙে দে ভেঙে দে ওই
দীপমালা । বল সখী, কে দিবে নিবায়ে
লজ্জাহীনা পূর্ণিমার আলো ? কেন আজ
মনে হয়, আমার এ জীবনের সুখ
আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে ।
অমনি ইলারে কেন অন্তপথপানে
সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর

রণক্ষেত্র । শিবির

বিক্রমদেব ও সেনাপতি

সেনাপতি । বন্দীকৃত শিলাদিত্য, উদয়ভাস্কর ;
শুধু যুধাজিৎ পলাতক—সঙ্গে লয়ে
সৈন্যদলবল ।

বিক্রমদেব ।

চলো তবে অবিলম্বে
তাহার পশ্চাতে । উঠাও শিবির তবে ।
ভালোবাসি আমি এই ব্যগ্র উদ্ধৃৎস্বাস
মানব-মুগ্ধা ; গ্রাম হতে গ্রামান্তরে,
বন গিরি নদীতীরে দিবারাত্রি এই

রাজা ও রানী

৩১৯

কোঁশলে কোঁশলে খেলা। বাকি আছে আর
কে বা বিজ্রোহীদের ?

সেনাপতি।

শুধু জয়সেন।

কর্তা সে-ই বিজ্রোহের। সৈন্তবল তার
সব চেয়ে বেশি।

বিক্রমদেব।

চলো তবে সেনাপতি,
তার কাছে। আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম,
বুকে বুকে বাহতে বাহতে—অতি তীব্র
প্রেম-আলিঙ্গন সম। ভালো নাহি লাগে
অস্ত্রে অস্ত্রে যুদ্ধ বানবানি—ক্ষুদ্র যুদ্ধে
ক্ষুদ্র জয়লাভ।

সেনাপতি।

কথা ছিল আসিবে সে
গোপনে সহসা, করিবে পশ্চাৎ হতে
আক্রমণ ; বুঝি শেষে জাগিয়াছে মনে
বিপদের ভয়, সন্ধির প্রস্তাব তরে
হয়েছে উন্মুখ।

বিক্রমদেব।

ধিক, ভীক, কাপুরুষ।
সন্ধি নহে—যুদ্ধ চাই আমি। রক্তে রক্তে
মিলনের শ্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সংগীতের
ধ্বনি। চলো সেনাপতি।

সেনাপতি।

যে আদেশ প্রভু।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব।

এ কী মুক্তি। এ কী পরিত্রাণ। কী আনন্দ
হৃদয় মাঝারে। অবলার ক্ষীণ বাহ
কী প্রচণ্ড স্মৃতি হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবর মাঝে। উদ্দাম হৃদয়
অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা খুঁজে
ক্রমাগত যেতেছিল রসাতলপানে।
মুক্তি, মুক্তি আজি। শৃঙ্খল বন্দীরে
ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এতদিন

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত
 কীর্তি, কত রঙ্গ—কত কী চলিতেছিল
 কর্মের প্রবাহ—আমি ছিলাম অন্তঃপুরে
 পড়ে; রুদ্ধদল চম্পক-কোরক মাঝে
 সুপ্ত কীট সম। কোথা ছিল লোকলাজ,
 কোথা ছিল বীরপরাক্রম। কোথা ছিল
 এ বিপুল বিশ্বতটভূমি। কোথা ছিল
 হৃদয়ের তরঙ্গ-তর্জন। কে বলিবে
 আজি মোরে দীন কাপুরুষ। কে বলিবে
 অন্তঃপুরচারী। যুদ্ধ গন্ধবহ আজি
 জাগিয়া উঠিছে বেগে ঝঙ্কারায়ুর্কপে।
 এ প্রবল হিংসা ভালো, ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে,
 প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ !
 হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তির
 সূত্র। হিংসা জাগরণ। হিংসা স্বাধীনতা।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। আসিছে বিদ্রোহী সৈন্য।
 বিক্রমদেব। চলো তবে চলো।

চরের প্রবেশ

চর। রাজন, বিপক্ষদল নিকটে এসেছে।
 নাই বাণ, নাই জয়ধ্বজা, নাই কোনো
 যুদ্ধ-আশ্ফালন; মার্জনা-প্রার্থনা তরে
 আসিতেছে যেন।
 বিক্রমদেব। থাক, চাহি না শুনিতে
 মার্জনার কথা। আগে আমি আপনারে
 করিব মার্জনা; অপযশ রক্তশ্রোতে
 করিব ক্ষালন। যুদ্ধে চলো সেনাপতি।

রাজা ও রানী

৩২১

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

দ্বিতীয় চর। বিপক্ষ শিবির হতে আসিছে শিবিক।
বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।

সেনাপতি। মহারাজ,
তিলেক অপেক্ষা করো—আগে শোনা যাক
কী বলে বিপক্ষদূত—

বিক্রমদেব। যুদ্ধ তার পরে।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারানী এসেছেন বন্দী ক'রে লয়ে
যুধাজিৎ আর জয়সেনে।

বিক্রমদেব। কে এসেছে ?

সৈনিক। মহারানী।

বিক্রমদেব। মহারানী ! কোন্ মহারানী ?

সৈনিক। আমাদের মহারানী।

বিক্রমদেব। বাতুল উন্মাদ !

যাও সেনাপতি। দেখে এস কে এসেছে।

[সেনাপতি প্রভৃতির প্রস্থান]

মহারানী এসেছেন বন্দী ক'রে লয়ে
যুধাজিৎ জয়সেনে ! এ কি স্বপ্ন না কি !
এ কি রণক্ষেত্র নয় ? এ কি অন্তঃপুর ?
এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে
মগ্ন ? সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারানী, সেই
পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে ?
বন্দী ? কারে বন্দী ? কী গুণিতে কী গুনেছি ?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী ? দূত !
সেনাপতি ! কে এসেছে ? কারে বন্দী লয়ে ?

৩২২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি । মহারানী এসেছেন লয়ে কাশ্মীরের
সৈন্তদল—সোদর কুমারসেন সাথে ।
এসেছেন পথ হতে যুদ্ধে বন্দী করে
পলাতক যুধাজিৎ আর জয়সেনে ।
আছেন শিবিরদ্বারে সাক্ষাতের তরে
অভিলাষী ।

বিক্রমদেব । সেনাপতি, পালাও, পালাও ।
চলো, চলো সৈন্ত লয়ে—আর কি কোথাও
নাই শত্রু, আর কেহ নাই কি বিদ্রোহী ।
সাক্ষাৎ ? কাহার সাথে ? রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময় ।

সেনাপতি । মহারাজ—
বিক্রমদেব । চূপ করো সেনাপতি ;—শোনো যাহা বলি ।
রুদ্ধ করো দ্বার—এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ ।

সেনাপতি । যে আদেশ মহারাজ ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবদত্তের কুটির

দেবদত্ত ও নারায়ণী

দেবদত্ত । প্রিয়ে, তবে অল্পমতি করো—দাস বিদায় হয় ।
নারায়ণী । তা যাও না, আমি তোমাকে বেঁধে রেখেছি না কি ?
দেবদত্ত । ওই তো, ওইজন্তেই তো কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না—বিদায় নিয়েও
সুখ নেই । যা বলি তা করো । ওইখানটায় আছাড় খেয়ে পড়ো । বলে, হা
হতোহ্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে । হা ভগবন্ মকরকেতন ।

রাজা ও রানী

৩২৩

নারায়ণী। মিছে ব'কো না। মাথা খাও, সত্যি করে বলো, কোথায় যাবে ?

দেবদত্ত। রাজার কাছে।

নারায়ণী। রাজা তো যুদ্ধ করতে গেছে। তুমি যুদ্ধ করবে নাকি ? জ্যোৎস্নাচার্য হয়ে উঠেছ ?

দেবদত্ত। তুমি থাকতে আমি যুদ্ধ করব ? যা হোক, এবার যাওয়া যাক।

নারায়ণী। সেই অবধি তো ওই এক কথাই বলছ। তা' যাও না। কে তোমাকে মাথার দিবি দিয়ে ধরে রেখেছে ?

দেবদত্ত। হায় মকরকেতন, এখানে তোমার পুষ্পশরের কর্ম নয়—একেবারে আস্ত শক্তিশেল না ছাড়লে মর্মে গিয়ে পৌঁছয় না। বলি ও শিখরদশনা, পঙ্কবিধাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জলটল কিছু বেরোবে কি ? সেগুলো শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো—আমি উঠি।

নারায়ণী। পোড়া কপাল। চোখের জল ফেলব কী দুঃখে ? হাঁ গা, তুমি না গেলে কি রাজার যুদ্ধ চলবে না ? তুমি কি মহাবীর ধ্বংসোচন হয়েছ ?

দেবদত্ত। আমি না গেলে রাজার যুদ্ধ থামবে না। মন্ত্রী বার বার লিখে পাঠাচ্ছে রাজ্য ছারখারে যায় কিন্তু মহারাজ কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে চান না। এদিকে বিদ্রোহ সমস্ত ধেমে গেছে।

নারায়ণী। বিদ্রোহই যদি ধেমে গেল তো মহারাজ কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন ?

দেবদত্ত। মহারানীর ভাই কুমারসেনের সঙ্গে।

নারায়ণী। হাঁ গা, সে কী কথা। শ্রাণার সঙ্গে যুদ্ধ ? বোধ করি রাজায় রাজায় এইরকম করেই ঠাট্টা চলে। আমরা হলে শুধু কান মলে দিতুম। কী বল ?

দেবদত্ত। বড়ো ঠাট্টা নয়। মহারানী কুমারসেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিৎকে যুদ্ধে বন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ করতে দেন নি।

নারায়ণী। হাঁ গা, বল কী ! তা তুমি এতদিন যাও নি কেন। এ খবর শুনেও বসে আছ ? যাও, যাও, এখন যাও। আমাদের রানীর মতো অমন সতীলক্ষ্মীকে অপমান করলে ? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেছে।

দেবদত্ত। বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেছে—মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা—অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দেবে। একজন বিদ্রোহী এসে আমাদের অপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল—যেন তোমার নিজ রাজ্য নিয়ে জ

রবীন্দ্র-রচনাবলী

৩২৪

শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্তে অমনি কান্দীর খেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কী হতে পারে। এই শুনে মহারাজ আশ্চর্য হয়ে। কুমারসেনকে পাঁচটা ভৎসনা করে এক দূত পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুব-পুরুষ, সখ্য করতে পারবে কেন? বোধ করি সেও দূতকে ছ-কথা শুনিয়ে দিবে থাকবে।

নারায়ণী। তা বেশ তো—কুমারসেন তো রাজার পর নয় আপনার লোক, তা কথা চলছিল বেশ তাই চলুক। তুমি কাছে না থাকলে রাজার ঘটে কি দুটো কথাও জোগায় না? কথা বন্ধ করে অস্ত্র চালাবার দরকার কী বাপু। ওই ওভেই ভো হার হল।

দেবদত্ত। আসল কথা একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে পারছেন না। নানা ছিল অশ্বেষণ করছেন। রাজাকে সাহস করে দুটো ভালো কথা বলে এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি তো আর থাকতে পারছি নে—আমি চললুম।

নারায়ণী। যেতে ইচ্ছে হয় যাও, আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না। তা আমি বলে রাখলুম। এই রইল তোমার সমস্ত পড়ে রইল। আমি বিবাহী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত। রোসো, আগে আমি ফিরে আসি তার পর যেরো। বল তো আমি থেকে বাই।

নারায়ণী। না না তুমি যাও। আমি কি আর তোমাকে সত্যি থাকতে বলছি? ওগো তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মরব না, সেজন্তে ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে।

দেবদত্ত। তা কি আর আমি জানি নে? মলয়-সমীরণ তোমার কিছু করতে পারবে না। বিরহ তো সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না। [প্রস্থানোদ্ধ]

নারায়ণী। হে ঠাকুর, রাজাকে সুবুদ্ধি দাও ঠাকুর। নীত্র নীত্র ফিরিয়ে আনো।

দেবদত্ত। এ-ঘর ছেড়ে কখনো কোথাও যাই নি। হে ভগবান, এদের সকলকে উপর তোমার দৃষ্টি রেখো।

[প্রস্থান]

রাজা ও রানী.

৩২৫

তৃতীয় দৃশ্য

জালন্ধর

কুমারসেনের শিবির

কুমারসেন ও স্মিত্রা

স্মিত্রা ।

ভাই, রাজাকে মার্জনা করো ; করো রোষ
আমার উপরে : আমি মাঝে না থাকিলে
যুদ্ধ করে বীর নাম করিতে উদ্ধার ।
যুদ্ধের আহ্বান শুনে অটল রহিলে
তবু তুমি ; জানি না কি অসম্মান শেল
চিরজীবী মৃত্যুসম মানীর হৃদয়ে ?
আপন ভায়ের হৃদে দুর্ভাগিনী আমি
হানিতে দিলাম হেন অপমান-শর
যেন আপনারি হস্তে । মৃত্যু ভালো ছিল,
ভাই, মৃত্যু ভালো ছিল ।

কুমারসেন ।

জানিস তো বোন

যুদ্ধ বীরধর্ম বটে, ক্ষমা তার চেয়ে
বীরত্ব অধিক । অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া ?

স্মিত্রা ।

ধন্য, ভাই,

ধন্য তুমি । সঁপিলাম এ জীবন মোর
তোমার লাগিয়া । তোমার এ স্নেহস্থল
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ ?
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজ মাঝে—

কুমারসেন ।

আমি ভাই তোর ।

চল বোন, আমাদের সেই শৈলগৃহে
তুষারশিখরঘেরা শুভ্র স্নানীতল
আনন্দ-কাননে । ছুটি নির্ব্বয়ের মতো

৩২৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সুমিত্রা ।

একত্রে করেছি খেলা দুই ভাইবোনে,
 এখন আর কি ফিরে যেতে পারিবি নে
 সেই উচ্চ, সেই গুল শৈশব-শিখরে ?
 চলো ছাই, চলো । যে ঘরেতে ভাইবোনে
 করিতাম খেলা, সেই ঘরে নিয়ে এসো
 প্রেমসী নারীরে,—সন্ধ্যাবেলা বসে তারে
 তোমার মনের মতো সাজাব যতনে ।
 শিখাইয়া দিব তারে তুমি ভালোবাস
 কোন্ ফুল, কোন্ গান, কোন্ কাব্যরস ।
 শুনাব বাল্যের কথা ; শৈশব-মহত্ব
 তব শিশু হৃদয়ের ।

কুমারসেন ।

মনে পড়ে মোর,
 দৌহে শিখিতাম বাঁধা । আমি ধৈর্যহীন
 যেতেম পালায়ে । তুই শয্যাপ্রান্তে বসে
 কেশবেশ ভুলে গিয়ে সারা সন্ধ্যাবেলা
 বাজাতিস, গম্ভীর আনন্দমুখখানি ।
 সংগীতেরে করে তুলেছিলি তোর সেই
 ছোটো ছোটো অঙ্গুলির বশ ।

সুমিত্রা ।

মনে আছে,
 খেলা হতে ফিরে এসে শোনাতে আমারে
 অদ্ভুত কল্পনা-কথা ; কোথা দেখেছিলে
 অজ্ঞাত নদীর ধারে স্বর্ণ স্বর্গপুর,
 অলৌকিক কল্পকুঞ্জে কোথায় ফলিত
 অমৃতমধুর ফল ; ব্যথিত হৃদয়ে
 সবিস্ময়ে শুনিতাম ; স্বপ্নে দেখিতাম
 সেই কিন্নর-কানন ।

কুমারসেন ।

বলিতে বলিতে
 নিজের কল্পনা শেষে নিজেরে ছলিত ।
 সত্য মিথ্যা হত একাকার, মেঘ আর
 গিরির মতন ; দেখিতে পেতেম যেন

রাজা ও রানী

৩২৭

দূর শৈল পরপারে রহস্ত-নগরী।

শংকর আসিছে ওই ফিরে। শোনা যাক
কী সংবাদ।

শংকরের প্রবেশ

শংকর।

প্রভু তুমি, তুমি মোর রাজা,
ক্ষমা করো বৃদ্ধ এ শংকরে। ক্ষমা করো
রানী, দিদি মোর। মোরে কেন পাঠাইলে
দূত করে রাজার শিবিরে। আমি বৃদ্ধ,
নহি পটু সাবধান বচন-বিজ্ঞাসে,
আমি কি সহিতে পারি তব অপমান?
শাস্তির প্রস্তাব শুনে যখন হাসিল
ক্ষুদ্র জয়সেন, হাসিমুখে ভৃত্য যুধাজিৎ
করিল স্মৃতির উপহাস, সজ্জভঙ্গে
কহিলা বিক্রমদেব জালন্ধররাজ
তোমারে বালক, ভীক; মনে হল যেন
চারিদিকে হাসিতেছে সভাসদ যত
পরস্পর মুখ চেয়ে, হাসিতেছে দূরে
ঘারের গ্রহরী—পশ্চাতে আছিল বারা
তাদের নীরব হাসি ভুজঙ্গের মতো
যেন পৃষ্ঠে আসি মোর দংশিতে লাগিল।
তখন ভুলিয়া গেহু শিখেছিহু যত
শাস্তিপূর্ণ মৃদুবাণী। কহিলাম রোষে—
“কলহেরে জান তুমি বীরত্ব বলিয়া,
নারী তুমি, নহ ক্ষত্রবীর। সেই খেদে
মোর রাজা কোষে লয়ে কোষরুদ্ধ অসি
ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইহু সবে।”
শুনিয়া কম্পিততনু জালন্ধরপতি।
প্রস্তুত হতেছে সৈন্য।

অমিত্রা।

ক্ষমা করো ভাই।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

৩২৮

শংকর।

এই কি উচিত তব কাশ্মীর-তনয়া
তুমি ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমান-কথা? বীরের স্বধর্ম হতে
বিরত ক'রো না তুমি আপন ভ্রাতারে,
রাখো এ মিনতি।

সুমিত্রা।

ব'লো না, ব'লো না আর
শংকর। মার্জনা করো ভাই। পদতলে
পড়িলাম। ওই তব রুদ্ধ কম্পমান
রোষানল নির্বাণ করিতে চাও? আছে
মোর হৃদয়-শোণিত। মৌন কেন ভাই।
বাল্যকাল হতে আমি ভালোবাসা তব
পেয়েছি না চেয়ে, আজ আমি ভিক্ষা মাগি
ওই রোষ তব, দাও তাহা।

শংকর।

কুমারসেন।

শোনো প্রভু।
চূপ করো বৃদ্ধ। যাও তুমি, সৈন্তদের
জানাও আদেশ—এখনি ফিরিতে হবে
কাশ্মীরের পথে।

শংকর।

হায় এ কী অপমান,
পলাতক ভীকু বলে রটিবে অখ্যাতি।

সুমিত্রা।

শংকর, বারেক তুই মনে করে দেখ।
সেই ছেলেবেলা। ছুটি ছোটো ভাইবোনে
কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে।
তার চেয়ে বেশি হল খ্যাতি ও অখ্যাতি?
প্রাণের সম্পর্ক এ যে চিরজীবনের—
পিতা মাতা-বিধাতার আশীর্বাদে ঘেরা
পুণ্য স্নেহতীর্থধানি। বাহির হইতে
হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণ-ভূমি
শংকর, করিতে চাস অঙ্গার-মলিন?

শংকর।

চল্ দিদি, চল্ ভাই ফিরে চলে যাই
সেই শান্তিসুধানিধি বাল্যকালমাবে।

রাজা ও রানী

৩২৯

চতুর্থ দৃশ্য

বিক্রমদেবের শিবির

বিক্রমদেব, যুধাজিৎ ও জয়সেন

বিক্রমদেব । পলাতক অরাতিরে আক্রমণ করা
নহে ক্ষাত্তধর্ম ।

যুধাজিৎ । পলাতক অপরাধী
সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি, রাজদণ্ড
ব্যর্থ হয় তবে ।

বিক্রমদেব । বালক সে, শাস্তি তার
যথেষ্ট হয়েছে । পলায়ন, অপমান,
আর শাস্তি কিবা ?

যুধাজিৎ । গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের
বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান ।
সেথায় সে যুবরাজ, কে জানিবে তার
কলঙ্কের কথা ।

জয়সেন । চলো মহারাজ, চলো
সেই কাশ্মীরের মাঝে যাই,—সেথা গিয়ে
দোষীরে শাসন করে আসি ; সিংহাসনে
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ ।

বিক্রমদেব । তাই চলো ।
বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা কর । কার্ষতোতে
আপনারে ভাসাইয়া দিহু, দেখি কোথা
গিয়া পড়ি, কোথা পাই কুল ।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী । মহারাজ,
এসেছে সাক্ষাৎ তরে ব্রাহ্মণতনয়
দেবদত্ত ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বিক্রমদেব । - দেবদত্ত ? নিয়ে এস, নিয়ে
 এস তারে । না, না, রোসো, থামো, ভেবে দেখি ।
 কী লাগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ ? জানি তারে
 ভালোমতে । এসেছে সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে
 ফিরিতে আমারে । হায় বিপ্র, তোমরাই
 ভাঙিয়াছ বাঁধ, এখন প্রবল শ্রোত
 শুধু কি শস্ত্রের ক্ষেত্রে জলসেক করে
 ফিরে যাবে তোমাদের আবশ্যক বুঝে
 পোষমানা প্রাণীর মতন ? চূর্ণিবে সে
 লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশগ্রাম ।
 সকম্পিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে
 তোমরা চাহিয়া থাকো, আমি খেয়ে চলি
 কার্ধবেগে, অবিশ্রাম গতিসুখে ; মত্ত
 মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙে
 ছুটে চিরদিন । প্রচণ্ড আনন্দ অক্ষ,
 মুহূর্ত তাহার পরমায়ু ; তারি মধ্যে
 উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের স্মৃতি
 মত্ত করিওঁতে ছিন্ন রক্তপদ্ম সম ।
 বিচার বিবেক পরে হবে । চিরকাল
 জড় সিংহাসনে পড়ি করিব মন্ত্রণা ।
 চাহি না করিতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে ।

জয়সেন ।

যে আদেশ ।

বুধাজিৎ ।

(জনান্তিকে জয়সেনের প্রতি)

- ব্রাহ্মণেরে জেনো শত্রু বলে ।

বন্দী করে রাখো ।

জয়সেন ।

বিলক্ষণ জানি তারে ।

রাজা ও রানী

৩৩১

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশ্মীর । প্রাসাদ

রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী । যুদ্ধসজ্জা ? কেন যুদ্ধসজ্জা । শত্রু কোথা ।
মিত্র আসিতেছে । সমাদরে ডেকে আনো
তারে । করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন । রাজ্যরক্ষা তরে তুমি এত
ব্যস্ত কেন । এ কি তব আপনার ধন ।
আগে তারে নিতে দাও, তার পরে ফিরে
নিয়ো বন্ধুভাবে । তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার ।

চন্দ্রসেন । চূপ করো, চূপ করো,
ব'লো না অমন করে । কর্তব্য আমার
করিব পালন ; তার পরে দেখা যাবে
অদৃষ্ট কী করে ।

রেবতী । তুমি কী করিতে চাও
আমি জানি তাহা । যুদ্ধের ছলনা করে
পরাজয় মানিবারে চাও । তার পর
চারিদিক রক্ষা করে সুবিধা বুঝিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্য সাধন ।

চন্দ্রসেন । ছি ছি রানী, এ-সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার পরে ।
মনে হয় সত্য বুঝি এমনি পাষাণ
আমি ; আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে

৩৩২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সন্দেহ জনমে । কর্তব্যের পথ হতে
কিরায়ে না মোরে ।

রেবতী ।

আমিও পালিব তবে
কর্তব্য আপন । নিশ্বাস করিয়া রোধ
বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন ।
রাজ্য যদি না করিবে তারে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ । অরণ্যে গমন ভালো, মৃত্যু ভালো,
রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা
ধিক্ বিড়ম্বনা । জেনো তুমি, রাজভ্রাতা,
আমার গর্ভের ছেলে সহিবে না কভু
পরের শাসনপাশ ; সমস্ত জীবন
পরদত্ত সাজ পরে রহিবে না বসে,
রাজসভা-পুত্তলিকা হয়ে । আমি তারে
দিরেছি জনম, আমি তারে সিংহাসন
দিব,—নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব
তারে । নভুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে
দিবে অভিশাপ ।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী ।

যুবরাজ এসেছেন
রাজধানীমাঝে । আসিছেন অবিলম্বে
রাজসাক্ষাতের তরে ।

[প্রস্থান

রেবতী ।

অস্তুরালে রব
আমি । তুমি তারে ব'লো, অন্ত্রশস্ত্র ছাড়ি
জালন্ধর-রাজপদে অপরাধিভাবে
করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ ।

চন্দ্রসেন ।

যেয়ো না চলিয়া ।

রেবতী ।

পারি নে লুকাতে আমি
হৃদয়ের ভাব । স্নেহের ছলনা করা

রাজা ও রানী

৩৩৩

অসাঁধ্য আমার । তার চেয়ে অন্তরালে
গুপ্ত থেকে গুনি বসে তোমাদের কথা ।

[প্রস্থান

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ

কুমারসেন । প্রণাম ।

সুমিত্রা । প্রণাম তাত ।

চন্দ্রসেন : দীর্ঘজীবী হও ।

কুমারসেন । বহু পূর্বে পাঠিয়েছি সংবাদ, রাজন,
শত্রুসৈন্য আসিছে পশ্চাতে, আক্রমণ
করিতে কাশ্মীর । কই রণসজ্জা কই ।
কোথা সৈন্যবল ।

চন্দ্রসেন । শত্রুপক্ষ কারে বল ।

বিক্রম কি শত্রু হল ? জননী সুমিত্রা,
বিক্রম কি নহে বংশে কাশ্মীর-জামাতা ?
সে যদি আসিল গৃহে এতকাল পরে,
অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ ?

সুমিত্রা । হায় তাত, মোরে কিছু ক'রো না জিজ্ঞাসা ।

আমি হুর্ভাগিনী মারী কেন আসিলাম
অন্তঃপুর ছাড়ি । কোথা লুকাইয়া ছিল
এত অকল্যাণ । অবলা নারীর ক্ষীণ
ক্ষুদ্র পদক্ষেপে সহসা উঠিল রুঘি
সর্প শতফণা । মোরে কিছু শুধায়ো না ।
বুদ্ধিহীন আমি । তুমি সব জান ভাই ।
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে
মৌন ছায়া । তুমি জান সংসারের গতি,
আমি শুধু তোমারেই জানি ।

কুমারসেন ।

মহারাজ,

আমাদের শত্রু নহে জালন্ধরপতি ;
নিতান্তই আপনার জন । কাশ্মীরের

রবীন্দ্র-রচনাবলী

শত্রু তিনি, আসিছেন শত্রুভাব ধরি ।
 অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান,
 কেমনে উপেক্ষা করি রাজ্যের বিপদ ।
 চন্দ্রসেন । সেজন্য ভেবো না বৎস, যথেষ্ট রয়েছে
 বল । কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই
 নাই ।

কুমারসেন । মোর হাতে দাও সৈন্যভার ।

চন্দ্রসেন । দেখা
 যাবে পরে । আগে হতে প্রস্তুত হইলে
 অকারণে জেগে ওঠে যুদ্ধের কারণ ।
 আবশ্যক কালে তুমি পাবে সৈন্যভার ।

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী । কে চাহিছে সৈন্যভার ?

সুমিত্রা ও কুমারসেন । প্রণাম জননী ।

রেবতী । যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তুমি এসেছ পলায়ে,
 নিতে চাও অবশেষে ঘরে ফিরে এসে
 সৈন্যভার ? তুমি রাজপুত্র ? তুমি চাও
 কাশ্মীরের সিংহাসন ? ছি ছি লজ্জাহীন ।
 বনে গিয়ে থাকো লুকাইয়া । সিংহাসনে
 বসো যদি, বিশ্বশত্রু সকলে দেখিবে
 কনককিরীটচূড়া কলঙ্কে অঙ্কিত ।

কুমারসেন । জননী, কী অপরাধ করেছি চরণে ?
 কী কঠিন বচন তোমার । এ কি মাতা
 স্নেহের ভংগনা । বহুদিন হতে তুমি
 অপ্রসন্ন অভাগার 'পরে । রোষদীপ্ত
 দৃষ্টি তব বিধে মোর মর্মস্থলে সদা ;
 কাছে গেলে চলে যাও কথা না কহিয়া
 অশ্রু ধরে ; অকারণে কহ তীব্র বাণী ।

রাজা ও রানী

৩৩৫

বলো মাতা, কী করিলে আমারে তোমার
আপন সন্তান বলে হইবে বিশ্বাস ।

রেবতী ।

বলি তবে ?

চন্দ্রসেন ।

ছি ছি, চূপ করো রানী ।

কুমারসেন ।

মাতঃ,

অধিক কহিতে কথা নাহিক সময় ।
দ্বারে এল শত্রুদল আমারে করিতে
আক্রমণ । তাই আমি সৈন্ত ভিক্ষা মাগি ।
তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধিভাবে
জালন্ধর-রাজকরে করিব অর্পণ ।

রেবতী ।

মার্জনা করেন ভালো, নতুবা যেমন
বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে ।
ধিক পাপ । চূপ করো মাতা । নারী হয়ে
রাজকার্যে দিয়ো না দিয়ো না হাত । ঘোর
অমঙ্গলপাশে সবারে আনিবে টানি,
আপনি পড়িবে । হেথা হতে চলো কিরে
দয়ামায়াহীন ওই সদা ঘূর্ণমান
কর্মচক্রে ছাড়ি । তুমি শুধু ভালোবাসো,
শুধু স্নেহ করো, দয়া করো, সেবা করো,—
জননী হইয়া থাকো প্রাসাদ-মাঝারে ।
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব রাজ্যরক্ষা আমাদের কার্য
নহে ।

কুমারসেন ।

কাল যায়, মহারাজ, কী আদেশ ।

চন্দ্রসেন ।

বৎস তুমি অনভিজ্ঞ, মনে কর তাই
শুধু ইচ্ছামাত্রে সব কার্য সিদ্ধ হয়
চক্ষুর নিমেঘে । রাজকার্য মনে রেখো
স্বকঠিন অতি । সহস্রের গুণাগুণ
কেমনে করিব স্থির মুহূর্তের মাঝে ।

কুমারসেন ।

নির্দয় বিলম্ব তবে পিতঃ । বিপদের
মুখে মোরে ফেলি অনায়াসে, স্থিরভাবে

৩৩৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বিচার-মন্ত্রণা ? প্রণাম, বিদায় হই।

[স্মৃতিত্রাকে লইয়া প্রস্থান

চন্দ্রসেন।

তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
 কুমারের 'পরে ; প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
 ডেকে নিয়ে বেঁধে তারে রাখি বক্ষ মাঝে,
 স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাত-বেদনা।

য়েবতী।

শিশু তুমি ! মনে কর আঘাত না করে
 আপনি ভাঙিবে বাধা ? পুরুষের মতো
 যদি তুমি কার্কে দিতে হাত, আমি তবে
 দয়ামায়া করিতাম ঘরে বসে বসে
 অবসর বুঝে। এখন সময় নাই।

[প্রস্থান

চন্দ্রসেন।

অতি-ইচ্ছা চলে অতি-বেগে। দেখিতে না
 পায় পথ, আপনারে করে সে নিষ্ফল।
 বায়ুবেগে ছুটে গিয়ে মত্ত অশ্ব যথা
 চূর্ণ করে ফেলে রথ পাশাণ-প্রাচীরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর। হাট

লোকসমাগম

প্রথম। কেমন হে খুড়ো, গোলা ভরে ভরে যে গম জমিয়ে রেখেছিলে, আর
 বেচবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন।

দ্বিতীয়। না বেচলে কি আর রক্ষা আছে। এদিকে জালন্ধরের সৈন্ত এল
 বলে। সমস্ত লুটে নেবে। আমাদের এই মহাজনদের বড়ো বড়ো গোলা আর
 মোটা মোটা পেট বেবাক ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুট দুয়েরই জায়গা থাকবে না।

রাজা ও রানী

৩৩৭

মহাজন। আচ্ছা ভাই আমোদ করে নে। কিন্তু শিগগির তোদের ওই দাঁতের পাটি ঢাকতে হবে। শূতো সকলেরই উপর পড়বে।

প্রথম। সেই সুখেই তো হাসছি বাবা। এবারে তোমায় আমার একসঙ্গে মরব। তুমি রাখতে গম জমিয়ে, আর আমি মরতুম পেটের জালায়। সেইটেই হবে না। এবার তোমাকেও জালা ধরবে। সেই শুকনো মুখখানি দেখে যেন মরতে পারি।

দ্বিতীয়। আমাদের ভাবনা কী ভাই। আমাদের আছে কী। প্রাণখানা এমনও বেশিদিন টিকবে না, অমনেও বেশিদিন টিকবে না। এ কটা দিন কমে মজা করে নে রে ভাই।

প্রথম। ও জনার্দন, এতগুলি থলে এনেছ কেন। কিছু কিনবে নাকি।

জনার্দন। একেবারে বছরখানেকের মতো গম কিনে রাখব।

দ্বিতীয়। কিনলে যেন, রাখবে কোথায়।

জনার্দন। আজ রাত্তিরেই আমার বাড়ি পালাচ্ছি।

প্রথম। আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছলে তো! পথে অনেক মামা বসে আছে, আদর করে ডেকে নেবে।

কোলাহল করিতে করিতে এক দল

লোকের প্রবেশ

পঞ্চম। ওরে কে তোরা লড়াই করতে চাস, আর।

প্রথম। রাজি আছি; কার সঙ্গে লড়তে হবে বলে দে।

পঞ্চম। খুড়ো-রাজা জালন্ধরের সঙ্গে ষড় করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।

দ্বিতীয়। বটে। খুড়ো-রাজার দাড়িতে আমরা মশাল ধরিয়ে দেব।

অনেকে। আমাদের যুবরাজকে আমরা রক্ষা করব।

পঞ্চম। খুড়ো-রাজা গোপনে যুবরাজকে বন্দী করতে চেষ্টা করেছিল, তাই আমরা যুবরাজকে লুকিয়ে রেখেছি।

প্রথম। চল ভাই, খুড়ো-রাজাকে গুঁড়ো করে দিয়ে আসি গে।

দ্বিতীয়। চল ভাই, তার মুণ্ডুখানা খসিয়ে তাকে মুড়ো করে দিই গে।

পঞ্চম। সে-সব পরে হবে রে। আপাতত লড়তে হবে।

প্রথম। তা লড়ব। এই হাট থেকেই লড়াই শুরু করে দেওয়া যাক না।

৩৩৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথমে ওই মহাজনদের গমের বস্তাগুলো লুটে নেওয়া যাক। তার পরে যি আছে, চামড়া আছে, কাপড় আছে।

যষ্ঠের প্রবেশ

যষ্ঠ। শুনেছিস, যুবরাজ লুকিয়েছেন শুনে জালন্ধরের রাজা রটিয়েছে যে ত্বর সন্ধান বলে দেবে তাকে পুরস্কার দেবে।

পঞ্চম। তোর এ-সব খবরে কাজ কী ?

দ্বিতীয়। তুই পুরস্কার নিবি নাকি ?

প্রথম। আয় না ভাই, ওকে সবাই মিলে পুরস্কার দিই। যা হয় একটা কাজ অসম্ভব করে দেওয়া যাক। চুপ করে বসে থাকতে পারি নে।

যষ্ঠ। আমাকে মারিস নে ভাই, দোহাই বাপসকল। আমি তোদের সাবধান করে দিতে এসেছি।

দ্বিতীয়। বেটা তুই আপনি সাবধান হ।

পঞ্চম। এ খবর যদি তুই রটাবি তাহলে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

দূরে কোলাহল

অনেকে মিলিয়া। এসেছে—এসেছে।

সকলে। ওরে এসেছে রে, জালন্ধরের সৈন্ত এসে পৌঁছেছে।

প্রথম। তবে আর কী। এবারে লুট করতে চললুম। ওই, জনার্দন খলে ভরে গোকর পিঠে বোঝাই করছে। এই বেলা চন্। ওই জনার্দনটাকে বাদ দিয়ে বাকি কটা গরু বোঝাইসুদ্ধ তাড়া করা যাক।

দ্বিতীয়। তোরা যা ভাই। আমি তামাশা দেখে আসি। সার বেঁধে খোলা তলোয়ার হাতে যখন সৈন্ত আসে আমার দেখতে বড়ো মজা লাগে।

গান

যমের দুয়োর খোলা পেয়ে

ছুটেছে সব ছেলেমেয়ে।

হরিবোল হরিবোল।

রাজ্য জুড়ে মন্ত খেলা

মরণ-বাঁচন অবহেলা,

রাজা ও রানী

৩৩৯

ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে
 সুখ আছে কি মরার চেয়ে ।
 হরিবোল হরিবোল ।
 বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক,
 ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
 এখন কাজকর্ম চুলোতে যাক.
 কেজো লোক সব আয় রে খেয়ে ।
 হরিবোল হরিবোল ।
 রাজা প্রজা হবে জড়ো,
 থাকবে না আর ছোটো বড়ো,
 একই শ্রোতের মুখে ভাসবে সুখে
 বৈতরণীর নদী বেয়ে ।
 হরিবোল হরিবোল ।

তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিচূড় । প্রাসাদ

অমররাজ ও কুমারসেন

অমররাজ । পালাও, পালাও । এসো না আমার রাজ্যে ।
 আপনি মজিবে তুমি আমারে মজাবে ।
 তোমারে আশ্রয় দিয়ে চাহি নে হইতে
 অপরাধী জালন্ধররাজ কাছে । হেথা
 তব নাহি স্থান ।

কুমারসেন । আশ্রয় চাহি নে আমি ।
 অনিশ্চিত অদৃষ্টের পারাবার মাঝে
 ভাসাইব জীবন-তরণী,—তার আগে
 ইলারে দেখিয়া যাব একবার শুধু
 এই ভিক্ষা মাগি ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ইলারে দেখিয়া যাবে ?
 অমররাজ । কী হইবে দেখে তারে । কী হইবে দেখা
 দিবে । স্বার্থপর । রয়েছে মৃত্যুর মুখে
 অপমান বহি—গৃহহীন আশাহীন,
 কেন আসিয়াছ ইলার হৃদয় মাঝে
 জাগাতে প্রেমের স্মৃতি ।

কেন আসিয়াছি ?
 কুমারসেন ।

হায়, আর্ষ, কেমনে তা বোঝাব তোমায় ।
 অমররাজ । বিপদের খরস্রোতে ভেসে চলিয়াছ,
 তুমি কেন চাহিছ ধরিতে ক্ষীণপ্রাণ
 কুসুমিত তীর-লতা ? যাও, ভেসে যাও ।

কুমারসেন । আমার বিপদ আজ দৌহার বিপদ,
 মোর দুঃখ দুঃজন্য দুঃখ । প্রেম শুধু
 সম্পদের নহে । মহারাজ, একবার
 বিদায় লইতে দাও হৃদয়ের তরে ।

অমররাজ । চিরকাল তরে তুমি লয়েছ বিদায় ।
 আর নহে । যাও চলে । ভুলে যেতে দাও
 তারে অবসর । হাসিমুখখানি তার
 দিয়ো না আঁধার করি এ-জন্মের মতো ।

কুমারসেন । ভুলিতে পারিত যদি দিতাম ভুলিতে ।
 কিরে এসে দেখা দিব বলে গিয়েছিলু ;
 জানি সে রয়েছে বসি আমার লাগিয়া
 পথপানে চাহি, আমারে বিশ্বাস করি ।
 সে সরল সে অগাধ বিশ্বাস তাহার—
 কেমনে ভাঙিতে দিব ।

অমররাজ । সে বিশ্বাস ভেঙে

যাক একবার । নতুবা নূতন পথে
 জীবন তাহার কিরাতে সে পারিবে না ।
 চিরকাল দুঃখতাপ চেয়ে কিছুকাল
 এ যজ্ঞা ভালো ।

রাজা ও রানী

৩৪১

কুমারসেন ।

তার সুখদুঃখ তুমি
 দিয়েছ আমার হাতে, কিছুতে কিরায়ে
 নিতে পারিবে না আর । তারে তুমি আর
 নাহি জান । তারে আর নারিবে বুঝিতে ।
 তুমি যারে সুখদুঃখ বলে মনে কর
 তাঁর সুখদুঃখ তাহা নহে । একবার
 দেখে যাই তারে ।

অমররাজ ।

আমি তারে জানায়েছি
 কান্ধীরে রয়েছে তুমি রাজমর্বাদায়,
 ক্ষুদ্র বলে আমাদের অবহেলা করে ;
 বিদেশে সংগ্রামযাত্রা মিছে ছল শুধু
 বিবাহ ভাঙিতে ।

কুমারসেন ।

ধিক, ধিক প্রতারণা ।
 সরল বালিকা সে কি তোমার দুহিতা ?
 এ নিষ্ঠুর মিথ্যা তারে কহিলে যখন
 বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল ? শিরে তব
 বজ্র পড়িল না ভেঙে ? এখনো সে বেঁচে
 রয়েছে কি ? যেতে দাও, যেতে দাও মোরে—
 দিবে না কি যেতে ? হানো তবে তরবারি—
 ব'লো তারে মরে গেছি আমি । প্রতারণা
 ক'রো না তাহারে ।

শংকরের প্রবেশ

শংকর ।

আসিছে সন্ধানে তব
 শত্রুচর, পেয়েছি সংবাদ । এইবেলা
 চলো যাই ।

কুমারসেন ।

কোথা যাব । কী হবে লুকায়ে ।
 এ জীবন পারি নে বহিতে ।

শংকর ।

বনপ্রান্তে
 তোমার অপেক্ষা করি আছেন স্মিত্রী ।

৩৪২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কুমারসেন।

চলো, যাই চলো। ইলা, কোথা আছ ইলা ?
 ফিরে গেছ দুয়ারে আসিয়া। দুর্ভাগ্যের
 দিনে, জগতের চারিদিকে রুদ্ধ হয়
 আনন্দের দ্বার। প্রিয়ে, হতভাগ্য আমি,
 তাই বলে নহি অবিশ্বাসী। চলো, যাই।

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিচূড়। অন্তঃপুর

ইলা ও সখীগণ

ইলা।

মিছে কথা, মিছে কথা। তোরা চূপ কর।
 আমি তার মন জানি। সখী, ভালো করে
 বেঁধে দে কবরী মোর ফুলমালা দিয়ে।
 নিয়ে আয় সেই নীলাঘর। স্বর্ণধালে
 আনু তুলে শুভ্র ফুল মালতীর ফুল।
 নির্ঝরিতীরে ওই বকুলের তলা
 ভালো সে বাসিত; ওইখানে শিলাতলে
 পেতে দে আসনখানি। এমনি যতনে
 প্রতিদিন করি সাজ, এমনি করিয়া
 প্রতিদিন থাকি বসে, কে জানে কখন
 সহসা আসিবে ফিরে প্রিয়তম মোর।
 এসেছিল আমাদের মিলন দেখিতে
 পরে পরে ছুটি পূর্ণিমার রাত, অন্ত
 গেছে নিরাশ হইয়া। মনে স্থির জানি
 এবার পূর্ণিমা-নিশি হবে না নিষ্ফল।
 আসিবে সে দেখা দিতে। না-ই যদি আসে
 তোদের কী! আমারে সে ভুলে যায় যদি

রাজা ও রানী

৩৪৩

আমিই সে বুঝিব অন্তরে। কেনই বা
 না তুলিবে, কী আছে আমার। ভুলে যদি
 স্মৃতি হয় সেই ভালো—ভালোবেসে যদি
 স্মৃতি হয় সেও ভালো। তোরা সখী, মিছে
 বকিস নে আর। একটুকু চূপ কর।

গান

আমি নিশিদিন তোমার ভালোবাসি
 তুমি অবসরমতো বাসিয়ে।
 আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
 তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ে।
 আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া
 রব বিরহ-শয়নে জাগিয়া,
 তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
 এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ে।
 তুমি চিরদিন মধু-পবনে
 চির- বিকশিত বন-ভবনে
 যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া,
 তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ে।
 যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
 তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
 যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী,
 মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ে ॥

পঞ্চম দৃশ্য

কাশ্মীর । শিবির

বিক্রমদেব, জয়সেন ও যুধাজিৎ

- জয়সেন । কোথায় সে পালাবে রাজন ! ধরে এনে
দিব তারে রাজপদে । বিবর-দুয়ারে
অগ্নি দিলে বাহিরিয়া আসে ভুজঙ্গম
উত্তাপকাতর । সমস্ত কাশ্মীর ঘিরি
লাগাব আগুন ; আপনি সে ধরা দিবে ।
- বিক্রমদেব । এতদূর এল পিছে পিছে, — কত বন,
কত নদী, কত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ভাঙি ;
আজ সে পালাবে হাত ছেড়ে ? চাহি তারে,
চাহি তারে আমি । সে না হলে সুখ নাই
নিদ্রা নাই মোর । শীঘ্র না পাইলে তারে,
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি
দেখিব কোথা সে আছে ।
- যুধাজিৎ । ধরিবারে তারে
পুরস্কার করেছি ঘোষণা ।
- বিক্রমদেব । তারে পেলে
অন্ত কার্বে দিতে পারি হাত । রাজ্য মোর
রয়েছে পড়িয়া ; শূন্যপ্রায় রাজকোষ ;
হুভিক্ষ হয়েছে রাজা অরাজক দেশে ;
ফিরিতে পারি নে তবু । এ কী দৃঢ়পাশে
আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক ।
সচকিতে সদা মনে হয়, এই এল,
এই এল, ওই দেখা যায়, ওই বুঝি
উড়ে ধূলা, আর দেরি নাই, এইবার

রাজা ও রানী

৩৪৫

বুঝি পাব তারে ধাবমান ঘনশ্বাস
 ত্রস্ত-আঁখি মৃগ সম । শীঘ্র আনো তারে
 জীবিত কি মৃত । ছিন্নভিন্ন হয়ে থাক
 মায়াপাশ । নতুবা যা কিছু আছে মোর
 সব যাবে অধঃপাতে ।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী ।

রাজা চন্দ্রসেন,
 মহিষী রেবতী, এসেছেন ভেটবার
 তরে ।

বিক্রমদেব ।

তোমরা সরিয়া যাও ।
 (প্রহরীকে) নিষে এস
 তাঁহাদের প্রণাম জানানো ।

[অগ্নি সকলের প্রস্থান
 কী বিপদ ।

আসিছেন শাশুড়ী আমার । কী বলিব
 গুধাইলে কুমারের কথা । কী বলিব
 মার্জনা চাহেন যদি যুবরাজ তরে,
 সহিতে পারি নে আমি অশ্রু রমণীর ।

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রবেশ

প্রণাম । প্রণাম আর্ষা ।

চন্দ্রসেন ।

চিরজীবী হও ।

রেবতী ।

জয়ী হও পূর্ণ হোক মনস্কাম তব ।

চন্দ্রসেন ।

গুনেছি তোমার কাছে কুমার হয়েছে
 অপরাধী ।

বিক্রমদেব ।

অপমান করেছে আমারে ।

চন্দ্রসেন ।

বিচারে কী শাস্তি তার করেছ বিধান ।

বিক্রমদেব ।

বন্দিভাবে অপমান করিলে স্বীকার,
 করিব মার্জনা ।

৩৪৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রেবতী।

এই শুধু? আর কিছু
নয়? অবশেষে মার্জনা করিবে যদি
তবে কেন এত ক্লেশে এত সৈন্ত লয়ে
এত দূরে আসা।

বিক্রমদেব।

ভংসনা ক'রো না মোরে।
রাজার প্রধান কাজ আপনার মান
রক্ষা করা। যে মন্তক মুকুট বহিছে
অপমান পারে না বহিতে। মিছে কাজে
আসি নি হেথায়।

চন্দ্রসেন।

ক্ষমা তারে করো, বংস,
বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
রাজ্য হতে করিয়ো বঞ্চিত—কেড়ে নিয়ো
সিংহাসন-অধিকার। নির্বাসন সেও
ভালো, প্রাণে বধিয়ো না।

বিক্রমদেব।

চাহি না বধিতে।

রেবতী।

তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া।
এত অগ্নি শর? নির্দোষী সৈনিকদের
বধ করে যাবে, যথার্থ যে জন দোষী,
ক্ষমিবে তাহারে?

বিক্রমদেব।

বুঝিতে পারি নে দেবী,
কী বলিছ তুমি।

চন্দ্রসেন।

কিছু নয়, কিছু নয়।
আমি তবে বলি বুঝাইয়া। সৈন্ত যবে
মোর কাছে মাগিল কুমার আমি তারে
কহিলাম বিক্রম স্নেহের পাত্র মোর;
তার সনে যুদ্ধ নাহি সাজে। সেই ক্ষোভে
ক্রুদ্ধ যুবা প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়া
বিদ্রোহে করিল উত্তেজিত। অসম্ভব
মহারানী তাই; রাজবিদ্রোহীর শাস্তি
করিছে প্রার্থনা তোমা কাছে। গুরুদণ্ড

রাজা ও রানী

৩৪৭

বিক্রমদেব । দিয়ে না তাহারে, সে যে অবোধ বালক ।
আগে তারে বন্দী করে আনি । তার পরে
যথাযোগ্য করিব বিচার ।

রেবতী । প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে । আশুন জালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের । শস্ত্রক্ষেত্র করে
ছারখার । ক্ষুধা-রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির ।

চন্দ্রসেন । চূপ করো চূপ করো রানী । চলো বৎস,
শিবির ছাড়িয়া চলো কাশ্মীর-প্রাসাদে ।

বিক্রমদেব পরে যাব, অগ্রসর হও মহারাজ ।

[চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রস্থান]

ওরে হিংস্র নারী ! ওরে নরকাগ্নিশিখা !
বন্ধুত্ব আমার সনে ! এতদিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্তিখান
দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে ।
অমনি শাপিত ক্রুর বক্র জালারেখা
আছে কি ললাটে মোর । রুদ্ধ হিংসাভারে
অধরের দুই প্রান্ত পড়েছে কি ভুয়ে ।
অমনি কি তীক্ষ্ণ মোর উষ্ণ তিক্ত বাণী
খুণীর ছুরির মতো বাঁকা বিষমাখা ।
নহে নহে কভু নহে । এ হিংসা আমার
চোর নহে, ক্রুর নহে, নহে ছদ্মবেশী ।
প্রচণ্ড প্রেমের মতো প্রবল এ জালা
অভ্রভেদী সর্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ
হুর্নিবার । নহি আমি তোদের আত্মীয় ।
হে বিক্রম, ক্ষান্ত করো এ সংহার খেলা ।
এ শ্মশান-নৃত্য তব থামাও থামাও,
নিবাও এ চিতা । পিশাচ-পিশাচী যত
অতৃপ্ত হৃদয়ে লয়ে দীপ্ত হিংসাতৃষা

৩৪৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ফিরে যাক রুদ্ধ রোষে, লালায়িত লোভে ।
 এক দিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি
 তোমাদের কেহ । নিরাশ করিব এই
 শুণ্ড লোভ, বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা ।
 দেখিব কেমন করে আপনার বিষে
 আপনি জলিয়া মরে নর-বিষধর ।
 রমণীর হিংস্র মুখ স্থচিময় যেন—
 কী ভীষণ, কী নিষ্ঠুর, একান্ত কুংসিত ।

চরের প্রবে

চর । ত্রিচূড়ের অভিমুখে গেছেন কুমার ।
 বিক্রমদেব । এ সংবাদ রাখিলো গোপনে । একা আমি
 যাব সেথা যুগ্মস্বার ছলে ।
 চর । যে আদেশ ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অরণ্য

শুষ্ক পর্ণশয্যায় কুমারসেন শয়ান, স্মিত্রা আসীন

কুমারসেন । কত রাত্রি ?
 স্মিত্রা । রাত্রি আর নাই ভাই । রাঙা
 হয়ে উঠেছে আকাশ । শুধু বনচ্ছায়া
 অন্ধকার রাখিয়াছে বেঁধে ।
 কুমারসেন । সারা রাত্রি
 জেগে বসে আছ, বোন, ঘুম নেই চোখে ?
 স্মিত্রা । আগিয়াছি দৃশ্যপন দেখে । সারা রাত
 মনে হয় গুনি যেন পদশব্দ কার ।

রাজা ও রানী

৩৪৯

শুধু পল্লবের 'পরে। তরু-অন্তরালে
 শুনি যেন কাহাদের চুপি চুপি কথা
 বিজন মন্ত্রণা। শ্রান্ত আঁখি যদি কভু
 মুদে আসে, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে
 জেগে উঠি। স্মৃতিস্মৃতি মুখখানি তব
 দেখে পুন প্রাণ পাই প্রাণে।

কুমারসেন।

দুর্ভাবনা

দুঃস্বপ্ন-জননী। ভেবো না আমার তরে
 বোন। স্মৃতি আঁখি। স্বপ্ন হয়ে জীবনের
 মাঝখানে, কে জেনেছে জীবনের স্মৃতি ?
 মরণের তটপ্রান্তে বসে, এ যেন গো
 প্রাণপণে জীবনের একান্ত সম্ভোগ।
 এ সংসারে যত স্মৃতি, যত শোভা, যত
 প্রেম আছে, সকলি প্রগাঢ় হয়ে যেন
 আমারে করিছে আলিঙ্গন। জীবনের
 প্রতি বিন্দুটিতে যত মিষ্ট আছে, সব
 আমি পেতেছি আশ্বাস। ঘন বন,
 তুঙ্গ শৃঙ্গ, উদার আকাশ, উচ্ছ্বসিত
 নির্ঝরিনী, আশ্চর্য এ শোভা। অযাচিত
 ভালোবাসা অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টিসম
 অবিভ্রাম হতেছে বর্ষণ। চারিদিকে
 ভক্ত প্রজাগণ। তুমি আছ প্রীতিময়ী
 শিয়রে বসিয়া। উড়িবার আগে বুঝি
 জীবন-বিহঙ্গ বিচিত্র-বরন পাখা
 করিছে বিস্তার। ওই শোনো কাঠুরিয়া
 গান গায়; শোনা যাবে রাজ্যের সংবাদ।

কাঠুরিয়ার প্রবেশ ও গান

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে।
 বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে।

৩৫০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সিংহাসনে বসাইতে

হৃদয়খানি দেব পেতে,

অভিষেক করব তোমায় আখিজলে ।

কুমারসেন । (অগ্রসর হইয়া) বন্ধু, আজি কী সংবাদ ?

কাঠুরিয়া ।

ভালো নয় প্রভু ।

জয়সেন কাল রাত্রে জালায়ে দিয়েছে

নন্দীগ্রাম ; আজ আসে পাণ্ডুপুর পানে ।

কুমারসেন ।

হায়, ভক্ত প্রজা মোর, কেমনে তোদের

রক্ষা করি ? ভগবান, নির্দয় কেন গো

নির্দোষ দীনের 'পরে ?

কাঠুরিয়া ।

(স্মৃতিজার প্রতি) জননী, এনেছি

কাষ্ঠভার, রাখি শ্রীচরণে ।

স্মৃতিজা ।

বেঁচে থাক ।

[কাঠুরিয়ার প্রস্থান]

মধুজীবীর প্রবেশ

কুমারসেন ।

কী সংবাদ ?

মধুজীবী ।

সাবধানে থেকো যুবরাজ ।

তোমাংরে যে ধরে দেবে জীবিত কি মৃত

পুরস্কার পাইবে সে, ঘোষণা করেছে

যুধাজিৎ । বিশ্বাস ক'রো না কারে প্রভু ।

কুমারসেন ।

বিশ্বাস করিয়া মরা ভালো ; অবিশ্বাস

কাহারে করিব ? তোরা সব অল্পবয়স্ক

বন্ধু মোর সরল-হৃদয় ।

মধুজীবী ।

মা-জননী,

এনেছি সঞ্চয় করে কিছু বনমধু,

দয়া করে করো মা গ্রহণ ।

স্মৃতিজা ।

ভগবান

মদল করুন তোরা ।

[মধুজীবীর প্রস্থান]

রাজা ও রানী

৩৫১

শিকারীর প্রবেশ

শিকারী ।

জয় হোক প্রভু ।

ছাগ শিকারের তরে যেতে হবে দূর
গিরিদেলে, দুর্গম সে পথ । তব পদে
প্রণাম করিয়া যাব । জয়সেন গৃহ
মোর দিয়াছে জালায়ে ।

কুমারসেন ।

ধিক সে পিশাচ ।

শিকারী ।

আমরা শিকারী । যতদিন বন আছে
আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন ?
কিছু খাণ্ড এনেছি জননী, দরিত্রের
তুচ্ছ উপহার । আশীর্বাদ করো যেন
কিরে এসে আমাদের যুবরাজে দেখি
সিংহাসনে ।

কুমারসেন । (বাহু বাড়াইয়া এস তুমি, এস আলিঙ্গনে ।

[শিকারীর প্রস্থান

ওই দেখো পল্লব ভেদিয়া পড়িতেছে
রবিকররেখা । যাই নির্বরের ধারে
স্নান সন্ধ্যা করি সমাপন । শিলাতটে
বসে বসে কতক্ষণ দেখি আপনার
ছায়া, আপনারে ছায়া বলে মনে হয় ।
নদী হয়ে গেছে চলে এই নির্বরিণী
ত্রিচূড়-প্রমোদবন দিয়ে । ইচ্ছা করে
ছায়া মোর ভেসে যায় স্রোতে যেথা সেই
সন্ধ্যাবেলা বসে থাকে তীরতরুতলে
ইলা—তার স্নান ছায়াখানি সঙ্গে নিয়ে
চিরকাল ভেসে যায় সাগরের পানে ।
থাক থাক কল্পনা স্বপন । চলো, বোন,
যাই নিত্য কাজে । ওই শোনো চারিদিকে
অরণ্য উঠেছে জেগে বিহঙ্গের গানে ।

৩৫২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সপ্তম দৃশ্য

ত্রিচূড় । প্রমোদবন

বিক্রমদেব ও অমররাজ

অমররাজ । তোমারে করিহু সমর্পণ, যাহা আছে
মোর । তুমি বীর, তুমি রাজ-অধিরাজ ।
তব যোগ্য কত্মা মোর, তাতে লহ তুমি ।
সহকার মাধবিকা-লতার আশ্রয় ।
ক্ষণেক বিলম্ব করো, মহারাজ, তাতে
দিই পাঠাইয়া ।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব ।

কী মধুর শান্তি হেথা ।

চিরন্তন অরণ্য আবাস, সুখসুপ্ত
ধনছায়া নির্বরিগী নিরন্তর-ধ্বনি ।
শান্তি যে শীতল এত, এমন গভীর,
এমন নিস্তর তব্ এমন প্রবল
উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে
ছিহু যেন । মনে হয়, আমার প্রাণের
অনন্ত অনল-দাহ, সেও যেন হেথা
হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দেশ,
এত ছায়া, এত স্থান, এত গভীরতা ।
এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের,
গেল কার অপরাধে ? আমার, কি তাঁর ?
যারি হোক—এ জনমে আর কি পাব না ?
যাও তবে—একেবারে চলে যাও দূরে ।
জীবনে থেকো না জেগে অহুতাপরূপে,
দেখা যাক যদি এইখানে—সংসারের
নির্জন নেপথ্যদেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলম্পর্শ, তেমনি মধুর ।

রাজা ও রানী

৫৩৩

সখীর সহিত ইলার প্রবেশ

এ কী অপরূপ মূর্তি ! চরিতার্থ আমি ।

আসন গ্রহণ করো দেবী । কেন মৌন,

নভশির, কেন স্নানমুখ, দেহলতা

কম্পিত কাতর ? কিসের বেদনা তব ?

ইলা ।

(নতজাহ্নু) গুনিয়াছি মহারাজ-অধিরাজ তুমি

সঙ্গাগরা ধরণীর পতি । ভিক্ষা আছে

তোমার চরণে ।

বিক্রমদেব ।

উঠ উঠ হে সুন্দরী ।

তব পদ-স্পর্শযোগ্য নহে এ ধরণী,

তুমি কেন ধূলায় পতিত ? চরাচরে

কিবা আছে অদেয় তোমারে ?

ইলা ।

মহারাজ,

পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে ;

আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি । কিরাইয়া

দাও মোরে । কত ধন, রত্ন, রাজ্য, দেশ

আছে তব, ফেলে রেখে যাও মোরে এই

ভূমিতলে । তোমার অভাব কিছু নাই ।

বিক্রমদেব ।

আমার অভাব নাই ? কেমনে দেখাব

গোপন হৃদয় ? কোথা সেথা ধনরত্ন ?

কোথা সঙ্গাগরা ধরা ? সব শূন্যময় ।

রাজ্যধন না থাকিত যদি,—শুধু তুমি

থাকিতে আমার—

ইলা ।

(উঠিয়া) লহ তবে এ জীবন ।

তোমরা যেমন করে বনের হরিণী

নিষে যাও, বুকে তার তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে.

তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া

জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে

নিষে যাও ।

বিক্রমদেব ।

কেন দেবী, মোর 'পরে এত

৩৫৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অবহেলা ? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য
নহি ? এত রাজ্য, দেশ, করিলাম জয়,
প্রার্থনা করেও আমি পাব না কি তব
হৃদয় তোমার ?

ইলা ।

সে কি আর আছে মোর ?

সমস্ত সঁপেছি যারে, বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে ।
কতদিন হল ; বনপ্রান্তে দিন আর
কাটে নাকো । পথ চেয়ে সদা পড়ে আছি ;
যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যাব,
আর যদি কিরিয়া না আসে ! মহারাজ,
কোথা নিয়ে যাবে ? রেখে যাও তার তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে ।

বিক্রমদেব ।

না জানি সে

কোন ভাগ্যবান । সাবধান, অতিপ্রেম
সহে না বিধির । শুন তবে মোর কথা ।
এক কালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি
শুধু ভালোবাসিতাম ; সে প্রেমের 'পরে
পড়িল বিধির হিংসা, জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙে ।
বসে আছ যার তরে কী নাম তাহার ?
কাশ্মীরের যুবরাজ—কুমার তাহার
নাম ।

ইলা ।

বিক্রমদেব ।

কুমার ?

ইলা ।

তারে জান তুমি ! কেই বা
না জানে । সমস্ত কাশ্মীর তারে দিয়েছে
হৃদয় ।

বিক্রমদেব ।

কুমার ? কাশ্মীরের যুবরাজ ?

ইলা ।

সেই বটে মহারাজ । তার নাম সদা

৩ রানী

৩৫৫

- ধ্বনিছে চৌদিকে । তোমারি সে বন্ধু বৃষি !
মহৎ সে, ধরণীর যোগ্য অধিপতি ।
- বিক্রমদেব । তাহার সৌভাগ্য-রবি গেছে অস্তাচলে,
ছাড়ো তার আশা । শিকারের যুগসম
সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন,
গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে ।
কান্দারের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ
সুখা তার চেয়ে ।
- ইলা । কী বলিলে মহারাজ ?
- বিক্রমদেব । তোমরা বসিয়া থাক ধরাপ্রান্তভাগে,
গুধু ভালোবাস । জান না বাহিরে বিধে
গরজে সংসার, কর্মশ্রোতে কে কোথায়
ভেসে যায়, ছল ছল বিশাল নয়নে
তোমরা চাহিয়া থাক । বৃথা তার আশা ।
- ইলা । সত্য বলো মহারাজ, ছলনা ক'রো না ।
জেনো এই অতি ক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ
গুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে ।
কোন গৃহহীন পথে কোন বনমাঝে
কোথা কিরে কুমার আমার ? আমি যাব
বলে দাও—গৃহ ছেড়ে কখনো যাই নি,
কোথা যেতে হবে ? কোন দিকে, কোন পথে ?
- বিক্রমদেব । বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে সদা
সঙ্কানে তাহার ।
- ইলা । তোমরা কি বন্ধু নহ
তার ? তোমরা কি রক্ষা করিবে না তারে ?
রাজপুত্র ফিরিতেছে বনে, তোমরা কি
রাজা হয়ে দেখিবে চাহিয়া ? এতটুকু
দয়া নেই কারো ? প্রিয়তম, প্রিয়তম,
আমি তো জানি নে, নাথ, সংকটে পড়েছ—
আমি হেথা বসে আছি তোমার লাগিয়া ।

৩৫৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অনেক বিলম্ব দেখে মাঝে মাঝে মনে
চকিত বিদ্যুৎ সম বেজেছে সংশয় ।
শুনেছিছ এত লোক ভালোবাসে তারে
কোথা তারা বিপদের দিনে ? তুমি নাকি
পৃথিবীর রাজা । বিপদের কেহ নহ ?
এত সৈন্ত, এত ষণ, এত বল নিয়ে
দূরে বসে রবে ? তবে পথ বলে দাও ।
জীবন সঁপিবে একা অবলা রমণী ।
কী প্রবল প্রেম ! ভালোবাসো ভালোবাসো
এমনি সবেগে চিরদিন । যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালোবাসো ।
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
খন্ড হই । দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম ।
শুদ্ধ সাথে বারে ফুল, অস্ত্র তরু হতে
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব ?
আমারে বিশ্বাস করো—আমি বন্ধু তব ।
চলো মোর সাথে আমি তারে এনে দেব,
সিংহাসনে বসারে কুমারে—তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী ।

ইলা ।

মহারাজ,

প্রাণ দিলে মোরে । যেথা যেতে বল, যাব ।

বিক্রমদেব ।

এস তবে প্রস্তুত হইয়া । যেতে হবে
কাশ্মীরের রাজধানী-মাঝে ।

[ইলা ও সখীর প্রস্থান

যুদ্ধ নাহি

ভালো লাগে । শাস্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ ।

গৃহহীন পলাতক, তুমি স্ত্রী মোর

চেয়ে । এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে

রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার

ধ্রুবদৃষ্টিসম ; পবিত্র কিরণে তারি

রাজা ও রানী

৩৫৭

দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মতো। আমি কোন্‌ স্তূথে কিরি
দেশ-দেশান্তরে, স্বপ্নে বহে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ।
কোথা আছে কোন্‌ দ্বিগু হৃদয়ের মাঝে
প্রফুল্লিত শুভ্র প্রেম শিশিরশীতল।
ধূয়ে দাও, প্রেমময়ী, পূর্ণা অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুবিত।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী।

ব্রাহ্মণ এসেছে মহারাজ, তব সাথে
সাক্ষাতের তরে।

বিক্রমদেব।

নিয়ে এস দেখা যাক।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত।

রাজার দোহাই, ব্রাহ্মণেরে রক্ষা করে।

বিক্রমদেব।

এ কী! তুমি কোথা হতে এলে? অমুকুল
দৈব মোর 'পরে। তুমি বন্ধুরত্ন মোর।

দেবদত্ত।

তাই বটে মহারাজ, রত্ন বটে আমি।
অতি যত্নে বন্ধ করে রেখেছিলে তাই।
ভাগ্যবলে পলায়েছি খোলা পেয়ে দ্বার।
আবার দিয়ো না সঁপি প্রহরীর হাতে
রত্নভ্রমে। আমি শুধু বন্ধুরত্ন নহি,
ব্রাহ্মণীর স্বামীরত্ন আমি। সে কি হায়
এতদিন বেঁচে আছে আর?

বিক্রমদেব।

এ কী কথা!

আমি তো জানি নে কিছু, এতদিন রুদ্ধ
আছ তুমি!

দেবদত্ত।

তুমি কী জানিবে মহারাজ।
তোমার প্রহরী দুটো জানে। কত শাস্ত্র
বলি তাহাদের, কত কাব্যকথা, শুনে

৩৫৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মুখ দুটো হাসে। একদিন বর্ষা দেখে
 বিরহ-ব্যথায় মেঘদূত কাব্যখানা
 শুনাতেম দৌহে ডেকে; গ্রাম্য মুখ দুটো
 পড়িল কাতর হয়ে নিদ্রার আবেশে।
 তখনি শিক্কারভরে কারাগার ছাড়ি
 আসিছু চলিয়া। বেছে বেছে ভালো লোক
 দিয়েছিলে বিরহী এ ব্রাহ্মণের 'পরে!
 এত লোক আছে স্থা অধীনে তোমার
 শাস্ত্র বোঝে এমন কি ছিল না দু-জন?
 বন্ধুবর, বড়ো কষ্ট দিয়েছে তোমারে।
 সমুচিত শাস্তি দিব তারে, যে পাষণ্ড
 রেখেছিল রুধিয়া তোমার। নিশ্চয় সে
 ক্রুরমতি জয়সেন।

বিক্রমদেব।

দেবদত্ত।

শাস্তি পরে হবে।

আপাতত যুদ্ধ রেখে, অবিলম্বে দেশে
 ফিরে চলো। সত্য কথা বলি মহারাজ,
 বিরহ সামান্য ব্যথা নয়, এবার তা
 পেরেছি বুঝিতে। আগে আমি ভাবিতাম
 শুধু বড়ো বড়ো লোক বিরহেতে মরে।
 এবার দেখেছি সামান্য এ ব্রাহ্মণের
 ছেলে, এরো ছাড়ে না পঞ্চবাণ ছোটো
 বড়ো করে না বিচার।

বিক্রমদেব।

যম আর প্রেম

উভয়েরি সমদৃষ্টি সর্বভূতে। বন্ধু,
 ফিরে চলো দেশে। কেবল যাবার আগে
 এক কাজ বাকি আছে। তুমি লহ ভার।
 অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া,
 ত্রিচূড়রাজের কাছে সন্ধান পাইবে
 সখে, তার কাছে যেতে হবে। ব'লো তারে,
 আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে

রাজা ও রানী

৩৫৯

বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে ।
 আর সখা,—আর কেহ যদি থাকে সেখা—
 যদি দেখা পাও আর কারো —

দেবদত্ত ।

জানি, জানি—

তাঁর কথা জাগিতেছে হৃদয়ে সতত ।
 এতক্ষণ বলি নাই কিছু । মুখে যেন
 সরে না বচন । এখন তাঁহার কথা
 বচনের অতীত হয়েছে । সাধ্বী তিনি,
 তাই এত দুঃখ তাঁর । তাঁরে মনে ক'রে
 মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা ।
 চলিলাম তবে ।

বিক্রমদেব ।

বসন্ত না আসিতেই

আগে আসে দক্ষিণ পূবন, তার পরে
 পল্লবে কুসুমে বনশ্রী প্রফুল্ল হয়ে
 ওঠে । তোমায়ে হেরিয়া আশা হয় মনে,
 আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন
 দিন মোর, নিয়ে তার সব সুখ-ভার ।

অষ্টম দৃশ্য

অরণ্য

কুমারের দুই জন অনুচর

প্রথম । হা দেখ মাথু, কাল যে স্বপ্নটা দেখলুম তার কোনো মানে ভেবে
 পাচ্ছি নে । শহরে গিয়ে দৈবিজি ঠাকুরের কাছে শুনিয়ে নিয়ে আসতে হবে ।

দ্বিতীয় । কী স্বপ্নটা বল তো শুনি ।

প্রথম । যেন এক জন মহাপুরুষ ওই জল থেকে উঠে আমাকে তিনটে বড়ো
 বড়ো বেল দিতে এল । আমি দুটো হু-হাতে নিলুম,—আর একটা কোথায়
 নেব ভাবনা পড়ে গেল ।

দ্বিতীয়। দূর যুগ, তিনটেই চাঁদরে বেঁধে নিতে হয়।

প্রথম। আরে জেগে থাকলে তো সকলেরই বুদ্ধি জোগায়—সে-সময়ে তুই কোথায় ছিলি? তার পর শোন না; সেই বাকি বেলটা মাটিতে পড়েই গড়াতে আরম্ভ করলে, আমি তার পিছন পিছন ছুটলুম। হঠাৎ দেখি যুবরাজ অশথতলায় বসে আঁহিক করছেন। বেলটা ধপ করে তাঁর কোলের উপর গিয়ে লাফিয়ে উঠল। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

দ্বিতীয়। এটা আর বুঝতে পারলি নে। যুবরাজ শিগগির রাজা হবে।

প্রথম। আমিও তাই ঠাউরেছিলুম। কিন্তু আমি যে দুটো বেল পেলুম, আমার কী হবে?

দ্বিতীয়। তোর আবার হবে কী? তোর খেতে বেগুন বেশি করে কলবে।

প্রথম। না ভাই আমি ঠাউরে রেখেছি আমার দুই পুত্রুর সন্তান হবে।

দ্বিতীয়। হা দেখ্ ভাই, বললে পিত্তর যাবি নে, কাল ভারি আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে গেছে। ওই জলের ধারে বসে রামচরণে আমাতে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলুম, তা আমি কথায় কথায় বললুম আমাদের দোবেজী গুনে বলেছে যুবরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে। আর দেখি নেই। এবার শিগগির রাজা হবে। হঠাৎ মাথার উপর কে তিন বার বলে উঠল “ঠিক ঠিক ঠিক”,—উপরে চেয়ে দেখি ডুমুরের ডালে এতবড়ো একটা টিকটিকি!

রামচরণের প্রবেশ

প্রথম। কী খবর রামচরণ?

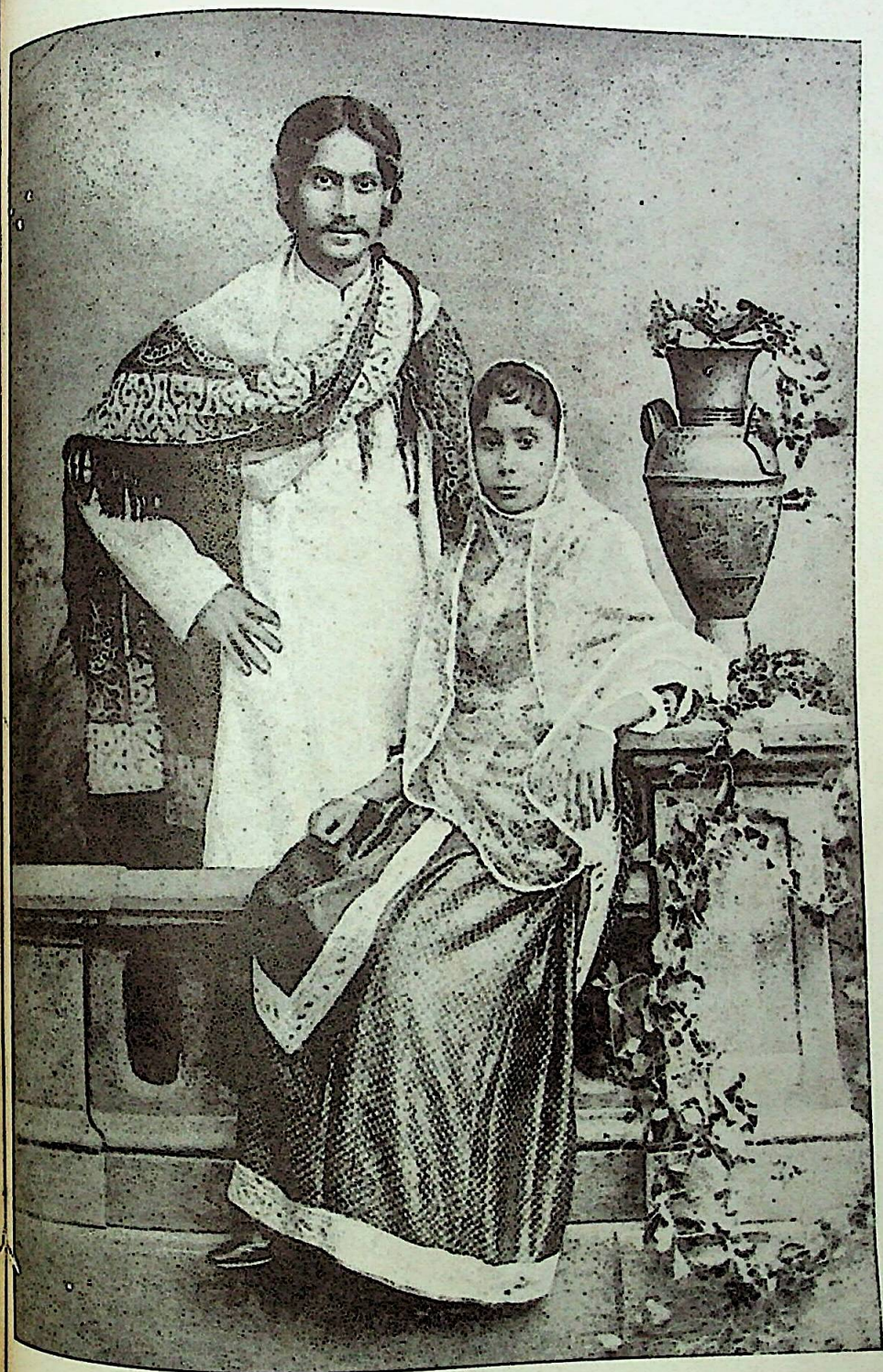
রামচরণ। ওরে ভাই, আজ একটা ব্রাহ্মণ এই বনের আশেপাশে যুবরাজের সন্ধান নিয়ে কিরছিল। আমাকে ঘুরিয়ে কিরিয়ে কত কথাই জিজ্ঞেসা করলে। আমি তেমনি বোকা আর কি! আমিও ঘুরিয়ে কিরিয়ে জবাব দিতে লাগলুম। অনেক খোঁজ করে শেষকালে চলে গেল। তাকে আমি চিত্তলের রাস্তা দেখিয়ে দিলুম। ব্রাহ্মণ না হলে তাকে আজ আর আমি আশু রাখতুম না।

দ্বিতীয়। কিন্তু তাহলে তো এ বন ছাড়তে হচ্ছে। বেটারা সন্ধান পেয়েছে দেখছি।

প্রথম। এইখানে বসে পড়ো না ভাই রামচরণ—দুটো গল্প করা যাক।

রামচরণ। যুবরাজের সঙ্গে আমাদের মা-ঠাকরুণ এই দিকে আসছেন। চল্ ভাই তকাত্তে গিয়ে বসি গে।

[প্রস্থান]



রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহধর্মিণী

৩৬২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কুমারসেন ।

আর তো সহ্যে না ।

দুগা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয় ।

সুমিত্রা ।

চলো

মোরা দুই জনে যাই রাজসভা মাঝে ;
দেখিব কেমনে, কোন্ ছলে জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব ।

কুমারসেন ।

শংকর বলিত,

“প্রাণ যায় সেও ভালো, তবু বন্দিভাবে
কখনো দিয়ো না ধরা ।” পিতৃসিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে গোরে
বিচারের ছল করি - এ কি সহ্য হবে ?
অনেক সহ্যছি বোন, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে ।

সুমিত্রা ।

তার চেয়ে

মৃত্যু ভালো ।

কুমারসেন ।

বলো বোন, বলো, “তার চেয়ে

মৃত্যু ভালো ।” এই তো তোমার যোগ্য কথা ।
তার চেয়ে মৃত্যু ভালো । ভালো করে ভেবে
দেখো । বেঁচে থাকা ভীকতা কেবল । বলো
এ কি সত্য নয় ? থেকো না নীরব হয়ে,
বিবাদ-আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে ।
মুখ তোলো, স্পষ্ট করে বলো এক বার
স্বণিত এ প্রাণ লয়ে লুকায়ে লুকায়ে
নিশিদিন মরে থাকা, এক দণ্ড এ কি
উচিত আমার ?

সুমিত্রা ।

ভাই—

কুমারসেন ।

আমি রাজপুত্র,

ছারখার হয়ে যায় সোনার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন

রাজা ও রানী

৩৬৩

প্রজা,—কেঁদে মরে পতিপুত্রহীনা নারী।
 তবু আমি কোনোমতে বাঁচিব গোপনে ?
 তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।
 বলো, তাই বলো।

সুমিত্রা।

কুমারসেন।

ভক্ত যারা অল্পবক্ত মোর—প্রতিদিন
 সঁপিছে আপন প্রাণ নির্ধাতন সহি।
 তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
 জীবন করিব ভোগ ! এ কি বেঁচে থাকা !

সুমিত্রা।

কুমারসেন।

এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।
 বাঁচিলাম শুনে।
 কোনোমতে রেখেছিছ তোমারি লাগিয়া
 এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
 নির্দোষের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ।
 আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
 যে-কথা বলিব তাহা করিবে পালন
 যতই কঠিন হোক।

সুমিত্রা।

কুমারসেন।

করিছ শপথ।
 এ জীবন দিব বিসর্জন। তার পরে
 তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজ হস্তে
 জালন্ধর-রাজকরে দিবে উপহার।
 বলিয়ো তাহারে—“কাশ্মীরে অতিথি তুমি ;
 ব্যাকুল হয়েছ এত যে-দ্রব্যের তরে
 কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা
 আতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে তোমারে পাঠায়।”
 মৌন কেন বোন ? সঘনে কাঁপিছে কেন
 চরণ তোমার ? ব'সো এই তরুতলে।
 পারিবে না তুমি ? একান্ত অসাধ্য এ কি ?
 তবে কি ভৃত্যের হস্তে পাঠাইতে হবে
 তুচ্ছ উপহার সম এ রাজমস্তক ?
 সমস্ত কাশ্মীর তারে ফেলিবে যে রোষে

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ছিন্নভিন্ন করি। [স্তমিত্তার মূর্ছা

ছি ছি বোন। উঠ, উঠ।

পাষাণে হৃদয় বাঁধো। হ'য়ে না বিহ্বল।

দুঃসহ এ কাজ—তাই তো তোমার 'পরে

দিতেছি দুঃসহ ভার। অগ্নি প্রাণাধিকে,

মহৎ-হৃদয় ছাড়া কাহারো সহিবে

জগতের মহাক্লেশ যত। বলো, বোন

পারিবে করিতে ?

পারিব।

স্তমিত্তা।

কুমারসেন।

দাঁড়াও তবে।

ধরো বল, তোলো শির। উঠাও জাগায়ে

সমস্ত হৃদয়-মন। ক্ষুদ্র নারী সম

আপন বেদনাভারে প'ড়ো না ভাঙিয়া।

স্তমিত্তা।

কুমারসেন।

অভাগিনী ইলা !

তারে কি জানি নে আমি ?

হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু

বাঁচিতে বলিত ? সে আমার ধ্রুবতারার

মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।

কাল পূর্ণিমার তিথি মিলনের রাত।

জীবনের গ্লানি হতে মুক্ত ধৌত হয়ে

চিরমিলনের বেশ করিব ধারণ।

চলো বোন। আগে হতে সংবাদ পাঠাই

দূতমুখে রাজসভামাঝে, কাল আমি

যাব ধরা দিতে। তাহা হলে অবিলম্বে

শংকর পাইবে ছাড়া—বান্ধব আমার।

রাজা ও রানী

৩৬৫

নবম দৃশ্য

কাশ্মীর। রাজসভা

বিক্রমদেব ও চন্দ্রসেন

বিক্রমদেব। আর্ধ, তুমি কেন আজ নীরব এমন ?
মার্জনা তো করেছি কুমারে।

চন্দ্রসেন। তুমি তারে
মার্জনা করেছ। আমি তো এখনো তার
বিচার করি নি। বিজ্রোহী সে মোর কাছে।
এবার তাহার শাস্তি দিব।

বিক্রমদেব। কোন শাস্তি
করিয়াছ স্থির ?

চন্দ্রসেন। সিংহাসন হতে তারে
করিব বঞ্চিত।

বিক্রমদেব। অতি অসম্ভব কথা।
সিংহাসন দিব তারে নিজ হস্তে আমি।

চন্দ্রসেন। কাশ্মীরের সিংহাসনে তোমার কী আছে
অধিকার ?

বিক্রমদেব। বিজয়ীর অধিকার।

চন্দ্রসেন। তুমি
হেথা আছ বন্ধুভাবে অতিথির মতো।

বিক্রমদেব। কাশ্মীরের সিংহাসন কর নাই জয়।
বিনা যুদ্ধে করিয়াছে কাশ্মীর আমারে
আত্মসমর্পণ। যুদ্ধ চাও যুদ্ধ করো,
রয়েছি প্রস্তুত। আমার এ সিংহাসন।
যারে ইচ্ছা দিব।

চন্দ্রসেন। তুমি দিবে। জানি আমি
গর্বিত কুমারসেন জন্মকাল হতে।
সে কি লবে আপনার পিতৃসিংহাসন
ভিক্ষার স্বরূপে ? প্রেম দাও প্রেম লবে,

৩৬৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে, ভিক্ষা দাও
 ঘৃণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে ।
 বিক্রমদেব । এত গর্ব যদি তার তবে সে কি কভু
 ধরা দিতে মোর কাছে আপনি আসিত ?
 চন্দ্রসেন । তাই ভাবিতেছি, মহারাজ, নহে ইহা
 কুমারসেনের মতো কাজ । দৃপ্ত যুবা
 সিংহসম । সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে
 শৃঙ্খল পরিতে গলে ? জীবনের মায়া
 এতই কি বলবান ।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী । শিবিকার দ্বার
 রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ ।
 বিক্রমদেব । শিবিকার দ্বার রুদ্ধ ?
 চন্দ্রসেন । সে কি আর কভু
 দেখাইবে মুখ ? আপনার পিতৃরাজ্যে
 আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে ; রাজপথে
 লোঁকারণ্য চারিদিকে, সহস্রের আঁখি
 রয়েছে তাকারে । কাশ্মীর ললনা যত
 গবাক্ষে দাঁড়ায় । উৎসবের পূর্ণচন্দ্র
 চেয়ে আছে আকাশের মাঝখান হতে ।
 সেই চিরপরিচিত গৃহ পথ হাট
 সরোবর মন্দির কানন, পরিচিত
 প্রত্যেক প্রজার মুখ । কোন্ লাঞ্জে আজি
 দেখা দিবে সবারে সে ? মহারাজ, শোনো
 নিবেদন । গীতবান্ধ বন্ধ করে দাও ।
 এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার ।
 আজ রাত্রে দীপালোক দেখে, ভাবিবে সে
 নিশীথ-তিমিরে পাছে লজ্জা ঢাকা পড়ে
 তাই এত আলো । এ আলোক শুধু বুঝি
 অপমান-পিশাচের পরিহাস-হাসি ।

রাজা ও রানী

৩৬৭

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত । জয়োন্ত রাজন । কুমারের অন্বেষণে
বনে বনে কিরিয়াছি, পাই নাই দেখা ।
আজ গুনিলাম নাকি আসিছেন তিনি
স্বচ্ছায় নগরে কিরি । তাই চলে এছ ।
বিক্রমদেব । করিব রাজার মতো অভ্যর্থনা তারে ।
তুমি হবে পুরোহিত অভিষেক-কালে ।
পূর্ণিমা-নিশীথে আজ কুমারের সনে
ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার
আয়োজন ।

নগরের ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

সকলে । মহারাজ, জয় হোক ।
প্রথম । করি

আশীর্বাদ, ধরণীর অধীশ্বর হও ।
লক্ষ্মী হোন অচলা তোমার গৃহে সদা ।
আজ যে আনন্দ তুমি দিয়েছ সবारे
বলিতে শক্তি নাই—লহ মহারাজ,
কৃতজ্ঞ এ কাশ্মীরের কল্যাণ-আশিস ।

[রাজার মস্তকে ধাতুদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ

বিক্রমদেব । ধন্য আমি কৃতার্থ জীবন ।

[ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান

যষ্টিহস্তে কণ্ঠে শংকরের প্রবেশ

শংকর । (চন্দ্রসেনের প্রতি) মহারাজ !
এ কি সত্য ? যুবরাজ আসিছেন নিজে
শত্রুকরে করিবারে আত্মসমর্পণ ?
বলো, এ কি সত্য কথা ?

চন্দ্রসেন । সত্য বটে ।

শংকর । ষিক,

সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ষিক ।

৩৬৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব,
 সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি
 চূর্ণ হয়ে গেল, যুক সম রহিলাম
 তবু সে কি এরি তরে? অবশেষে তুমি
 আপনি ধরিলে বন্দিবেশ, কাশ্মীরের
 রাজপথ দিয়ে চলে এলে নতশিরে
 বন্দিশালা মাঝে? এই কি সে রাজসভা
 পিতামহদের? যেথা বসি পিতা তব
 উঠিতেন ধরণীর সর্বোচ্চ শিখরে
 সে আজ তোমার কাছে ধরার ধুলার
 চেয়ে নিচে! তার চেয়ে নিরাশ্রয় পথ
 গৃহতুল্য, অরণ্যের ছায়া সমুজ্জল,
 কঠিন পর্বতশৃঙ্গ অমূল্য মরু
 রাজ্যের সম্পদে পূর্ণ। চিরভৃত্য তব
 আজি দুর্দিনের আগে মরিল না কেন?
 বিক্রমদেব। ভালো হতে মন্দটুকু নিয়ে, বৃদ্ধ, মিছে
 এ তব ক্রন্দন।

শংকর। রাজন, তোমার কাছে
 আসি নি কাঁদিতে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ
 রয়েছে জাগি ওই সিংহাসন কাছে,
 আজি তাঁরা স্নানমুখ, লজ্জানত শির,
 তাঁরা বুঝিবেন মোর হৃদয়-বেদনা।

বিক্রমদেব। কেন মোরে শত্রু বলে করিতেছ ভ্রম?
 মিত্র আমি আজি।

শংকর। অতিশয় দয়া তব
 জালন্ধরপতি! মার্জনা করেছ তুমি!
 দণ্ড ভালো মার্জন্যের চেয়ে।

বিক্রমদেব। এর মতো

হেন ভক্ত বন্ধু হায় কে আমার আছে?
 দেবদত্ত। আছে বন্ধু, আছে মহারাজ।

রাজা ও রানী

৩৬৯

বাহিরে ছলুধনি, শঙ্খধনি, কোলাহল
শংকরের দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন
প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী ।

আসিয়াছে

দুয়ারে শিবিকা ।

বিক্রমদেব ।

বাণ্ড কোথা, বাজাইতে

বলো । চলো সখা, অগ্রসর হয়ে তারে
অভ্যর্থনা করি ।

বাঁচোড়ম । সভামধ্যে শিবিকার প্রবেশ

বিক্রমদেব । (অগ্রসর হইয়া) এস, এস, বন্ধু এস ।

স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার শিবিকা বাহিরে আগমন
সহসা সমস্ত বাণ্ড নীরব

বিক্রমদেব । সুমিত্রা ! সুমিত্রা !

চন্দ্রসেন । এ কী, জননী সুমিত্রা !

সুমিত্রা । ফিরেছ সন্ধানে যার রাজ্যদিন ধরে
কাননে কান্তারে শৈলে—রাজ্য ধর্ম দয়া
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া, যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহ মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির । আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ । পূর্ণ তব
মনস্বাম, এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্নিরাশি,
সুখী হও তুমি । (উর্ধ্বস্বরে) মাগো জগৎজননী,
দয়াময়ী, স্থান দাও কোলে ।

[পতন ও মৃত্যু

৩৭২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ছুটিয়া ইলার প্রবেশ

ইলা।

এ কী, এ কী,

[মুর্ছা

শংকর।

মহারাজ, কুমার আমার—

(অগ্রসর হইয়া)

প্রভু, স্বামী,

বংস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,

এই ভালো, এই ভালো। মুকুট পরেছ

তুমি, এসেছ রাজার মতো আপনার

সিংহাসনে। মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা

উজ্জল করেছে তব ভাল। এতদিন

এ বৃদ্ধের রেখেছিল বিধি, আজি তব

এ মহিমা দেখাবার তরে। গেছ তুমি

পুণ্যধামে—ভৃত্য আমি চিরজনমের

আমিও যাইব সাথে।

চন্দ্রসেন।

(মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া)

ধিক এ মুকুট।

ধিক এই সিংহাসন।

[সিংহাসনে পদাঘাত

রেবতীর প্রবেশ

রাক্ষসী পিশাচী

দূর হ দূর হ—আমারে দিস নে দেখা

পাপীয়সী।

রেবতী।

এ রোষ রবে না চিরদিন।

[প্রস্থান

বিক্রমদেব।

(নতজাহ্নু) দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,

তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে

গেলে চির অপরাধী করে? ইহজন্ম

নিত্য-অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি

ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?

দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,

অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

উপন্যাস ও গল্প



বউ-ঠাকুরানীর হাট

উপহার

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী

শ্রীচরণেষু

দিদি,

তোমার স্নেহের কোলে আমার স্নেহের ধন
করিবু অর্পণ।

বিমল প্রশান্ত স্নেহে ফুটিবে স্নেহের হাস
দেখিবারে আশ।

সুদূর প্রবাস হতে আজি বহুদিন পরে
আসিতেছ ঘরে,

দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি উপহার লয়ে করে
সমর্পণ তরে।

কাছে থাকি দূরে থাকি দেখ আর নাহি দেখ
শুধু স্নেহ দাও,

স্নেহ করে ভালো থাক স্নেহ দিতে ভালোবাস
কিছু নাহি চাও,

দূরে থেকে কাছে থাক আপনি হৃদয় তাহা
জানিবারে পায়,

সুদূর প্রবাস হতে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়।

এত আছে এত দাও কথাটি নাহিক কও,
— স্নেহ-পারাবার—

প্রভাত-শিশির সম নীরবে পরানে মম
ঝরে স্নেহধার।

୭୭୨

রবীন্দ্র-রচনাবলী

তব স্নেহ চারি পাশে কেবল নীরবে ভাসে
সৌরভের প্রায়,
নীরবে বিমল হাসি উষার কিরণরাশি
প্রাণেরে জাগায় ।

সূচনা

অসুবিধয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে একসময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।

প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গল্পরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারি প্রথম প্রয়াস দেখা দিল বউঠাকুরানীর হাট গল্পে—একটা রোম্যান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্র-গুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে। আজো হয়তো এই গল্পটার দিকে ফিরে চাওয়া যেতে পারে। এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের ঝাঁকা ছবি; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়েনি তাতে। কিন্তু আটের খেলাঘরে ছেলেমানুষিরও একটা মূল্য আছে। বুদ্ধির বাধাহীন পথে তার খেলাঘর যা-তা কাণ্ড করতে বসে, তার থেকে প্রাথমিক মনের একটা কিছু কারিগরি বেরিয়ে পড়ে।

সজীবতার স্বতঃচাপল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই যে, এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে তিনি নিন্দা করেননি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে

অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে।
দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস
এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল
বহুমূল্য।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যিক। স্বদেশী উদ্দীপনার
আবেগে প্রতাপাদিত্যকে একসময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে
খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি
সে-সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম
তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অত্যাচারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক,
দিল্লীধ্বংসকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা
ছিল না। সে-সময়কার ইতিহাসলেখকদের উপরে পরবর্তী কালের
দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে-সময়ে এই বই অসংকোচে
লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।

বট-ঠাকুরানীর হাট

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাত্রি অনেক হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। যশোহরের যুবরাজ, প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, উদয়াদিত্য তাঁহার শয়নগৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী সুরমা।

সুরমা বলিলেন, “প্রিয়তম, সহ করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। একদিন মুখের দিন আসিবে।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি তো আর-কোনো স্ত্রু চাই না। আমি চাই, আমি রাজপ্রাসাদে না যদি জন্মাইতাম, যুবরাজ না যদি হইতাম, যশোহর-অধিপতির ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম প্রজার প্রজা হইতাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার সিংহাসনে, তাঁহার সমস্ত ধন মান যশ প্রভাব গৌরবের একমাত্র উত্তরাধিকারী না হইতাম! কী তপশ্চা করিলে এ-সমস্ত অতীত উল্টাইয়া যাইতে পারে!”

সুরমা অতি কাতর হইয়া যুবরাজের দক্ষিণ হস্ত দুই হাতে লইয়া চাপিয়া ধরিলেন, ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। যুবরাজের ইচ্ছা পূর্যইতে প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু প্রাণ দিলেও এই ইচ্ছা পূর্যইতে পারিবেন না, এই ভুখ।

যুবরাজ কহিলেন, “সুরমা, রাজ্যের ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়াই স্ত্রী হইতে পারিলাম না। রাজ্যের ঘরে সকলে বুঝি কেবল উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মায়, সম্ভান হইয়া জন্মায় না। পিতা ছেলেবেলা হইতেই আমাকে প্রতিমুহূর্তে পরখ করিয়া দেখিতেছেন, আমি তাঁহার উপার্জিত যশোমান বজায় রাখিতে পারিব কি না, বংশের যুগ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না, রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে পারিব কি না। আমার প্রতি কার্য, প্রতি অঙ্গভঙ্গী তিনি পরীক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, স্নেহের চক্ষে নহে। আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রী, রাজসভাসদগণ, প্রজারা আমার প্রতি কথা প্রতি কাজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া লইয়া আমার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া আসিতেছে। সকলেই ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না, আমার দ্বারা এ বিপদে রাজ্য রক্ষা হইবে না। আমি নিবোধ, আমি

কিছুই বুঝিতে পারি না। সকলেই আমাকে অবহেলা করিতে লাগিল, পিতা আমাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। একবার খোজও লইতেন না।

সুরমার চক্ষে জল আসিল। সে কহিল, “আহা! কেমন করিয়া পারিত! ” তাহার দুঃখ হইল, তাহার রাগ হইল, সে কহিল, “তোমাকে যাহারা নির্বোধ মনে করিত তাহারাই নির্বোধ। ”

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাসিলেন, সুরমার চিবুক ধরিয়া তাহার রোষে আরক্তিম মুখখানি নাড়িয়া দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হইয়া কহিলেন,

“না, সুরমা, সত্য সত্যই আমার রাজ্যাশাসনের বুদ্ধি নাই। তাহার যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেছে। আমার যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন মহারাজ-কাজ শিখাইবার জন্ত হোসেনখালি পরগনার ভার আমার হাতে সমর্পণ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটতে লাগিল। খাজনা কমিয়া গেল, প্রজারা আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কর্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে রাজ্যের নিকটে অভিযোগ করিতে লাগিল। রাজসভার সকলেরই মত হইল, যুবরাজ প্রজাদের যখন অত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তখন বুঝা যাইতেছে উহার দ্বারা রাজ্যাশাসন কখনো ঘটতে পারিবে না। সেই অবধি মহারাজ আমার পানে আর বড়ো একটা তাকাইতেন না। বলিতেন—ও কুলাঙ্গার ঠিক রায়গড়ের খুড়া বসন্ত রায়ের মতো হইবে, সেতার বাজাইয়া নাচিয়া বেড়াইবে ও রাজ্য অধঃপাতে দিবে। ”

সুরমা আবার কহিলেন, “প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। হাজার হউন, পিতা তো বটেন। আজকাল রাজ্য-উপার্জন, রাজ্যবৃদ্ধির একমাত্র দুরাশায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে, সেখানে স্নেহের ঠাই নাই। যতই তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার স্নেহের রাজ্য বাড়িতে থাকিবে। ”

যুবরাজ কহিলেন, “সুরমা, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দূরদর্শী, কিন্তু এইবারে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। এক তো, আশার শেষ নাই; দ্বিতীয়ত, পিতার রাজ্যের সীমা-যতই বাড়িতে থাকিবে, রাজ্য যতই লাভ করিতে থাকিবেন, ততই তাহা হারািবার ভয় তাঁহার মনে বাড়িতে থাকিবে; রাজ্যকার্য যতই গুরুতর হইয়া উঠিবে, ততই আমাকে তাহার অমুপযুক্ত মনে করিবেন। ”

সুরমা ভুল বুঝে নাই, ভুল বিশ্বাস করিত মাত্র; বিশ্বাস বুদ্ধিকেও লজ্জন করে। সে একমনে আশা করিত, এইরূপই যেন হয়।

“চারিদিকে কোথাও বা কৃপাবৃষ্টি কোথাও বা অবহেলা সহ্য করিতে না পারিয়া

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৭৫

আমি মাঝে মাঝে পালাইয়া রায়গড়ে দাদামহাশয়ের কাছে যাইতাম। পিতা বড়ো একটা খোঁজ লইতেন না। আঃ, সে কী পরিবর্তন। সেখানে গাছপালা দেখিতে পাইতাম, গ্রামবাসীদের কুটরে যাইতে পারিতাম, দিবানিশি রাজবেশ পরিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়া জান তো, যেখানে দাদামহাশয় থাকেন, তাহার ত্রিসীমার বিবাদ ভাবনা বা কঠোর গাভীর্ষ তিষ্ঠিতে পারে না। গাহিয়া বাজাইয়া, আগোদ করিয়া চারিদিক পূর্ণ করিয়া রাখেন। চারিদিকে উল্লাস, সন্তাব, শান্তি। সেইখানে গেলেই আমি ভুলিয়া যাইতাম যে, আমি যশোহরের যুবরাজ। সে কী আশ্রমের ভুল। অবশেষে আমার বয়স যখন আঠারো বৎসর, একদিন রায়গড়ে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে সবুজ কুঞ্জবন, সেই বসন্তে আমি রুক্মিণীকে দেখিলাম।”

সুসমা বলিয়া উঠিল, “ও-কথা অনেক বার শুনিয়াছি।”

উদয়াদিত্য। “আর-এক বার শুন। মাঝে মাঝে এক-একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে, সে-কথাগুলো যদি বাহির করিয়া না দিই, তবে আর বাঁচিব কী করিয়া। সেই কথাটা তোমার কাছে এখনো বলিতে লজ্জা করে, কষ্ট হয়, তাই বারবার করিয়া বলি, যেদিন আর লজ্জা করিবে না, কষ্ট হইবে না, সেদিন বুঝিব আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল, সেদিন আর বলিব না।”

সুসমা। “কিসের প্রায়শ্চিত্ত প্রিয়তম? তুমি যদি পাপ করিয়া থাক তো সে পাপের দোষ, তোমার দোষ নহে। আমি কি তোমাকে জানি না? অন্তর্ধামী কি তোমার মন দেখিতে পান না?”

উদয়াদিত্য বলিতে লাগিলেন, “রুক্মিণীর বয়স আমার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়ো। সে একাকিনী বিধবা। দাদামহাশয়ের অল্পগ্রহে সে রায়গড়ে বাস করিতে পাইত। মনে নাই, সে আমাকে কী কৌশলে প্রথমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। তখন আমার মনের মধ্যে মধ্যাহ্নের কিরণ জ্বলিতেছিল। এত প্রথম আলো যে, কিছুই ভালো করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, চারিদিকে জগৎ জ্যোতির্ময় বাস্পে আবৃত। সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠিতেছিল; কিছুই আশ্চর্য, কিছুই অসম্ভব মনে হইত না; পথ বিপথ, দিক বিদিক সমস্ত এক আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার পূর্বেও আমার এমন কখনো হয় নাই, ইহার পরেও আমার এমন কখনো হয় নাই। জগদীশ্বর জানেন, তাহার কী উদ্দেশ্য সাধন করিতে এই ক্ষুদ্র দুর্বল বুদ্ধিহীন হৃদয়ের বিরুদ্ধে এক দিনের জন্ত সমস্ত জগৎকে যেন উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিশ্ব-চরাচর যেন একতন্ত্র হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে মুহূর্তে বিপথে লইয়া গেল। মুহূর্তমাত্র—আর অধিক নয়—সমস্ত বহির্জগতের মুহূর্তস্থায়ী এক নিদারুণ আঘাত,

আর মুহূর্তের মধ্যে একটি ক্ষীণ হৃদয়ের মূল বিদীর্ণ হইয়া গেল, বিদ্যাহুগে সে ধূলিকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িল। তাহার পরে যখন উঠিল তখন ধূলিধূসরিত, নান—সে ধূলি আর মুছিল না, সে মলিনতার চিহ্ন আর উঠিল না। আমি কী করিয়াছিলাম, বিধাতা, যে পাপে এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুভকে কালি করিলে? দিনকে রাত্রি করিলে? আমার হৃদয়ের পুষ্পবনে মালতী ও জুঁই ফুলের মুখগুলিও যেন লজ্জায় কালো হইয়া গেল।”

বলিতে বলিতে উদয়াদিত্যের গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আয়ত নেত্র অধিকতর বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মাথা হইতে পা পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎশিখা কাঁপিয়া উঠিল। সুরমা হর্ষে, গর্বে, কষ্টে কহিল, “আমার মাথা খাও, ও-কথা থাক।”

উদয়াদিত্য। “ধীরে ধীরে যখন রক্ত নীতল হইয়া গেল, সকলি তখন যথামুখ পরিমাণে দেখিতে পাইলাম। যখন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিতমস্তিষ্ক, রক্তনয়ন মাতালের কুজাটিকাময় স্বর্ণমান স্বপ্নদৃশ্য বলিয়া মনে না হইয়া প্রকৃত কার্যক্ষেত্র বলিয়া মনে হইল, তখন মনের কী অবস্থা! কোথা হইতে কোথায় পতন! শত সহস্র লক্ষ ক্রোশ পাতালের গহ্বরে, অন্ধ অন্ধতর অন্ধতম রজনীর মধ্যে একেবারে পলক না ফেলিতে পড়িয়া গেলাম। দাদামহাশয় স্নেহভরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; তাঁহার কাছে মুখ দেখাইলাম কী বলিয়া? কিন্তু সেই অবধি আমাকে রায়গড় ছাড়িতে হইল। দাদামহাশয় আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না; আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার এমনি ভয় করিত যে, আমি কোনোমতেই যাইতে পারিতাম না। তিনি স্বয়ং আমাকে ও ভগিনী বিভাকে দেখিতে আসিতেন। অভিমান নাই, কিছুই নাই। জিজ্ঞাসাও করিতেন না, কেন যাই নাই। আমাদের দেখিতেন, আমোদ-উল্লাস করিতেন ও চলিয়া যাইতেন।”

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাস্ত করিয়া অতিশয় মৃদু কোমল প্রেমে তাঁহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি প্রাবৃত করিয়া সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। সুরমা বুঝিল, এইবার কী কথা আসিতেছে। মুখ নত হইয়া আসিল; ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িল। যুবরাজ দুই হস্তে তাহার দুই কপোল ধরিয়া নত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। অধিকতর নিকটে গিয়া বসিলেন; মুখখানি নিজের স্বন্ধে ধীরে ধীরে রাখিলেন। কটিদেশ বামহস্তে বেঁধে রাখিয়া ধরিলেন ও গভীর প্রশান্ত প্রেমে তাহার কপোল চুষন করিয়া বলিলেন,

“তার পর কী হইল, সুরমা বলো দেখি? এই বুদ্ধিতে দীপ্যমান, স্নেহপ্রেমে কোমল, হাস্তে উজ্জ্বল ও প্রশান্ত ভাবে বিমল মুখখানি কোথা হইতে উদয় হইল? আমার সে গভীর অন্ধকার ভাঙিবে আশা ছিল কি? তুমি আমার উষা, আমার আলো,

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৭৭

আমার আশা, কী মায়ামন্ত্রে সে আঁধার দূর করিলে?" যুবরাজ বার বার সুরমার মুখচুসন করিলেন। সুরমা কিছুই কথা কহিল না, আনন্দে তাহার চোখ জলে পুরিয়া আসিল। যুবরাজ কহিলেন,

“এতদিনের পরে আমি যথার্থ আশ্রয় পাইলাম। তোমার কাছে প্রথম শুনিলাম যে আমি নির্বোধ নই, তাহাই বিশ্বাস করিলাম, তাহাই বুঝিতে পারিলাম। তোমার কাছে শিখিলাম বুদ্ধি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গলির মতো বাঁকাচোরা উচুনিচু নহে, রাজপথের ছায় সরল সমতল প্রশস্ত। পূর্বে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতাম, আপনাকে অবহেলা করিতাম। কোনো কাজ করিতে সাহস করিতাম না। মন যদি বলিত, ইহাই ঠিক, আত্মসংশয় সংস্কার বলিত, উহা ঠিক না হইতেও পারে। যে দ্রোণ ব্যবহার করিত তাহাই সহিয়া থাকিতাম, নিজে কিছু ভাবিতে চেষ্টা করিতাম না। এতদিনের পরে আমার মনে হইল, আমি কিছু, আমি কেহ। এতদিন আমি অপোচর ছিলাম, তুমি আমাকে বাহির করিয়াছ, সুরমা তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ, এখন আমার মন যাহা ভালো বলে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সাধন করিতে চাই। তোমার উপর আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস কর, তখন আমিও আমাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করিতে পারি। ওই স্কুমার শরীরে এত বল কোথায় ছিল যাহাতে আমাকেও তুমি বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছ।”

কী অপরিণীত নির্ভরের ভাবে সুরমা স্বামীর বক্ষ বেঁধেন করিয়া ধরিল। কী সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জী দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ কহিল, “আমার আর কিছুই নাই কেবল তুমি আছ, তাই আমার সব আছে।”

বাল্যকাল হইতে উদয়াদিত্য আত্মীয়-স্বজনের উপেক্ষা সহিয়া আসিতেছেন, মাঝে মাঝে এক-একদিন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সুরমার নিকট সেই শতবার-কথিত পুরানো জীবনকাহিনী খণ্ডে খণ্ডে সোপানে সোপানে আলোচনা করিতে তাঁহার বড়ো ভালো লাগে।

উদয়াদিত্য কহিলেন, “এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে সুরমা? এদিকে রাজসভায় সভাসদগণ কেমন একপ্রকার কৃপাদৃষ্টিতে আমার প্রতি চান, ওদিকে অগ্নিপুত্র মা তোমাকে লাঞ্ছনা করিতেছেন। দাসদাসীরা পর্যন্ত তোমাকে তেমন মানে না। আমি কাহাকেও ভালো করিয়া কিছু বলিতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি, সব করিয়া যাই। তোমার তেজস্বী স্বভাব, কিন্তু তুমিও নীরবে সহিয়া যাও। যখন তোমাকে স্তম্ভী করিতে পারিলাম না, আমা হইতে তোমাকে কেবল অপমান আর কষ্টই সহ্য করিতে হইল, তখন আমাদের এ বিবাহ না হইলেই ভালো ছিল।”

সুরমা। “সে কী কথা নাথ। এই সময়েই তো সুরমাকে আবশ্যক। সুখের সময় আমি তোমার কী করিতে পারিতাম। সুখের সময় সুরমা বিলাসের দ্রব্য, খেলিবার জিনিস। সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া আমার মনে এই সুখ জাগিতেছে যে, আমি তোমার কাছে লাগিতেছি, তোমার জন্ত দুঃখ সহিতে যে অতুল আনন্দ আছে, সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি। কেবল দুঃখ এই, তোমার সমুদয় কষ্ট কেন আমি বহন করিতে পারিলাম না।”

যুবরাজ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, “আমি নিজের জন্ত তেমন ভাবি না। সকলি সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার জন্ত তুমি কেন অপমান সহ করিবে? তুমি যথার্থ স্ত্রীর মতো আমার দুঃখের সময় সাহায্য দিয়াছ, শান্তির সময় বিশ্রাম দিয়াছ, কিন্তু আমি স্বামীর মতো তোমাকে অপমান হইতে লজ্জা হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। তোমার পিতা শ্রীপুর-রাজ আমার পিতাকে প্রধান বলিয়া না মানাতে আপনাকে যশোহরছত্রের অধীন বলিয়া স্বীকার না করাতে, পিতা তোমার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া নিজের প্রধানত্ব বজায় রাখিতে চান। তোমাকে কেহ অপমান করিলে তিনি কানেই আনেন না। তিনি মনে করেন, তোমাকে যে পুত্রবধু করিয়াছেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এক-একবার মনে হয়, আর পারিয়া উঠি না, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া চলিয়া যাই। এতদিনে হয়তো যাইতাম, তুমি কেবল আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ।”

রাত্রি গভীর হইল। অনেকগুলি সন্ধ্যার তারা অস্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রের তারা উদ্ভিত হইল। প্রাকার-তোরণস্থিত গ্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদয় জগৎ স্তব্ধ। নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, গৃহদ্বার রুদ্ধ, দৈবাৎ দু-একটা শৃগাল ছাড়া একটি জনপ্রাণীও নাই। উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল। শশব্যস্ত যুবরাজ দুয়ার খুলিয়া দিলেন—“কেন বিভা? কী হইয়াছে? এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন?”

পাঠকেরা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন বিভা উদয়াদিত্যের ভগিনী। বিভা কহিল, “এতক্ষণে বুঝি সর্বনাশ হইল!” সুরমা ও উদয়াদিত্য একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, “কেন, কী হইয়াছে?” বিভা ভয়কম্পিত স্বরে চুপি চুপি কী কহিল। বলিতে বলিতে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, “দাদা কী হইবে?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি তবে চলিলাম।” বিভা বলিয়া উঠিল, “না না, তুমি যাইয়ো না।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৭৯

উদয়াদিত্য। “কেন বিভা?”

বিভা। “পিতা যদি জানিতে পারেন? তোমার উপরে যদি রাগ করেন?”

সুরমা কহিল, “ছিঃ বিভা; এখন কি তাহা ভাবিবার সময়?”

উদয়াদিত্য বস্ত্রাদি পরিয়া কটবন্ধে তরবারি বাধিয়া প্রস্থানের উত্তোগ করিলেন। বিভা তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, “দাদা তুমি যাইয়ো না, তুমি লোক পাঠাইয়া দাও, আমার বড়ো ভয় করিতেছে।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “বিভা এখন বাধা দিস নে; আর সময় নাই।” এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

বিভা সুরমার হাত ধরিয়া কহিল, “কী হইবে ভাই? বাবা যদি টের পান?”

সুরমা কহিল, “আর কী হইবে? স্নেহের বোধ করি আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যেটুকু আছে সেটুকু গেলেও বড়ো একটা ক্ষতি হইবে না।”

বিভা কহিল, “না ভাই, আমার বড়ো ভয় করিতেছে। পিতা যদি কোনোপ্রকার হানি করেন। যদি দণ্ড দেন?”

সুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “আমার বিশ্বাস, সংসারে যাহার কেহই সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়। হে প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক না হয় যেন। এ বিশ্বাস আমার ভাঙিয়ো না।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, কাজটা কি ভালো হইবে?”

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন কাজটা?”

মন্ত্রী কহিলেন, “কাল যাহা আদেশ করিয়াছিলেন।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “কাল কী আদেশ করিয়াছিলাম?”

মন্ত্রী কহিলেন, “আপনার পিতৃত্ব্য সম্বন্ধে।”

প্রতাপাদিত্য আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “আমার পিতৃত্ব্য সম্বন্ধে কী?”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ আদেশ করিয়াছিলেন, যখন বসন্ত রায় যশোহরে আসিবার পথে শিমুলতলির চটতে আশ্রয় লইবেন তখন—”

প্রতাপাদিত্য অকুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন, “তখন কী? কথাটা শেষ করিয়াই কোলো।”

মন্ত্রী। “তখন দুই জন পাঠান গিয়া—”

প্রতাপ। “হাঁ।”

মন্ত্রী। “তাহাকে নিহত করিবে।”

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “মন্ত্রী, হঠাৎ তুমি শিশু হইয়াছ নাকি? একটা কথা শুনিতে দশটা প্রশ্ন করিতে হয় কেন? কথাটা মুখে আনিতে বুঝি সংকোচ হইতেছে। এখন বোধ করি তোমার রাজকাৰ্বে মনোযোগ দিবার বয়স গিয়াছে, এখন পরকাল চিন্তার সময় আসিয়াছে। এতদিন অবসর প্রার্থনা কর নাই কেন?”

মন্ত্রী। “মহারাজ আমার ভাবটা ভালো বুঝিতে পারেন নাই।”

প্রতাপ। “বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে কাজটা করিতে পারি, তুমি তাহা মুখে আনিতেও পার না? তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল, আমি যখন এ কাজটা করিতে যাইতেছি, তখন অবশ্য তাহার গুরুতর কারণ আছে; আমি অবশ্য ধর্ম অধর্ম সমস্ত ভাবিয়াছিলাম।”

মন্ত্রী। “আজ্ঞা মহারাজ, আমি—”

প্রতাপ। “চুপ করো, আমার সমস্ত কথাটা শোনো আগে। আমি যখন এ কাজটা—আমি যখন নিজের পিতৃব্যকে খুন করিতে উত্তত হইয়াছি, তখন অবশ্য তোমার চেয়ে ঢের বেশি ভাবিয়াছি। এ কাজে অধর্ম নাই। আমার ব্রত এই—এই যে স্লেচ্ছরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে, যাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আৰ্যধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা মোগলকে কণ্ঠা দিতেছে, হিন্দুরা আচারভ্রষ্ট হইতেছে, এই স্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব, আমাদের আৰ্যধর্মকে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিব। এই ব্রত সাধন করিতে অনেক বলের আবশ্যক। আমি চাই, সমস্ত বঙ্গদেশের রাজারা আমার অধীনে এক হয়। যাহারা যবনের মিত্র, তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে না। পিতৃব্য বসন্ত রায় আমার পূজ্যপাদ, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই, তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে স্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এমন লোকের সহিত প্রতাপাদিত্য রায়ের কোন সম্পর্ক নাই। ক্ষত হইলে নিজের রাহুকে কাটিয়া ফেলা যায়; আমার ইচ্ছা যায় বংশের ক্ষত, বঙ্গদেশের ক্ষত ওই বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায়-বংশকে বাঁচাই, বঙ্গদেশকে বাঁচাই।”

মন্ত্রী কহিলেন, “এ-বিষয়ে মহারাজের সহিত আমার অন্য মত ছিল না।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “হাঁ ছিল। ঠিক কথা বলো। এখনো আছে। দেখো মন্ত্রী, যতক্ষণ আমার মতের সহিত তোমার মত না মিলিবে, ততক্ষণ তাহা প্রকাশ

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৮১

করিয়ে। সে সাহস যদি না থাকে তবে এ পদ তোমার নহে। সন্দেহ থাকে তো বলিয়ে। আমাকে বুঝাইবার অবসর দিয়ে। তুমি মনে করিতেছ নিজের পিতৃব্যকে হনন করা সকল সময়েই পাপ। 'না' বলিয়ে না, ঠিক এই কথাই তোমার মনে জাগিতেছে। ইহার উত্তর আছে। পিতার অম্মরোধে ভৃগু নিজের মাতাকে বধ করিয়াছিলেন, ধর্মের অম্মরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে বধ করিতে পারি না?"

এ বিষয়ে—অর্থাৎ ধর্ম অধর্ম বিষয়ে যথার্থই মন্ত্রীর কোনো মতামত ছিল না। মন্ত্রী যতদূর তলাইয়াছিলেন, রাজা ততদূর তলাইতে পারেন নাই। মন্ত্রী বিলক্ষণ জানিতেন যে, উপস্থিত বিষয়ে তিনি যদি সংকোচ দেখান তাহা হইলে রাজা আপাতত কিছু রুষ্ট হইবেন বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার জ্ঞান মনে মনে সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ না করিলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এককালে-না-এককালে রাজার সন্দেহ ও আশঙ্কা জন্মিতে পারে।

মন্ত্রী কহিলেন, “আমি বলিতেছিলাম কি, দিল্লীশ্বর এ সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই রুষ্ট হইবেন।”

প্রতাপাদিত্য জলিয়া উঠিলেন, “হাঁ হাঁ রুষ্ট হইবেন! রুষ্ট হইবার অধিকার তো সকলেরই আছে। দিল্লীশ্বর তো আমার ঈশ্বর নহেন। তিনি রুষ্ট হইলে ধরধর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে এমন জীব যথেষ্ট আছে, মানসিংহ আছে, বীরবল আছে, আমাদের বসন্ত রায় আছেন, আর সম্প্রতি দেখিতেছি তুমিও আছ; কিন্তু আত্মবৎ সকলকে মনে করিয়ে না।”

মন্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, “আজ্ঞা, মহারাজ, ফাঁকা রোষকে আমিও বড়ো একটা ডমাই না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঢাল-তলোয়ার যদি থাকে তাহা হইলে ভাবিতে হয় বই কি। দিল্লীশ্বরের রোষের অর্থ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য।”

প্রতাপাদিত্য ইহার একটা সূত্বের না দিতে পারিয়া কহিলেন, “দেখো মন্ত্রী, দিল্লীশ্বরের ভয় দেখাইয়া আমাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ে না, তাহাতে আমার নিতান্ত অপমান বোধ হয়।”

মন্ত্রী কহিলেন, “প্রজারা জানিতে পারিলে কী বলিবে?”

প্রতাপ। “জানিতে পারিলে তো?”

মন্ত্রী। “এ কাজ অধিকদিন ছাপা রহিবে না। এ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ আপনায় বিরোধী হইবে। যে উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতে চান, তাহা সমূলে বিনাশ পাইবে। আপনাকে জাতিচ্যুত করিবে ও বিবিধ নিগ্রহ সহিতে হইবে।”

প্রতাপ। দেখো মন্ত্রী, আবার তোমাকে বলিতেছি, আমি যাহা করি তাহা বিশেষ ভাবিয়া করি। অতএব আমি কাজে প্রবৃত্ত হইলে মিছামিছি কতকগুলি ভয় দেখাইয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়ো না, আমি শিশু নহি। প্রতি পদে আমাকে বাধা দিবার জন্ত, তোমাকে আমার নিজের শৃঙ্খলস্বরূপে রাখি নাই।”

মন্ত্রী চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি রাজার দুইটি আদেশ ছিল। এক, যতক্ষণ মতের অমিল হইবে ততক্ষণ প্রকাশ করিবে; দ্বিতীয়ত বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া রাজাকে কোনো কাজ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়ো না। মন্ত্রী আজ পর্যন্ত এই দুই আদেশের ভালোরূপ সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।

মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কহিলেন, “মহারাজ, দিল্লীশ্বর—” প্রতাপাদিত্য জলিয়া উঠিয়া কহিলেন, “আবার দিল্লীশ্বর? মন্ত্রী, দিনের মধ্যে তুমি যতবার দিল্লীশ্বরের নাম কর ততবার যদি জগদীশ্বরের নাম করিতে তাহা হইলে পরকালের কাজ শুছাইতে পারিতে। যতক্ষণে না আমার এই কাজটা শেষ হইবে, ততক্ষণ দিল্লীশ্বরের নাম মুখে আনিয়ো না। যখন আজ বিকালে এই কাজ সমাধার সংবাদ পাইব, তখন আসিয়া আমার কানের কাছে তুমি মনের সাধ মিটাইয়া দিল্লীশ্বরের নাম জপিয়ো। ততক্ষণ একটু আত্মসংযম করিয়া থাকো।”

মন্ত্রী আবার চুপ করিয়া গেলেন। দিল্লীশ্বরের কথা বন্ধ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—”

রাজা কহিলেন, “দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল, এখন অবশেষে সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা বলিয়া ভয় দেখাইবে না কি?”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, আপনি অত্যন্ত ভুল বুঝিতেছেন। আপনার কাজে বাধা দিবার অভিপ্রায় আমার মূলেই নাই।”

প্রতাপাদিত্য ঠাণ্ডা হইয়া কহিলেন, “তবে কী বলিতেছিলে বলো।”

মন্ত্রী বলিলেন, “কাল রাত্রে যুবরাজ সহসা অস্বাভাবিক করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছেন, এখনো কিরিয়া আসেন নাই।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “কোন দিকে গেছেন?”

মন্ত্রী কহিলেন, “পূর্বাভিমুখে।”

প্রতাপাদিত্য দাঁতে দাঁত লাগাইয়া কহিলেন, “কখন গিয়াছিল?”

মন্ত্রী। “কাল প্রায় অর্ধরাত্রের সময়।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে কি এখানেই আছে?”

মন্ত্রী। “আজ্ঞা হাঁ।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৮৩

প্রতাপাদিত্য। “সে তাহার পিত্রালয়ে থাকিনেই তো ভালো হয়।”
মন্ত্রী কোন উত্তর দিলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “উদয়াদিত্য কোনোকালেই রাজার মতো ছিল না। ছেলেবেলা হইতে প্রজাদের সঙ্গেই তাহার মেশামেশি। আমার সম্বন্ধ যে এমন হইবে তাহা কে জানিত? সিংহ-শাবককে কি, কী করিয়া সিংহ হইতে হয় তাহা শিখাইতে হয়? তবে কিনা—নরাণাং মাতুলক্রমঃ। বোধ করি সে তাহার মাতামহদের স্বভাব পাইয়াছে। তাহার উপরে আবার সম্প্রতি শ্রীপুরের ঘরে বিবাহ দিয়াছি; সেই অবধি বালকটা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। ঈশ্বর করুন, আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়, আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তাহা শেষ যদি না করিতে পারি তাহা হইলে মরিবার সময়ে ভাবনা না থাকিয়া যায় যেন। সে কি তবে এখনো কিরিয়া আসে নাই?”

মন্ত্রী। “না মহারাজ।”

ভূমিতে পদাঘাত করিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “একজন প্রহরী তাহার সঙ্গে কেন যায় নাই?”

মন্ত্রী। “একজন যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বারণ করিয়াছিলেন।”

প্রতাপ। “অদৃষ্টভাবে দূরে দূরে থাকিয়া কেন যায় নাই?”

মন্ত্রী। “তাহারা কোনোপ্রকার অস্ত্রায় সন্দেহ করে নাই।”

প্রতাপ। “সন্দেহ করে নাই! মন্ত্রী, তুমি কি আমাকে বুঝাইতে চাও, তাহার বড়ো ভালো কাজ করিয়াছিল? মন্ত্রী, তুমি আমাকে অনর্থক যাহা-তাহা একটা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়ো না। প্রহরীর কর্তব্য কাজে বিশেষ অবহেলা করিয়াছে। সে-সময়ে দ্বারে কাহারো ছিল থাকিয়া পাঠাও। ঘটনাটির জ্ঞান যদি আমার কোনো একটা ইচ্ছা বিফল হয়, তবে আমি সর্বনাশ করিব। মন্ত্রী, তোমারও তাহা হইলে জয়ের সম্ভাবনা আছে। আমার কাছে তুমি প্রমাণ করিতে আসিয়াছ এ কাজের জ্ঞান কেহই দায়ী নহে। তবে এ দায় তোমার।”

প্রতাপাদিত্য প্রহরীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ গভীরভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঁ। দিল্লীশ্বরের কথা কী বলিতেছিলে?”

মন্ত্রী। “শুনিলাম আপনার নামে দিল্লীশ্বরের নিকটে অভিযোগ করিয়াছে।”

প্রতাপ। “কে? তোমাদের যুবরাজ উদয়াদিত্য নাকি?”

মন্ত্রী। “আজ্ঞা মহারাজ, এমন কথা বলিবেন না। কে করিয়াছে সন্ধান পাই নাই।”

প্রতাপ। “বেই করুক, তাহার জন্ত অধিক ভাবিয়া না, আমিই দিল্লীখয়ের বিচারকর্তা, আমিই তাহার দণ্ডের উদ্যোগ করিতেছি। সে পাঠানেরা এখনো কিরিল না? উদয়াদিত্য এখনো আসিল না? শীঘ্র প্রহরীকে ডাকো।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান পথ দিয়া বিদ্যুৎবেগে যুবরাজ অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়াছেন। অশ্বকার রাজি, কিন্তু পথ দীর্ঘ সরল প্রশস্ত বলিয়া কোনো ভয়ের আশঙ্কা নাই। শুদ্ধ রাত্রি অশ্বের শব্দের শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দুই-একটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, দুই-একটা শৃগাল চকিত হইয়া পথ ছাড়িয়া বাঁশবাড়ের মধ্যে লুকাইতেছে। আলোকের মধ্যে আকাশের তারা ও পথপ্রান্তস্থিত গাছে জোনাকি; শব্দের মধ্যে ‘রি’ ‘রি’ পোকের অবিশ্রাম শব্দ; মনুষ্যের মধ্যে কঙ্কাল-অবশেষ একটি ভিখারি বৃদ্ধা গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছে। পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ পথ ছাড়িয়া একটা মাঠে নামিলেন। অশ্বের বেগ অপেক্ষাকৃত সংযত করিতে হইল। দিনের বেলায় বৃষ্টি হইয়াছিল, মাটি ভিজা ছিল, পদে পদে অশ্বের পা বসিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে সম্মুখের পায়ে ভর দিয়া অশ্ব তিন বার পড়িয়া গেল। শ্রান্ত অশ্বের নাসারন্ধ্র বিক্ষারিত, মুখে ফেন, পশ্চাতের পদদ্বয়ের ঘর্ষণে ফেন জন্মিয়াছে, পঞ্জরের ভিতর হইতে একটা শব্দ বাহির হইতেছে, সর্বাঙ্গ ঘর্মে প্রাবিত। এদিকে দারুণ গ্রীষ্ম, বাতাসের লেশমাত্র নাই, এখনো অনেকটা পথ অবশিষ্ট রহিয়াছে। বহুতর জলা ও চবা মাঠ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ অবশেষে একটা কাঁচা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বকে আবার দ্রুতবেগে ছুটাইলেন। একবার তাহার স্বন্ধ চাপড়াইয়া উৎসাহ দিয়া ডাকিলেন, “সুগ্রীব।” সে চকিতে একবার কান খাড়া করিয়া বড়ো বড়ো চোখে বন্ধিম দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিল, একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া ত্রৈধাবনি করিল ও সবলে মুখ নামাইয়া রাশ শিথিল করিয়া লইল ও গ্রীবা নত করিয়া উর্ধ্বাঙ্গে ছুটিতে লাগিল। দুই পার্শ্বের গাছপালা চোখে ভালো দেখা যাইতেছে না, আকাশে চাহিলে মনে হইতেছে যেন দলে দলে নক্ষত্রেরা অগ্নি-ফুলিঙ্গের মতো সবগে উড়িয়া যাইতেছে এবং সেই শুদ্ধবায়ু আকাশে বায়ু তরঙ্গিত হইয়া কানের কাছে সৌ সৌ করিতে লাগিল। রাজি যখন তৃতীয় প্রহর, লোকালয়ের কাছে শৃগালেরা যখন প্রহর ডাকিয়া গেল, তখন যুবরাজ শিমূলতলির চটির দ্বারা আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার অশ্ব তৎক্ষণাৎ গতজীবন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। নামিয়া

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৮৫

তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, তাহার মুখ তুলিয়া ধরিলেন, “সুগ্রীব” বলিয়া কতবার ডাকিলেন, সে আর নড়িল না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যুবরাজ দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। বার বার আঘাতের পর চটির অধ্যক্ষ দ্বার না খুলিয়া জানালার মধ্য দিয়া কহিল, “এত রাত্রে তুমি কে গো?” দেখিল একজন সশস্ত্র যুবক দ্বারে দাঁড়াইয়া।

যুবরাজ কহিলেন, “একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, দ্বার খোলো।”

সে কহিল, “দ্বার খুলিবার আবশ্যক কী, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, জিজ্ঞাসা করো না।”

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “রায়গড়ের রাজা বসন্ত রায় এখানে আছেন?”

সে কহিল, “আজ্ঞা, সন্ধ্যার পর তাঁহার আসিবার কথা ছিল বটে কিন্তু এখনো আসেন নাই। আজ বোধ করি তাঁহার আসা হইল না।”

যুবরাজ দুইটি মুদ্রা লইয়া শব্দ করিয়া কহিলেন, “এই লও।”

সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া মুদ্রা দুইটি লইল। তখন যুবরাজ তাকে কহিলেন, “বাপু, আমি একবারটি তোমার চটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, কে কে আছে?”

চটি-রক্ষক সন্দিগ্ধভাবে কহিল, “না মহাশয়, তাহা হইবে না।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমাকে বাধা দিও না। আমি রাজবাটীর কর্মচারী। দুই জন অপরাধীর অনুসন্धानে আসিয়াছি।”

এই কথা বলিয়াই তিনি প্রবেশ করিলেন। চটি-রক্ষক তাঁহাকে আর বাধা দিল না। তিনি সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন। না বসন্ত রায়, না তাঁহার অনুচর, না কোনো পাঠানকে দেখিতে পাইলেন। কেবল দুই জন স্তম্ভোৎখিতা প্রোচা চোঁচাইয়া উঠিল, “আ মরণ, মিনসে অমন করিয়া তাকাইতেছিস কেন?”

চটি হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন যে, ভালোই হইয়াছে, হয়তো আজ দৈবক্রমে তিনি আসিতে পারেন নাই। আবার মনে করিলেন, যদি ইহার পূর্ববর্তী কোন চটিতে থাকেন ও পাঠানেরা তাঁহার অনুসন্ধানে সেখানে গিয়া থাকে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দূর গিয়া দেখিলেন, বিপরীত দিক হইতে এক জন অখারোহী আসিতেছে। নিকটে আসিলে কহিলেন, “কে ও, রতন নাকি?” সে অশ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, “আজ্ঞা হাঁ। যুবরাজ, আপনি এত রাত্রে এখানে যে?”

৩৮৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

যুবরাজ কহিলেন, “তাহার কারণ পরে বলিব। এখন বলো তো দাদামহাশয় কোথায় আছেন।”

“আজ্ঞা, তাঁহার তো চটতেই থাকিবার কথা।”

“সে কী! সেখানে তো তাঁহাকে দেখিলাম না।”

সে অবাক হইয়া কহিল, “ত্রিশ জন অনুচর সমেত মহারাজ যশোর উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। আমি কার্যবশত পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। এই চটিতে আজ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার সহিত মিলিবার কথা।”

“পথে যেরূপ কাদা তাহাতে পদচিহ্ন থাকিবার কথা, তাহাই অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলাম। তোমার ষোটক লইলাম। তুমি পদব্রজে আইস।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান পথের ধারে অশথ গাছের তলায় বাহকশূণ্য ভূতলস্থিত এক শিবিকার মধ্যে বৃদ্ধ বসন্ত রায় বসিয়া আছেন। কাছে আর কেহ নাই, কেবল একটি পাঠান শিবিকার বাহিরে। একটা জনকোলাহল দূরে মিলাইয়া গেল। রজনী স্তব্ধ হইয়া গেল। বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

“খাঁ সাহেব, তুমি যে গেলে না?”

পাঠান কহিল, “হজুর, কী করিয়া যাইব? আপনি আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্ত আপনার সকল অনুচরগুলিকেই পাঠাইলেন। আপনাকে এই পথের ধারে রাখে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইব, এতবড়ো অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাহরাইবেন না। আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী; পরকালে সে ঋণ তাহাকে শোধ করিতে হইবে; যে আমার উপকার করে আমি তাহার কাছে ঋণী, কিন্তু কোনোকালে তাহার সে ঋণ শোধ করিতে পারিব না।”

বসন্ত রায় মনে মনে কহিলেন, বাহবা, লোকটা তো বড়ো ভালো। কিছুক্ষণ বিতর্ক করিয়া পালকি হইতে তাঁহার টাকবিশিষ্ট মাথাটি বাহির করিয়া কহিলেন, “খাঁ সাহেব, তুমি বড়ো ভালো লোক।”

খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ এক সেলাম করিলেন। এ-বিষয়ে বসন্ত রায়ের সহিত খাঁ সাহেবের কিছুমাত্র মতের অনৈক্য ছিল না। বসন্ত রায় মশালের আলোকে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “তোমাকে বড়োঘরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৮৭

পাঠান আবার সেলাম করিয়া কহিল, “কেয়া তাজ্জব, মহারাজ, ঠিক গ্রহাইয়াছেন।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “এখন তোমার কী করা হয়?”

পাঠান নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, “হজুর, দুর্বস্থায় পড়িয়াছি, এখন চাষবাস করিয়া ভুজুরান চালাইতে হইতেছে। কবি বলিতেছেন, হে অদৃষ্ট, তুমি যে তৃণকে তৃণ করিয়া গড়িয়াছ, ইহাতে তোমার নির্ভরতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তুমি যে অশথ গাছকে অশথ গাছ করিয়া গড়িয়া অবশেষে বড়ের হাতে তাহাকে তৃণের সহিত সমতল করিয়া শোয়াও ইহাতেই আন্দাজ করিতেছি, তোমার মনটা পাথরে গড়া।”

বসন্ত রায় নিতান্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বাহবা, বাহবা, কবি কী কথাই বলিয়াছেন। সাহেব, যে দুইটি বয়েং আজ বলিলে, ওই দুইটি লিখিয়া দিতে হইবে।”

পাঠান ভাবিল, তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বুড়া, লোক বড়ো সরেস; গরিবের বহু কাজে লাগিতে পারিবে। বসন্ত রায় ভাবিলেন, আহা, এককালে যে ব্যক্তি বড়োলোক ছিল আজ তাহার এমন দুর্বস্থা। চপলা লক্ষ্মীর এ বড়ো অত্যাচার। মনে মনে তিনি কিছু কাতর হইলেন, পাঠানকে কহিলেন,

“তোমার যে-রকম সুন্দর শরীর আছে, তাহাতে তো তুমি অনায়াসে সৈন্তশ্রেণীতে নিযুক্ত হইতে পার।”

পাঠান তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “হজুর, পারি বইকি। সেই তো আমাদের কাজ। আমার পিতা-পিতামহেরা সকলেই তলোয়ার হাতে করিয়া মরিয়াছেন, আমারও সেই একমাত্র সাধ আছে। কবি বলেন,—”

বসন্ত রায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “কবি যাহাই বলুন বাপু, আমার কাজ যদি গ্রহণ কর, তবে তলোয়ার হাতে করিয়া মরিবার সাধ মিটিতেও পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ হইতে খোলা তোমার ভাগ্যে ঘটয়া উঠিবে না। বুড়া হইয়া গড়িয়াছি, প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, ভগবান করুন, আর যেন লড়াই করিবার প্রকার না হয়। বয়স গিয়াছে; তলোয়ার ত্যাগ করিয়াছি। এখন তলোয়ারের পরিবর্তে আর-এক জন আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছে।” এই বলিয়াই পার্শ্বে শায়িত সহচরী সেতারটিকে দুই-একটি ঝংকার দিয়া একবার জাগাইয়া দিলেন।

পাঠান ঘাড় নাড়িয়া চোখ বুজিয়া কহিল, “আহা, যাহা বলিতেছেন, ঠিক বলিতেছেন। একটি বয়েং আছে যে, তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।”

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, “কী বলিলে থা সাহেব? সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা

যায়। কী চমৎকার।” চূপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে লাগিলেন, যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই যেন অধিকতর অবাক হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বয়েসটির ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন, “তলোয়ার যে এতবড়ো ভয়ানক দ্রব্য তাহাতেও শত্রুর শত্রুতা নাশ করা যায় না,—কেমন করিয়া বলিব নাশ করা যায়? রোগীকে বধ করিয়া রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতর আরোগ্য? কিন্তু সংগীত যে এমন মধুর জিনিস, তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুতা নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিত্বের কথা? বাঃ, কী তারিফ।” বৃদ্ধ এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, শিবিকার বাহিরে পা রাখিয়া বসিলেন, পাঠানকে আরো কাছে আসিতে বলিলেন ও কহিলেন, “তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকেও মিত্র করা যায়, কেমন খাঁ সাহেব?”

পাঠান। “আজ্ঞা হাঁ হজুর।”

বসন্ত রায়। “তুমি একবার রায়গড়ে যাইয়ো। আমি যশোর হইতে কিরিয়া গিয়া তোমার ষথাসাধ্য উপকার করিব।”

পাঠান উৎফুল্ল হইয়া কহিল, “আপনি ইচ্ছা করিলে কী না করিতে পারেন।” পাঠান ভাবিল একরকম বেশ শুছাইয়া লইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার সেতার বাজানো আসে?”

বসন্ত রায় কহিলেন, “হাঁ” ও তৎক্ষণাৎ সেতার তুলিয়া লইলেন। অস্থূলিতে মেজরাপ আঁটিয়া বেহাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে পাঠান মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, “বাহবা! খাসী!” ক্রমে উত্তেজনার প্রভাবে শিবিকার মধ্যে বসিয়া থাকা বসন্ত রায়ের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। মর্দাদা গান্ধীর্ষ আত্মপর সমস্ত বিস্তৃত হইলেন ও বাজাইতে বাজাইতে অবশেষে গান ধরিলেন—“কেয়সে কাটোঙ্গী রয়ন, সো পিয়া বিনা।”

গান থামিলে পাঠান কহিল, “বাঃ কী চমৎকার আওয়াজ।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “তবে বোধ করি নিস্তব্ধ রাত্রে, খোলা মাঠে সকলের আওয়াজই মিঠা লাগে। কারণ, গলা অনেক সাধিয়াছি বটে কিন্তু লোকে আমার আওয়াজের তো বড়ো প্রশংসা করে না। তবে কী না, বিধাতা যতগুলি রোগ দিয়াছেন তাহার সকলগুলিরই একটি না একটি ঔষধ দিয়াছেন, তেমনি যতগুলি গলা দিয়াছেন তাহার একটি না একটি শ্রোতা আছেই। আমার গলাও ভালো লাগে এমন দুটো অর্বাচীন আছে। নহিলে এতদিনে সাহেব, এ গলার দোকানপাট বন্ধ করিতাম; সেই দুটো আনাড়ি খরিদার আছে, মাল চিনে না, তাহাদেরই কাছ

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৮৯

হইতে বাহবা মিলে। অনেকদিন ছুটাকে দেখি নাই, গীতগানও বন্ধ আছে; তাই ছুটিয়া চলিয়াছি। মনের সাথে গান শুনাইয়া, প্রাণের বোকা নামাইয়া বাড়ি কিরিব।” বৃদ্ধের ক্ষীণজ্যোতি চোখছুটি মেহে ও আনন্দে দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

পাঠান মনে মনে কহিল, “তোমার একটা সাধ মিটিরাছে, গান শুনানো হইয়াছে, এখন প্রাণের বোকাটা আমিই নামাইব কি? তোবা, তোবা, এমন কাজও করে! কাকেরকে মারিলে পুণ্য আছে বটে কিন্তু সে পুণ্য এত উপার্জন করিয়াছি যে পরকালের বিষয়ে আর বড়ো ভাবনা নাই, কিন্তু ইহকালের সমস্তই যে-প্রকার বেবন্দোবস্ত দেখিতেছি, তাহাতে এই কাকেরটাকে না মারিয়া যদি তাহার একটা বিলিবন্দেজ করিয়া লইতে পারি তাহাতে আপত্তি দেখিতেছি না।

বসন্ত রায় কিরংক্ষণ চুপ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল - পাঠানের নিকটবর্তী হইয়া অতি চুপি চুপি কহিলেন, “কাহাদের কথা বলিতেছিলাম, সাহেব, জান? তাহার আমার নাতি ও নাতনী।” বলিতে বলিতে অধীর হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, “আমার অল্পস্বরের কথা কিরিয়া আসিবে?” আবার সেতার লইয়া গান আরম্ভ করিলেন।

এক জন অশ্বারোহী পুরুষ নিকটে আসিয়া কহিল, “আঃ বাচিলান। দাদানবংশ পথের ধারে এত রাত্রে কাহাকে গান শুনাইতেছ?”

আনন্দে ও বিস্ময়ে বসন্ত রায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেতার শিবিকা-উপরে রাখিয়া উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া নামাইলেন ও তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আনিধন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “খবর কী দাদা? দিদি ভালো আছে তো?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “সমস্তই মঙ্গল।”

তখন বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে সেতার তুলিয়া লইলেন ও পা দিয়া তাল রাখিয়া মাথা নাড়িয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

“বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?

সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিবাস।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর মিলে?

এরি মধ্যে মিটল কি প্রণয়েরি আশ?

এখনো তো রয়েছে রাত এখনো তো হয় নি প্রভাত,

এখনো এ রাধিকার ফুরায় নি তো অশ্রুপাত।

চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ এখনি কি শুকাল আজ?

চকোর হে, মিলাল কি সে চন্দ্রমুখের মধুর হাস?”

উদয়াদিত্য পাঠানের দিকে চাহিয়া বসন্ত রায়কে কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদামহাশয়, এ কাবুলি কোথা হইতে জুটিল?”

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিলেন, “খাঁ সাহেব বড়ো ভালো লোক। সমঝদার ব্যক্তি। আজ রাজি বড়ো আনন্দে কাটানো গিয়াছে।”

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া খাঁ সাহেব মনে মনে বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

উদয়াদিত্য পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চটিতে না গিয়া এখানে যে?”

পাঠান সহসা বলিয়া উঠিল, “হুজুর, আশাস পাই তো একটা কথা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা। মহারাজ আমাকে ও আমার ভাইকে আদেশ করেন যে আপনি যখন যশোহরের মুখে আসিবেন, তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।”

বসন্ত রায় চমকিয়া কহিয়া উঠিলেন, “রাম রাম রাম।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “বলিয়া যাও।”

পাঠান। “আমরা কখনো এমন কাজ করি নাই, স্মৃতরাং আপত্তি করাতে তিনি আমাদের নানাপ্রকার ভয় দেখান। স্মৃতরাং বাধ্য হইয়া এই কাজের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। পথের মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার ভাই গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া কাঁদিয়া কাঁটিয়া আপনার অনুচরদের লইয়া গেলেন। আমার উপর এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ, যদিও রাজার আদেশ, তথাপি এমন কাজে আমার কোনোমতেই প্রবৃত্তি হইল না। কারণ, আমাদের কবি বলেন, রাজার আদেশে প্রভুর আদেশে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে পার কিন্তু সাবধান, স্বর্গের এক কোণও ধ্বংস করিয়া না। এখন গরিব, মহারাজের শরণাপন্ন হইল। দেশে কিরিয়া গেলে আমার সর্বনাশ হইবে। আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই।” বলিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

বসন্ত রায় অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে পাঠানকে কহিলেন, “তোমাকে একটি পত্র দিতেছি তুমি রায়গড়ে চলিয়া যাও। আমি সেখানে কিরিয়া গিয়া তোমার একটা সুবিধা করিয়া দিব।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “দাদামহাশয়, আবার যশোহরে যাইবে নাকি?”

বসন্ত রায় কহিলেন, “হাঁ ভাই।”

উদয়াদিত্য অবাক হইয়া কহিলেন, “সে কী কথা।”

বসন্ত রায়। “প্রতাপ আমার তো আর কেহ নয়, সহস্র অপরাধ করুক, সে আমার নিতান্তই স্নেহভাজন। আমার নিজের কোনো হানি হইবে বলিয়া ভয় করি না।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৯১

আমি তো ভাই, ভবসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া ; একটা ঢেউ লাগিলেই আমার সমস্ত ফুটাইল। কিন্তু এই পাপকার্য করিলে প্রতাপের ইহকালের ও পরকালের যে হানি হইত, তাহা ভাবিয়া আমি কি নিশ্চিত থাকিতে পারি ? তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া একবার সমস্ত বুঝাইয়া বলি।”

বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের চোখে জল আসিল। উদয়াদিত্য দুই হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন।

এমন সময়ে কোলাহল করিতে করিতে বসন্ত রায়ের অলুচরণ কিরিয়া আসিল।

“মহারাজ কোথায় ? মহারাজ কোথায় ?”

“এইখানেই আছি বাপু, আর কোথায় যাইব ?”

সকলে সমস্তের বলিল, “সে নেড়ে বেটা কোথায়।”

বসন্ত রায় বিব্রত হইয়া মাঝে পড়িয়া কহিলেন, “হাঁ হাঁ বাপু, তোমরা খাঁ সাহেবকে কিছু বলিয়ো না।”

প্রথম। “আজ মহারাজ, বড়ো কষ্ট পাইয়াছি, আজ সে—”

দ্বিতীয়। “তুই থাম না রে ; আমি সমস্ত ভালো করিয়া শুদ্ধাইয়া বলি। সে গঠান বেটা আমাদের বরাবর সোজা লইয়া গিয়া অবশেষে বাঁ-হাতি একটা আম-বাগানের মধ্যে—

তৃতীয়। “না রে সেটা বাবলা বন।”

চতুর্থ। “সেটা বাঁ-হাত নয় সেটা ডান-হাতি।”

দ্বিতীয়। “দূর থেপা, সেটা বাঁ-হাতি।”

চতুর্থ। “তোমর কথাতেই সেটা বাঁ-হাতি ?”

দ্বিতীয়। “বাঁ-হাতি যদি না হইবে তবে সে গুরুটা—”

উদয়াদিত্য। “হাঁ বাপু, সেটা বাঁ-হাতি বলিয়া বোধ হইতেছে, তার পরে বলিয়া যাও।”

দ্বিতীয়। “আজ্ঞা হাঁ। সেই বাঁ-হাতি আমবাগানের মধ্য দিয়া একটা মাঠে লইয়া গেল। কত চবা মাঠ জমি জলা বাঁশঝাড় পার হইয়া গেলাম, কিন্তু গায়ের নামগন্ধও পাইলাম না। এমন করিয়া তিন ঘণ্টা ঘুরিয়া গায়ের কাছাকাছি হইতেই সে বেটা যে কোথায় পালাইল খোঁজ পাইলাম না।”

প্রথম। “সে বেটাকে দেখিয়াই আমার ভালো ঠেকে নাই।”

দ্বিতীয়। “আমিও মনে করিয়াছিলাম এইরকম একটা কিছু হইবেই।”

তৃতীয়। “যখনি দেখিয়াছি নেড়ে, তখনি আমার সন্দেহ হইয়াছে।”

অবশেষে সকলেই ব্যক্ত করিল যে তাহারা পূর্ব হইতেই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “দেখো দেখি মন্ত্রী, সে পাঠান ছুটা এখনো আসিল না।”

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, “সেটা তো আর আমার দোষ নয় মহারাজ।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “দোষের কথা হইতেছে না। দেখি যে হইতেছে তাহার তো একটা কারণ আছে? তুমি কী অহুমান কর, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

মন্ত্রী। “শিমুলতলি এখান হইতে বিস্তর দূর। যাইতে, কাজ সমাধা করিতে ও কিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবার কথা।”

প্রতাপাদিত্য মন্ত্রীর কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি চান, তিনিও যাহা অহুমান করিতেছেন, মন্ত্রীও তাহাই অহুমান করেন। কিন্তু মন্ত্রী সেদিক দিয়া গেলেন না। প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “উদ্‌যাদিত্য কাল রাত্রে বাহির হইয়া গেছে?”

মন্ত্রী। “আজ্ঞা হাঁ, সে তো পূর্বেই জানাইয়াছি।”

প্রতাপাদিত্য। “পূর্বেই জানাইয়াছি! কী উপযুক্ত সময়েই জানাইয়াছ! যে সময়ে হউক জানাইলেই বুঝি তোমার কাজ শেষ হইল? উদ্‌যাদিত্য তো পূর্বে এমনতর ছিল না। শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে বোধ করি তাহাকে কুপরামর্শ দিয়া থাকিবে। কী বোধ হয়?”

মন্ত্রী। “কেমন করিয়া বলিব মহারাজ।”

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, “তোমার কাছে কি আমি বেদবাক্য শুনিতে চাহিতেছি? তুমি কী আন্দাজ কর, তাই বলো না!”

মন্ত্রী। “আপনি মহিষীর কাছে বধুমাতা ঠাকুরানীর কথা সমস্তই শুনিতে পান, এ-বিষয়ে আপনিই অহুমান করিতে পারেন, আমি কেমন করিয়া অহুমান করিব?”

এক জন পাঠান গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, “কী হইল? কাজ নিকাশ করিয়াছ?”

পাঠান। “হাঁ, মহারাজ, এতক্ষণে নিকাশ হইয়া গেছে।”

প্রতাপাদিত্য। “সে কী রকম কথা? তবে তুমি জান না?”

পাঠান। “আজ্ঞা হাঁ, জানি। কাজ নিকাশ হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই, তবে আমি সে-সময়ে উপস্থিত ছিলাম না।”

প্রতাপাদিত্য। “তবে কী করিয়া কাজ নিকাশ হইল?”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৯৩

পাঠান। “আপনার পরামর্শ মতে আমি তাঁহার লোকজনদের তকাত করিয়াই চলিয়া আসিতেছি, হোসেন খাঁ কাজ শেষ করিয়াছে।”

প্রতাপাদিত্য। “যদি না করিয়া থাকে?”

পাঠান। “মহারাজ, আমার শির জামিন রাখিলাম।”

প্রতাপাদিত্য। “আচ্ছা, ওইখানে হাজির থাকো। তোমার ভাই কিরিয়া আসিলে পুরস্কার মিলিবে।”

পাঠান দূরে দ্বারের নিকট গ্রহরীদের জিন্মায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মন্ত্রীকে ধীরে ধীরে কহিলেন, “এটা যাহাতে প্রজারা কোনোমতে না জানিতে পার তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, অসম্ভব না হন যদি তো বলি ইহা প্রকাশ হইবেই।”

প্রতাপাদিত্য। “কিসে তুমি জানিতে পারিলে?”

মন্ত্রী। “ইতিপূর্বে আপনি প্রকাশভাবে আপনার পিতৃব্যের প্রতি ঘৃণ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার কন্যার বিবাহের সময় আপনি বসন্ত রায়কে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি স্বয়ং অনিমন্ত্রিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ আপনি সহসা বিনা কারণে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ও পথের মধ্যে কে তাঁহাকে হত্যা করিল। এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এই ঘটনাটির মূল বলিয়া জানিবে।”

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না মন্ত্রী। এই কথাটা প্রকাশ হইলেই তুমি যেন খুশি হও, আমার নিন্দা রটিলেই তোমার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নহিলে দিনরাত্রি তুমি কেন বলিতেছ যে, কথাটা প্রকাশ হইবেই। প্রকাশ হইবার আমি তো কোনো কারণ দেখিতেছি না। বোধ করি, আর কিছুতেই সংবাদটা রাষ্ট্র না হইলে তুমি নিজে গিয়া দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া বেড়াইবে।”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, মার্জনা করিবেন। আপনি আমার অপেক্ষা সকল বিষয়েই অনেক ভালো বুঝেন। আপনাকে মন্ত্রণা দেওয়া আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের পক্ষে অত্যন্ত স্পর্ধার বিষয়। তবে আপনি না কি আমাকে বাছিয়া মন্ত্রী রাখিয়াছেন, এই সাহসেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা মনে হয় আপনাকে মাঝে মাঝে বলিয়া থাকি। মন্ত্রণায় রুষ্ট হন যদি তবে এ দাসকে এ কার্যভার হইতে অব্যাহতি দিন।”

প্রতাপাদিত্য সিদ্ধা হইলেন। মাঝে মাঝে মন্ত্রী যখন তাঁহাকে দুই-একটা শব্দ কণা শুনাইয়া দেন, তখন প্রতাপাদিত্য মনে মনে সন্তুষ্ট হন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আমি বিবেচনা করিতেছি, ওই পাঠান ছটাকে মারিয়া ফেলিলে এ-বিষয়ে আর কোনো ভয়ের কারণ থাকিবে না।”

মন্ত্রী কহিলেন, “একটা খুন চাপিয়া রাখাই দায়, তিনটা খুন সামলানো অসম্ভব। প্রজারা জানিতে-পারিবেই।” মন্ত্রী বরাবর নিজের কথা বজায় রাখিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, “তবে তো আমি ভয়ে সারা হইলাম! প্রজারা জানিতে পারিবে! যশোহর রায়গড় নহে; এখানে প্রজাদের রাজত্ব নাই। এখানে রাজা ছাড়া আর বাকি সকলেই রাজা নহে। অতএব আমাকে তুমি প্রজার ভয় দেখাইয়ো না। যদি কোনো প্রজা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো কথা কহে, তবে তাহার জিহ্বা তপ্ত লৌহ দিয়া পুড়াইব।”

মন্ত্রী মনে মনে হাসিলেন। মনে মনে কহিলেন, “প্রজার জিহ্বাকে এত ভয়। তথাপি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, কোনো প্রজাকে ডরাই না।”

প্রতাপাদিত্য। “শ্রদ্ধশাস্তি শেষ করিয়া লোকজন লইয়া একবার রায়গড়ে যাইতে হইবে। আমি ছাড়া সেখানকার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর তো কাহাকেও দেখিতেছি না।”

বুদ্ধ বসন্ত রায় ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন—প্রতাপাদিত্য চমকিয়া পিছু হাটিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, বুঝি উপদেবতা। অবাক হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। বসন্ত রায় নিকটে গিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য। তাহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বুদ্ধ, তোমার অনিষ্ট করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই।”

প্রতাপাদিত্যের চৈতন্য হইয়াছে, কিন্তু কথা বানাইয়া বলিতে তিনি নিতান্ত অপটু। নিরুত্তর হইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতৃব্যকে প্রণাম করা পর্বস্ত হইল না।

বসন্ত রায় আবার ধীরে ধীরে কহিলেন, “প্রতাপ, একটা যাহা হয় কথা কও। যদি দৈবাৎ এমন একটা কাজ করিয়া থাক, যাহাতে আমাকে দেখিয়া তোমার লজ্জা ও সংকোচ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জন্ত ভাবিয়ো না। আমি কোনো কথা উত্থাপন করিব না। এস বৎস, দুই জনে একবার কোলাকুলি করি। আজ অনেকদিনের পর দেখে হইয়াছে; আর তো অধিক দিন দেখা হইবে না।”

এতক্ষণের পর প্রতাপাদিত্য প্রণাম করিলেন ও উঠিয়া পিতৃব্যের সহিত কোলাকুলি করিলেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রী আস্তে আস্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৯৫

গেছেন। বসন্ত রায় ঈষৎ কোমল হাশ্ব হাসিয়া প্রতাপাদিত্যের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, “বসন্ত রায় অনেকদিন ঝাটিয়া আছে—না প্রতাপ? সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনো যে কেন ডাক পড়িল না বিধাতা জানেন। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই।”

বসন্ত রায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর করিলেন না। বসন্ত রায় আবার কহিলেন, “তবে স্পষ্ট করিয়া সমস্ত বলি। তুমি যে আমাকে ছুরি তুলিয়াছ, তাহাতে আমাকে ছুরির অপেক্ষা অধিক বাজিয়াছে। (বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু জল আসিল।) কিন্তু আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। আমি কেবল তোমাকে দুটি কথা বলিব। আমাকে বধ করিয়া না প্রতাপ! তাহাতে তোমার ইহকাল পরকালের ভালো হইবে না। এতদিন পর্যন্ত যদি আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলে, তবে আর দুটা দিন পারিবে না? এইটুকুর জন্য গাপের ভাগী হইবে?”

বসন্ত রায় দেখিলেন, প্রতাপাদিত্য কোনো উত্তর দিলেন না। দোষ অস্বীকার করিলেন না, বা অনুতাপের কথা কহিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, কহিলেন, “প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চলো। অনেকদিন সেখানে যাও নাই। অনেক পরিবর্তন দেখিবে। সৈন্তেরা এখন তলোয়ার ছাড়িয়া লাঙল ধরিয়াছে; যেখানে সৈন্তদের বাসস্থান ছিল সেখানে অতিথিশালা—”

এমন সময়ে প্রতাপাদিত্য দূর হইতে দেখিলেন, পাঠানটা পালাইবার উত্তোগ করিতেছে। আর থাকিতে পারিলেন না। মনের মধ্যে যে নিরুদ্ধ রোষ ফুটিতেছিল, তাহা অগ্নি-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বজ্রধ্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ধবধধা উহাকে ছাড়িস না। পাকড়া করিয়া রাখ্।” বলিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজা মন্ত্রীকে ডাকাইয়া কহিলেন, “রাজকাৰ্ঘ্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে।”

মন্ত্রী আস্তে আস্তে কহিলেন, “মহারাজ, এ-বিষয়ে আমার কোনো দোষ নাই।”

প্রতাপাদিত্য তারম্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আমি কি কোনো বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি? আমি বলিতেছি, রাজকাৰ্ঘ্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে। সেদিন তোমার কাছে এক চিঠি রাখিতে দিলাম তুমি হারাইয়া ফেলিলে।”

ষড় মাস পূর্বে এইরূপ একটা ঘটনাছিল বটে, কিন্তু তখন মহারাজ মন্ত্রীকে একটি কথাও বলেন নাই।

“আর-একদিন উমেশ রায়ের নিকট তোমাকে যাইতে আদেশ করিলাম, তুমি লোক পাঠাইয়া কাজ সারিলে। চূপ করো। দোষ কাটাইবার জন্ত মিছামিছি চেষ্টা করিয়ো না। যাহা হউক, তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম, রাজকাৰ্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছ না।”

রাজা প্রহরীদের ডাকাইলেন। পূর্বে রাজ্যের প্রহরীদের বেতন কাটিয়াছিলেন, এখন তাহাদের প্রতি কারাবাসের আদেশ হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া মহিষীকে ডাকাইয়া কহিলেন, “মহিষী, রাজপরিবারের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখিতেছি। উদয়াদিত্য পূর্বে তো এমন ছিল না। এখন সে-যখন-তখন বাহির হইয়া যায়। প্রজাদের কাজে যোগ দেয়। আমার বিরুদ্ধাচরণ করে। এ সকলের অর্থ কী?”

মহিষী ভীতা হইয়া কহিলেন, “মহারাজ, তাহার কোনো দোষ নাই। এ সমস্ত অনর্থের মূল ওই বড়োবউ। বাছা আমার তো আগে এমন ছিল না। যেদিন হইতে শ্রীপুরের ঘরে তাহার বিয়ে হইল, সেই দিন হইতে উদয় কেমন যে হইল কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।”

মহারাজ সুরমাকে শাসনে রাখিতে আদেশ করিয়া বাহিরে গেলেন। মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উদয়াদিত্য আসিলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আহা, বাছা আমার রোগা কালো হইয়া গিয়াছে। বিয়ের আগে বাছার রং কেমন ছিল। যেন তপ্ত সোনার মতো। তোর এমন দশা কে করিল? বাবা, বড়োবউ তোকে যা বলে তা শুনিস না। তার কথা শুনিয়াই তোর এমন দশা হইয়াছে।” সুরমা ঘোমটা দিয়া চূপ করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। মহিষী বলিতে লাগিলেন, “ওর ছোটো বংশে জন্ম, ও কি তোর যোগ্য? ও কি তোকে পরামর্শ দিতে জানে? আমি যথার্থ কথা বলিতেছি ও কখনো তোকে ভালো পরামর্শ দেয় না, তোর মন হইলেই ও যেন বাঁচে। এমন রাক্ষসীর সঙ্গেও মহারাজ তোর বিবাহ দিয়া-ছিলেন।” মহিষী অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

উদয়াদিত্যের প্রশান্ত ললাটে ষর্ষবিন্দু দেখা দিল। তাঁহার মনের অধীরতা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত তাঁহার আয়ত নেত্র অন্ধদিকে ফিরাইলেন।

এক জন পুরানো বৃদ্ধ দাসী বসিয়া ছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, “শ্রীপুরের মেয়েরা জাহ্নু জানে। নিশ্চয় বাছাকে ওষুধ করিয়াছে।” এই বলিয়া, উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বলিল, “বাবা, ও তোমাকে ওষুধ করিয়াছে। ওই যে মেয়েটি দেখিতেছ, উনি বড়ো সামান্য মেয়ে নন। শ্রীপুরের ঘরের মেয়ে। ওরা ভাইনী। আহা

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৯৭

বাছার শরীরে আর কিছু রাখিল না।” এই বলিয়া সে সুরমার দিকে তীরের মতো এক কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও আঁচল দিয়া দুই হস্তে দুই গুচ্চ চক্ষু রগড়াইয়া লাল করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া আবার মহিষীর হৃৎক একেবারে উধলিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে বৃদ্ধাদের মধ্যে ক্রন্দনের সংক্রামকতা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কাঁদিবার অভিপ্রায়ে সকলে রানীর ঘরে আসিয়া সমবেত হইল। উদয়াদিত্য করুণনেত্রে একবার সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। ঘোমটার মধ্য হইতে সুরমা তাহা দেখিতে পাইল ও চোখ মুছিয়া একটি কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা মহিষী প্রতাপাদিত্যকে কহিলেন, “আজ উদয়কে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম। বাছা আমার তেমন নহে। বুঝাইয়া বলিলে বুঝে। আজ তাহার চোখ ফুটিয়াছে।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিভার স্নান মুখ দেখিয়া সুরমা আর থাকিতে পারিল না, তাহার গলা ধরিয়া কহিল, “বিভা, তুই চুপ করিয়া থাকিস কেন? তোর মনে যখন যাহা হয় বলিস না কেন?”

বিভা ধীরে ধীরে কহিল, “আমার আর কী বলিবার আছে?”

সুরমা কহিল, “অনেকদিন তাঁহাকে দেখিস নাই, তোর মন কেমন করিবেই তো! তুই তাঁহাকে আসিবার জন্ত একখানা চিঠি লেখ না। আমি তোর দাদাকে দিয়া পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিব।”

বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

বিভা ঘাড় হেঁট করিয়া কহিতে লাগিল, “এখানে কেহ যদি তাঁহাকে গ্রাহ্য না করে, কেহ যদি তাঁহাকে ডাকিবার আবশ্যক বিবেচনা না করে, তবে এখানে তিনি না আসিলেই ভালো। তিনি যদি আপনি আসেন তবে আমি বারণ করিব। তিনি রাজা, যেখানে তাঁহার আদর নাই, সেখানে তিনি কেন আসিবেন? আমাদের চেয়ে তিনি কিসে ছোটো যে, পিতা তাঁহাকে অপমান করিবেন?” বলিতে বলিতে বিভা আর সামলাইতে পারিল না, তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল ও সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরমা বিভার মুখ বুকে রাখিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া কহিল, “আচ্ছা বিভা, তুই যদি পুরুষ হইতিস তো কী করিতিস? নিমন্ত্রণপত্র পাস নাই বলিয়া কি শত্রুবাড়ি যাইতিস না?”

বিভা বলিয়া উঠিল, “না, তাহা পারিতাম না। আমি যদি পুরুষ হইতাম তো এখনই চলিয়া যাইতাম; মান-অপমান কিছুই ভাবিতাম না। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া না ডাকিয়া আনিলে তিনি কেন আসিবেন?”

বিভা এত কথা কখনো কহে নাই। আজ আবেগের মাথায় অনেক কথা বলিয়াছে। এতক্ষণে একটু লজ্জা করিতে লাগিল। মনে হইল, বড়ো অধিক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আবার, যে-রকম করিয়া বলিয়াছি, বড়ো লজ্জা করিতেছে। ক্রমে তাহার মনের উত্তেজনা হ্রাস হইয়া আসিল ও মনের মধ্যে একটা গুরুভার অবসাদ আস্তে আস্তে চাপিয়া পড়িতে লাগিল। বিভা বাহুতে মুখ ঢাকিয়া সুরমার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল, সুরমা মাথা নত করিয়া কোমল হস্তে তাহার ঘন কেশভার পৃথক করিয়া দিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ গেল। উভয়ের মুখে একটি কথা নাই। বিভার চোখ দিয়া এক-এক বিন্দু করিয়া জল পড়িতেছে ও সুরমা আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ বাদে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন বিভা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল ও চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসির অর্থ, “আজ কী ছেলেমানুষিই করিয়াছি।” ক্রমে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গিয়া পালাইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সুরমা কিছু না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া রহিল। পূর্বকার কথা আর কিছু উত্থাপন না করিয়া কহিল, “বিভা শুনিয়াছিস, দাদামহাশয় আসিয়াছেন?”

বিভা। “দাদামহাশয় আসিয়াছেন?”

সুরমা। “হাঁ।”

বিভা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “কখন আসিয়াছেন?”

সুরমা। “প্রায় চার প্রহর বেলার সময়।”

বিভা। “এখনো যে আমাদের দেখিতে আসিলেন না?”

বিভার মনে ঈষৎ অভিমানের উদয় হইল। দাদামহাশয়ের দখল লইয়া বিভা অতিশয় সতর্ক। এমন কি একদিন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া বিভাকে অন্তঃপুরে তিন দণ্ড অপেক্ষা করাইয়াছিলেন, এক বায়েই তাহার সহিত দেখা করিতে যান নাই, এই জন্ত বিভার এমন কষ্ট হইয়াছিল যে, যদিও সে বিষয়ে সে কিছু বলে নাই বটে তবু প্রসন্নমুখে দাদামহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারে নাই।

বসন্ত রায় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে গান ধরিলেন,

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৩৯৯

“আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।

ভয় নাইকো সুখে থাকো,

অধিক ক্ষণ থাকব নাকো

আসিয়াছি দু-দণ্ডের তরে।

দেখব শুধু মুখখানি

শুনব ছুটি মধুর বাণী

আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।”

গান শুনিয়া বিভা মুখ নত করিয়া হাসিল। তাহার বড়ো আফ্লাদ হইয়াছে।
জটটা আফ্লাদ পাছে ধরা পড়ে বলিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

স্বরমা বিভার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, “দাদামহাশয়, বিভার হাসি দেখিবার
জন্য তো আড়ালে যাইতে হইল না।”

বসন্ত রায়। “না, বিভা মনে করিল, নিতান্তই না হাসিলে যদি বুড়া বিদায় না
হয়, তবে না হয় একটু হাসি। ও ডাকিনীর মতলব আমি বেশ বুঝি, আমাকে
তাড়াইবার ফন্দি। কিন্তু শীঘ্র তাহা হইতেছে না। আসিলাম যদি তো ভালো করিয়া
জলিয়া যাইব, আবার যতদিন না দেখা হয় মনে থাকিবে।”

স্বরমা হাসিয়া কহিল, “দেখো দাদামহাশয়, বিভা আমার কানে কানে বলিল
যে মনে রাখানোই যদি অভিপ্রায় হয়, তবে যা জালাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে,
আর নূতন করিয়া জালাইতে হইবে না।”

কথাটা শুনিয়া বসন্ত রায়ের বড়োই আনন্দ বোধ হইল। তিনি হাসিতে
লাগিলেন।

বিভা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, “না, আমি কখনো ও-কথা বলি নাই।
আমি কোনো কথাই কই নাই।”

স্বরমা কহিল, “দাদামহাশয়, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তুমি হাসি
দেখিতে চাহিলে তাহা দেখিলে, কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে তাহাও শুনাইলাম, তবে
এখন দেশান্তরে যাও।”

বসন্ত রায়। “না ভাই, তাহা পারিলাম না। আমি গোটা-পনেরো গান
ও একমাথা পাকা চুল আনিয়াছি, সেগুলি সমস্ত নিকাশ না করিয়া যাইতে
পারিতেছি না।”

বিভা আর থাকিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিল, কহিল, “তোমার আধমাথা বই
চল নাই যে দাদামহাশয়।”

দাদামহাশয়ের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। অনেকদিনের পর প্রথম আলাপে বিভার মুখ খুলিতে কিছু আয়োজনের আবশ্যক করে, কিন্তু দাদামহাশয়ের কাছে বিভার মুখ একবার খুলিলে তাহা বন্ধ করিতে আবার ততোধিক আয়োজনের আবশ্যক হয়। কিন্তু দাদামহাশয় ব্যতীত আর কাহারও কাছে কোনো অবস্থাতেই বিভার মুখ খুলে না।

বসন্ত রায় টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “সে একদিন গিয়াছে যে ভাই। যেদিন বসন্ত রায়ের মাথায় একমাথা চুল ছিল, সেদিন কি আর এত রাত্তা হাঁটিয়া তোমাদের খোশামোদ করিতে আসিতাম? একগাছি চুল পাকিলে তোমাদের মতো পাঁচটা রূপসী চুল তুলিবার জন্ত উমেদার হইত ও মনের আগ্রহে দশটা কাঁচা চুল তুলিয়া ফেলিত।”

বিভা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা দাদামহাশয়, তোমার যখন একমাথা চুল ছিল, তখন কি তোমাকে এখনকার চেয়ে ভালো দেখিতে ছিল?”

মনে মনে বিভার সে-বিষয়ে বিবম সন্দেহ ছিল। দাদামহাশয়ের টাকটি, তাঁহার গুহ্মসম্পর্কশূন্য অধরের প্রশস্ত হাসিটি, তাঁহার পাকা আত্মের স্থায় ভাবটি, সে মনে মনে পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিল, কোনোমতেই ভালো ঠেকিল না। সে দেখিল, সে টাকটি না দিলে তাহার দাদামহাশয়কে কিছুতে মানায় না। আর গৌফ জুড়িয়া দিলে দাদামহাশয়ের মুখখানি একেবারে খারাপ দেখিতে হইয়া যায়। এত খারাপ হইয়া যায় যে, সে তাহা কল্পনা করিলে হাসি রাখিতে পারে না। দাদামহাশয়ের আবার গৌফ। দাদামহাশয়ের আবার টাক নাই।

বসন্ত রায় কহিলেন, “সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমার নাতনীরা আমার টাক দেখিয়া মোহিত হয়, তাহারা আমার চুল দেখে নাই। আমার দিদিমারা আমার চুল দেখিয়া মোহিত হইতেন, তাঁহারা আমার টাক দেখেন নাই। যাহারা উভয়ই দেখিয়াছে, তাহারা এখনো একটা মত স্থির করিতে পারে নাই।”

বিভা কহিল, “কিন্তু তা বলিয়া দাদামহাশয়, যতটা টাক পড়িয়াছে তাহার অধিক পড়িলে আর ভালো দেখাইবে না।”

সুরমা কহিল, “দাদামহাশয়, টাকের আলোচনা পরে হইবে। এখন বিভার একটা যাহা হয় উপায় করিয়া দাও।”

বিভা তাড়াতাড়ি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল, “দাদামহাশয়, আমি তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।”

সুরমা। “আমি বলি কি—”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪০১

বিভা। “শোনো না দাদামহাশয়, তোমার—”

সুরমা। “বিভা চুপ কর। আমি বলি কি, তুমি গিয়ে একবার—”

বিভা। “দাদামহাশয়, তোমার মাথায় পাকা চুল ছাড়া যে আর কিছুই নেই, তুলে দিলে সমস্ত মাথায় টাক পড়বে।”

বসন্ত রায়। “আমাকে যদি কথা শুনতে না দিস দিদি, আমাকে যদি বিরক্ত করিস তবে আমি রাগ হিন্দোল আলাপ করিব।”

বলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন সেতারটির কান মোচড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দোল রাগের উপর বিভার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল।

বিভা বলিল, “কী সর্বনাশ। তবে আমি পালাই।” বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সুরমা গম্ভীর হইয়া কহিল, “বিভা নীরব হইয়া দিনরাত্রি যে কষ্ট প্রাণের মধ্য বহন করে তাহা জানিতে পারিলে বোধ করি মহারাজারও মনে দয়া হয়।”

“কেন। কেন। তাহার কী হয়েছে।” বলিয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত বসন্ত রায় সুরমার কাছে গিয়া বসিলেন।

সুরমা কহিল, “বৎসরের মধ্যে একটি দিন ঠাকুরজামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া গাঠাইতেও কাহারও মনে পড়ে না?”

বসন্ত রায় চিন্তা করিয়া কহিলেন “ঠিক কথাই তো।”

সুরমা কহিল, “স্বামীর প্রতি এ অনাদর কয়জন মেয়ে সহিতে পারে বলো তো? বিভা ভালোমানুষ, তাই কাহাকেও কিছু বলে না, আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে।”

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে?”

সুরমা। “আজ বিকালে আমার কাছে কত কাঁদিতেছিল।”

বসন্ত রায়। “বিভা আজ বিকালে কাঁদিতেছিল?”

সুরমা। “হাঁ।”

বসন্ত রায়। “আহা, তাহাকে একবার ডাকিয়া আনো, আমি দেখি।”

সুরমা বিভাকে ধরিয়া আনিল। বসন্ত রায় তাহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, “তুই কাদিস কেন দিদি? যখন তোর যা কষ্ট হয় তোর দাদামহাশয়কে বলিস না কেন? তা হলে আমি আমার যথাসাধ্য করি। আমি এখনই যাই, প্রতাপকে বলিয়া আসি গে।”

বিভা বলিয়া উঠিল, “দাদামহাশয়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার বিষয়ে যাবাকি কিছু বলিয়ো না। দাদামহাশয়, তোমার পায়ে পড়ি যাইয়ো না।”

বলিতে বলিতে, বসন্ত রায় বাহির হইয়া গেলেন ; প্রতাপাদিত্যকে গিয়া বলিলেন, “তোমার জামাতাকে অনেকদিন নিমন্ত্রণ কর মাই ইহাতে তাহার প্রতি নিভান্ত অবহেলা প্রকাশ করা হইতেছে। যশোহরপতির জামাতাকে যতখানি সমাদর করা উচিত, ততখানি সমাদর যদি তাহাকে না করা হয়, তবে তাহাতে তোমারই অপমান। তাহাতে গৌরবের কথা কিছুই নাই।”

প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের কথায় কিছুমাত্র বিরক্তি করিলেন না। লোকসহ নিমন্ত্রণপত্র চন্দ্রদীপে পাঠাইবার হুকুম হইল।

অন্তঃপুরে বিভা ও সুরমার কাছে আসিয়া বসন্ত রায়ের সেতার বাজাইবার ধুম পড়িয়া গেল।

“মলিন মুখে ফুটুক হাসি জুড়াক দু-নয়ন।”

বিভা লজ্জিত হইয়া কহিল, “দাদামহাশয়, বাবার কাছে আমার কথা সমস্ত বলিয়াছ?” বসন্ত রায় গান গাহিতে লাগিলেন,

“মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু-নয়ন।

মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ।”

বিভা সেতারের তারে হাত দিয়া সেতার বন্ধ করিয়া আবার কহিল, “বাবার কাছে আমার কথা বলিয়াছ?”

এমন সময়ে উদয়াদিত্যের কনিষ্ঠ অষ্টমবর্ষীয় সমরাদিত্য ঘরের মধ্যে উকি মারিয়া বলিয়া উঠিল, “জ্যা দিদি। দাদামহাশয়ের সহিত গল্প করিতেছ। আমি যাকে বলিয়া দিয়া আসিতেছি।”

“এস, এস, ভাই এস।” বলিয়া বসন্ত রায় তাহাকে পাকড়া করিলেন।

রাজপরিবারের বিশ্বাস এই যে, বসন্ত রায় ও সুরমায় মিলিয়া উদয়াদিত্যের সর্বনাশ করিয়াছে। এই নিমিত্ত বসন্ত রায় আসিলে সামাল সামাল পড়িয়া যায়। সমরাদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ছাড়াইবার জন্ত টানাহেঁচড়া আরম্ভ করিল। বসন্ত রায় তাহাকে সেতার দিয়া, তাহাকে কাঁধে চড়াইয়া, তাহাকে চশমা পরাইয়া, দুই দণ্ডের মধ্যে এমনি বশ করিয়া লইলেন যে, সে সমস্ত দিন দাদামহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল ও অনবরত সেতার বাজাইয়া তাঁহার সেতারের পাচটা তার ছিঁড়িয়া দিল ও মেজরাপ কাড়িয়া লইয়া আর দিল না।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪০৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রবীপের রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহার রাজকক্ষে বসিয়া আছেন। ঘরটি খুটকোণ। কড়ি হইতে কাপড়ে মোড়া ঝাড় ঝুলিতেছে। দেয়ালের কুলদ্বির মধ্যে একটাতে গণেশের ও বাকিগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবস্থার প্রতিমূর্তি স্থাপিত। সেগুলি বিখ্যাত কারিকর বটকৃষ্ণ কুন্ডকারের স্বহস্তে গঠিত। চারিদিকে চাদর পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদি, তাহার উপর একটি রাজা ও একটি ভকিয়া। তাহার চারি কোণে জরির ঝালর। দেয়ালের চারিদিকে দেশী আয়না ঝুলানো, তাহাতে মুখ ঠিক দেখা যায় না। রাজার চারিদিকে যে-সকল মহুয়া-আয়না আছে, তাহাতেও তিনি মুখ ঠিক দেখিতে পান না, শরীরের পরিমাণ অত্যন্ত বড়ো দেখায়। রাজার বাম পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড আলবোলা ও মস্ত্রী হরিশংকর। রাজার দক্ষিণে রমাই ভাঁড় ও চশমাপরা সেনাপতি ফর্নাণ্ডিজ।

রাজা বলিলেন, “ওহে রমাই !”

রমাই বলিল, “আজ্ঞা, মহারাজ।”

রাজা হাসিয়া আকুল। মস্ত্রী রাজার অপেক্ষা অধিক হাসিলেন। ফর্নাণ্ডিজ হততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। সম্ভোষে রমাইয়ের চোখ মিটমিট করিতে লাগিল। রাজা ভাবেন, রমাইয়ের কথায় না হাসিলে অরসিকতা প্রকাশ পায়; মস্ত্রী ভাবেন, রাজা হাসিলে হাসা কর্তব্য; ফর্নাণ্ডিজ ভাবে, অবশ্য হাসিবার কিছু আছে। তাহা হুড়া, যে দুর্ভাগ্য রমাই ঠোট খুলিলে দৈবাৎ না হাসে, রমাই তাহাকে কাঁদাইয়া ছাড়িবে। নহিলে রমাইয়ের মান্দাতার সমবয়স্ক ঠাট্টাগুলি শুনিয়া অল্প লোকেই আমোদে হাসে। তবে ভয়ে ও কর্তব্যজ্ঞানে সকলেরই বিষম হাসি পায়, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারী পর্যন্ত।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “খবর কী হে ?”

রমাই ভাবিল রসিকতা করা আবশ্যক।

“পরম্পরায় শুনা গেল, সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে চোর পড়িয়াছিল।”

সেনাপতি মহাশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন একটা পুরাতন গল্প তাঁহার উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। তিনি রমাইয়ের রসিকতার ভয়ে যেমন কাতর, রমাই প্রতিবারে তেমনি তাঁহাকেই চাপিয়া ধরে। রাজার বড়োই আমোদ। রমাই আসিলেই ফর্নাণ্ডিজকে ডাকিয়া পাঠান। রাজার জীবনে দুইটি

প্রধান আনন্দ আছে ; এক ভেড়ার লড়াই দেখা, আর রমাইয়ের মুখের সামনে কর্ণাণ্ডিকে স্থাপন করা ; রাজকার্ষে প্রবেশ করিয়া অবধি সেনাপতির গায়ে একটা ছিটাগুলি বা তীরের আঁচড় লাগে নাই। অনবরত হাশ্বের গোলাগুলি খাইয়া সে ব্যক্তি কান্দো কান্দো হইয়া আসিয়াছে ; পাঠকেরা মার্জনা করিবেন, আমরা রমাইয়ের সকল রসিকতাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারিব না, স্মৃতিচরিত্র অল্পরোধে অধিকাংশ স্থলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

রাজা চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার পরে ?”

“নিবেদন করি মহারাজ। (কর্ণাণ্ডিজ তাঁহার কোর্তার বোতাম খুলিতে লাগিলেন ও পরিতে লাগিলেন।) আজ দিন তিন-চার ধরিয়া সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে রাজে চোর আনাগোনা করিতেছিল। সাহেবের ব্রাহ্মণী জানিতে পারিয়া কর্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোনোমতেই কর্তার ঘুম ভাঙাইতে পারেন নাই। ”

রাজা। “হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !”

মন্ত্রী। “হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ !”

সেনাপতি। “হিঃ হিঃ !”

“দিনের বেলা গৃহিণীর নিগ্রহ আর সহিতে না পারিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, ‘দোহাই তোমার, আজ রাজে চোর ধরিব।’ রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গৃহিণী বলিলেন, ‘ওগো চোর আসিয়াছে।’ কর্তা বলিলেন, ‘ওই যাঃ, ঘরে যে আলো জলিতেছে। চোর যে আমাদের দেখিতে পাইবে ও দেখিতে পাইলেই পালাইবে।’ চোরকে ডাকিয়া কহিলেন, ‘আজ তুই বড়ো বাঁচিয়া গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পালাইতে পারিবি, কাল আসিস দেখি, অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস।’

রাজা। “হা হা হা হা !”

মন্ত্রী। “হোহোহোহোহোহো !”

সেনাপতি। “হি।”

রাজা বলিলেন, “তার পর ?”

রমাই দেখিল, এখনো রাজার তৃপ্তি হয় নাই। “জানি না, কী কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হইল না। তাহার পররাজেও ঘরে আসিল। গিন্নি কহিলেন, সর্বনাশ হইল, ওঠো।’ কর্তা কহিলেন, ‘তুমি ওঠো না।’ গিন্নি কহিলেন, ‘আমি উঠিয়া কী করিব।’ কর্তা বলিলেন, ‘কেন, ঘরে একটা আলো জালাও না। কিছু যে দেখিতে পাই না।’ গিন্নি বিষম ক্রুদ্ধ। কর্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ‘দেখো দেখি, তোমার জন্মই তো যথাসর্বস্ব গেল। আলোটা জালাও বন্দুকটা আনো।’ ইতিমধ্যে

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪০৫

চোর কাজকর্ম সারিয়া কহিল, ‘মহাশয়, এক ছিলিম তামাকু খাওয়াইতে পারেন? বড়ো পরিশ্রম হইয়াছে।’ কর্তা বিষম ধমক দিয়া কহিলেন, ‘রোস্ বেটা! আমি তামাক সাজিয়া দিতেছি। কিন্তু আমার কাছে আসিবি তো এই বন্দুকে তোমর মাথা উড়াইয়া দিবা।’ তামাক খাইয়া চোর কহিল, ‘মহাশয়, আলোটা যদি জ্বালেন তো উপকার হয়। সিঁধকাটিটা পড়িয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইতেছি না।’ সেনাপতি কহিলেন, ‘বেটার ভয় হইয়াছে। তফাতে থাক্, কাছে আসিস না।’ বলিয়া তাড়াতাড়ি আলো জালিয়া দিলেন। ধীরে স্তম্বে জিনিসপত্র বাঁধিয়া চোর চলিয়া গেল। কর্তা গিল্মিকে কহিলেন, ‘বেটা বিষম ভয় পাইয়াছে।’ ”

রাজা ও মন্ত্রী হাসি সামলাইতে পারেন না। কর্ণাণ্ডিজ থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে “হিঃ হিঃ” করিয়া টুকরা টুকরা হাসি টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন, “রমাই, গুনিয়াছ আমি খণ্ডরালয়ে যাইতেছি?”

রমাই মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, “অসারং খলু সংসারং সারং খণ্ডরমন্দিরং (হাস্ত। প্রথমে রাজা, পরে মন্ত্রী, পরে সেনাপতি)। কথাটা মিথ্যা নহে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) খণ্ডরমন্দিরের সকলই সার,—আহারটা, সমাদরটা; ছুধের সরটি পাওয়া যায়, মাছের মুড়োটি পাওয়া যায়; সকলি সার পদার্থ; কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ওই স্ত্রীটা।”

রাজা হাসিয়া কহিলেন, “সে কী হে, তোমার অর্ধাঙ্গ—”

রমাই জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে কহিল, “মহারাজ, তাহাকে অর্ধাঙ্গ বলিবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করিলে আমি বরঞ্চ, একদিন তাহার অর্ধাঙ্গ হইতে পারিব, এমন ভরসা আছে। আমার মতো পাঁচটা অর্ধাঙ্গ জুড়িলেও তাহার আয়তনে কুলায় না!” (যথাক্রমে হাস্ত)। কথাটার রস আর সকলেই বুঝিল, কেবল মন্ত্রী পারিলেন না, এই নিমিত্ত যথাক্রমে সর্বাপেক্ষা অধিক হাসিতে হইল।

রাজা কহিলেন, “আমি তো গুনিয়াছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়োই শাস্ত্রমুগ্ধা ও ধরকন্না বিশেষ পটু।”

রমাই। “সে কথায় কাজ কী। ঘরে আর সকল রকম জঞ্জালই আছে, কেবল আমি তিষ্ঠিতে পারি না। প্রত্যুষে গৃহিণী এমনি কাঁটাইয়া দেন যে, একেবারে মহারাজের ঘরে আসিয়া পড়ি।”

এইখানে কথাপ্রসঙ্গে রমাইয়ের ব্রাহ্মণীর পরিচয় দিই। তিনি অত্যন্ত কুশাস্ত্রী ও দিনে দিনে ক্রমেই আরো ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন। রমাই ঘরে আসিলে তিনি

কোথায় যে আশ্রয় লইবেন ভাবিয়া পান না। রাজসভায় রমাই একপ্রকার ভদ্রীতে দাঁত দেখায় ও ঘরে আসিয়া গৃহিণীর কাছে আর-একপ্রকার ভদ্রীতে দাঁত দেখায়। কিন্তু গৃহিণীর বার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিলে নাকি হাস্যরস না আসিয়া করুণ রস আসে; এই নিমিত্ত রাজসভায় রমাই তাহার গৃহিণীকে স্থলকায়া ও উগ্রচণ্ডা করিয়া বর্ণনা করেন, রাজা ও মন্ত্রীরা হাসি রাখিতে পারেন না।

হাসি থামিলে পর রাজা কহিলেন, “ওহে রমাই, তোমাকে যাইতে হইবে, সেনাপতিকেও সঙ্গে লইব।”

সেনাপতি বুঝিলেন, এবার রমাই তাঁহার উপর দ্বিতীয় আক্রমণ করিবে। চশমাটা চোখে তুলিয়া পরিলেন এবং বোতাম খুলিতে ও পরিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, “উৎসবস্থলে যাইতে সেনাপতি মহাশয়ের কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ এ তো আর যুদ্ধস্থল নয়।”

রাজা ও মন্ত্রী ভাবিলেন, ভারি একটা মজার কথা আসিতেছে; আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?”

রমাই। “সাহেবের চক্ষে দিনরাত্রি চশমা জাঁটা। ঘুমাইবার সময়েও চশমা পরিয়া শোন, নহিলে ভালো করিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারেন না। সেনাপতি মহাশয়ের যুদ্ধে যাইতে আর কোনো আপত্তি নাই, কেবল পাছে চশমার কাঁচে কামানের গোলা লাগে ও কাঁচ ভাঙিয়া চোখ কানা হইয়া যায়, এই যা ভয়। কেমন মহাশয়?”

সেনাপতি চোখ টিপিয়া কহিলেন, “তাহা নয় তো কী।” তিনি আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন, “মহারাজ, আদেশ করেন তো বিদায় হই।”

রাজা সেনাপতিকে যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইতে কহিলেন, “যাত্রার সমস্ত উত্তোগ করো। আমার চৌবট্টা দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে।” মন্ত্রী ও সেনাপতি - প্রস্থান করিলেন।

রাজা কহিলেন, “রমাই, তুমি তো সমস্তই শুনিয়াছ। গতবারে খণ্ডরালয়ে আমাকে বড়োই মাটি করিয়াছিল।”

রমাই। “আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের লাজুল বানাইয়া দিয়াছিল।”

রাজা হাসিলেন, মুখের দস্তের বিদ্যুৎছটা বিকাশ হইল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে ঘোরতর মেঘ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ রমাই জানিতে পারিয়াছে শুনিয়া তিনি বড়ো সন্তুষ্ট নহেন। আর কেহ জানিলে ততটা ক্ষতি ছিল না। অনবরত গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, “আপনার এক শ্রালক আসিয়া আমাকে কহিলেন ‘বাস-ঘরে

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪০৭

তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পাইয়াছে ; তিনি রামচন্দ্র, না রামদাস ? এমন তো পূর্বে জানিতাম না ।’ আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম, ‘পূর্বে জানিবেন কিরূপে ? পূর্বে তো ছিল না । আপনাদের ঘরে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তাই যন্নির দেশে যদাচার অবলম্বন করিয়াছেন ।’

রাজা জবাব শুনিয়া বড়োই স্তম্ভী । ভাবিলেন, রমাই হইতে তাঁহার এবং তাঁহার পূর্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল হইল ও প্রতাপাদিত্যের আদিত্য একেবারে চির-রাজগ্রস্ত হইল । রাজা যুদ্ধবিগ্রহের বড়ো একটা ধার ধারেন না । এই সকল ছোটোখাটো ঘটনাগুলিকে তিনি যুদ্ধবিগ্রহের ত্রায় বিষম বড়ো করিয়া দেখেন । এতদিন তাঁহার ধারণা ছিল যে তাঁহার ঘোরতর অপমানসূচক পরাজয় হইয়াছে । এ কলঙ্কের কথা দিনরাত্রি তাঁহার মনে পড়িত ও তিনি লজ্জায় পৃথিবীকে দ্বিধা হইতে অল্পরোধ করিতেন । আজ তাঁহার মন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল যে সেনাপতি রমাই রণে জিতিয়া আসিয়াছে । কিন্তু তথাপি তাঁহার মন হইতে লজ্জার ভার একেবারে দূর হয় নাই ।

রাজা রমাইকে কহিলেন, “রমাই, এবারে গিয়া জিতিয়া আসিতে হইবে । যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার অঙ্গুরী উপহার দিব ।”

রমাই বলিল, “মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী ? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়ী ঠাকুরানীকে পর্বস্ত মনের সাথে ঘোল পান করাইয়া আসিতে পারি ।”

রাজা কহিলেন, “তাঁহার ভাবনা ? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই লইয়া যাইব ।”

রমাই কহিল, “আপনার অসাধ্য কী আছে ?”

রাজারও তাহাই বিশ্বাস । তিনি কী না করিতে পারেন ? অল্পগতবর্গের কেহ যদি বলে, “মহারাজের জয় হউক, সেবকের বাসনা পূর্ণ করুন ।” মহামহিম রামচন্দ্র রায় তৎক্ষণাৎ বলেন, “হাঁ, তাহাই হইবে ।” কেহ যেন মনে না করে এমন কিছু কাজ আছে, যাহা তাঁহা দ্বারা হইতে পারে না । তিনি স্থির করিলেন, রমাই তাঁড়কে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, স্বয়ং মহিষী-মাতার সঙ্গে বিজ্ঞপ করাইবেন, তবে তাঁহার নাম রাজা রামচন্দ্র রায় । এতবড়ো মহৎ কাজটা যদি তিনি না করিতে পারিলেন, তবে আর তিনি কিসের রাজা ।

চন্দ্রপাখিপতি রামমোহন মালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । রামমোহন মাল পরাক্রমে ভীমের মতো ছিল । শরীর প্রায় সাড়ে চারি হাত লম্বা । সমস্ত শরীরে-মাংসপেশী তরঙ্গিত । সে স্বর্ণীয় রাজার আমলের লোক । রামচন্দ্রকে বাল্যকাল হইতে

পালন করিয়াছে। রমাইকে সকলেই ভয় করে, রমাই যদি কাহাকেও ভয় করে তো সে এই রামমোহন। রামমোহন রমাইকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। রমাই তাহার ঘৃণার দৃষ্টিতে কেমন আপনা-আপনি সংকুচিত হইয়া পড়িত। রামমোহনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলে সে ছাড়িত না। রামমোহন আসিয়া দাঁড়াইল। রাজ কহিলেন, তাঁহার সঙ্গে পক্ষাশ জন অল্পচর যাইবে। রামমোহন তাহাদিগের সর্দার হইয়া যাইবে।

রামমোহন কহিল, “যে আজ্ঞা, রমাই ঠাকুর যাইবেন কি?” বিড়ালচক্ষু খবাকুতি রমাই ঠাকুর সংকুচিত হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যশোহর রাজবাটিতে আজ কর্মচারীরা ভারি ব্যস্ত। জামাতা আসিবে, নানা-প্রকার উদ্ভোগ করিতে হইতেছে। আহাৰাদির বিস্তৃত আয়োজন হইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ যশোহরের তুলনায় যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, সে-বিষয়ে প্রতাপাদিত্যের সহিত মহিষীর কোনো মতান্তর ছিল না, তথাপি জামাতা আসিবে বলিয়া আজ তাঁহার অত্যন্ত আত্মলাদ হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে বিভাকে তিনি স্বহস্তে সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন—বিভা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে। কারণ সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বয়স্ক মাতার সহিত যুবতী দুহিতার নানা বিষয়ে ঝড়িভেদ আছে, কিন্তু হইলে হয় কী, বিভার কিসে ভালো হয়, মহিষী তাহা অবশ্য ভালো বুঝেন। বিভার মনে মনে ধারণা ছিল, তিনগাছি করিয়া পাতলা ফিরোজ রঙের চুড়ি পরিলে তাহার শুভ্র কচি হাত দুইখানি বড়ো মানাইবে; মহিষী তাহাকে সোনার আটগাছা মোটা চুড়ি ও হীরার এক-একগাছা বৃহদাকার বালা পরাইয়া এত অধিক আনন্দিত হইয়া উঠিলেন যে, সকলকে দেখাইবার জন্ত বাড়ির সমুদয় বৃদ্ধা দাসী ও বিধবা পিসীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিভা জানিত যে তাহার ছোটো সুরুমার মুখখানিতে নথ কোনোমতেই মানায় না—কিন্তু মহিষী তাহাকে একটা বড়ো নথ পরাইয়া তাহার মুখখানি একবার দক্ষিণ পার্শ্বে একবার বাম পার্শ্বে ফিরাইয়া গর্বসহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতও বিভা চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু মহিষী যে ছাঁদে তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহা তাহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে গোপনে সুরুমার কাছে গিয়া মনের মতো চুল বাঁধিয়া আসিল। কিন্তু তাহা মহিষীর নজর এড়াইতে পারিল না। মহিষী দেখিলেন, কেবল চুল বাঁধার

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪০৯

ঘোষে বিভার সমস্ত সাজ মাটি হইয়া গিয়াছে। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সুরমা হিন্দা করিয়া বিভার চুল বাঁধা খারাপ করিয়া দিয়াছে। সুরমার হীন উদ্দেশ্যের প্রতি বিভার চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন। অনেকক্ষণ বকিয়া যখন স্থির করিলেন কৃতকার্ণ হইয়াছেন তখন তাহার চুল খুলিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে বিভা তাহার খোঁপা, তাহার নথ, তাহার দুই বাহুপূর্ণ চুড়ি, তাহার এক হৃদয়পূর্ণ আনন্দের ভার বহন করিয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, দুরন্ত আত্মাদিকে কোনোমতেই সে কেবলই অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখে মুখে সে কেবলই বিদ্রোহের মতো উঁকি মারিয়া বাইতেছে। তাহার মনে হইতেছে, বাড়ির দেওয়ালগুলা পৰ্যন্ত তাহাকে উপহাস করিতে উত্তত রহিয়াছে। সুবর্জ উদয়াদিত্য আসিয়া গভীর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত আনন্দের সহিত বিভার সলজ্জ হৃদয় মুখখানি দেখিলেন। বিভার হৃদয় দেখিয়া তাঁহার এমন আনন্দ হইল যে, গৃহে গিয়া সঙ্গেহে মৃদু হাস্তে সুরমাকে চুখন করিলেন।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, “কী?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “কিছুই না।”

এমন সময়ে বসন্ত রায় জোর করিয়া বিভাকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া হাজির করিলেন। চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, “দেখো দাদা, আজ একবার তোমাদের বিভার মুখখানি দেখো। সুরমা, ও সুরমা, একবার দেখে যাও।” আনন্দে গদগদ হইয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন। বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আত্মাদ হই তো ভালো করেই হাস না ভাই, দেখি।

হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে,

হাসির সে প্রাণের সাধ ঐ অধরে থেলা করে।

বয়স যদি না ঘাইত তো আজ তোর ঐ মুখখানি দেখিয়া এইখানে পড়িতাম আর মরিতাম। হায় হায়, মরিবার বয়স গিয়াছে। ঘোঁবনকালে ষড়ি ষড়ি মরিতাম। বুড়াবয়সে রোগ না হইলে আর মরণ হয় না।”

প্রতাপাদিত্যকে যখন তাঁহার শ্রালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “জামাই বাবাজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত কে গিয়াছে?” তিনি কহিলেন “আমি কী জানি।” “আজ পথে অবশ্য আলো দিতে হইবে?” নেত্র বিস্ফারিত করিয়া মহারাজ কহিলেন, “অবশ্যই দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই।” তখন রাজশ্রালক সসংকোচে কহিলেন, “নহবত বসিবে না কি?” “সে সকল বিষয় ভাবিবার অবসর নাই।” আসল কথা, বাজনা বাজাইয়া একটা জামাই ঘরে আনা প্রতাপাদিত্যের কার্য নহে।

রামচন্দ্র রায়ের মহা অভিমান উপস্থিত হইয়াছে। তিনি স্থির করিয়াছেন তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্বক অপমান করা হইয়াছে। পূর্বে দুই-এক বার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্ত রাজবাটা হইতে চকদিহিতে লোক প্রেরিত হইত এবারে চকদিহি পার হইয়া দুই ক্রোশ আসিলে পর বামনহাটিতে দেওয়ানজি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। যদি বা দেওয়ানজি আসিলেন, তাঁহার সহিত দুই শত পঞ্চাশ জন বই লোক আসে নাই। কেন, সমস্ত যশোহরে কি আর-পঞ্চাশ জন লোক মিলিল না। রাজাকে লইতে যে হাতিটি আসিয়াছে রমাই ভাঁড়ের মতে স্থলকায় দেওয়ানজি তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর। দেওয়ানকে রমাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “মহাশয়, উট বুঝি আপনার কনিষ্ঠ?” ভালোমাহুষ দেওয়ানজি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া উত্তর দিয়াছেন, “না, ওটা হাতি।”

রাজা ক্ষুব্ধ হইয়া দেওয়ানকে কহিলেন, “তোমাদের মন্ত্রী যে হাতিটাতে চড়িয়া থাকে, সেটাও যে ইহা অপেক্ষা বড়ো।”

দেওয়ান কহিলেন, “বড়ো হাতিগুলি রাজকার্য উপলক্ষে দূরে পাঠানো হইয়াছে, শহরে একটিও নাই।”

রামচন্দ্র স্থির করিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্তই তাহাদের দূরে পাঠানো হইয়াছে। নহিলে আর কী কারণ থাকিতে পারে।

রাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় আরক্তিম হইয়া শ্বশুরের নাম ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, “প্রতাপাদিত্য রায়ের চেয়ে আমি কিসে ছোটো?”

রমাই ভাঁড় কহিল, “বয়সে আর সম্পর্কে, নহিলে আর কিসে। তাঁহার মেয়েকে যে আপনি বিবাহ করিয়াছেন ইহাতেই—”

কাছে রামমোহন মাল দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার আর সহ হইল না, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, “দেখো ঠাকুর, তোমার বড়ো বাড় বাড়িয়াছে। আমার মা-ঠাকরনের কথা অমন করিয়া বলিয়ে না। এই স্পষ্ট কথা বলিলাম।”

প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া রমাই কহিল, “অমন ঢের ঢের আদিত্য দেখিয়াছি। জানেন তো মহারাজ, আদিত্যকে যে-ব্যক্তি বগলে ধরিয়া রাখিতে পারে, সে-ব্যক্তি রামচন্দ্রের দাস।”

রাজা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। রামমোহন তখন ধীরপদক্ষেপে রাজার সম্মুখে আসিয়া জোড়হস্তে কহিল, “মহারাজ, ওই বামনা যে আপনার শ্বশুরের নামে যাহা ইচ্ছা তাই বলিবে, ইহা তো আমার সহ হয় না। বলেন তো উহার মুখ বন্ধ করি।”

রাজা কহিলেন, “রামমোহন, তুই থাম।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪১১

তখন রামমোহন সেখান হইতে দূরে চলিয়া গেল।

রামচন্দ্র সেদিন বহু সহস্র খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া বিস্তৃত আয়োজন করিয়াছেন। অভিমানে তিনি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রতাপাদিত্যের কাছে এমন মূর্তি ধারণ করিবেন, যাহাতে প্রতাপাদিত্য বুঝিতে পারেন তাঁহার জামাতা কতবড়ো লোক।

যখন প্রতাপাদিত্যের সহিত রামচন্দ্র রায়ের দেখা হইল, তখন প্রতাপাদিত্য রাজকক্ষে তাঁহার মন্ত্রী সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দেখিবামাত্রই রামচন্দ্র নতমুখে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

প্রতাপাদিত্য কিছুমাত্র উল্লাস বা ব্যস্তভাব প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে কহিলেন, “এস, ভালো আছ তো?”

রামচন্দ্র মুহূর্তের কহিলেন, “আজ্ঞা হাঁ।”

মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “ভাঙামাধি পরগনার তহসিলদারের যে অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার কোনো তদন্ত করিয়াছ?”

মন্ত্রী দীর্ঘ এক কাগজ বাহির করিয়া রাজার হাতে দিলেন, রাজা পড়িতে লাগিলেন। কিয়দূর পড়িয়া একবার চোখ তুলিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “গত বৎসরের মতো এবার তো তোমাদের ওখানে বন্যা হয় নাই?”

রামচন্দ্র। “আজ্ঞা না। আশ্বিন মাসে একবার জল বৃদ্ধি—”

প্রতাপাদিত্য। “মন্ত্রী। এ চিঠিখানার অবস্থা একটা নকল রাখা হইয়াছে।” বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ করিয়া জামাতাকে কহিলেন, “যাও যাপু, অন্তঃপুরে যাও।”

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহার অপেক্ষা প্রতাপাদিত্য কিসে বড়ো।

নবম পরিচ্ছেদ

রামমোহন মাল যখন অন্তঃপুরে আসিয়া বিভাকে প্রণাম করিয়া কহিল, “মা, তোমার একবার দেখিতে আসিলাম” তখন বিভার মনে বড়ো আহ্লাদ হইল। রামমোহনকে সে বড়ো ভালোবাসিত। কুটুম্বিতার নানাবিধ কার্যভার বহন করিয়া রামমোহন প্রায় মাঝে মাঝে চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরে আসিত। কোনো আবশ্যক না

থাকিলেও অবসর পাইলে সে এক-একবার বিভাকে দেখিতে আসিত। রামমোহনকে বিভা কিছুমাত্র লক্ষ্য করিত না। বৃদ্ধ বলিষ্ঠ দীর্ঘ রামমোহন যখন “মা” বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইত তখন তাহার মধ্যে এমন একটা বিস্তৃত সরল অলংকারশূন্য স্নেহের ভাব থাকিত যে, বিভা তাহার কাছে আপনাকে নিতান্ত বালিকা মনে করিত। বিভা তাকে কহিল, “মোহন, তুই এতদিন আসিস নাই কেন?”

রামমোহন কহিল, “তা মা, ‘কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়’, তুমি কোন্ আমাকে মনে করিলে? আমি মনে মনে কহিলাম, ‘মা’ না থাকিলে আমি যাব না, দেখি, কতদিনে তাঁর মনে পড়ে।’ তা কই, একবারও তো মনে পড়িল না।”

বিভা ভারি মুশকিলে পড়িল। সে কেন ডাকে নাই, তাহা ভালো করিয়া বলিতে পারিল না। তাহা ছাড়া; ডাকে নাই বলিয়া যে মনে করে নাই, এই কথাটার মধ্যে এক জায়গায় কোথায় যুক্তির দোষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে, অথচ ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছে না।

বিভার মুশকিল দেখিয়া রামমোহন হাসিয়া কহিল, “না মা, অবসর পাই নাই বলিয়া আসিতে পারি নাই।”

বিভা কহিল, “মোহন, তুই ব’স; তোদের দেশের গল্প আমার বন্।”

রামমোহন বসিল। চন্দ্রবীপের বর্ণনা করিতে লাগিল। বিভা গালে হাত দিয়া একমনে শুনিতে লাগিল। চন্দ্রবীপের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে তাহার হৃদয়টুকুর মধ্যে কত কী কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেদিন সে আসমানের উপর কত ঘরবাড়িই বাধিয়াছিল তাহার আর ঠিকানা নাই। যখন রামমোহন গল্প করিল, গত বর্ষার বস্ত্র তাহার ঘরবাড়ি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে একাকী তাহার বৃদ্ধ মাতাকে পিঠে করিয়া সীতার দিয়া মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়াছিল ও দুই জনে মিলিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে যাপন করিয়াছিল তখন বিভার ক্ষুদ্র বুকটির মধ্যে কী হৃৎকম্পই উপস্থিত হইয়াছিল।

গল্প ফুরাইলে পর রামমোহন কহিল, “মা, তোমার জন্ম চারগাছি শাঁখা আনিয়াছি, তোমাকে ওই হাতে পরিতে হইবে, আমি দেখিব।”

বিভা তাহার চারগাছি সোনার চুড়ি খুলিয়া শাঁখা পরিল ও হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে গিয়া কহিল, “মা, মোহন তোমার চুড়ি খুলিয়া আমাকে চারগাছি শাঁখা পরাইয়া দিয়াছে।”

মহিষী কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া হাসিয়া কহিলেন, “তা বেশ তো সাজিয়াছে, বেশ তো মানাইয়াছে।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪১৩

রামমোহন অত্যন্ত উৎসাহিত ও গর্বিত হইয়া উঠিল। মহিষী তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন, নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে আহাৰ করাইলেন। সে তৃপ্তিপূৰ্বক ভোজন করিলে পর তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “মোহন, এইবারে তোৰ সেই আগমনীর গানটি গা।” রামমোহন বিভাৰ দিকে চাহিয়া গাহিল,

“সারা বরষ দেখি নে মা, মা তুই আমার কেমনধারা,
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা।

এলি কি পাষাণী ওরে

দেখব তোরে আঁখি ভরে

কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।”

রামমোহনের চোখে জল আসিল, মহিষীও বিভাৰ মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জল মুছিলেন। আগমনীর গানে তাঁহার বিজয়ার কথা মনে পড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পুরমহিলাদের জনতা বাড়িতে লাগিল। প্রতিবেশিনীরা জামাই দেখিবার জন্ত ও সম্পর্ক অনুসারে জামাইকে উপহাস করিবার জন্ত অন্তঃপুরে সমাগত হইল। আনন্দ, লজ্জা, আশঙ্কা, একটা অনিশ্চিত অনির্দেশ্য না-জানি-কী-হইবে ভাবে বিভাৰ হৃদয় তোলপাড় করিতেছে, তাহার মুখ-কান লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাত-পা শীতল হইয়া গিয়াছে। ইহা কষ্ট কি সুখ কে জানে।

জামাই অন্তঃপুরে আসিয়াছেন। হলবিশিষ্ট সৌন্দর্যের বাঁকের গায় রমণীগণ চারিদিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিকে হাসির কোলাহল উঠিল। চারিদিক হইতে কোকিল-কণ্ঠের তীব্র উপহাস, মুণাল-বাহুর কঠোর তাড়ন, চম্পক-অমূলির চন্দ্র-নখরের তীক্ষ্ণ পীড়ন চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায় যখন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একজন প্রোঢ়া রমণী আসিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিল। সে কঠোর কণ্ঠে এমনি কাটা কাটা কথা কহিতে লাগিল ও ক্রমেই তাহার মুখ ঘিয়া এমনি সকল রুচির বিকার বাহির হইতে লাগিল যে পুররমণীদের মুখ একপ্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার মুখের কাছে থাকোদিদিও চূপ করিয়া গেলেন। বিমলাদিদি ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ভূতোর মা তাহাকে খুব এক কথা তনাইয়াছিল। যখন উল্লিখিত ভূতোর মার মুখ খুব চলিতেছিল, তখন সেই প্রোঢ়া তাহাকে বলিয়াছিল, “মাগো মা, তোমার মুখ নয় তো, একগাছা বাঁটা।” ভূতোর মা তৎক্ষণাৎ কহিল, “আর মাগি, তোৰ মুখটা আঁস্তাকুড়, এত বাঁটাইলাম তবুও সাফ হইল না।” বলিয়া গস গস করিয়া চলিয়া গেল। একে একে ঘর খালি হইল, রামচন্দ্র রায় বিরাম পাইলেন।

তখন সেই প্রোচা গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহিবীর কক্ষে উপস্থিত হইল। সেখানে মহিবী দাসদাসীদিগকে খাওয়াইতেছিলেন। রামমোহনও একপার্শ্বে বসিয়া থাইতেছিল। সেই প্রোচা মহিবীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, “এই যে নিকষা জননী।” শুনিবামাত্র রামমোহন চমকিয়া উঠিল, প্রোচার মুখের দিকে চাহিল। তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিয়া শাদুলের ত্রায় লম্ফ দিয়া তাহার দুই হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, “আমি যে ঠাকুর তোমার চিনি।” বলিয়া তাহার মস্তকের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলিল। আর কেহ নহে, রমাই ঠাকুর। রামমোহন ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, গাত্র হইতে চাদর খুলিয়া ফেলিল; দুই হস্তে অবলীলাক্রমে রমাইকে আকাশে তুলিল, কহিল, “আজ আমার হাতে তোর মরণ আছে।” বলিয়া তাহাকে দুই এক পাক আকাশে ঘুরাইল। মহিবী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, “রামমোহন তুই করিস কী?” রমাই কাতর স্বরে কহিল, “দোহাই বাবা, ব্রহ্মহত্যা করিস না।” চারিদিক হইতে বিষম একটা গোলযোগ উঠিল। তখন রামমোহন রমাইকে ভূমিতে নামাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, “হতভাগা, তোর কি আর মরিবার জায়গা ছিল না?”

রমাই কহিল, “মহারাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন।” রামমোহন বলিয়া উঠিল, “কী বলিলি, নিমকহারাম? স্বেদ অমন কথা বলিবি তো এই শানের পাথরে তোর মুখ ধরিয়া দিব।” বলিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

রমাই আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন রামমোহন খর্বকায় রমাইকে চাদর দিয়া বাঁধিয়া বস্তার মতন করিয়া বুলাইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা অনেকটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার শ্রালক আসিয়া সেই রাত্রে প্রতাপাদিত্যকে সংবাদ দিলেন যে, জামাতা রমাই ভাঁড়কে রমণীবেশে অন্তঃপুরে লইয়া গেছেন। সেখানে সে পুররমণীদের সহিত, এমন কি, মহিবীর সহিত বিক্রপ করিয়াছে।

তখন প্রতাপাদিত্যের মূর্তি অতিশয় ভয়ংকর হইয়া উঠিল। রোষে তাঁহার সর্বাঙ্গ আলাড়িত হইয়া উঠিল। ক্ষীতজটা সিংহের ত্রায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, “লছমন সর্দারকে ডাকো।” লছমন সর্দারকে কহিলেন, “আজ রাতে আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিন্ন মণ্ড দেখিতে চাই।” সে তৎক্ষণাৎ সেলাম করিয়া কহিল, “যো হুকুম মহারাজ।” তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রালক তাঁহার পদতলে পড়িল, কহিল, “মহারাজ, মার্জনা করুন, বিভার কথা একবার মনে করুন। অমনে কাজ করিবেন না।” প্রতাপাদিত্য পুনরায় দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “আজ রাত্রে

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪১৫

মধ্যেই আমি রামচন্দ্র রায়ের মুণ্ড চাই।” তাঁহার ঞ্চালক তাঁহার পা ছড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “মহারাজ, আজ তাঁহারা অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন, মার্জনা করুন।” তখন প্রতাপাদিত্য কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, “লছমন গুন, কাল প্রভাতে যখন রামচন্দ্র রায় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবে তখন তাহাকে বধ করিবে, তোমার উপর আদেশ রহিল।” ঞ্চালক দেখিলেন, তিনি যতদূরে মনে করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিলেন।

তখন দূর হইতে দুই প্রহরের নহবত বাজিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রে সেই নহবতের শব্দ জ্যোৎস্নার সহিত দক্ষিণা বাতাসের সহিত মিশিয়া ঘুমন্ত প্রাণের মধ্যে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। বিভার শয়নকক্ষের মুক্ত বাতায়ন ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আলো বিছানার আসিয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্র রায় নিদ্রায় মগ্ন। বিভা উঠিয়া বসিয়া চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া তাহার চোখ দিয়া দুই-এক বিন্দু অশ্রু বরিয়া পড়িতেছিল। বুঝি যেমনটি কল্পনা করিয়াছিল ঠিক তেমনটি হয় নাই। তাহার প্রাণের মধ্যে কাঁদিতেছিল। এতদিন যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, সে দিন তো আজ আসিয়াছে।

রামচন্দ্র রায় শয়ন করিয়া অবধি বিভার সহিত একটি কথা কন নাই। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিয়াছে—তিনি প্রতাপাদিত্যকে অপমান করিবেন কী করিয়া? না, বিভাকে অগ্রাহ্য করিয়া। তিনি জানাইতে চান, “তুমি তো যশোহরের প্রতাপাদিত্যের মেয়ে, চন্দ্রবীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের পাশে কি তোমাকে সাজে?” এই স্থির করিয়া সেই যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন আর পার্থ পরিবর্তন করেন নাই। যত মান-অভিমান সমস্তই বিভার প্রতি। বিভা জাগিয়া বসিয়া জ্বালাতেছে। একবার জ্যোৎস্নার দিকে চাহিতেছে, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছে। তাহার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া এক-একবার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতেছে—প্রাণের মধ্যে বড়ো ব্যথা বাজিয়াছে। সহসা একবার রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সহসা দেখিলেন, বিভা চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। সেই নিদ্রোচ্ছিন্ন অবস্থার প্রথম মুহূর্তে যখন অপমানের স্মৃতি জাগিয়া উঠে নাই, গভীর নিদ্রার পরে মনের স্তব্ধ ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে, রোষের ভাব চলিয়া গিয়াছে, তখন সহসা বিভার সেই অশ্রুপাণ্ডিত করুণ কচি মুখখানি দেখিয়া সহসা তাঁহার মনে করুণা জাগিয়া উঠিল। বিভার হাত ধরিয়া কহিলেন, “বিভা, কাঁদিতেছ?” বিভা আকুল হইয়া উঠিল। বিভা কথা কহিতে পারিল না, বিভা চোখে দেখিতে পাইল না, বিভা শুইয়া পড়িল। তখন

৪১৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রামচন্দ্র রায় উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বিভার মাথাটি লইয়া কোলের উপর রাখিলেন, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। এমন সময়ে দ্বারে কে আঘাত করিল। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, “কে ও?” বাহির হইতে উত্তর আসিল, “অবিলম্বে দ্বার খোলো।”

দশম পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় শয়নকক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিলেন। রাজশালক রমাপতি কহিলেন, “বাবা এখনই পালাও, মুহূর্ত বিলম্ব করিয়ো না।”

সেই রাত্রে সহসা এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র রায় একেবারে চমকিয়া উঠিলেন, তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল, রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, কেন, কী হইয়াছে?”

“কী হইয়াছে তাহা বলিব না, এখনই পালাও।”

বিভা শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মামা, কী হইয়াছে?”

রমাপতি কহিলেন, “সে-কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই, মা।”

বিভার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে একবার বসন্ত রায়ের কথা ভাবিল, একবার উদয়াদিত্যের কথা ভাবিল। বলিয়া উঠিল, “মামা, কী হইয়াছে বলো।”

রমাপতি তাহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, “বাবা, অনর্থক কালবিলম্ব হইতেছে। এই বেলা গোপনে পালাইবার উপায় দেখো।”

ইহা শুনিয়া বিভার মনে একটা দারুণ অশুভ আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। গমনোত্তম মাতুলের পথরোধ করিয়া কহিল, “ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, কী হইয়াছে বলিয়া যাও।”

রমাপতি সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, “গোল করিস নে বিভা চুপ কর, আমি সমস্তই বলিতেছি।”

যখন রমাপতি একে একে সমস্তটা বলিলেন, তখন বিভা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। রমাপতি তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন—কহিলেন, “চুপ, চুপ, সর্বনাশ করিস নে।” বিভা রুদ্ধশ্বাসে অর্ধরুদ্ধস্বরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

রামচন্দ্র রায় সকাতরে কহিলেন, “এখন আমি কী উপায় করিব? পালাইবার কী পথ আছে, আমি তো কিছুই জানি না।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪১৭

রমাপতি কহিলেন, “আজ রাত্রে প্রহরীরা চারিদিকে সতর্ক আছে। আমি একবার চারিদিকে দেখিয়া আসি যদি কোথাও কোনো উপায় থাকে।”

এই বলিয়া তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। বিভা তাঁহাকে ধরিয়া কহিল, “মামা, তুমি কোথায় যাও। তুমি যাইয়ো না, তুমি আমাদের কাছে থাকো।”

রমাপতি কহিলেন, “বিভা, তুই পাগল হইয়াছিস। আমি কাছে থাকিলে কোনো উপকার দেখিবে না। ততক্ষণ আমি একবার চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া আসি।”

বিভা তখন বলপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত-পা ধরধর করিয়া কাঁপিতেছে। কহিল, “মামা, তুমি আর-একটু এইখানে থাকো। আমি একবার দাদার কাছে যাই।” বলিয়া বিভা তাড়াতাড়ি উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন ক্ষীণ চন্দ্র অন্ত যায় যায়। চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। কোথাও মাদাশব্দ নাই। রামচন্দ্র রায় তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন-তুই পার্শ্বে রাজ-অস্ত্রপুরের শ্রেণীবদ্ধ কক্ষে দ্বার রুদ্ধ, সকলেই নিঃশব্দচিন্তে ঘুমাইতেছে। সম্মুখের প্রাঙ্গণে চারিদিকের ভিত্তির ছায়া পড়িয়াছে ও তাহার এক পার্শ্বে একটুখানি জ্যোৎস্না এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে। ক্রমে সেটুকুও মিলাইয়া গেল। অন্ধকার এক পা এক পা করিয়া সমস্ত জগৎ দখল করিয়া লইল। অন্ধকার দূরে বাগানের শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির মধ্যে আসিয়া জমিয়া বসিল। অন্ধকার কোল বেষিয়া অতি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রামচন্দ্র রায় কল্পনা করিতে লাগিলেন এই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে না জানি কোথায় একটা ছুরি তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। দক্ষিণে না বামে, সম্মুখে না পশ্চাতে? ওই যে ইতস্তত এক-একটা কোণ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে একটা কোণে তো কেহ মুখ গুঁজিয়া, সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই? কী জানি ঘরের মধ্যে যদি কেহ থাকে। খাটের নিচে, অথবা দেওয়ালের এক পার্শ্বে। তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কপাল দিয়া বাম পড়িতে লাগিল। একবার মনে হইল যদি মামা কিছু করেন, যদি তাঁহার কোনো অভিসন্ধি থাকে? আন্তে আন্তে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। একটা বাতাস আসিয়া ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেল। রামচন্দ্র ভাবিলেন, কে এক জন বুঝি প্রদীপ নিবাইয়া দিল—কে এক জন বুঝি ঘরে আছে। রমাপতির কাছে বেষিয়া গিয়া ডাকিলেন, “মামা।” মামা কহিলেন, “কী বাবা?” রামচন্দ্র রায় মনে মনে কহিলেন, বিভা কাছে থাকিলে ভালো হইত, মামাকে ভালো বিশ্বাস হইতেছে না।

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে একেবারে কাঁদিয়া গিয়া পড়িল, তাহার মুখ দিয়া আর

কথা বাহির হইল না। সুরমা তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কী হইয়াছে, বিভা?” বিভা সুরমাকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। উদয়াদিত্য স্নেহে বিভার মাথার হাত দিয়া কহিলেন, “কেন বিভা, কী হইয়াছে?” বিভা তাহার ভ্রাতার দুই হাত ধরিয়া কহিল, “দাদা, আমার সঙ্গে এস, সমস্ত শুনিবে।”

তিন জনে মিলিয়া বিভার শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্ধকারে রামচন্দ্র বসিয়া ও রমাপতি দাঁড়াইয়া আছেন। উদয়াদিত্য তাড়াভাঙি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মামা, হইয়াছে কী?” রমাপতি একে একে সমস্তটা কহিলেন। উদয়াদিত্য তাঁহার আয়ত নেত্র বিস্তারিত করিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আমি এখনই পিতার কাছে যাই—তাঁহাকে কোনোমতেই আমি ও-কাজ করিতে দিব না। কোনোমতেই না।”

সুরমা কহিল, “তাহাতে কি কোনো কল হইবে? তাহার চেয়ে বরং একবার দাদামহাশয়কে তাঁহার কাছে পাঠাও, যদি কিছু উপকার দেখে।”

সুবরাজ কহিলেন, “আচ্ছা।”

বসন্ত রায় তখন অগাধ নিদ্রা দিতেছিলেন। ঘুম ভাঙিয়াই উদয়াদিত্যকে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভোর হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ললিতে একটা গান গাহিবার উপক্রম করিলেন,

“কবরীতে ফুল শুকাইল, কানের ফুল ফুটল বনে,
দিনের আলো প্রকাশিল, মনের সাধ রহিল মনে।”

উদয়াদিত্য বলিলেন, “দাদামহাশয়, বিপদ ঘটয়াছে।”

তৎক্ষণাৎ বসন্ত রায়ের গান বন্ধ হইয়া গেল। ত্রস্তভাবে উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জ্যা। সে কী দাদা। কী হইয়াছে। কিসের বিপদ।”

উদয়াদিত্য সমস্ত বলিলেন। বসন্ত রায় শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ষাড় নাড়িয়া কহিলেন, “না দাদা, না, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আর সময় নাই, একবার পিতার কাছে যাও।”

বসন্ত রায় উঠিলেন, চলিলেন, যাইতে যাইতে কতবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদা, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?”

প্রতাপাদিত্যের গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা প্রতাপ, এ কি

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪১৯

কখনো সম্ভব ?” প্রতাপাদিত্য এখনও শয়নকক্ষে যান নাই—তিনি তাঁহার মস্তগৃহে বসিয়া আছেন। একবার এক মুহূর্তের জন্ত মনে হইয়াছিল লছমন-সদারকে ফিরিয়া ডাকিবেন। কিন্তু সে সংকল্প তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূর হইয়া গেল। প্রতাপাদিত্য কখনো দুইবার আদেশ করেন ? যে-মুখে আদেশ দেওয়া সেই মুখে আদেশ ফিরাইয়া লওয়া ? আদেশ লইয়া ছেলেখেলা করা তাঁহার কার্য নহে। কিন্তু বিভা ? বিভা বিধবা হইবে। রামচন্দ্র রায় যদি স্বেচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে কাঁপ দিত, তাহা হইলেও তো বিভা বিধবা হইত। রামচন্দ্র রায় প্রতাপাদিত্য রায়ের রোষাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্বক কাঁপ দিয়াছে, তাহার অনিবার্য কলঙ্করূপ বিভা বিধবা হইবে। ইহাতে প্রতাপাদিত্যের কী হাত আছে। কিন্তু এত কথাও তাঁহার মনে হয় নাই। মাঝে মাঝে যখনই সমস্ত ঘটনাটা উজ্জলরূপে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে তখনই তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন রাত কখন পোহাইবে ? ঠিক এমন সময় বৃদ্ধ বসন্ত রায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ও আকুল ভাবে প্রতাপাদিত্যের দুই হাত ধরিয়া কহিলেন, “বাবা প্রতাপ, ইহা কি কখনো সম্ভব ?”

প্রতাপাদিত্য একেবারে জলিয়া উঠিয়া বলিলেন, “কেন সম্ভব নয় ?”

বসন্ত রায় কহিলেন, “ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের মোগ্য পাত্র ?”

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, “ছেলেমানুষ ! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়, ইহা বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই ! ছেলেমানুষ ! কোথাকার একটা লম্বীছাড়া নির্বোধ মূর্থ ব্রাহ্মণ, নির্বোধদের কাছে দাঁত দেখাইয়া যে রোজগার করিয়া খায়, তাহাকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রূপ করিবার জন্ত আনিয়াছে,—এতটা বুদ্ধি যাহার জোগাইতে পারে, তাহার ফল কী হইতে পারে, সে-বুদ্ধিটা আর তাহার মাথায় জোগাইল না। দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় জোগাইবে, তখন তাহার মাথাও তাহার শরীরে থাকিবে না।” যতই বলিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর আরো কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হইতে লাগিল, তাঁহার অধীরতা আরো বাড়িয়া উঠিল।

বসন্ত রায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “আহা সে ছেলেমানুষ। সে কিছুই বুঝে না।”

প্রতাপাদিত্যের অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “দেখো পিতৃব্যঠাকুর, যশোহরের রায়-বংশের কিসে মান-অপমান হয় সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিবে, তবে কি ওই পাকা চুলের উপর মোগল বাদশাহের শিরোপা জড়াইয়া বেড়াইতে পার। বাদশাহের প্রসাদগর্বে তুমি মাথা তুলিয়া বেড়াইতেছ বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মাথা

একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে। যখন-চরণের স্পর্শিকা তুমি কপালে ফোটা করিয়া পরিয়া থাকো। তোমার ওই যবনের পদধূলিময় অকিঞ্চিৎকর মাথাটা ধুলিতে লুটাইবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহাতে বাধা পড়িল। এই তোমাকে স্পষ্টই বলিলাম। তুমি বলিয়াই বুঝিলে না, আজ রায়-বংশের কতবড়ো অপমান হইয়াছে, তুমি বলিয়াই আজ রায়-বংশের অপমানকারীর জন্ত মার্জনা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ।”

বসন্ত রায় তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, “প্রতাপ, আমি বুঝিয়াছি, তুমি যখন একবার ছুরি তোল, তখন সে ছুরি এক জনের উপর পড়িতেই চায়। আমি তাহার লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়িলাম বলিয়া আর-এক জন তাহার লক্ষ্য হইয়াছে। ভালো প্রতাপ, তোমার মনে যদি দয়া না থাকে, তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ এক জনকে যদি গ্রাস করিতেই চায়, তবে আমাকেই করুক। এই তোমার খুড়ার মাথা (বলিয়া বসন্ত রায় মাথা নিচু করিয়া দিলেন)। ইহা লইয়া যদি তোমার তৃপ্তি হয় তবে লও। ছুরি আনো। এ মাথায় চুল নাই, এ মুখে ঘোঁবনের রূপ নাই। যম নিমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়াছে, সে সভার উপযোগী সাজসজ্জাও শেষ হইয়াছে। (বসন্ত রায়ের মুখে অতি যত্ন হস্তরেখা দেখা দিল)। কিন্তু ভাবিয়া দেখো প্রতাপ, বিভা আমাদের দুখের মেয়ে, তার যখন দুটি চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িবে তখন—” বলিতে বলিতে বসন্ত রায় অধীর উচ্ছ্বাসে একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন, “আমাকে শেষ করিয়া ফেলো প্রতাপ। আমার বাঁচিয়া সুখ নাই। তাহার চোখে জল দেখিবার আগে আমাকে শেষ করিয়া ফেলো।”

প্রতাপাদিত্য এত ক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। যখন বসন্ত রায়ের কথা শেষ হইল তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন কথাটা প্রকাশ হইয়াছে। নিচে গিয়া প্রহরীদের ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, রাজপ্রাসাদসংলগ্ন খাল এখনই যেন বড়ো বড়ো শালকাঠ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সেই খালে রামচন্দ্র রায়ের নৌকা আছে। প্রহরীদিগকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কেহ যেন বাহির হইতে না পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় যখন অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিভা একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। বসন্ত রায় আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, “দাদা, তুমি ইহার একটা উপায় করিয়া দাও।” রামচন্দ্র রায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন উদয়াদিত্য তাঁহার তরবারি হস্তে লইলেন, “এস আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।” সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উদয়াদিত্য কহিলেন, “বিভা, তুই এখানে থাক, তুই আসিস নে।” বিভা শুনিল না। রামচন্দ্র রায়ও কহিলেন, “না, বিভা সঙ্গে সঙ্গেই আসুক।” সেই নিম্নরক্ত রাজ্যে সকলেই পা টিপিয়া চলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, বিভীষিকা চারিদিক হইতে তাহার অদৃষ্ট হস্ত প্রসারিত করিতেছে। রামচন্দ্র রায় সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মামার প্রতি মাঝে মাঝে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া বহির্দেশে যাইবার দ্বারে আসিয়া উদয়াদিত্য দেখিলেন দ্বার বন্ধ। বিভা ভয়কম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, “দাদা, নিচে যাইবার দরজা হয়তো বন্ধ করে নাই। সেইখানে চলো।” সকলে সেই দিকে চলিল। দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নিচে চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায়ের মনে হইল, এ সিঁড়ি দিয়া নামিলে বুঝি আর কেহ উঠে না, বুঝি বাসুকি-সাপের গর্তটা এখানে, পাতালে নামিবার সিঁড়ি এই। সিঁড়ি ফুরাইলে দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন দ্বার বন্ধ। আবার সকলে ধীরে ধীরে উঠিল। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার যতগুলি পথ আছে সমস্তই বন্ধ। সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেক দ্বারে ফিরিয়া ফিরিয়া দুই-তিন বার করিয়া গেল। সকলগুলিই বন্ধ।

যখন বিভা দেখিল, বাহির হইবার কোনো পথ নাই, তখন সে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। স্বামীর হাত ধরিয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেল। দৃঢ়পদে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, “দেখিব, এ ঘর হইতে তোমাকে কে বাহির করিয়া লইতে পারে। তুমি যেখানে যাইবে, আমি তোমার আগে আগে যাইব, দেখিব আমাকে কে বাধা দেয়।” উদয়াদিত্য দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কহিলেন, “আমাকে বধ না করিয়া কেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।” স্ত্রীমা কিছু না বলিয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় সকলের আগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মায়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র রায়ের এ বন্দোবস্ত কিছুতেই ভালো

লাগিল না। তিনি ভাবিতেছেন, “প্রতাপাদিত্য যে-রকম লোক দেখিতেছি তিনি কী না করিতে পারেন। বিভা ও উদয়াদিত্য যে মাঝে পড়িয়া কিছু করিতে পারিবেন, এমন ভরসা হয় না। এ বাড়ি হইতে কোনোমতে বাহির হইতে পারিলে ঠাচি।”

কিছুক্ষণ বাদে সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, “আমাদের এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যে কোনো ফল হইবে তাহা তো বোধ হয় না, বরং উল্টা। পিতা যতই বাধা পাইবেন, ততই তাঁহার সংকল্প আরো দৃঢ় হইবে। আজ রাত্রেই কোনোমতে প্রাসাদ হইতে পালাইবার উপায় করিয়া দাও।”

উদয়াদিত্য চিন্তিতভাবে কিয়ৎক্ষণ সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “তবে আমি যাই, বলপ্রয়োগ করিয়া দেখি গে।”

সুরমা দৃঢ়ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, “যাও।”

উদয়াদিত্য তাঁহার উত্তরীয় বসন ফেলিয়া দিলেন, চলিলেন। সুরমা সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গেল। নিভৃত স্থানে গিয়া সে উদয়াদিত্যের বক্ষ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। উদয়াদিত্য শির নত করিয়া তাহাকে একটি দীর্ঘ চুম্বন করিলেন ও মল্লুর্তের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন সুরমা তাহার শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। জোড়হস্তে কহিল, “মাগো, যদি আমি পতিব্রতা সতী হই, তবে এবার আমার স্বামীকে তাঁহার পিতার হাত হইতে রক্ষা করো। আমি যে তাঁহাকে আজ এই বিপদের মধ্যে বিদায় দিলাম, সে কেবল তোর ভরসাতেই না। তুই যদি আমাকে বিনাশ করিস, তবে পৃথিবীতে তোকে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।” বলিতে বলিতে কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা সেই অন্ধকারে বসিয়া কতবার মনে মনে “মা” “মা” বলিয়া ডাকিল, কিন্তু মনে হইল যেন মা তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না। মনে মনে তাঁহার পায়ে যে পুষ্পাঞ্জলি দিল মনে হইল যেন তিনি তাহা লইলেন না, তাঁহার পা হইতে পড়িয়া গেল। সুরমা কাঁদিয়া কহিল, “কেন মা, আমি কী করিয়াছি?” তাহার উত্তর শুনিতে পাইল না। সে সেই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইল, প্রলয়ের মূর্তি নাচিতেছে। সুরমা চারিদিক শূন্যময় দেখিতে লাগিল। সে একাকী সে-ঘরে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া বিভার ঘরে আসিল।

বসন্ত রায় কাতর স্বরে কহিলেন, “দাদা এখনো কিঁরিল না, কী হইবে?”

সুরমা দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “বিধাতা যাহা করেন।”

রামচন্দ্র রায় তখন মনে মনে তাঁহার পুরাতন ভৃত্য রামমোহনের সর্বনাশ করিতে ছিলেন। কেন না, তাহা হইতেই এই সমস্ত বিপদ ঘটিল। তাহার যতপ্রকার

বউ ঠাকুরানীর হাট

৪২৩

শান্তি সম্ভব তাহার বিধান করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে এক-এক বার চৈতন্য হইতেছে যে, শান্তি দিবার বুঝি আর অবসর থাকিবে না।

উদয়াদিত্য তরবারি হস্তে অন্তঃপুরে অতিক্রম করিয়া রুদ্ধ দ্বারে গিয়া সবলে পলায়িত করিলেন—কহিলেন, “কে আছিস?”

বাহির হইতে উত্তর আসিল, “আজ্ঞা, আমি সীতারাম।”

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “শীঘ্র দ্বার খোলো।”

সে অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। উদয়াদিত্য চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে সে জোড়হস্তে কহিল, “যুবরাজ মাপ করুন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কাহারও বাহির হইবার হুকুম নাই।”

যুবরাজ কহিলেন, “সীতারাম, তবে কি তুমিও আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে? আচ্ছা তবে এস।” বলিয়া অসি নিক্ষেপিত করিলেন।

সীতারাম জোড়হস্তে কহিল, “না যুবরাজ, আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিব না, আপনি দুইবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।” বলিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

যুবরাজ কহিলেন, “তবে কী করিতে চাও শীঘ্র করো, আর সময় নাই।”

সীতারাম কহিল, “যে প্রাণ আপনি দুইবার রক্ষা করিয়াছেন, এবার তাহাকে বিনাশ করিবেন না। আমাকে নিরস্ত্র করুন। এই লউন আমার অস্ত্র। আমাকে আপাদমস্তক বন্ধন করুন। নহিলে মহারাজের নিকট কাল আমার রক্ষা নাই।”

যুবরাজ তাহার অস্ত্র লইলেন, তাহার কাপড় দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সে সেইখানে পড়িয়া রহিল, তিনি চলিয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া একটা অনতিউচ্চ প্রাচীরের মতো আছে। সে প্রাচীরের একটিমাত্র দ্বার, সে দ্বারও রুদ্ধ! সেই দ্বার অতিক্রম করিলেই একেবারে অন্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া যায়। যুবরাজ দ্বারে আঘাত না করিয়া একেবারে প্রাচীরের উপর লাফ দিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, এক জন প্রহরী প্রাচীরে ঠেসান দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছে। অতি সাবধানে তিনি নামিয়া পড়িলেন। বিদ্যাবেগে সে নিদ্রিত প্রহরীর উপর গিয়া পড়িলেন। তাহার অস্ত্র কাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন ও সেই হতবুদ্ধি অভিভূত প্রহরীকে আপাদমস্তক বাঁধিয়া ফেলিলেন। তাহার কাছে চাবি ছিল, সেই চাবি কাড়িয়া লইয়া দ্বার খুলিলেন। তখন প্রহরীর চৈতন্য হইল, বিস্মিত স্বরে কহিল, “যুবরাজ, করেন কী?”

যুবরাজ কহিলেন, “অন্তঃপুরের দ্বার খুলিতেছি।”

প্রহরী কহিল, “কাল মহারাজের কাছে কী জবাব দিব?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “বলিস, যুবরাজ বলপূর্বক আমাদেরকে পরাভূত করিয়া অস্ত্রপুত্রের ঘর খুলিয়াছেন। তাহা হইলে খালাস পাইবি।”

উদয়াদিত্য অস্ত্রপুত্র হইতে বাহির হইয়া ঘে-ঘরে জামাতার লোকজন থাকে সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন। সে ঘরে কেবল রামমোহন ও রমাই ভাঁড় ঘুমাইতেছিল, আর বাকি সকলে আহাতি করিয়া নৌকায় গিয়াছে। যুবরাজ, ঘীরে ঘীরে রামমোহনকে স্পর্শ করিলেন। সে চমকাইয়া লাফাইয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া কহিল, “এ কী যুবরাজ?” যুবরাজ কহিলেন, “বাহিরে এস।” রামমোহন বাহিরে আসিল। রামমোহনকে যুবরাজ সমস্ত কহিলেন।

তখন রামমোহন মাথায় চাদর বাঁধিয়া লাঠি বাগাইয়া ধরিল, ক্রোধে ক্ষীত হইয়া কহিল, “দেখিব লছমন সর্দার কতবড়ো লোক। যুবরাজ আমাদের মহারাজকে একবার কেবল আমার কাছে আনিয়া দিন। আমি একা এই লাঠি লইয়া একশ জন লোক ভাগাইতে পারি।”

যুবরাজ কহিলেন, “সে-কথা আমি মানি, কিন্তু যশোহরের রাজপ্রাসাদে এক শত অপেক্ষা অনেক অধিক লোক আছে। তুমি বলপূর্বক কিছু করিতে পারিবে না। অল্প কোনো উপায় দেখিতে হইবে।”

রামমোহন কহিল, “আচ্ছা, মহারাজকে একবার আমার কাছে আনুন, আমার পাশে তিনি দাঁড়াইলে আমি নিশ্চিত হইয়া উপায় ভাবিতে পারি।” তখন অস্ত্রপুত্র গিয়া উদয়াদিত্য রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গ সকলেই আসিল।

রামচন্দ্র রামমোহনকে দেখিয়াই ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিলেন, “তোকে আমি এখনি ছাড়াইয়া দিলাম, তুই দূর হইয়া যা। তুই পুরানো লোক, তোকে আর অধিক কী শাস্তি দিব। যদি এ-রাত্রা বাঁচিয়া যাই তবে তোর মুখ আর আমি দেখিব না।” বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি যথার্থই রামমোহনকে ভালোবাসিতেন, শিশুকাল হইতে রামমোহন তাঁহাকে পালন করিয়া আসিতেছে।

রামমোহন জোড়হাত করিয়া কহিল, “তুমি আমাকে ছাড়াইবার কে মহারাজ? আমার এ চাকরি ভগবান দিয়াছেন। যেদিন যমের তলব পড়িবে, সেদিন ভগবান আমার এ চাকরি ছাড়াইবেন। তুমি আমাকে রাখ না রাখ আমি তোমার চাকর।” বলিয়া সে রামচন্দ্রকে আগলাইয়া দাঁড়াইল।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪২৫

উদয়াদিত্য কহিলেন, “রামমোহন, কী উপায় করিলে?” রামমোহন কহিল, আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে এই লাঠিই উপায়। আর মা কালীর চরণ ভরসা।”

উদয়াদিত্য ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, “ও উপায় কোনো কাজের উপায় নয়। আচ্ছা রামমোহন, তোমাদের নৌকা কোন্ দিকে আছে?”

রামমোহন কহিলেন, “রাজবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বের খালে।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “চলো একবার ছাদে যাই।”

রামমোহনের মাথায় হঠাৎ একটা উপায় উদ্ভাবিত হইল—সে কহিল, “হা, ঠিক কথা, সেইখানে চলুন।”

সকলে প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। ছাদ হইতে প্রায় সমস্ত হাত নিচে খাল। সেই খালে রামচন্দ্রের চৌবটি দাঁড়ের নৌকা ভাসিতেছে। রামমোহন কহিল, রামচন্দ্র রায়কে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া সে সেইখানে বাঁপাইয়া পড়িবে।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি শশব্যস্ত হইয়া রামমোহনকে ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, “না না না, সে কি হয়? রামমোহন, তুমি অমন অসম্ভব কাজ করিতে যাইয়ো না।”

বিভা চমকিয়া সত্রাসে বলিয়া উঠিল, “না মোহন, তুই ও কী বলিতেছিস।” রামচন্দ্র বলিলেন, “না রামমোহন, তাহা হইবে না।”

তখন উদয়াদিত্য অন্তঃপুরে গিয়া কতকগুলি খুব মোটা বৃহৎ চাদর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। রামমোহন সেগুলি পাকাইয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া একটা প্রকাণ্ড রজ্জুর মতো প্রস্তুত করিল। যেদিকে নৌকা ছিল, সেইদিককার ছাদের উপরের একটি ক্ষুদ্র জলের সহিত রজ্জু বাঁধিল। রজ্জু নৌকার কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে গিয়া শেষ হইল। রামমোহন রামচন্দ্র রায়কে কহিল, “মহারাজ, আপনি আমার পিঠ জড়াইয়া ধরবেন, আমি রজ্জু বাহিয়া নামিয়া পড়িব।” রামচন্দ্র তাহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। তখন রামমোহন সকলকে একে একে প্রণাম করিল ও সকলের পদধূলি লইল, কহিল, “জয় মা কালী।” রামচন্দ্রকে পিঠে তুলিয়া লইল, রামচন্দ্র চোখ বুঁজিয়া প্রাণপণে তাহার পিঠ আঁকড়িয়া ধরিলেন। বিভার দিকে চাহিয়া রামমোহন কহিল, “মা, তবে আমি চলিয়া। তোমার সম্ভান থাকিতে কোনো ভয় করিযো না।”

রামমোহন রজ্জু আঁকড়িয়া ধরিল। বিভা স্তম্ভে ভর দিয়া প্রাণপণে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় কম্পিত চরণে দাঁড়াইয়া চোখ বুঁজিয়া “হুর্গা” “হুর্গা” জপিতে লাগিলেন। রামমোহন রজ্জু বাহিয়া নামিয়া রজ্জুর শেষ প্রান্তে গেল। তখন সে হাত ছাড়িয়া দাঁত দিয়া রজ্জু কামড়াইয়া ধরিল ও রামচন্দ্রকে পৃষ্ঠ হইতে ছাড়াইয়া দুই

হস্তে বুলাইয়া অতি সাবধানে নৌকায় নামাইয়া দিল ও নিজেও লাকাইয়া পড়িল। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন অমনি মূর্ছিত হইলেন। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন, অমনি বিভা গভীর ও সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। বসন্ত রায় চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদা, কী হইল?” উদয়াদিত্য মূর্ছিত বিভাকে সম্মুখে কোলে করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া করিল, “এখন তোমার কী হইবে?” উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমার জন্ত আমি ভাবি না।”

এদিকে নৌকা খানিক দূর গিয়া আটক পড়িল। বড়ো বড়ো শাল কাঠে খাল বন্ধ। এমন সময়ে সহসা প্রহরীরা দূর হইতে দেখিল, নৌকা পালাইয়া যায়। পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল, একটাও গিয়া পৌঁছিল না। প্রহরীদের হাতে তলোয়ার ছিল, বন্দুক ছিল না। এক জন বন্দুক আনিতে গেল। খোঁজ খোঁজ করিয়া বন্দুক জুটিল তো চকমকি জুটিল না। “ওরে বারুদ কোথায়—গুলি কোথায়” করিতে করিতে রামমোহন ও অন্নচরণ কাঠের উপর দিয়া নৌকা টানিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। প্রহরীগণ অহুসরণ করিবার জন্ত একটা নৌকা ডাকিতে গেল। যাহার উপরে নৌকা ডাকিবার ভার পড়িল পথের মধ্যে সে হরি মন্দির দোকানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইল ও রামশংকরকে তাহার বিছানা হইতে উঠাইয়া তাহার পাওনা টাকা শীঘ্র পাইবার জন্ত তাগাদা করিয়া গেল। যখন নৌকার প্রয়োজন একেবারে ফুরাইল তখন হাঁকডাক করিতে করিতে নৌকা আসিল। বিলম্ব দেখিয়া সকলে নৌকা-আহ্বানকারীকে সুদীর্ঘ ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। সে কহিল, “আমি তো আর ঘোড়া নই।” একে একে সকলের যখন ভৎসনা করা ফুরাইল, তখন তাহাদের চৈতন্য হইল যে নৌকা ধরিবার আর কোনো সম্ভাবনা নাই। নৌকা আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছিল, ভৎসনা করিতে তাহার তিন গুণ বিলম্ব হইল। যখন রামচন্দ্রের নৌকা ভৈরব নদে গিয়া পৌঁছিল তখন কর্ণাণ্ডিজ এক তোপের আওয়াজ করিল। প্রত্যাষে প্রতাপাদিত্যের নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সেই তোপের শব্দে সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি ডাকিয়া উঠিলেন, “প্রহরী।” কেহই আসিল না। দ্বারের প্রহরীগণ সেই রাত্রেই পালাইয়া গেছে। প্রতাপাদিত্য উচ্চতর স্বরে ডাকিলেন, “প্রহরী।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য ঘুম ভাঙিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন, “প্রহরী।” যখন প্রহরী আসিল না, তখন অবিলম্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বিছানার দিক ঘুর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাকিলেন, “মন্ত্রী।” একজন ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া অবিলম্বে মন্ত্রীকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল।

“মন্ত্রী, প্রহরীরা কোথায় গেল ?

“মন্ত্রী, কহিলেন, “বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালাইয়া গেছে।” মন্ত্রী দেখিলেন, মাথার উপরে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই নিমিত্ত প্রতাপাদিত্যের কথার স্পষ্ট পরিষ্কার দ্রুত উত্তর দিলেন। যতই ঘুরাইয়া ও যতই বিলম্ব করিয়া তাঁহার কথার উত্তর দেওয়া হয়, ততই তিনি আগুন হইয়া উঠিতে থাকেন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “অন্তঃপুরের প্রহরীরা ?”

মন্ত্রী কহিলেন, “আসিবার সময় দেখিলাম তাহার হাতপা-বাঁধা পড়িয়া আছে।” মন্ত্রী রাত্রির ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। কী হইয়াছে কিছু অনুমান করিতে পারিতেছেন না। অথচ বুঝিয়াছেন, একটা কী ঘোরতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। সে-সময়ে মহারাজকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব।

প্রতাপাদিত্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “রামচন্দ্র রায় কোথায় ? উদয়াদিত্য কোথায় ? বসন্ত রায় কোথায় ?”

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, “বোধ করি তাঁহার অন্তঃপুরেই আছেন।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “বোধ তো আমিও করিতে পারিতাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কী করিতে। যাহা বোধ করা যায় তাহা সকল সময়ে সত্য হয় না।”

মন্ত্রী কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রম্যপতির কাছে রাজের ঘটনা সমস্তই অবগত হইলেন। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র রায় পালাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হইল। মন্ত্রী বাহিরে গিয়া দেখিলেন, খর্বকায় রমাই ভাঁড় গুড়ি মারিয়া বসিয়া আছে। মন্ত্রীকে দেখিয়া রমাই ভাঁড় কহিল, “এই যে মন্ত্রী জাম্বুবান।” বলিয়া দাঁত বাহির করিল। তাহার সেই দন্তপ্রধান হাঁতকে রামচন্দ্রের সভাসদেরা রসিকতা বলিত, বিভীষিকা বলিত না। মন্ত্রী তাহার সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, তাহার প্রতি দৃকপাতও করিলেন না। একজন ভৃত্যকে কহিলেন,

“ইহাকে লইয়া আয়।” মন্ত্রী ভাবিলেন, এই অপদার্থটাকে এই বেলা প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের সামনে খাড়া করিয়া দিই। প্রতাপাদিত্যের বজ্র এক জন না এক জনের উপরে পড়িবেই—তা এই কলাগাছটার উপরেই পড়ুক, বাকি বড়ো বড়ো গাছ রক্ষা পাক্।

রমাইকে দেখিয়াই প্রতাপাদিত্য একেবারে জলিয়া উঠিলেন। বিশেষত সে যখন প্রতাপাদিত্যকে সম্ভট করিবার জন্ত দাঁত বাহির করিয়া, অঙ্গভঙ্গী করিয়া একটা হস্তরসের কথা কহিবার উপক্রম করিল, তখন প্রতাপাদিত্যের আর সহ্য হইল না। তিনি অবিলম্বে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দুই হাত নাড়িয়া দাক্ষণ ঘৃণায় বলিয়া উঠিলেন, “দূর করো, দূর করো, উহাকে এখনই দূর করিয়া দাও। ওটাকে আমার সম্মুখে আনিতে কে কহিল?” প্রতাপাদিত্যের রাগের সহিত যদি ঘৃণার উদয় না হইত, তবে রমাই ভাঁড় এ-যাত্রা পরিত্রাণ পাইত না। কেন না ঘৃণা ব্যক্তিকে প্রহার করিতে গেলেও স্পর্শ করিতে হয়। রমাইকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, রাজজামাতা—”

প্রতাপাদিত্য অধীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “রামচন্দ্র রায়—”

মন্ত্রী কহিলেন, “হাঁ, তিনি কাল রাত্রে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।”

প্রতাপাদিত্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, “পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! প্রহরীরা গেল কোথায়?”

মন্ত্রী পুনরায় কহিলেন, “বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালাইয়া গেছে।”

প্রতাপাদিত্য মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিলেন, “পালাইয়া গেছে? পালাইবে কোথায়? যেখানে থাকে তাহাদের খুঁজিয়া আনিতে হইবে। অন্তঃপুরের প্রহরীদের এখনই ডাকিয় লইয়া এস।” মন্ত্রী বাহির হইয়া গেলেন।

রামচন্দ্র রায় যখন নৌকায় চড়িলেন তখনো অন্ধকার আছে। উদয়াদিত্য, বসন্ত রায়, সুরমা ও বিভা সে-রাত্রে আসিয়া আর বিছানায় শুইল না। বিভা একটি কথা না বলিয়া, একটি অশ্রু না ফেলিয়া অবসন্নভাবে শুইয়া রহিল, সুরমা তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। উদয়াদিত্য ও বসন্ত রায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অন্ধকার ঘরে পরস্পরের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যে যেন অদৃশ্য এক জন কে—অন্ধকার বল, আশঙ্কা বল, অদৃষ্ট বল—বসিয়া আছে, তাহার নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনা যাইতেছে। সদানন্দ হৃদয় বসন্ত রায় চারিদিকে নিরানন্দ দেখিয়া একেবারে আবুল হইয়া

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪২৯

পড়িয়াছেন। তিনি অনবরত টাকে হাত বুলাইতেছেন, চারিদিক দেখিতেছেন, ও ভাবিতেছেন—এ কী হইল। তাঁহার গোলমাল ঠেকিয়াছে, চারিদিককার ব্যাপার ভালোরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। সমস্ত ঘটনা তাঁহার একটা জটিল দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। এক-একবার বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কাতর স্বরে কহিতেছেন, “দাদা।” উদয়াদিত্য কহিতেছেন, “কী দাদামহাশয়?” তাহার উত্তরে বসন্ত রায়ের আর কথা নাই। ওই এক “দাদা” সম্বোধনের মধ্যে একটি আকুল দিশাহারা হৃদয়ের বাক্যহীন সহস্র অব্যক্ত প্রশ্ন প্রকাশ পাইবার জন্য আঁকুঝাঁকু করিতেছে। তাঁহার বিশেষ একটা কোনো প্রশ্ন নাই, তাঁহার সমস্ত কথার অর্থ এই—এ কী? চারিদিককার অন্ধকার এমনি গোলমাল করিয়া একটা কী ভাষায় তাঁহার কানের কাছে কথা কহিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে উদয়াদিত্যের সাড়া পাইলেও তাঁহার মনটা একটু স্থির হয়। থাকিয়া থাকিয়া তিনি সকাতে উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, “দাদা, আমার জন্মই কি এ-সমস্ত হইল?” তাঁহার বার বার মনে হইতেছে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারাতেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। উদয়াদিত্যের তখন অধিক কথা কহিবার মতো ভাব নহে। তিনি ক্রোমল স্বরে কহিলেন, “না দাদামহাশয়।” অনেকক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। থাকিয়া থাকিয়া বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, “বিভা, দিদি আমার, তুই কথা কহিতেছিস না কেন?” বলিয়া বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বসিলেন। কিছু ক্ষণ পরে বসন্ত রায় আবার বলিয়া উঠিলেন, “সুরমা, ও সুরমা।” সুরমা মুখ তুলিয়া চাহিল, আর কিছু বলিল না। বৃদ্ধ বসিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটা অনির্দেশ্য বিপদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সুরমা তখন স্থিরভাবে বসিয়া বিভার কপালে হাত বুলাইতেছিল, কিন্তু সুরমার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল, তাহা অন্তর্ধামাই দেখিতেছিলেন। সুরমা সেই অন্ধকারে একবার উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিল। তখন উদয়াদিত্য দেয়ালে মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিলেন। সুরমার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আস্তে আস্তে মুছিয়া ফেলিল, পাছে বিভা জানিতে পায়।

যখন চারিদিক আলো হইয়া আসিল তখন বসন্ত রায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তখন তাঁহার মন হইতে একটা অনির্দেশ্য আশঙ্কার ভাব দূর হইল। তখন স্থিরচিত্তে সমস্ত ঘটনা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলেন। তিনি বিভার ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। অন্তঃপুরের দ্বারে হাতপা-বাঁধা সীতারামের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে কহিলেন, “দেখ সীতারাম, তোকে যখন প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিবে, কে তোকে

বাঁধিয়াছে, তুই আমার নাম করিস। প্রতাপ জানে, এককালে বসন্ত রায় বলিষ্ঠ ছিল, সে তোর কথা বিশ্বাস করিবে।”

সীতারাম প্রতাপাদিত্যের কাছে কী জবাব দিবে, এতক্ষণ ধরিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। এ সম্বন্ধে উদয়াদিত্যের নাম করিতে কোনোমতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। সে একটা বাঁকা-পা তিন-চোখো তালবৃক্ষাকৃতি ভূতকে আসামী করিবে বলিয়া একবার স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বসন্ত রায়কে পাইয়া নিরপরাধ ভূতটাকে থালাস দিল। বসন্ত রায়ের কথায় সে তৎক্ষণাৎ রাজি হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় প্রহরীর নিকট গিয়া কহিলেন, “ভাগবত, প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়ো বসন্ত রায় তোমাকে বাঁধিয়াছে।” সহসা ভাগবতের ধর্মজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, অসত্যের প্রতি নিতান্ত বিরাগ জন্মিল; তাহার প্রধান কারণ, উদয়াদিত্যের প্রতি সে ভারি জুঁহু হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবত কহিল, “এমন কথা আমাকে আদেশ করিবেন না, ইহাতে আমার অধর্ম হইবে।”

বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিলেন, “ভাগবত, আমার কথা শুন; ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। সাধু লোকের প্রাণ বাঁচাইতে মিথ্যা কথা বলিতে যদি কোনো অধর্ম থাকিবে, তবে আমি কেন তোমাকে এমন অল্পরোধ করিব?” বসন্ত রায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া গিঠে হাত দিয়া বার বার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে কোনো অধর্ম নাই। কিন্তু লোকের যখন ধর্মজ্ঞান সহসা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তখন কোনো যুক্তিই তাহার কাছে খাটে না। সে কহিল, “না মহারাজ, মনিবের কাছে মিথ্যা কথা বলিব কী করিয়া।”

বসন্ত রায় বিষম অস্থির হইয়া উঠিলেন। ব্যাকুলভাবে কহিলেন, “ভাগবত, আমার কথা শুন, আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলি, এ মিথ্যা কথায় কোনো পাপ নাই। দেখো বাপু, আমি তোমাকে পরে খুব খুশি করিব, তুমি আমার কথা রাখো। এই লও আমার কাছে যাহা আছে, এই দিলাম।”

ভাগবত তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইল ও সেই টাকাগুলি মুহূর্তের মধ্যে তাহার ট্যাকে আশ্রয় লাভ করিল। বসন্ত রায় কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপাদিত্যের নিকট হরিদ্বয়ের ডাক পড়িয়াছে। মন্ত্রী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্য তখন তাঁহার উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। প্রত্যেক কথা ধীরে ধীরে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “কাল রাত্রে অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হইল কী করিয়া?”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৩১

সীতারামের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, সে জোড়হস্তে কহিল, “দোহাই মহারাজ, আমার কোনো দোষ নাই।”

মহারাজ অকুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন, “সে-কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে?”

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, “আজ্ঞা না, বলি, মহারাজ, যুবরাজ—যুবরাজ আমাকে বলপূর্বক বাঁধিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াছিলেন।” যুবরাজের নাম তাহার মুখ দিয়া কেমন হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। ওই নামটা কোনোমতে করিবে না বলিয়া সে সর্বাপেক্ষা অধিক ভাবিয়াছিল, এই নিমিত্ত গোলমালে ওই নামটাই সর্বাপেক্ষে তাহার মুখাগ্রে উপস্থিত হইল। একবার যখন বাহির হইল তখন আর রক্ষা নাই।

এমন সময় বসন্ত রায় শুনিলেন, প্রহরীদের ডাক পড়িয়াছে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সীতারাম কহিতেছে, “যুবরাজকে আমি নিষেধ করিলাম তিনি শুনিলেন না।”

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ হাঁ সীতারাম, কী কহিলি? অধর্ম করিস নে, সীতারাম, ভগবান তোর পরে সন্তুষ্ট হইবেন। উদয়াদিত্যের ইহাতে কোনো দোষ নাই।”

সীতারাম তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, “আজ্ঞা না, যুবরাজের কোনো দোষ নাই।”

প্রতাপাদিত্য দৃঢ়স্বরে কহিলেন, “তবে তোর দোষ?”

সীতারাম কহিল, “আজ্ঞা না।”

“তবে কার দোষ?”

“আজ্ঞা মহারাজ—”

ভাগবতকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন সে সমস্ত কথা ঠিক করিয়া কহিল, কেবল সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেইটে গোপন করিল। বুদ্ধ বসন্ত রায় চারিদিক ভাবিয়া কোনো উপায় দেখিলেন না। তিনি চোখ বুজিয়া মনে মনে “হুর্গা” “হুর্গা” কহিলেন। প্রহরীদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করা হইল। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহাদের যদি বলপূর্বক বাঁধিতে পারা যায় তবে তাহারা প্রহরী-বৃত্তি করিতে আসিয়াছে কী বলিয়া? এই অপরাধের জন্য তাহাদের প্রতি কশাঘাতের আদেশ হইল।

তখন প্রতাপাদিত্য বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, “উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জনা নাই।” এমনি ভাবে বলিলেন যেন উদয়াদিত্যের

সে অপরাধ বসন্ত রায়েই। যেন তিনি উদয়াদিত্যকে সম্মুখে রাখিয়াই ভৎসনা করিতেছেন। বসন্ত রায়েই অপরাধ, তিনি উদয়াদিত্যকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন।

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, “বাবা প্রতাপ, উদয়ের ইহাতে কোনো দোষ নাই।”

প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া কহিলেন, “দোষ নাই? তুমি দোষ নাই বলিতেছ বলিয়াই তাকে বিশেষরূপে শাস্তি দিব। তুমি মাঝে পড়িয়া গীমাংসা করিতে আসিয়াছ কেন?”

বসন্ত রায় অত করিয়া উদয়াদিত্যের পক্ষ লইয়াছেন বলিয়াই প্রতাপাদিত্যের মন উদয়াদিত্যের বিশেষ বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। বসন্ত রায় দেখিলেন, তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্তই পাছে উদয়াদিত্যকে শাস্তি দেওয়া হয়। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “যদি জানিতাম উদয়াদিত্যের কিছুমাত্র নিজের মনের জোর আছে, তাহার একটা মত আছে, একটা অভিপ্রায় আছে, যাহা করে, সব নিজে হইতেই করে, যদি না জানিতাম যে সে-নির্বোধটাকে যে খুশি হুঁ দিয়া উড়াইয়া বেড়াইতে পারে, কটাক্ষের সংকেতে ঘুরাইয়া মারিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আজ আর রক্ষা ছিল না। আমি যেখানে ওই পালকটাকে উড়িতে দেখিয়াছি, নিচের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি হুঁ দিতেছে কে। এইজন্য উদয়াদিত্যকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে না। সে শাস্তিরও অযোগ্য। কিন্তু শোনো, পিতৃব্যর্থাবুর, তুমি যদি দ্বিতীয়বার যশোহরে আসিয়া উদয়াদিত্যের সহিত দেখা কর, তবে তাহার প্রাণ বাঁচানো দায় হইবে।”

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিলেন, “ভালো প্রতাপ, আজ সন্ধ্যাবেলায় তবে আমি চলিলাম।” আর-একটি কথা না বলিয়া বসন্ত রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, বাহির হইয়া গিয়া গভীর এক নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপাদিত্য স্থির করিয়াছেন, যে-কেহ উদয়াদিত্যকে ভালোবাসে, উদয়াদিত্য যাহাদের বশীভূত, তাহাদিগকে উদয়াদিত্যের নিকট হইতে তফাত করিতে হইবে। মন্ত্রীকে কহিলেন, “বউমাকে আর রাজপুত্রীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না, কোনো সূত্রে তাহাকে বাপের বাড়ি পাঠাইতে হইবে।” বিভার প্রতি প্রতাপাদিত্যের কোনো আশঙ্কা হয় নাই; হাজার হউক, সে বাড়ির মেয়ে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের ঘরে আসিয়া কহিলেন, “দাদা, তোর সঙ্গে আর দেখা হইবে না।” বলিয়া উদয়াদিত্যকে বৃদ্ধ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, “কেন দাদামহাশয়?”

বসন্ত রায় সমস্ত বলিলেন। কাঁদিয়া কহিলেন, “ভাই, তোকে আমি ভালোবাসি বলিয়াই তোর এত দুঃখ। তা তুই যদি সুখে থাকিস তো এ-কটা দিন আমি এক-রকম কাটাইয়া দিব।”

উদয়াদিত্য মাথা নাড়িয়া কহিলেন, “না. তাহা কখনোই হইবে না। তোমাতে আমাতে দেখা হইবেই। তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। তুমি গেলে দাদামহাশয়, আমি আর বাঁচিব না।

বসন্ত রায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “প্রতাপ আমাকে বধ করিল না, তোকে আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইল। দাদা, আমি যখন চলিয়া যাইব, আমার পানে কিরিয়া চাহিস নে, মনে করিস বসন্ত রায় মরিয়া গেল।”

উদয়াদিত্য শয়নকক্ষে সুরমার নিকটে গেলেন। বসন্ত রায় বিভার কাছে গিয়া বিভার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, “বিভা, দিদি আমার, একবার ওঠ। বুড়ার এই মাথাটায় একবার ওই হাত বুলাইয়া দে।” বিভা উঠিয়া বসিয়া দাদামহাশয়ের মাথা লইয়া পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য সুরমাকে সমস্ত কহিলেন ও বলিলেন, “সুরমা, পৃথিবীতে আমার যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাই কাড়িয়া লইবার জন্ত যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে।” সুরমার হাত ধরিয়া কহিলেন, “সুরমা, তোমাকে যদি কেহ আমার কাছ হইতে ছিনিয়া লইয়া যায়?”

সুরমা দৃঢ়ভাবে উদয়াদিত্যকে আলিঙ্গন করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, “সে যম পারে, আর কেহ পারে না।”

সুরমার মনেও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইরূপ একটা আশঙ্কা জন্মিতেছে। সে যেন দেখিতে পাইতেছে, একটা কঠোর হস্ত তাহার উদয়াদিত্যকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া দিবার জন্ত অগ্রসর হইতেছে। সে মনে মনে উদয়াদিত্যকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, মনে মনে কহিল, “আমি ছাড়িব না, আমাকে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না।”

সুরমা আবার কহিল, “আমি অনেকক্ষণ হইতে ভাবিয়া রাখিয়াছি আমাকে তোমার কাছ হইতে কেহই লইতে পারিবে না।”

সুরমা ওই কথা বার বার করিয়া বলিল। সে মনের মধ্যে বল সঞ্চয় করিতে চায়, যে-বলে সে উদয়াদিত্যকে দুই বাহু দিয়া এমন জড়াইয়া থাকিবে যে, কোনো পার্শ্ব শক্তি তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। বার বার ওই কথা বলিয়া মনকে সে বজ্রের বলে বাঁধিতেছে।

উদয়াদিত্য সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া নিখাস ফেলিয়া কহিলেন, “সুরমা, দাদামহাশয়কে আর দেখিতে পাইব না।”

সুরমা নিখাস ফেলিল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি নিজের কণ্ঠের জন্ত ভাবি না সুরমা, কিন্তু দাদামহাশয়ের প্রাণে যে বড়ো বাজিবে। দেখি বিধাতা আরো কী করেন। তাঁর আরো কী ইচ্ছা আছে।”

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের কত গল্প করিলেন।

বসন্ত রায় কোথায় কী কহিয়াছিলেন, কোথায় কী করিয়াছিলেন সমুদয় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। বসন্ত রায়ের করুণ হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডারে ছোটো ছোটো বস্তুর মতো জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই আজ একে একে সুরমার কাছে বাহির করিতে লাগিলেন।

সুরমা কহিল, “আহা, দাদামহাশয়ের মতো কি আর লোক আছে।”

সুরমা ও উদয়াদিত্য বিভার ঘরে গেলেন।

তখন বিভা তাহার দাদামহাশয়ের পাকা চুল তুলিতেছে, ও তিনি বসিয়া গান গাহিতেছেন,

ওরে, যেতে হবে, আর দেয়ি নাই,

পিছিয়ে পড়ে রবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই।

আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছে রে,

(ওরে) পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই।

খেলতে এল ভবের নাটে, নতুন লোকে নতুন খেলা,

হেথা হতে আয় রে সেরে, নইলে তোরে মারবে ঢেলা,

নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আর এক দেশে চল রে সোজা,

(সেখা) নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেলবি সে ঠাই।”

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, “দেখো ভাই, বিভা আমাকে

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৩৫

ছাড়িতে চায় না। কী জানি আমাকে উহার কিসের আবশ্যক। এককালে যে দুখ ছিল, বুড়া হইয়া সে ঘোল হইয়া উঠিয়াছে, তা বিভা দুখের সাথ ঘোলে মিটাইতে চায় কেন? আমি যাব শুনিয়া বিভা কঁাদে! এমন আর কখনো শুনিয়াছ? আমি ভাই, বিভার কান্না দেখিতে পারি না।” বলিয়া গাহিতে লাগিলেন,

“আমার যাবার সময় হল,
আমায় কেন রাখিস ধরে,
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে
বাঁধিস নে আর মায়াভোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
কিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস নে ভাই,
যেতে হবে স্বরা করে।”

“ওই দেখো, ওই দেখো বিভার রকম দেখো। দেখ বিভা, তুই যদি অমন করিয়া কাঁদিবি তো—” বলিতে বলিতে বসন্ত রায়ের আর কথা বাহির হইল না। তিনি বিভাকে শাসন করিতে গিয়া নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া কহিলেন, “দাদা, ওই দেখো ভাই, সুরমা কাঁদিত্তেছে। এই বেলা ইহার প্রতিবিধান করো; নহিলে আমি সত্য সত্যই থাকিয়া যাইব, তোমার জায়গাটি দখল করিয়া বসিব। ওই দুই হাতে পাকা চুল তোলাইব, ওই কানের কাছে এই ভাঙা দাঁতের পাটির মধ্য হইতে কিসকিস করিব, আর কানের অত কাছে গিয়া আর যদি কোনো-প্রকার অঘটন সংঘটন হয় তবে তাহার দায়ী আমি হইব না।”

বসন্ত রাশ দেখিলেন, কেহ কোনো কথা কহিল না, তখন তিনি কাতর হইয়া তাঁহার সেতারটা তুলিয়া লইয়া বান বান করিয়া বিবম বেগে বাজাইতে শুরু করিলেন। কিন্তু বিভার চোখের জল দেখিয়া তাঁহার সেতার বাজাইবার বড়োই ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তাঁহার চোখ মাঝে মাঝে বাপসা হইয়া আসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিভাকে এবং উপস্থিত সকলকে তিরস্কারচ্ছলে রাশ রাশ কথা বলিবার বাসনা হইতে লাগিল, কিন্তু আর কথা জোগাইল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সেতার বন্ধ করিয়া নামাইয়া রাখিতে হইল। অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল।

উদয়াদিত্যকে দীর্ঘকাল আলিঙ্গন করিয়া শেষ কথা এই বলিয়া গেলেন, “এই সেতার রাখিয়া গেলাম দাদা, আর সেতার বাজাইব না। সুরমা ভাই সুখে থাকো। বিভা—” কথা শেষ হইল না, অশ্রু মুছিয়া পালকিতে উঠিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মঙ্গলার কুটির যশোহরের একটি প্রান্তে ছিল। সেইখানে বসিয়া সে মালা জপ করিতেছিল। এমন সময়ে শাকসবজির চুবড়ি হাতে করিয়া রাজবাটীর দাসী মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাতঙ্গ কহিল, “আজ হাটে আসিয়াছিলাম, অমনি ভাবিলাম, অনেকদিন মঙ্গলা দ্বিধিকে দেখি নাই, তা একবার দেখিয়া আসিগে। আজ ভাই অনেক কাজ আছে, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।” বলিয়া চুবড়ি রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে সেইখানে বসিল। “তা দিদি, তুমি তো সব জানই, সেই মিনসে আমাকে বড়ো ভালোবাসিত, ভালো এখনো বাসে তবে আর-এক জন কার পরে তার মন গিয়াছে আমি টের পাইয়াছি—তা সেই মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হয় এমন করিতে পার না?”

মঙ্গলার নিকট গোরু হারানো হইতে স্বামী হারানো পর্যন্ত সকল প্রকার দুর্ঘটনারই ঔষধ আছে, তা ছাড়া সে বশীকরণের এমন উপায় জানে যে, রাজবাটীর বড়ো বড়ো ভৃত্য মঙ্গলার কুটিরে কত গঙা গঙা গড়াগড়ি যায়। যে-মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হইলে মাতঙ্গিনী বাঁচে সে আর কেহ নয় স্বয়ং মঙ্গলা।

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, “সে মাগীর মরিবার জন্ত বড়ো তাড়াতাড়ি পড়ে নাই, যমের কাজ বাড়াইয়া তবে সে মরিবে।” মঙ্গলা হাসিয়া প্রকাশে কহিল, “তোমার মতন রূপসীকে কৈলিয়া আর কোথাও মন যায় এমন অরসিক আছে নাকি? তা নাতিনী, তোমার ভাবনা নাই। তাহার মন তুমি কিরিয়া পাইবে। তোমার চোখের মধ্যেই ঔষধ আছে, একটু বেশি করিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখিও, তাহাতেও যদি না হয় তবে এই শিকড়টি তাহাকে পানের সঙ্গে খাওয়াইয়ো।” বলিয়া এক শুকনা শিকড় আনিয়া দিল।

মঙ্গলা মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “বলি রাজবাটীর খবর কী?”

মাতঙ্গিনী হাত উল্টাইয়া কহিল, “সে-সব কথাই আমাদের কাজ কী ভাই?”

মঙ্গলা কহিল, “ঠিক কথা। ঠিক কথা।”

মঙ্গলার যে এ-বিষয়ে সহসা মতের এতটা ঐক্য হইয়া যাইবে, তাহা মাতঙ্গিনী আশা করে নাই। সে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে পড়িয়া কহিল, “তা, তোমাকে বলিতে দোষ নাই। তবে আজ আমার বড়ো সময় নাই, আর-একদিন সমস্ত বলিব।” বলিয়া বসিয়া রহিল।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৩৭

মঙ্গলা কহিল, “তা বেশ, আর-একদিন শুনা যাইবে।”

মাতঙ্গিনী অধীর হইয়া পড়িল, কহিল, “তবে আমি যাই ভাই। দেহি করিলাম বলিয়া আবার কত বকুনি খাইতে হইবে। দেখো ভাই, সেদিন আমাদের ওখানে রাজার জামাই আসিয়াছিলেন, তা তিনি যেদিন আসিয়াছিলেন সেই রাত্রেই কাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।”

মঙ্গলা কহিল, “সত্যি নাকি? বটে। কেন বলো দেখি? তাই বলি, মাতঙ্গ-না হইলে আমাকে ভিতরকার খবর কেহ দিতে পারে না।”

মাতঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া কহিল, “আঁসল কথা কী জান? আমাদের যে বউ-ঠাকরুনটি আছেন, তিনি ছুটি চক্ষে কাহারো ভালো দেখিতে পারেন না। তিনি কী মন্তর জানেন, সোয়ামিকে একেবারে ভেড়ার মত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি—না ভাই, কাজ নাই, কে কোথা দিয়া শুনিবে আর বলিবে মাতঙ্গ রাজবাড়ির কথা বাহিরে বলিয়া বেড়ায়।”

মঙ্গলা আর কোঁতুহল সামলাইতে পারিল না; যদিও সে জানিত, আর খানিক ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকিলে মাতঙ্গ আপনি সমস্ত বলিবে, তবু তাহার বিলম্ব সহিল না, কহিল, “এখানে কোনো লোক নাই নাভনী। আর আপনা-আপনির মধ্যে কথা, ইহাতে আর দোষ কী? তা তোমাদের বউ-ঠাকরুন কী করিলেন?”

“তিনি আমাদের দিদি-ঠাকরুনের নামে জামাইয়ের কাছে কী সব লাগাইয়াছিলেন, তাই জামাই রাতারাতিই দিদি-ঠাকরুনকে ফেলিয়া চলিয়া গেছেন। দিদি-ঠাকরুন তো কাঁদিয়া কাটিয়া অনান্ত করিতেছেন। মহারাজা খাপা হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি বউ-ঠাকরুনকে শ্রীপুরে বাপের বাড়িতে পাঠাইতে চান। ওই দেখো ভাই, তোমার সকল কথাতেই হাসি। ইহাতে হাসিবার কী পাইলে? তোমার যে আর হাসি ধরে না।”

রামচন্দ্র রায়ের পলায়নবার্তার ষথার্থ কারণ রাজবাটীর প্রত্যেক দাসদাসী সঠিক অবগত ছিল, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও কথার ঐক্য ছিল না।

মঙ্গলা কহিল, “তোমাদের মা-ঠাকরুনকে বলিয়ে যে, বউ-ঠাকরুনকে শীঘ্র বাপের বাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। মঙ্গলা এমন ওষুধ দিতে পারে যাহাতে যুবরাজের মন তাঁহার উপর হইতে একেবারে চলিয়া যায়।” বলিয়া সে খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল। মাতঙ্গ কহিল, “তা বেশ কথা।”

মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাদের বউ-ঠাকরুনকে কি যুবরাজ বড়ো ভালোবাসেন?”

“সে কথায় কাজ কী। এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। যুবরাজকে ‘তু’ বলিয়া ডাকিলেই আসেন।”

“আচ্ছা আমি ওষুধ দিব। দিনের বেলাও কি যুবরাজ তাঁহার কাছেই থাকেন?”

“হাঁ।”

মঙ্গলা কহিল, “ও মা কী হইবে। তা সে যুবরাজকে কী বলে, কী করে, দেখিয়াছিস?”

“না ভাই, তাহা দেখি নাই।”

“আমাকে একবার রাজবাটীতে লইয়া যাইতে পারিস, আমি তাহা হইলে একবার দেখিয়া আসি।”

মাতঙ্গ কহিল, “কেন ভাই, তোমার এত মাথাব্যথা কেন?”

মঙ্গলা কহিল, “বলি তা নয়। একবার দেখিলেই বুঝিতে পারিব, কী মন্ত্রে সে বশ করিয়াছে, আমার মন্ত্র খাটিবে কি না।”

মাতঙ্গ কহিল, “তা বেশ, আজ তবে আসি।” বলিয়া চুবড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

মাতঙ্গ চলিয়া গেলে মঙ্গলা যেন ফুলিতে লাগিল। দাঁতে দাঁত লাগাইয়া চক্ষুতারকা প্রসারিত করিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় চলিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিভা প্রাসাদের ছাদের উপর গেল। ছাদের উপর হইতে দেখিল, পালকি চলিয়া গেল। বসন্ত রায় পালকির মধ্য হইতে মাথাটি বাহির করিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে চোখের জলের মধ্য হইতে পরিবর্তনহীন অবিচলিত পাষাণহৃদয় রাজবাটীর দীর্ঘ কঠোর দেয়ালগুলি ঝাপসা ঝাপসা দেখিতে পাইলেন। পালকি চলিয়া গেল, কিন্তু বিভা সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। পথের পানে চাহিয়া রহিল। তারাগুলি উঠিল, দীপগুলি জলিল, পথে লোক রহিল না। বিভা দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। স্মরণ তাহাকে সারা দেশ খুঁজিয়া কোথাও না পাইয়া অবশেষে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। বিভার গলা ধরিয়া মেহের স্বরে কহিল, “কী দেখিতেছিস বিভা?” বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৩৯

কহিল, “কে জানে ভাই।” বিভা সমস্তই শ্রুতময় দেখিতেছে। তাহার প্রাণে স্মৃতি নাই। সে কেন যে ঘরের মধ্যে যায়, কেন যে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে, কেন হইয়া পড়ে, কেন উঠিয়া যায়, কেন দুই প্রহর মধ্যাহ্নে বাড়ির এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না। রাজবাড়ি হইতে তাহার বাড়ি চলিয়া গেছে যেন, রাজবাড়িতে যেন তাহার ঘর নাই। অতি ছেলেবেলা হইতে নানা খেলাধুলা, নানা স্মৃতিহীন হাসিকান্নায় মিলিয়া রাজবাড়ীর মধ্যে তাহার জন্ম যে একটি সাধের ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিল, সে ঘরটি একদিনে কে ভাঙিয়া দিল রে। এ ঘর তো আর তাহার ঘর নয়। সে এখন গৃহের মধ্যে গৃহহীন। তাহার দাদামহাশয় ছিল, গেল, তাহার—চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিভাকে লইতে কবে লোক আসিবে? হয়তো রাম-মোহন মাল রওনা হইয়াছে, এতক্ষণে তাহারা না জানি কোথায়। বিভার স্মৃতির এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। তাহার অমন দাদা আছে, তাহার প্রাণের সুরমা আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও যেন একটা কী বিপদ ছায়ার মতো পশ্চাতে দ্বিগত হইতেছে। যে-বাড়ির ভিটা ভেদ করিয়া একটা ঘন ঘোর গুপ্ত রহস্য অদৃশ্যভাবে ধ্বংসিত হইতেছে সে-বাড়িকে কি আর ঘর বলিয়া মনে হয়?

উদয়াদিত্য গুনিলেন, কর্মচ্যুত হইয়া সীতারামের দুর্দশা হইয়াছে। একে তাহার এক পরসার সঞ্চল নাই, তাহার উপর তাহার অনেকগুলি গলগ্রহ জুটিয়াছে। কারণ যখন সে রাজবাড়ি হইতে মোটা মাহিয়ানা পাইত, তখন তাহার পিসা সহসা স্নেহের আধিক্য-বশত কাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তাহার স্নেহাস্পদের বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। মিলনের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়া আনন্দে গদগদ হইয়া কহিল যে, সীতারামকে দেখিয়াই তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্ত দূর হইয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হওয়ার বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু কেবল সীতারামকে দেখিয়াই হইত কিনা, সে-বিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই। সীতারামের এক দূরসম্পর্কের বিধবা ভগিনী তাহার এক পুত্রকে কাজকর্মে পাঠাইবার উত্তোগ করিতেছিল, এমন সময়ে সহসা তাহার চৈতন্য হইল যে, বাছাকে ছোটো কাজে নিযুক্ত করিলে বাছার মামাকে অপমান করা হয়। এই বুঝিয়া সে বাছার মামার মান রক্ষা করিবার জন্ত কোনোমতে সে-কাজ করিতে পারিল না। এইরূপে সে মান রক্ষা করিয়া সীতারামকে খণী করিল ও তাহার বিনিময়ে আপনার প্রাণ রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহার উপর সীতারামের বিধবা মাতা আছে ও এক অবিবাহিত বালিকা কন্যা আছে। এদিকে আবার সীতারাম লোকটি অতিশয় শৌখিন, আমোদপ্রমোদটি নহিলে তাহার চলে না। সীতারামের অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবল্লিক পরিবর্তন কিছুই হয় নাই।

তাহার পিসার ক্ষুধাতৃষ্ণা ঠিক সমান রহিয়াছে; তাহার ভাগিনেরটির যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই তাহার উদরের প্রসর ও মামার মান-অপমানের প্রতি দৃষ্টি অধিক করিয়া বাড়িতেছে। সীতারামের টাকার খলি ব্যতীত আর কাহারও উদর কমিবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না। সীতারামের অস্ত্রান্ত গলগ্রহের সঙ্গে শখটিও বজায় আছে, সেটি ধারের উপর বর্ধিত হইতেছে, সুদও যে-পরিমাণে পুষ্ট হইতেছে, সেও সেই পরিমাণে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। উদয়াদিত্য সীতারামের দারিদ্র্যদশা শুনিয়া তাহার ও ভাগবতের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন। সীতারাম টাকাটা পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। মহারাজার নিকট উদয়াদিত্যের নাম করিয়া অবধি সে নিজের কাছে ও উদয়াদিত্যের কাছে নিতান্ত অপরাধী হইয়া আছে। উদয়াদিত্যের টাকা পাইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। একদিন যুবরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে ভগবান, জগদীশ্বর, দয়াময় সোধোদন করিয়া বিস্তর ক্ষমা চাহিল। ভাগবত লোকটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির। সে শতরঞ্চ খেলে, তামাক খায় ও প্রতিবেশীদিগকে স্বর্গনরকের জমি বিলি করিয়া দেয়। সে যখন উদয়াদিত্যের টাকা পাইল, তখন মুখ বাঁকাইয়া নানা ভাবভঙ্গীতে জানাইল যে যুবরাজ তাহার যে সর্বনাশ করিয়াছেন এ টাকাতে তাহার কী প্রতিশোধ হইবে। টাকাটা লইতে সে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

যুবরাজ কর্মচ্যুত প্রহরিদ্বয়কে মাসিক বৃত্তি দিতেছেন, এ-কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। আগে হইলে যাইত না। আগে তিনি উদয়াদিত্যকে এত অবহেলা করিতেন যে, উদয়াদিত্য সঘন্থে সকল কথা তাঁহার কানে যাইত না। মহারাজ জানিতেন যে, উদয়াদিত্য প্রজাদের সহিত মিশিতেন, এবং অনেক সময়ে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি প্রায় এমন সামান্য ও এমন অল্পে অল্পে তাহা তাঁহার সহিয়া আসিয়াছিল যে, বিশেষ একটা কিছু না হইলে উদয়াদিত্যের অস্তিত্ব সঘন্থে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না। এইবার উদয়াদিত্যের প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে, তাই উপরি-উক্ত ঘটনাটি অবিলম্বে তাঁহার কানে গেল। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া আনিলেন ও কহিলেন, “আমি যে সীতারামকে ও ভাগবতকে কর্মচ্যুত করিলাম, সে কি কেবল রাজকোষে তাহাদের বেতন দিবার উপযুক্ত অর্থ ছিল না বলিয়া? তবে যে তুমি নিজের হইতে তাহাদের মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছ?”

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, “আমি দোষী। আপনি তাহাদের দণ্ড দিয়া

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৪১

আমাকে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমি আপনার সেই বিচার অনুসারে মাসে মাসে তাহাদের নিকট দণ্ড দিয়া থাকি।”

ইতিপূর্বে কখনোই প্রতাপাদিত্যকে উদয়াদিত্যের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতো হয় নাই। উদয়াদিত্যের ধীর গম্ভীর বিনীত স্বর ও তাঁহার সুসংযত কথাগুলি প্রতাপাদিত্যের নিতান্ত মন্দ লাগিল না। উদয়াদিত্যের কথার কোনো উত্তর না দিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আমি আদেশ করিতেছি উদয়, ভবিষ্যতে তাহাদের যেন আর অর্থসাহায্য না করা হয়।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হইল।” হাত জোড় করিয়া কহিলেন, “কিন্তু এমন কী অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে এতবড়ো শাস্তি আমাকে বহন করিতে হইবে? আমি কী বরিয়া দেখিব, আমার জ্ঞান আট-নয়টি ক্ষুধিত মুখে অন্ন জুটিতেছে না, আট-নয়টি হতভাগা নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, অথচ আমার পাতে অন্নের অভাব নাই? পিতা, আমার যাহা-কিছু সব আপনারই প্রসাদে। আপনি আমার পাতে আবশ্যকের অধিক অন্ন দিতেছেন, কিন্তু আপনি যদি আমার আহ্বারের সময় আমার সম্মুখে আট-নয়টি ক্ষুধিত কাতরকে বসাইয়া রাখেন, অথচ তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে বাধা দেন, তবে সে অন্ন যে আমার বিষ।”

উত্তেজিত উদয়াদিত্যকে প্রতাপাদিত্য কথা কহিবার সময় কিছুমাত্র বাধা দিলেন না, সমস্ত কথা শেষ হইলে পর আন্তে আন্তে কহিলেন, “তোমার যা বক্তব্য তাহা তনুলায়, এক্ষণে আমার যা বক্তব্য তাহা বলি। ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি, আর কেহ যদি তাহাদের বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেয়, তবে সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া গণ্য হইবে।” প্রতাপাদিত্যের মনে মনে বিশেষ একটু রোষের উদয় হইয়াছিল। সম্ভবত তিনি নিজেও তাহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার কারণ এই “আমি যেন ভারি একটা নিষ্ঠুরতা করিয়াছি, তাই দয়ার শরীর উদয়াদিত্য তাহার প্রতিবিধান করিতে আসিলেন। দেখি, তিনি দয়া করিয়া কী করিতে পারেন। আমি যেখানে নিষ্ঠুর সেখানে আর যে কেহ দয়ালু হইবে, এতবড়ো আত্মপর্থা কাহার প্রাণে সয়।”

উদয়াদিত্য সুরমার কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। সুরমা কহিল, “সেদিন সমস্ত দিন কিছু খাইতে পায় নাই, সন্ধ্যাবেলায় সীতারামের বা সীতারামের ছোটো মেয়েটিকে লইয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আমি সেই সন্ধ্যাবেলায় কিছু দিই, তবে তাহারা সমস্ত পরিবার খাইতে পায়। সীতারামের মেয়েটি দুধের মেয়ে, সমস্ত

দিন কিছু খায় নাই, তাহার মুখপানে কি তাকানো যায়। ইহাদের কিছু কিছু না দিলে ইহারা যাইবে কোথায় ?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “বিশেষত রাজবাটী হইতে যখন তাহারা তাড়িত হইয়াছে, তখন পিতার ভয়ে অস্ত্র কেহ তাহাদের কর্ম দিতে বা সাহায্য করিতে সাহস করিবে না, এ-সময়ে আমরাও যদি বিমুখ হই তাহা হইলে তাহাদের আর সংসারে কেহই থাকিবে না। সাহায্য আমি করিবই, তাহার জন্ত ভারি যো না সুরমা, কিন্তু অনর্থক পিতাকে অসন্তুষ্ট করা ভালো হয় না, বাহাতে এ কাজটা গোপনে সমাধা করা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে।”

সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, “তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, আমি সমস্ত করিব। আমার উপরে ভার দাও।” সুরমা নিজেকে দিয়া উদয়াদিত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়। এই বৎসরটা উদয়াদিত্যের দুর্বৎসর পড়িয়াছে। অদৃষ্ট তাঁহাকে যে-কাজেই প্রবৃত্ত করাইতেছে, সবগুলিই তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে; অথচ সেগুলি এমন কাজ যে, সুরমার মতো স্ত্রী প্রাণ ধরিয়া স্বামীকে সে-কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সুরমা তেমন স্ত্রী নহে। স্বামী যখন ধর্মযুদ্ধে যান, তখন সুরমা নিজের হাতে তাঁহার বর্ম বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর ঘরে গিয়া সে কাঁদে। সুরমার প্রাণ প্রতি পদে ভয়ে আকুল হইয়াছে, অথচ উদয়াদিত্যকে সে প্রতি পদে ভরসা দিয়াছে। উদয়াদিত্য ঘোর বিপদের সময় সুরমার মুখের দিকে চাহিয়াছেন, দেখিয়াছেন সুরমার চোখে জল, কিন্তু সুরমার হাত কাঁপে নাই, সুরমার পদক্ষেপ অটল।

সুরমা তাঁহার এক বিশ্বস্তা দাসীর হাত দিয়া সীতারামের মায়ের কাছে ও ভাগবতের স্ত্রীর কাছে বৃত্তি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দাসী বিশ্বস্তা বটে, কিন্তু মঙ্গলার কাছে এ-কথা গোপন রাখিবার সে কোনো আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। এই নিমিত্ত মঙ্গলা ব্যতীত বাহিরের আর কেহ অবগত ছিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

যখন গোপনে বৃত্তি পাঠানোর কথা প্রতাপাদিত্যের কানে গেল, তখন তিনি কথা না কহিয়া অন্তঃপুরে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন, সুরমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে। উদয়াদিত্য বক্ষে দৃঢ় বল বাঁধিলেন। বিভা কাঁদিয়া সুরমার গলা জড়াইয়া কহিল, “তুমি যদি যাও, তবে এ শ্মশানপুরীতে আমি কী করিব ?” সুরমা বিভার

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৪৩

চিৎক ধরিয়া, বিভার মুখ চুখন করিয়া কহিল, “আমি কেন যাইব বিভা, আমার সর্ব্ব এখানে রহিয়াছে।” সুরমা যখন প্রতাপাদিত্যের আদেশ শুনিল, তখন কহিল, “আমি পিত্রালয়ে যাইবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। সেখান হইতে আমাকে লইতে লোক আসে নাই, আমার স্বামীরও এ-বিষয়ে মত নাই। অতএব বিনা কারণে সহসা পিত্রালয়ে যাইবার আমি কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না।” শুনিয়া প্রতাপাদিত্য জলিয়া গেলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, কোনো উপায় নাই। সুরমাকে কিছু বলপূর্ব্বক বাড়ি হইতে বাহির করা যায় না, অস্তঃপুরে শারীরিক বল থাকে না। প্রতাপাদিত্য মেয়েদের বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি ছিলেন, বলের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে তিনি জানিতেন, কিন্তু এই অবলাদের সম্বন্ধে কিরূপ চাল চালিতে হয়, তাহা তাঁহার মাথায় আসিত না। তিনি বড়ো বড়ো কাছি টানিয়া ছিঁড়িতে পারেন কিন্তু তাঁহার মোটা মোটা অঙ্গুলি দিয়া ক্ষীণ স্ত্রের স্তন্য স্তন্য গ্রহি মৌচন করিতে পারেন না। এই মেয়েগুলো তাঁহার মতে নিতান্ত দুজ্জের ও জানিবার অল্পপযুক্ত সামগ্রী। ইহাদের সম্বন্ধে যখনই কোনো গোল বাধে, তিনি তাড়াহাড়ি মহিষীর প্রতি ভার দেন। ইহাদের বিষয়ে ভাবিতে বসিতে তাঁহার অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই এবং যোগ্যতাও নাই। ইহা তাঁহার নিতান্ত অল্পপযুক্ত কাজ। এবারেও প্রতাপাদিত্য মহিষীকে ডাকিয়া কহিলেন, “সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠাও।” মহিষী কহিলেন, “তাহা হইলে বাবা উদয়ের কী হইবে?” প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “উদয় তো আর ছেলেমানুষ নয়, আমি রাজকার্যের অহুসোখে সুরমাকে রাজপুরী হইতে দূরে পাঠাইতে চাই, এই আমার আদেশ।”

মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, “বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।” উদয়াদিত্য কহিলেন, “কেন মা, সুরমা কী অপরাধ করিয়াছে?”

মহিষী কহিলেন, “কী জানি বাছা, আমরা মেয়েমানুষ, কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া মহারাজার রাজকার্যে যে কী সুযোগ হইবে, তা মহারাজাই জানেন।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “মা, আমাকে কষ্ট দিয়া আমাকে দুঃখী করিয়া রাজকার্যের কী উন্নতি হইল? যতদূর কষ্ট সহিবার তাহা তো সহিয়াছি, কোন্ সুখ আমার অবশিষ্ট আছে? সুরমা যে বড়ো সুখে আছে তাহা নয়। হুই সন্ধ্যা সে ভংসনা সহিয়াছে, ‘দূর ছাই’ সে অন্ধ-আভরণ করিয়াছে। অবশেষে কি রাজবাড়িতে তাহার লজ্জা একটুকু স্থানও কুলাইল না। তোমাদের সঙ্গে কি তাহার কোনো সম্পর্ক নাই মা? সে কি ভিখারি অতিথি যে, যখন খুশি রাখিবে, যখন খুশি তাড়াইবে?”

তাহা হইলে মা, আমার জন্মও রাজবাড়িতে স্থান নাই, আমাকেও বিদায় করিয়া দাও।”

মহিষী কাদিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন, “কী জানি বাবা। মহারাজা কখন কী যে করেন, কিছু বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাও বলি বাছা, আমাদের বউমাও বড়ো ভালো মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি এখানে আর শাস্তি নাই। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেল। তা ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই থাক না কেন, দেখা যাক। কী বল বাছা। ও দিনকতক এখান হইতে গেলেই দেখিতে পাইবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না।”

উদয়াদিত্য এ-কথার আর কোনো উত্তর করিলেন না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

মহিষী কাদিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া পড়িলেন, কহিলেন, “মহারাজ রক্ষা করো। সুরমাকে পাঠাইলে উদয় বাঁচিবে না। বাছার কোনো দোষ নাই, ওই সুরমা ওই ডাইনীটা তাহাকে কী মন্ত্র করিয়াছে।” বলিয়া মহিষী কাদিয়া আকুল হইলেন।

প্রতাপাদিত্য বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “সুরমা যদি না যায় তো আমি উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব।”

মহিষী মহারাজার কাছ হইতে আসিয়া সুরমার কাছে গিয়া কহিলেন, “পোড়াগুখী, আমার বাছাকে তুই কী করিলি? আমার বাছাকে আমাকে ফিরাইয়া দে। আসিয়া অবধি তুই তাহার কী সর্বনাশ না করিলি? অবশেষে—সে রাজার ছেলে—তার হাতে বেড়ি না দিয়া কি তুই ক্ষান্ত হইবি না?”

সুরমা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, “আমার জন্ম তাঁর হাতে বেড়ি পড়িবে? সে কী কথা মা। আমি এখনই চলিলাম।”

সুরমা বিভার কাছে গিয়া স্তম্ভ কহিল। বিভার গলা ধরিয়া কহিল, “বিভা, এই যে চলিলাম, আর বোধ করি আমাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দিবে না।” বিভা কাদিয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। সুরমা সেইখানে বসিয়া পড়িল। অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত প্রাপ্ত হইতে একটা কথা আসিয়া তাহার প্রাণে বাজিতে লাগিল, “আর হইবে না!” আর আসিতে পাইব না, আর হইবে না, আর কিছু রহিবে না! এমন একটা মহাশূন্য ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইল,—যে ভবিষ্যতে সে মুখ নাই, সে হাসি নাই, সে আদর নাই, চোখে চোখে বুকে বুকে প্রাণে প্রাণে মিলন নাই, সুখদুঃখের বিনিময় নাই, বুক ফাটিয়া গেলেও একমুহূর্তের

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৪৫

জন্মও একবিন্দু প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছু নাই, কী ভয়ানক ভবিষ্যৎ। সুরমার বুক কাটিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখের জল শুকাইয়া গেল। উদয়াদিত্য আসিবামাত্র সুরমা তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া বুকে চাপিয়া বুক কাটির কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা এমন করিয়া কখনো কাঁদে নাই। তাহার বলিষ্ঠ হৃদয় আজ শতধা হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইয়াছে সুরমা?” সুরমা উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া আর কি কথা কহিতে পারে? মুখের দিকে চায় আর কাঁদিয়া ওঠে। বলিল, “ওই মুখ আমি দেখিতে পাইব না? সন্ধ্যা হইবে, তুমি বাতায়নে আসিয়া বসিবে, আমি পাশে নাই? ঘরে দীপ জ্বলাইয়া দিবে, তুমি ওই ঘরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে, আর আমি হাসিতে হাসিতে তোমার হাত ধরিয়া আনিব না? তুমি যখন এখানে, আমি তখন কোথায়?” সুরমা যে বলিল “কোথায়”, তাহাতে কতখানি নিরাশা, তাহাতে কত দূর-দূরান্তরের বিচ্ছেদের ভাব! যখন কেবলমাত্র চোখে চোখেই মিলন হইতে পারে তখন মধ্যে কত দূর! যখন তাহাও হইতে পারে না, তখন আরো কত দূর! যখন বার্তা লইতে বিলম্ব হয়, তখন আরো কতদূর! যখন প্রাণান্তিক ইচ্ছা হইলেও একমুহূর্তের জন্মও দেখা হইবে না, তখন—তখন ওই পা তুখানি ধরিয়া এনি করিয়া বুক চাপিয়া এই মুহূর্তেই মরিয়া যাওয়াতেই স্মৃৎ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উপাখ্যানের আরম্ভভাগে রুক্মিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ করি পাঠকেরা তাহাকে বিস্মৃত হন নাই। এই মঙ্গলাই সেই রুক্মিণী। সে ব্রাহ্মণ পরিভ্রমণ করিয়া নাম-পরিবর্তন-পূর্বক যশোহরের প্রান্তদেশে বাস করিতেছে। রুক্মিণীর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। সাধারণ নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের দ্বারা সে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ, মনোবাজ্য-অধিকারলোলুপ। হাসিকান্না তাহার হাতধরা, আবশ্যক হইলে বাহির করে, আবশ্যক হইলে তুলিয়া রাখে। যখন সে রাগে তখন সে অতি প্রচণ্ডা, মনে হয় যেন রাগের পাত্রকে দাঁতে নখে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তখন অধিক কথা কয় না, চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে থাকে, ধরধর করিয়া কাঁপে। গলিত লোহের মতো তাহার হৃদয়ের কটাহে রাগ টগবগ করিতে থাকে। তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষা সাপের মতো ফৌস ফৌস করে ও ফুলিয়া ফুলিয়া লেজ

আছড়াইতে থাকে। এদিকে সে নানাবিধ ব্রত করে, নানাবিধ তান্ত্রিক অমুষ্ঠান করে। যে শ্রেণীর লোকদের সহিত সে মেশে, তাহাদের মন সে আশ্চর্যরূপে বৃত্তিতে পারে। যুবরাজ যখন সিংহাসনে বসিবেন তখন সে যুবরাজের হৃদয়ের উপর সিংহাসন পাতিয়া তাহার হৃদয়রাজ্য ও যশোহর-রাজ্য একত্রে শাসন করিবে, এ আশা শয়নে স্বপ্নে তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে। ইহার জন্ত সে কী না করিতে পারে। বহুদিন ধরিয়া অনবরত চেষ্টা করিয়া রাজবাটীর সমস্ত দাসদাসীর সহিত সে ভাব করিয়া লইয়াছে। রাজবাটীর প্রত্যেক ক্ষুদ্র খবরটি পর্যন্ত সে রাখে। সুরমার মুখ কবে মলিন হইল তাহাও সে শুনিতে পায়, প্রতাপাদিত্যের সামান্য পীড়া হইলেও তাহার কানে যায়, ভাবে এইবার বুঝি আপদটার মরণ হইবে। প্রতাপাদিত্য ও সুরমার মরণোদ্দেশ্যে সে নানা অমুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এখনো তো কিছুই সকল হয় নাই। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া সে মনে করে আজ হয়তো শুনিতে পাইব, প্রতাপাদিত্য অথবা সুরমা বিছানায় পড়িয়া মরিয়া আছে। প্রতিদিন তাহার অধীরতা বাড়িয়া উঠিতেছে। ভাবিতেছে মন্ত্রতন্ত্র চুলায় যাক, একবার হাতের কাছে পাই তো মনের সাধ মিটাই। ভাবিতে ভাবিতে এমন অধর দংশন করিতে থাকে যে, অধর কাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হয়।

রুক্মিণী দেখিল যে, প্রতিদিন সুরমার প্রতি রাজার ও রাজমহিষীর বিরাগ বাড়িতেছে। অবশেষে এতদূর পর্যন্ত হইল যে, সুরমাকে রাজবাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। যখন সে দেখিল তবুও সুরমা গেল না, তখন সে বিদায় করিয়া দিবার সহজ উপায় অবলম্বন করিল।

রাজমহিষী যখন শুনিলেন, মঙ্গলা নামক একজন বিধবা তন্ত্র মন্ত্র ঔষধ নানাপ্রকার জানে, তখন তিনি ভাবিলেন সুরমাকে রাজবাটী হইতে বিদায় করিবার আগে যুবরাজের মনটা তাহার কাছ হইতে আদায় করিয়া লওয়া ভালো। মাতঙ্গিনীকে মঙ্গলার নিকট হইতে গোপনে ঔষধ আনা হইতে পাঠাইলেন।

মঙ্গলা নানাবিধ শিকড় লইয়া সমস্ত রাত ধরিয়া কাটিয়া ভিজাইয়া ঝাটিয়া মিশাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিষ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেই নিম্নতর গভীর রাতে নির্জন নগরপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটির-মধ্যে হামানদিস্তার শব্দ উঠিতে লাগিল, সেই শব্দই তাহার একমাত্র সঙ্গী হইল, সেই অবিপ্রায় একদেয়ে শব্দ তাহার নর্তনশীল উৎসাহের তালে তালে করতালি দিতে লাগিল, তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ নাচিতে লাগিল, তাহার চোখে আর ঘুম রহিল না।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৪৭

ঔষধ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিল। বিষ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু সুরমা মরিবার সময় বাহাতে যুবরাজের মনে দয়া না হয়, এই উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়িতে ও অল্পাশ্রয় করিতে অনেক সময় লাগিল।

প্রতাপাদিত্যের মত লইয়া মহিষী সুরমাকে আরো কিছু দিন রাজবাটীতে থাকিতে দিলেন। সুরমা চলিয়া যাইবে, বিভা চারিদিকে অকুল পাথার দেখিতেছে। এ কয়দিন সে অনবরত সুরমার কাছে বসিয়া আছে। একটি মলিন ছায়ার মতো সে চুপ করিয়া সুরমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এক-একটা দিন যায়, সন্ধ্যা আইসে, বিভা ততই যেন ঘনিষ্ঠতর ভাবে সুরমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। দিনগুলিকে কে যেন তাহার প্রাণপণ আকর্ষণ হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে। বিভার চারিদিকে অন্ধকার। সুরমার চক্ষেও সমস্তই শূন্য। তাহার আর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম নাই, সংসারের দিগ্বিদিক সমস্ত মিশাইয়া গেছে। সে উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া থাকে, কোলের উপর শুইয়া থাকে, তাহার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে, আর কিছু করে না। বিভাকে বলে, “বিভা, তোর কাছে আমার সমস্ত রাখিয়া গেলাম”, বলিয়া দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

অপরাক্ত হইয়া আসিয়াছে; কাল প্রভু্যবে সুরমার বিদায়ের দিন। তাহার গার্হস্থ্যের যাহা কিছু সমস্ত একে একে বিভার হাতে সমর্পণ করিল। উদয়াদিত্য প্রশান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, হয় সুরমাকে রাজপুরীতে রাখিবেন, নয় তিনিও চলিয়া যাইবেন। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন সুরমা আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে শয়নগৃহে গিয়া শুইয়া পড়িল, কহিল, বিভা, “বিভা, শীঘ্র একবার তাঁহাকে ডাক আর বিলম্ব নাই!”

উদয়াদিত্য দ্বারের কাছে আসিতেই সুরমা বলিয়া উঠিল, “এস, এস, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।” বলিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া দিল। উদয়াদিত্য কাছে আসিতেই তাহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিল। উদয়াদিত্য বসিলেন, তখন সুরমা বহু কষ্টে নিশ্বাস লইতেছে, তাহার হাত পা শীতল হইয়া আসিয়াছে। উদয়াদিত্য ভীত হইয়া ডাকিলেন, “সুরমা।” সুরমা অতি ধীরে মাথা তুলিয়া উদয়াদিত্যের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, “কী নাথ।” উদয়াদিত্য ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “কী হইয়াছে সুরমা?” সুরমা কহিল, “বোধ করি আমার সময় হইয়া আসিয়াছে।” বলিয়া উদয়াদিত্যের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্ত হাত উঠাইতে চাহিল হাত উঠিল না। কেবল মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। উদয়াদিত্য দুই হাতে সুরমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, “সুরমা, সুরমা,

তুমি কোথায় যাইবে সুরমা। আমার আর কে রহিল ?” সুরমার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে কেবল বিভার মুখের দিকে চাহিল। বিভা তখন হতচেতন হইয়া বোধশূন্য নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া আছে। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় সুরমা ও উদয়াদিত্য বসিয়া থাকিতেন, সম্মুখে সে বাতায়ন উন্মুক্ত। আকাশের তারা দেখা যাইতেছে, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, চারিদিক স্তব্ধ। ঘরে প্রদীপ জ্বলাইয়া গেল। রাজবাটিতে পূজার শাখ-ঘণ্টা বাজিয়া ক্রমে থামিয়া গেল। সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, “একটা কথা কও, আমি চোখে ভালো দেখিতে পাইতেছি না।”

ক্রমে রাজবাটিতে রাষ্ট্র হইল যে, সুরমা নিজ হস্তে বিষ খাইয়া মরিতেছে। রাজমহিষী ছুটিয়া আসিলেন, সকলে ছুটিয়া আসিল। সুরমার মুখ দেখিয়া মহিষী কাদিয়া উঠিয়া কহিলেন, “সুরমা মা আমার, তুই এইখানেই থাক, তোকে কোথাও যাইতে হইবে না। তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তোকে কে যাইতে বলে ?” সুরমা শাণ্ডীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। মহিষী দ্বিগুণ কাদিয়া উঠিয়া কহিলেন, “মা তুই কি রাগ করিয়া গেলি রে ?” তখন সুরমার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, কী কথা বলিতে গেল, বাহির হইল না। ‘রাত্রি যখন চারি দণ্ড আছে, তখন চিকিৎসক কহিলেন, “শেষ হইয়া গেছে।” “দাদা, কী হইল গো” বলিয়া বিভা সুরমার বুকের উপরে পড়িয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। প্রভাত হইয়া গেল, উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুরমা কি আর নাই ? বিভার কিছুতেই তাহা মনে হয় না কেন ? যেন সুরমার দেখা পাইবে, যেন সুরমা ওইদিকে কোথায় আছে ! বিভা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার প্রাণ যেন সুরমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। চুল বাঁধিবার সময় সে চূপ করিয়া বসিয়া থাকে, যেন এখনই সুরমা আসিবে, তাহার চুল বাঁধিয়া দিবে, তাহারই জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। না রে না, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাত্রি হইয়া আসে, সুরমা বুঝি আর আসিল না। চুল বাঁধা আর হইল না। আজ বিভার মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে, আজ বিভা এত কাদিতেছে, তবু কেন সুরমা আসিল না, সুরমা তো কখনো এমন করে না। বিভার মুখ একটু মলিন হইলেই অমনি সুরমা তাহার কাছে আসে, তাহার গলা ধরে, প্রাণ জুড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। আর আজ—ওরে, আজ বুক কাটিয়া গেলেও সে আসিবে না।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৪৯

উদয়াদিত্যের অর্ধেক বল অর্ধেক প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাজে যে তাঁহার আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, যাহার মন্ত্রণা তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, যাহার হাসি তাঁহার একমাত্র পুরস্কার ছিল—সে-ই চলিয়া গেল। তিনি তাঁহার শয়নগৃহে যাইতেন, যেন কী ভাবিতেন, একবার চারিদিক দেখিতেন, দেখিতেন—কেহ নাই। ধীরে ধীরে সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেন; যেখানে সুরমা বসিত সেইখানটি শূন্য রাখিয়া দিতেন—আকাশে সেই জ্যোৎস্না, সম্মুখে সেই কানন, তেমনি করিয়া বাতাস বহিতেছে—মনে করিতেন, এমন সন্ধ্যায় সুরমা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে?

সহসা তাঁহার মনে হইত, যেন সুরমার মত কার গলার স্বর শুনিতে পাইলাম, চমকিয়া উঠিতেন, যদিও অসম্ভব মনে হইত, তবু একবার চারিদিক দেখিতেন, একবার বিছানায় যাইতেন, দেখিতেন—কেহ আছে কি না। যে উদয়াদিত্য সমস্ত দিন শত শত ক্ষুদ্র কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, দরিদ্র প্রজারা তাহাদের খেতের ও বাগানের ফলমূল শাকসবজি উপহার লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা-পড়া করিতেন, তাহাদের পরামর্শ দিতেন; আজকাল আর সে-সব কিছুই করিতে পারেন না, তবুও সন্ধ্যাবেলার শ্রান্ত হইয়া পড়েন—শ্রান্তপদে শয়নালয়ে আসেন, মনের মধ্যে যেন একটা আশা থাকে যে, সহসা শয়নকক্ষের দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব—সুরমা সেই বাতায়নে বসিয়া আছে। উদয়াদিত্য যখন দেখিতে পান, বিভা একাকী নানমুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিভাকে কাছে ডাকেন, তাহাকে আদর করেন, তাহাকে কত কী স্নেহের কথা বলেন, অবশেষে দাদার হাত ধরিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠে, উদয়াদিত্যেরও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। একদিন উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, “বিভা, এ-বাড়িতে আর তোর কে রহিল? তোকে এখন শগুরবাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই। কী বলিস? আমার কাছে লজ্জা করিস না বিভা। তুই আর কার কাছে তোর মনের সাধ প্রকাশ করিবি বল?” বিভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। এ-কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? পিতৃভবনে কি আর তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে? পৃথিবীতে যে তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থল আছে, সেইখানে—সেই চন্দ্রবীপে যাইবার জন্ত তাহার প্রাণ অস্থির হইবে না তো কী? কিন্তু তাহাকে গইতে এ-পর্বন্ত একটুও তো লোক আসিল না! কেন আসিল না?

বিভাকে শগুরবাড়ি পাঠাইবার প্রস্তাব উদয়াদিত্য একবার পিতার নিকট উপস্থাপন করিলেন। প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “বিভাকে শগুরবাড়ি পাঠাইতে আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের নিকট যদি বিভার কোনো আদর থাকিত,

তবে তাহারা বিভাকে লইতে নিজে হইতে লোক পাঠাইত। আমাদের অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক দেখি না।”

রাজমহিষী বিভাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করেন। বিভার সখা অবস্থায় বৈধব্য কি চোখে দেখা যায়? বিভার করুণ মুখখানি দেখিলে তাঁহার প্রাণে শেল বাজে। তাহা ছাড়া মহিষী তাঁহার জামাতাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, সে একটা কী ছেলেমানুষি করিয়াছে বলিয়া তাঁহার ফল যে এতদূর পর্যন্ত হইবে, ইহা তাঁহার কিছুতেই ভালো লাগে নাই। তিনি মহারাজের কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, বিভাকে শ্বেতবর্ণা পাঠাও।” মহারাজ রাগ করিলেন, কহিলেন, “ওই এক কথা আমি অনেকবার শুনিয়াছি, আর আমাকে বিরক্ত করিও না। যখন তাহারা বিভাকে ভিক্ষা চাহিবে, তখন তাহারা বিভাকে পাইবে।” মহিষী কহিলেন, “মেয়ে অধিক দিন শ্বেতবর্ণা না গেলে দশজনে কী বলিবে?” প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আর প্রতাপাদিত্য নিজে সাধিয়া যদি মেয়েকে পাঠায় আর রামচন্দ্র রায় যদি তাহাকে দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলেই বা দশজনে কী বলিবে?”

মহিষী কাদিতে কাদিতে ভাবিলেন, মহারাজা এক-এক সময় কী যে করেন তাঁহার কোনো ঠিকানা থাকে না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

মান অপমানের প্রতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। রাজা একদিন চতুর্দোলায় করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, দুই জন অভিজ্ঞ তাঁতি তাহাদের কুটিরের সম্মুখে বসিয়া তাঁত বুনিতেছিল, চতুর্দোল দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় নাই, রাজা তাহা লইয়া হলস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার যশোহরে তাঁহার শ্বেতবর্ণার এক চাকরকে তিনি একটা কী কাজের জন্ত আদেশ করিয়াছিলেন, সে বেচারী এক গুনিতে আর গুনিয়াছিল, কাজে ভুল করিয়াছিল, মহামানী রামচন্দ্র রায় তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শ্বেতবর্ণার ভৃত্যেরা তাঁহাকে মানে না। তাহারা অবশ্য তাহাদের মনিবদের কাছেই এইরূপ শিখিয়াছে, নহিলে তাহারা সাহস করিত না। বিশেষত সেইদিন প্রাতঃকালেই তিনি দেখিয়াছিলেন যুবরাজ উদয়াদিত্য সেই চাকরকে চুপি চুপি কী একটা কথা বলিতেছিলেন—অবশ্য তাঁহাকে অপমান করিবার পরামর্শই চলিতেছিল, নহিলে আর কী হইতে পারে। একদিন কয়েক জন বালক

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৫১

মাটির টিপির সিংহাসন গড়িয়া, রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ সাজিয়া রাজসভার অহুকরণে খেলা করিতেছিল। রাজার কানে যায়, তিনি তাহাদের পিতাদের ডাকিয়া বিলক্ষণ শাসন করিয়া দেন।

আজ মহারাজা গদির উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। সম্মুখে এক ভীষণ দরিদ্র অপরাধী খাড়া রহিয়াছে, তাহার বিচার চলিতেছে। সে ব্যক্তি কোনো যত্নে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায় সংক্রান্ত ঘটনা গুনিতে পায় ও তাহা হইয়া আপনা-আপনির মধ্যে আলোচনা করে, তাহাই গুনিয়া তাহার শত্রুপক্ষের একজন সে-কথাটা রাজার কানে উত্থাপন করে। রাজা মহা খাপা হইয়া তাহাকে তলব করেন। তাহাকে ফাঁসিই দেন কি নির্বাসনই দেন, এমনি একটা কাণ্ড বাধিয়া গেছে।

রাজা বলিতেছেন, “বেটা, তোর এতবড়ো যোগ্যতা!”

সে কাঁদিয়া কহিতেছে, “দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নাই।”

মন্ত্রী কহিতেছেন, “বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আমাদের মহারাজের তুলনা।”

দেওয়ান কহিতেছেন, “বেটা, জানিস না, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয়, তাহাকে রাজটিকা পরাইবার জন্ত সে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে আবেদন করে! অনেক কাঁদাকাটা করাতে তিনি তাঁহার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়া তাহাকে টিকা পরাইয়া দেন।”

রমাই ভাঁড় কহিতেছে, “বিক্রমাদিত্যের ছেলে প্রতাপাদিত্য, উহার তো দুই পুরুষ রাজা! প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হইল জোক, বেটা প্রজার বক্ত খাইয়া খাইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিল, সেই জোকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাথাটা কুলোপানা করিয়া তুলিয়াছে ও সাপের মতো চক্র ধরিতে শিখিয়াছে। আমরা পুরুষাত্মকরূপে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করিয়া আসিতেছি, আমরা বেদে, আমরা জ্ঞাত-সাপ চিনি না?” রাজা রামচন্দ্র রায় বিষম সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্রবদনে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। আজকাল প্রত্যহ সভায় প্রতাপাদিত্যের উপর একবার করিয়া আক্রমণ হয়। প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠ লক্ষ্যপূর্বক শব্দভেদী বচন-বাণ বর্ষণ করিয়া সেনানীদের ভূণ নিশের হইলে সভা ভঙ্গ হয়। যাহা হউক আজিকার বিচারে অপরাধী অনেক কাঁদাকাটা করিতে দোঁর্দপ্রতাপ রামচন্দ্র রায় কহিলেন, “আচ্ছা যা, এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান থাকিস।”

অত্যাগত সভাসদ চলিয়া গেল, কেবল মন্ত্রী ও রমাই ভাঁড় রাজার কাছে রহিল। প্রতাপাদিত্যের কথাই চলিতে লাগিল।

রমাই কহিল, “আপনি তো চলিয়া আসিলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়িলেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কত্কাটি বিধবা হইলে হাতের লোহা ও বালা দুগাছি বিক্রয় করিয়া রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন। তাহা লইয়া তথি কত !”

রাজা হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, “বটে !”

মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, শুনিতে পাই। প্রতাপাদিত্য আজকাল আপসোসে সারা হইতেছেন। এখন কী উপায়ে মেরেকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবেন, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার আহারনিদ্রা নাই।”

রাজা কহিলেন, “সত্য নাকি !” বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তামাক টানিতে লাগিলেন, বড়োই আনন্দ বোধ হইল।

মন্ত্রী কহিল, “আমি বলিলাম, আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতেই তোমাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেছে। তাহার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে আনিয়া ঘর নিচু করা, এত পুণ্য এখনো তোমরা কর নাই। কেমন হে ঠাকুর !”

রমাই কহিল, “তাহার সন্দেহ আছে ! মহারাজ, আপনি যে পাকে পা দিয়াছেন, সে তো পাকের বাবার ভাগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে ঢুকিবার সময় পা ধুইয়া আসিবেন না তো কী !”

এইরূপে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের কাল্পনিক মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করা হইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের যে কী অপরাধ তাহা বুঝিতে পারি না। তিনি যে নিজে বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্র রায়ের প্রাণরক্ষা করিলেন, সে-সকল কথা চুলায় গেল, আর তিনি প্রতাপাদিত্যের সন্তান হইয়াছেন, এই অপরাধে রামচন্দ্র রায় তাঁহার কথা তুলিয়া অকাতরে হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রায় যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, তিনি এক জন লঘুহৃদয়, সংকীর্ণপ্রাণ লোক। উদয়াদিত্য যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি কৃতজ্ঞ নহেন। তিনি মনে করেন, ইহা তো হইবেই, ইহা না হওয়াই অস্বাভাবিক। রামচন্দ্র রায় বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বাঁচাইবে না তো কী ! তাঁহার মনে হয়, রামচন্দ্র রায়ের পায়ে কাঁটা ফুটিলে সমস্ত জগৎ-সংসারের প্রাণে বেদনা লাগে। তিনি মনে করিতে পারেন না যে, পৃথিবীর একজন অতি ক্ষুদ্রতম লোকেরও নিজের বিপদের কাছে মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় কিছুই নহে। দিব্যরাজি শত শত স্তুতিবাদকের দাঁড়িপাল্লায় এক দিকে জগৎকে ও আর-এক দিকে নিজেকে

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৫৩

চড়াইয়া তিনি নিজেকেই ওজনে ভারি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এইজন্য সহজে আর কাহারও উপরে তাঁর কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। তাহা ছাড়া উদয়াদিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতার উদয় না হইবার আর-এক কারণ এই যে, তিনি মনে করেন, উদয়াদিত্য নিজের ভগিনীর জন্যই তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার প্রাণরক্ষাই উদয়াদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা ছাড়া, যদি বা রামচন্দ্রের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইত, তবুও তিনি উদয়াদিত্যকে লইয়া হস্তপরিহাসের ক্রটি করিতেন না। কারণ যেখানে দশজনে মিলিয়া একজনকে লইয়া হাসিতামাশা করিতেছে, বিশেষত রমাই ভাঁড় বাহাকে লইয়া বিদ্রুপ করিতেছে, সেখানে তিনি তাহাদের মুখ বন্ধ করেন বা তাহাদের সহিত যোগ না দেন, এমন তাঁহার মনের জোর নাই। তাঁহার মনে হয়, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে।

এখনো বিভার প্রতি রামচন্দ্র রায়ের আসক্তির মতো একটা ভাব আছে। বিভা সুন্দরী, বিভা সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিভার অতি অল্প দিনই সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন—কিন্তু যখন সেই রাত্রে প্রথম নিজা ভাঙিয়া সহসা তিনি দেখিলেন, বিভা শয্যা বসিয়া কাদিতেছে, তাহার মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, তাহার অর্ধ-অনাবৃত বক্ষ কাপিয়া কাপিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর করুণ দুটি চক্ষু বহিয়া জন পড়িতেছে, তাহার হৃদ দুটি অধর কচি কিশলয়ের মতো কাপিতেছে, তখন তাঁহার মনে সহসা একটা কী উজ্জ্বল হইল, বিভার মাথা কোলে রাখিলেন, চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বিভার করুণ অধর চুষন করিবার জন্য হৃদয়ে একটা আবেগ উপস্থিত হইল, তখনই প্রথম তাঁহার শরীরে মৃত্যুর্তের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল, তখনই প্রথম তিনি বিভার নববিকশিত যৌবনের লাবণ্যরাশি দেখিতে পাইলেন, সেই প্রথম তাঁহার নিখাস বেগে বহিল, অর্ধনিম্নলিত নেত্রপল্লবে জলের রেখা দেখা দিল, হৃদয় বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিভাকে চুষন করিতে গেলেন। এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়িল, এমন সময়ে বিপদের সংবাদ শুনিতে পাইলেন। সেই যে হৃদয়ের প্রথম বিকাশ, সেই যে বাসনার প্রথম উজ্জ্বল, সেই যে নয়নের মোহদৃষ্টি, তাহা পরিতৃপ্ত হইল না বলিয়া তাহার তৃষা-কাতর হইয়া রামচন্দ্র রায়ের স্মৃতি অধিকার করিয়া রহিল। ইহা স্থায়ী প্রেমের ভাব নহে, কারণ রামচন্দ্র রায়ের লঘু হৃদয়ের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। একটা বিলাসজীব্যের প্রতি শৌখিন হৃদয়ের যেমন সহসা একটা টান পড়ে, শৌখিন রামচন্দ্র রায়েরও বিভার প্রতি সেইরূপ একটা ভাব জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, যে-কারণেই হউক রামচন্দ্র রায়ের

যৌবন-স্বপ্নে বিভা জাগিতেছিল। বিভাকে পাইবার জন্য তাঁহার একটা অভিশাপ উদয় হইয়াছিল। কিন্তু যদি বিভাকে আনিতে পার্ঠান, তাহা হইলে সকলে কী মনে করিবে! সভাসদেরা যে তাঁহাকে স্ত্রৈণ মনে করিবে, মন্ত্রী যে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইবে, রমাই ভাঁড় যে মনে মনে হাসিবে! তাহা ছাড়া, প্রতাপাদিত্যের তাহা হইলে কী শাস্তি হইল? শ্বশুরের উপর প্রতিহিংসা তোলা হইল কই? এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া বিভাকে আনিতে পার্ঠাইতে তাঁহার ভরসা হয় না, প্রবৃত্তি হয় না। এমন কি, বিভাকে লইয়া হস্তপরিহাস চলিতে থাকে, তাহাতে বাধা দিতেও তাঁহার সাহস হয় না, এবং প্রতাপাদিত্যের কথা মনে করিয়া তাহাতে বাধা দিতে তাঁহার ইচ্ছাও হয় না।

রমাই ভাঁড় ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে রামমোহন মাল আসিয়া জোড়হাতে কহিল, “মহারাজ।”

রাজা কহিলেন, “কী রামমোহন।”

রামমোহন। “মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি ঠাকুরানীকে আনিতে যাই।”

রাজা কহিলেন, “সে কী কথা।”

রামমোহন কহিল, “আজ্ঞা হাঁ। অন্তঃপুর শূন্য হইয়া আছে, আমি তাহা দেখিতে পারিব না। অন্তঃপুরে যাই, মহারাজের ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাই না, আমার যেন প্রাণ কেমন করিতে থাকে। আমার মা-লক্ষ্মী গৃহে আসিয়া গৃহ উজ্জল করুন আমরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করি।”

রাজা কহিলেন, “রামমোহন তুমি পাগল হইয়াছ? সে-মেয়েকে আমি ঘরে আনি?”

রামমোহন নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল, “কেন মহারাজ, আমার মা-ঠাকুরানী কী অপরাধ করিয়াছেন?”

রাজা কহিলেন, “বল কী রামমোহন। প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনিব?”

রামমোহন কহিল, “কেন আনিবেন না? প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কিসের? যতদিন বিবাহ-না হয় ততদিন মেয়ে বাপের; বিবাহ হইলে পর আর তাহাতে বাপের অধিকার থাকে না। এখন আপনার মহিষী আপনার—আপনি যদি তাঁহাকে ঘরে না আনেন, আপনি যদি তাঁহাকে সমাদর না করেন, তবে আর কে করিবে?”

রাজা কহিলেন, “প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি,

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৫৫

ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আবার তাহাকে ঘরে আনিব? তাহা হইলে মান রক্ষা হইবে কী করিয়া?”

রামমোহন কহিল, “মান রক্ষা? আপনার নিজের মহিষীকে আপনি পরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর আপনার কোনো অধিকার নাই, তাঁহার উপর অল্প লোক বাহা ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারে, ইহাতেই কি আপনার মান রক্ষা হইতেছে?”

রাজা কহিলেন, “যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয়?”

রামমোহন বিশাল বক্ষ ফুলাইয়া কহিল, “কী বলিলেন মহারাজ? যদি না দেয়? এতবড়ো সাধ্য কাহার যে দিবে না? আমার মা-জ্ঞাননী, আমাদের ঘরের মা-লক্ষ্মী, কাহার সাধ্য তাঁহাকে আমাদের কাছ হইতে রাখিতে পারে? যতবড়ো প্রতাপাদিত্যই হউন না কেন, তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইব। এই বলিয়া গেলাম। আমার মাকে আমি আনিব, তুমি বারণ করিবার কে?” বলিয়া রামমোহন প্রস্থানের উপক্রম করিল।

রাজা তাড়াতাড়ি কহিলেন, “রামমোহন, যেয়ো না, শোনো শোনো। আচ্ছা তুমি মহিষীকে আনিতে যাও তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু—দেখো, এ-কথা যেন কেহ শুনিতে না পায়। রমাই কিংবা মঞ্জীর কানে যেন এ-কথা না উঠে।”

রামমোহন কহিল, “যে আজ্ঞা মহারাজ।” বলিয়া চলিয়া গেল।

যদিও মহিষী রাজপুত্রে আসিলেই সকলে জানিতে পারিবে, তথাপি সে অনেক বিলম্ব আছে, তাহার জন্ত প্রস্তুত হইবার সময় আছে। আপাতত উপস্থিত লজ্জার হাত এড়াইতে পারিলেই রামচন্দ্র রায় বাঁচেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য কিসে স্নুখে থাকেন, দিনরাত বিভার সেই একমাত্র চেষ্টা। নিজের হাতে সে তাঁহার সমস্ত কাজ করে। সে নিজে তাঁহার খাবার আনিয়া দেয়, আহারের সময় স্নুখে বসিয়া থাকে, সামান্য বিষয়েও ত্রুটি হইতে দেয় না। যখন সন্ধ্যার সময় উদয়াদিত্য তাঁহার ঘরে আসিয়া বসেন, দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, বুঝি চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, তখন বিভা

আস্তু আস্তু তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসে—কথা উত্থাপন করিতে চেষ্টা করে, কিছুই কথা জোগায় না। দুইজনে শুধু, কাহারও মুখে কথা নাই। মলিন দীপের আলো মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের উপরে একটা আঁধারের ছায়া কাঁপিতেছে, বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বুক কাটিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠে, “দাদা, সে কোথায় গেল?” উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠেন, চক্ষুর আচ্ছাদন অপসারণ করিয়া বিভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, যেন বিভা কী বলিল ভালো বুঝিতে পারেন নাই, যেন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, সহসা চৈতন্য হয়, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বিভার কাছে আসিয়া বলেন, “আয় বিভা একটা গল্প বলি শোন।”

বর্ষার দিন, খুব মেঘ করিয়াছে, সমস্ত দিন বুপ বুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। দিনটা আঁধার করিয়া রহিয়াছে, বাগানের গাছপালাগুলি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। এক-এক বার বাতাস দিতেছে ও ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ছাঁট আসিতেছে। উদয়াদিত্য চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, দিগন্তে বিদ্যুৎ হানিতেছে। বৃষ্টির অবিশ্রাম শব্দ কেবল যেন বলিতেছে, “সুরমা নাই—সে নাই।” মাঝে মাঝে আর্দ্র বাতাস ছুঁ করিয়া আসিয়া যেন বলিয়া যায়, “সুরমা কোথায়!” বিভা ধীরে ধীরে উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহে, “দাদা।” দাদা আর উত্তর দিতে পারেন না, বিভাকে দেখিয়াই তিনি মুখ ঢাকিয়া বাতায়নের উপরে মাথা রাখিয়া পড়েন, মাথার উপরে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যায়, সন্ধ্যা হইয়া আসে, রাত্রি হইতে থাকে। বিভা উদয়াদিত্যের আহ্বারের আয়োজন করিয়া আবার আসিয়া বলে, “দাদা, খাবার আসিয়াছে, খাওসে।” উদয়াদিত্য কোনো উত্তর করেন না। রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। বিভা কাঁদিয়া কহে, “দাদা, উঠ, রাত হইল।” উদয়াদিত্য মুখ তুলিয়া দেখেন, বিভা কাঁদিতেছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিভার চোখ মুছাইয়া খাইতে যান। ভালো করিয়া খান না। বিভা তাই দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া গুইতে যায়, সে আর আহ্বার স্পর্শ করে না।

বিভা কথা কহিতে, গল্প করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিভা অধিক কথা কহিতে পারে না। উদয়াদিত্যকে কী করিয়া যে সুখে রাখিবে ভাবিয়া পায় না। সে কেবল ভাবে, আহা যদি দাদামহাশয় থাকিতেন!

আজকাল উদয়াদিত্যের মনে কেমন একটা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি প্রতাপাদিত্যকে অত্যন্ত ভয় করেন। আর সে পূর্বকার সাহস নাই। বিপদকে

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৫৭

তৃপ্তজ্ঞান করিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিতে এখন আর পারেন না। সকল কাজেই ইতস্তত করেন, সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হয়।

একদিন উদয়াদিত্য শুনিলেন, ছাপরার জমিদারের কাছারিতে রাজ্জিয়োগে নাট্যিয়াল পাঠাইয়া কাছারি লুট করিবার ও কাছারিতে আগুন লাগাইয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে কহিয়া অস্ত্রপূরে গেলেন। শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিক দেখিলেন। কী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অশ্রুমনস্ক হইয়া বেশ পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিলেন। ভৃত্য আসিয়া কহিল, “যুবরাজ, অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছে। কোথায় যাইতে হইবে?” যুবরাজ কিছুক্ষণ অশ্রুমনস্ক হইয়া ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ও অবশেষে কহিলেন, “কোথাও না। তুমি অশ্ব লইয়া যাও।”

একদিন এক ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইয়া উদয়াদিত্য বাহির হইয়া আসিলেন, দেখিলেন, রাজকর্মচারী এক প্রজাকে গাছে বাঁধিয়া মারিতেছে। প্রজা কাদিয়া যুবরাজের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “দোহাই যুবরাজ।” যুবরাজ তাহার যত্নগণা দেখিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আগে হইলে ফলাফল বিচার না করিয়া কর্মচারীকে বাধা দিতেন, প্রজাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেছে। তাহাদিগকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অর্থ সাহায্য করিতে যুবরাজের আর সাহস হয় না। যখনই তাহাদের কষ্টের কথা শুনে, তখনই মনে করেন, “আজই আমি টাকা পাঠাইয়া দিব।” তাহার পরেই ইতস্তত করিতে থাকেন, পাঠানো আর হয় না।

কেহ যেন না মনে করেন, উদয়াদিত্য প্রাণের ভয়ে এরাপ করিতেছেন। সম্প্রতি জীবনের প্রতি তাঁহার যে পূর্বাপেক্ষা বিশেষ আসক্তি জন্মিয়াছে তাহা নহে। তাঁহার মনে একটা অন্ধ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে তিনি যেন বহুসময় কী একটা মনে করেন। যেন উদয়াদিত্যের অদৃষ্ট, উদয়াদিত্যের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত প্রতাপাদিত্যের মুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। উদয়াদিত্য যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে অবস্থান করিতেছেন, তখনো যদি প্রতাপাদিত্য লুক্কায়িত করিয়া বাঁচিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে যেন তখনো তাঁহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিধবা রুক্মিণীর (মঙ্গলার) কিঞ্চিৎ নগদ টাকা আছে। সেই টাকা খাটাইয়া স্নান লইয়া সে জীবিকা নির্বাহ করে। রূপ এবং রূপা এই দুয়ের জোরে সে অনেককে বেশে রাখিয়াছে। সীতারাম শৌখিন লোক, অথচ ঘরে এক পরসার সংস্থান নাই, এইজন্য রুক্মিণীর রূপ ও রূপা উভয়ের প্রতিই তাহার আন্তরিক টান আছে। যেদিন ঘরে হাঁড়ি কাঁদিতেছে, সেদিন সীতারামকে দেখো, দিব্য নিশ্চিন্ত মুখে হাতে লাঠি লইয়া পাতলা চাদর উড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলিতেছে, মঙ্গলার বাড়ি যাইবে। পথে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, “কেমন হে সীতারাম, সংসার কেমন চলিতেছে?” সীতারাম তৎক্ষণাৎ অগ্নানবদনে বলে, “বেশ চলিতেছে। কাল আমাদের ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল।” সীতারামের বড়ো বড়ো কথাগুলো কিছুমাত্র কমে নাই, বরঞ্চ অবস্থা যতই মন্দ হইতেছে কথার পরিমাণ লম্বা ও চওড়ার দিকে ততই বাড়িতেছে। সীতারামের অবস্থা বড়ো মন্দ হইতে চলিল। সম্প্রতি এমন, হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পিসা তাঁহার অনারারি পিসা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মানস করিতেছেন।

আজ টাকার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, সীতারাম রুক্মিণীর বাড়িতে আসিয়াছে। হাসিয়া কাছে বৈষিয়া কহিল—

“ভিক্ষা যদি দিবে রাই,

(আমার) সোনা রূপার কাজ নাই,

(আমি) প্রাণের দায়ে এসেছি হে,

মান রতন ভিক্ষা চাই।

না ভাই, ছড়াটা ঠিক খাটিল না। মান রতনে আমার আপাতত তেমন আবশ্যক নাই, যদি আবশ্যক হয় পরে দেখা যাইবে, আপাতত কিঞ্চিৎ সোনা রূপা পাইলে কাজে লাগে।”

রুক্মিণী সহসা বিশেষ অমুরাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, “তা তোমার যদি আবশ্যক হইয়া থাকে তো তোমাকে দিব না তো কাহাকে দিব?”

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, “নাঃ—আবশ্যক এমনই কী। তবে কী জান ভাই, আমার মার কাছে টাকা থাকে, আমি নিজের হাতে টাকা রাখি না। আজ সকালে মা জোড়াঘাটার তাঁর জামাইয়ের বাড়ি গিয়াছেন। টাকা বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গেছেন। তা আমি কালই শোধ করিয়া দিব।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৫৯

মদলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, “তোমার অত তাড়াতাড়ি করিবার আবশ্যক কী? যখন সুবিধা হয় শোধ দিলেই হইবে। তোমার হাতে দিতেছি, এ তো আর জ্বলে ফেলিয়া দিতেছি না।” জ্বলে ফেলিয়া দিলেও বরঞ্চ পাইবার সম্ভাবনা আছে, সীতারামের হাতে দিলে সে সম্ভাবনাটুকুও নাই, এই প্রভেদ।

মদলার এইরূপ অমুরাগের লক্ষণ দেখিয়া সীতারামের ভালোবাসা একেবারে উল্লিয়া উঠিল। সীতারাম রসিকতা করিবার উত্তোগ করিল। বিনা টাকায় নবাবি করা ও বিনা হাশুরসে রসিকতা করা সীতারামের স্বভাবসিদ্ধ। সে যাহা মুখ আসে তাহাই বলে ও আর কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজেই হাসিতে থাকে। তাহার হাসি দেখিয়া হাসি পায়। সে যখন রাজবাড়ির প্রহরী ছিল, তখন অন্যান্য প্রহরীদের সহিত সীতারামের প্রায় মাঝে মাঝে দাদাহাদ্যমা বাধিবার উত্তোগ হইত, তাহার প্রধান কারণ, সীতারাম যাহাকে মজা মনে করিত আর সকলে তাহাকে মজা মনে করিত না। হুম্মানপ্রসাদ তেওয়ারি পাহারা দিতে দিতে ঢুলিতেছিল, সীতারাম আস্তে আস্তে তাহার পশ্চাতে গিয়া হঠাৎ পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙা রসিকতার জালায় তাহার পিঠ ও পিত্ত একসঙ্গে জলিয়া উঠিল। সীতারাম উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল, কিন্তু হুম্মানপ্রসাদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া কিলের সহিত হাশুরসের প্রভেদ ও করুণ রসের সম্বন্ধ উদাহরণ দ্বারা সীতারামকে অতিশয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। সীতারামের রসিকতার এমন আরো শত শত গল্প এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সীতারামের অমুরাগ সহসা উল্লিয়া উঠিল, সে কল্পিনীর কাছে যেখিয়া প্রীতিভরে কহিল, “তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ।”

কল্পিনী কহিল, “মব্ মিনসে। সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন!”

সীতারাম কহিল, “তাহা কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া।”

কল্পিনী হাসিতে লাগিল, সীতারাম বুক ফুলাইয়া কহিল, “না, তা হইবে না, হাসিলে হইবে না, জবাব দাও। সুভদ্রা যদি বোনই হইল তবে সুভদ্রাহরণ হইল কী করিয়া।”

সীতারামের বিশ্বাস যে, সে এমন প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে যে, ইহার উপরে আর কথা কহিবার জো নাই।

কল্পিনী অতি মিষ্টস্বরে কহিল, “দ্র মূখ।”

সীতারাম গলিয়া গিয়া কহিল, “মুখ ই তো বটে, তোমার কাছে আমি তো ভাই

হারিয়াই আছি, তোমার কাছে আমি চিরকাল মুখ।” সীতারাম মনে মনে ভাবিল, খুব জবাব দিয়াছি, বেশ কথা জোগাইয়াছে।

আবার কহিল, “আচ্ছা ভাই, কথাটা যদি তোমার পছন্দ না হইল, কী বলিয়া ডাকিলে তুমি খুশি হইবে, আমাকে বলো।”

রুক্মিণী হাসিয়া কহিল, “বলো প্রাণ।”

সীতারাম কহিল, “প্রাণ।”

রুক্মিণী কহিল, “বলো প্রিয়ে।”

সীতারাম কহিল, “প্রিয়ে।”

রুক্মিণী কহিল, “বলো প্রিয়তমে।”

সীতারাম কহিল, “প্রিয়তমে।”

রুক্মিণী কহিল, “বলো প্রাণপ্রিয়ে।”

সীতারাম কহিল, “প্রাণপ্রিয়ে। আচ্ছা ভাই প্রাণপ্রিয়ে, তুমি যে টাকাটা দিলে, তাহার সুদ কত লইবে?”

রুক্মিণী রাগ করিল, মুখ বাকাইয়া কহিল, “যাও যাও, এই বুঝি তোমার ভালোবাসা। সুদের কথা কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করিলে?”

সীতারাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, “না না, সে কি হয়? আমি কি ভাই সত্য বলিতেছিলাম? আমি যে ঠাট্টা করিতেছিলাম, এইটে আর বুঝিতে পারিলে না? ছি প্রিয়তমে।”

সীতারামের মায়ের কী রোগ হইল জানি না, আজকাল প্রায় মাঝে মাঝে সে জামাইবাড়ি যাইতে লাগিল ও টাকা বাহির করিয়া দিবার বিষয়ে তাহার স্বরণশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কাজেই সীতারামকে প্রায় মাঝে মাঝে রুক্মিণীর কাছে আসিতে হইত। আজকাল দেখা যায় সীতারাম ও রুক্মিণীতে মিলিয়া অতি গোপনে কী একটা বিষয় লইয়া পরামর্শ চলিতেছে। অনেকদিন পরামর্শের পর সীতারাম কহিল, “আমার ভাই অত কন্দী আসে না, এ-বিষয়ে ভাগবতের সাহায্য না লইলে চলিবে না।”

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত ঝড় হইতেছে। রাজবাড়ির ইতস্তত দুমদাম করিয়া দরজা পড়িতেছে। বাতাস এমন বেগে বহিতেছে যে, বাগানের বড়ো বড়ো গাছের শাখা হেলিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। বস্তার মুখে ভগ্ন চূর্ণ গ্রামপল্লীর মতো ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জন। উদয়াদিত্য চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছোটো একটি মেয়েকে কোলে

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৬১

ইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়াছেন। ঘর অন্ধকার। মেয়েটি কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরমা যখন বাঁচিয়া ছিল, এই মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালোবাসিত। সুরমার মৃত্যুর পর ইহার মা ইহাকে আর রাজবাড়িতে পাঠান নাই। অনেকদিনের পর সে আজ একবার রাজবাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সহসা উদয়াদিত্যকে দেখিয়া “কাকা” “কাকা” বলিয়া সে তাঁহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। উদয়াদিত্য তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার শয়নগৃহে লইয়া আসিয়াছেন। উদয়াদিত্যের মনের ভাব এই যে, সুরমা এই মেয়েটিকে যদি একবার দেখিতে আসে। ইহাকে যে সে বড়ো ভালোবাসিত। এত স্নেহের ছিল, সে কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে। মেয়েটি একবার জিজ্ঞাসা করিল, “কাকা, কাকীমা কোথায়?”

উদয়াদিত্য রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “একবার তাঁহাকে ডাক না।” মেয়েটি “কাকীমা” “কাকীমা” করিয়া ডাকিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের মনে হইল, ওই যেন কে সাড়া দিল। দূর হইতে ওই যেন কে বলিয়া উঠিল, “এই যাই রে।” যেন স্নেহের মেয়েটির করুণ আহ্বান শুনিয়া স্নেহময়ী আর থাকিতে পারিল না, তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে আসিতেছে। বালিকা কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। উদয়াদিত্য প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন। একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করিয়া অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া রহিলেন। বাহিরে হ হ করিয়া বাতাস বহিতেছে। ইতস্তত ঝট ঝট করিয়া শব্দ হইতেছে। ওই না পদশব্দ শুনা গেল? পদশব্দই বটে। বুক এমন দুড়দুড় করিতেছে যে, শব্দ ভালো শুনা যাইতেছে না। দ্বার খুলিয়া গেল, ঘরের মধ্যে দীপালোক প্রবেশ করিল। ইহাও কি কখনো সম্ভব। দীপ হস্তে চুপি চুপি ঘরে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল। উদয়াদিত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন, “সুরমা কি?” পাছে সুরমাকে দেখিলে সুরমা চলিয়া যায়। পাছে সুরমা না হয়।

রমণী প্রদীপ রাখিয়া কহিল, “কেন গা, আমাকে কি আর মনে পড়ে না।”

বজ্রধ্বনি শুনিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙিল। উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু চাহিলেন। মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া “কাকা” বলিয়া কাদিয়া উঠিল। তাহাকে বিছানার উপর কেলিয়া উদয়াদিত্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কী করিবেন কোথায় যাইবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। ক্লান্তি কাছে আসিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, “বলি, এখন তো মনে পড়িবেই না। তবে এককালে কেন আশা দিয়া আকাশে তুলিয়াছিলে?” উদয়াদিত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুতেই কথা কহিতে পারিলেন না।

তখন রুক্মিণী তাহার ব্রহ্মাঙ্গ বাহির করিল। কাঁদিয়া কহিল, “আমি তোমার কী দোষ করিয়াছি, যাহাতে তোমার চক্ষুশূল হইলাম। তুমিই তো আমার সর্বনাশ করিয়াছ। যে রমণী যুবরাজকে একদিন দেহপ্রাণ বিকাইয়াছে সে আজ ভিখারিনীর মতো পথে পথে বেড়াইতেছে। এ পোড়া কপালে বিধাতা কি এই লিখিয়াছিল?”

এইবার উদয়াদিত্যের প্রাণে গিয়া আঘাত লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল আমিই বুঝি ইহার সর্বনাশ করিয়াছি। অতীতের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কী করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, প্রতিদিন তাঁহার পথের সম্মুখে জাল পাতিয়া বসিয়া ছিল, আবর্তের মতো তাঁহাকে তাহার দুই মোহময় বাঁহ দিয়া বেঁটন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মুহূর্তের মধ্যে পাতালের অন্ধকারে নিষ্কম্প করিয়াছিল—সে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। দেখিলেন রুক্মিণীর বসন মলিন, ছিন্ন। রুক্মিণী কাঁদিতেছে। করুণহৃদয় উদয়াদিত্য কহিলেন, “তোমার কী চাই?”

রুক্মিণী কহিল, “আমার আর কিছু চাই না, আমার ভালোবাসা চাই। আমি ওই বাতাসনে বসিয়া তোমার বুকে মুখ রাখিয়া তোমার সোহাগ পাইতে চাই। কেন গা, সুরমার চেয়ে কি এ মুখ কালো? যদি কালোই হইয়া থাকে তো সে তোমার জগুই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া। আগে তো কালো ছিল না!”

এই বলিয়া রুক্মিণী উদয়াদিত্যের শয্যার উপর বসিতে গেল। উদয়াদিত্য আর থাকিতে পারিলেন না। কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ও বিছানায় বসিয়ে না, বসিয়ে না।”

রুক্মিণী আহত ফণিনীর মতো মাথা তুলিয়া বলিল, “কেন বসিব না?”

উদয়াদিত্য তাহার পথ রোধ করিয়া কহিলেন, “না, ও-বিছানার কাছে তুমি যাইয়ো না। তুমি কী চাও আমি এখনই দিতেছি।”

রুক্মিণী কহিল, “আচ্ছা তোমার আঙুলের ওই আংটিটা দাও।”

উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে আংটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রুক্মিণী কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। মনে ভাবিল ডাকিনীর মস্তমোহ এখনো দূর হয় নাই, আরো কিছুদিন যাক, তাহার পর আমার মস্ত্র খাটিবে। রুক্মিণী চলিয়া গেলে উদয়াদিত্য শয্যার উপরে আসিয়া পড়িলেন। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, “কোথায় সুরমা কোথায়। আজ আমার এ দম্ব বজ্রাহত হৃদয়ে শান্তি দিবে কে?”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৬৩

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভাগবতের অবস্থা বড়ো ভালো নহে। সে চুপচাপ বসিয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত তামাক ফুঁকিতেছে। ভাগবত যখন মনোযোগের সহিত তামাক ফুঁকিতে থাকে, তখন প্রতিবেশীদের আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়। কারণ, তাহার মুখ দিয়া কালো কালো ধোয়া পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে, তাহার মনের মধ্যেও তেমনি একটা কুম্ভবর্ণ পাকচক্রেয় কারখানা চলিতে থাকে। কিন্তু ভাগবত লোকটা বড়ো ধর্মনিষ্ঠ। সে কাহারও সঙ্গে মেশে না এই যা তাহার দোষ, হরিনামের মালা লইয়া থাকে, অধিক কথা কয় না, পরচর্চায় থাকে না। কিন্তু কেহ যখন ঘোরতর বিপদে পড়ে, তখন ভাগবতের মতো পাকা পরামর্শ দিতে আর কেহ পারে না। ভাগবত কখনো ইচ্ছা করিয়া পরের অনিষ্ট করে না, কিন্তু আর কেহ যদি তাহার অনিষ্ট করে, তবে ভাগবত ইহজন্মে তাহা কখনো ভোলে না, তাহার শোধ তুলিয়া তবে সে হঁকা নামাইয়া রাখে। এক কথায়, সংসারে যাহাকে ভালো বলে, ভাগবত তাহাই। পাড়ার লোকেরাও তাহাকে মান্ত করে, দূরবস্থায় ভাগবত খার করিয়াছিল, কিন্তু ষটিবাটি বেচিয়া তাহা শোধ করিয়াছে।

একদিন সকালে সীতারাম আসিয়া ভাগবতকে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা, কেমন আছ হে?”

ভাগবত কহিল, “ভালো না।”

সীতারাম কহিল, “কেন বলো দেখি?”

ভাগবত কিয়ৎক্ষণ তামাক টানিয়া সীতারামের হাতে হঁকা দিয়া কহিল, “বড়ো টানাটানি পড়িয়াছে।”

সীতারাম কহিল, “বটে? তা কেমন করিয়া হইল?”

ভাগবত মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিল, “কেমন করিয়া হইল? তোমাকেও তাহা বলিতে হইবে নাকি? আমি তো জানিতাম আমারও যে দশা তোমারও সে দশা।”

সীতারাম কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, “না হে, আমি সে-কথা কহিতেছি না, আমি বলিতেছি তুমি খার কর না কেন?”

ভাগবত কহিল, “খার করিলে তো শুধিতে হইবে। শুধিব কী দিয়া? বিক্রি করিবার ও বাঁধা দিবার জিনিস বড়ো অধিক নাই।”

সীতারাম সগর্বে কহিল, “তোমার কত টাকা খার চাই, আমি দিব।”

ভাগবত কহিল, “বটে ? তা এতই যদি তোমার টাকা হইয়া থাকে যে, এক মুঠা জলে ফেলিয়া দিলেও কিছু না আসে যায়, তা হইলে আমাকে গোটা দশেক দিয়া ফেলো। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, আমার শুধিবার শক্তি নাই।”

সীতারাম কহিল, “সেজ্ঞে দাদা, তোমাকে ভাবিতে হইবে না।”

সীতারামের কাছে এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির আশা পাইয়া ভাগবত বন্ধুতার উচ্ছ্বাসে যে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। আর-এক ছিলিম তামাক সাজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল।

সীতারাম আস্তে আস্তে কথা পাড়িল, “দাদা, রাজার অগ্রায় বিচারে আমাদের তো অন্ন মারা গেল।”

ভাগবত কহিল, “কই তোমার ভাবে তো তাহা বোধ হইল না !” সীতারামের বদান্ধতা ভাগবতের বড়ো সহ্য হয় নাই, মনে মনে কিছু চটিয়াছিল।

সীতারাম কহিল, “না ভাই, কথার কথা বলিতেছি ! আজ না যায় তো দশ দিন পরে তো যাইবে।”

ভাগবত কহিল, “তা রাজা যদি অগ্রায় বিচার করেন তো আমরা কী করিতে পারি।”

সীতারাম কহিল, “আহা যুবরাজ যখন রাজা হইবে, তখন যশোরে রামরাজ্য হইবে, ততদিন যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি।”

ভাগবত চটিয়া গিয়া কহিল, “ও-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই ? তুমি বড়ো-মাছুষ লোক, তুমি নিজের ঘরে বসিয়া রাজা-উজির মার, সে শোভা পায়। আমি গরিব মাছুষ, আমার অতটা ওরসা হয় না।”

সীতারাম কহিল, “রাগ কর কেন দাদা ? কথাটা মন দিয়া শোনই না কেন ?” বলিয়া চুপি চুপি কী বলিতে লাগিল।

ভাগবত মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “দেখো সীতারাম, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আমার কাছে অমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।”

সীতারাম সেদিন তো চলিয়া গেল। ভাগবত ভারি মনোযোগ দিয়া সমস্ত দিন কী একটা ভাবিতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালবেলায় সে নিজে সীতারামের কাছে গেল। সীতারামকে কহিল, “কাল যে-কথাটা বলিয়াছিলে বড়ো পাকা কথা বলিয়াছিলে।”

সীতারাম গর্বিত হইয়া উঠিয়া কহিল, “কেমন দাদা, বলি নাই !”

ভাগবত কহিল, “আজ সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৬৫

সীতারাম আরো গর্বিত হইয়া উঠিল। কয়দিন ধরিয়া ক্রমিক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল তাহা এই, একটা জাল দরখাস্ত লিখিতে হইবে, যেন যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের নামে সম্রাট-বিশ্বোহিতার অভিযোগ করিয়া নিজে রাজ্য পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতেছেন। তাহাতে যুবরাজের সীলমোহর মুদ্রিত থাকিবে। রুশ্বিনী যে আংটি লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে যুবরাজের নাম-মুদ্রাঙ্কিত সীল আছে, অতএব কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছে।

পরামর্শমতো কাজ হইল। একখানা জাল দরখাস্ত লেখা হইল, তাহাতে যুবরাজের নাম মুদ্রিত রহিল। নির্বোধ সীতারামের উপর নির্ভর করা যায় না, অতএব স্থির হইল, ভাগবত নিজে দরখাস্ত লইয়া দিল্লীধ্বজের হস্তে সমর্পণ করিবে।

ভাগবত সেই দরখাস্তখানি লইয়া দিল্লির দিকে না গিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। মহারাজকে কহিল, “উদয়াদিত্যের এক ভৃত্য এই দরখাস্তটি লইয়া দিল্লির দিকে যাইতেছিল, আমি কোনো সূত্রে জানিতে পারি। ভৃত্যটা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেছে দরখাস্তটি লইয়া আমি মহারাজের নিকট আসিতেছি।” ভাগবত সীতারামের নাম করে নাই। দরখাস্ত পাঠ করিয়া প্রতাপাদিত্যের কী অবস্থা হইল তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না। ভাগবতের পুনর্বীর রাজবাড়িতে ঢাকরি হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বিভার প্রাণের মধ্যে আঁধার করিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে কী যেন একটা মর্মভেদী দুঃখ, একটা মরুস্রী নিরাশা, জীবনের সমস্ত সুখের জলাঞ্জলি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, প্রতিমুহূর্তে তাহার কাছে কাছে সরিয়া আসিতেছে। সেই যে জীবনশূন্যকারী চরাচরগ্রাসী শুষ্ক সীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা, তাহারই একটা ছায়া আসিয়া যেন বিভার প্রাণের মধ্যে পড়িয়াছে। বিভার মনের ভিতরে কেমন করিতেছে। বিভা বিছানায় একেলা পড়িয়া আছে। এ-সময়ে বিভার কাছে কেহ নাই। বিভা নিখাস ফেলিয়া বিভা কাঁদিয়া বিভা আকুল হইয়া কহিল, “আমাকে কি তবে পরিত্যাগ করিলে? আমি তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছি?” কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, “আমি কী অপরাধ করিয়াছি?” দুটি হাতে মুখ গুপিয়া বালিশ বুকে লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার করিয়া কহিল, “আমি কী

করিয়াছি? একখানি পত্র না, একটি লোকও আসিল না, কাহারও মুখে সংবাদ শুনিতে পাই না। আমি কী করিব? বুক ফাটিয়া ছটকট করিয়া সমস্ত দিন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কেহ তোমার সংবাদ বলে না, কাহারও মুখে তোমার নাম শুনিতে পাই না। মা গো মা, দিন কী করিয়া কাটিবে।” এমন কত দিন গেল। এমন কত মধ্যাহ্নে কত অপরাহ্নে কত রাত্রে সঙ্গিহীন বিভা রাজবাড়ির শূন্য ঘরে ঘরে একখানি শীর্ণ ছায়ার মতো ঘুরিয়া বেড়ায়।

এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে রামমোহন আসিয়া “মা গো জয় হোক” বলিয়া প্রণাম করিল, বিভা এমনই চমকিয়া উঠিল, যেন তাহার মাথায় একটা মূখের বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইল। সে সচকিত হইয়া কহিল, “মোহন, তুই এলি!”

“হাঁ মা, দেখিলাম, মা আমাদের ভুলিয়া গেছেন, তাঁহাকে একবার স্মরণ করাইয়া আসি।”

বিভা কত কী জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল কিন্তু লজ্জায় পারিল না—বলে বলে করিয়া হইয়া উঠিল না, অথচ শুনিলার জন্ত প্রাণটা আকুল হইয়া রহিল।

রামমোহন বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “কেন মা, তোমার মুখখানি এমন মলিন কেন? তোমার চোখে কালি পড়িয়াছে। মুখে হাসি নাই। চুল রুক্ষ। এস মা, আমাদের ঘরে এস। এখানে বুঝি তোমাকে যত্ন করিবার কেহ নাই!”

বিভা স্নান হাসি হাসিল, কিছু কহিল না। হাসিতে হাসিতে হাসি আর রহিল না। দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—শীর্ণ বিবর্ণ দুটি কপোল প্রাবিত করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অশ্রু আর থামে না। বহুদিন অনাদরের পর একটু আদর পাইলে যে অভিমান উৎখলিয়া উঠে, বিভা সেই অতিকোমল মৃদু অনন্তপ্রীতিপূর্ণ অভিমানে কাঁদিয়া কেলিল। মনে মনে কহিল, “এতদিন পরে কি আমাকে মনে পড়িল?”

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না, তাহার চোখে জল আসিল, কহিল, “এ কী অলক্ষণ। মা লক্ষী, তুমি হাসিমুখে আমাদের ঘরে এস। আজ শুভদিনে চোখের জল মোছো।”

মহিবীর মনে মনে ভয় ছিল, পাছে জামাই তাঁর মেয়েকে গ্রহণ না করে। রামমোহন বিভাকে লইতে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি রামমোহনকে ডাকাইয়া জামাইবাড়ির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ যত্নে রামমোহনকে আহ্বান করাইলেন, রামমোহনের গল্প শুনিলেন, আনন্দে দিন কাটিল।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৬৭

কাল যাত্রার দিন ভালো, কাল প্রভাতেই বিভাকে পাঠাইবেন স্থির হইল। প্রতাপাদিত্য এ-বিষয়ে আর কিছু আপত্তি করিলেন না।

যাত্রার যখন সমস্তই স্থির হইয়া গেছে, তখন বিভা একবার উদয়াদিত্যের কাছে গেল। উদয়াদিত্য একাকী বসিয়া কী একটা ভাবিতেছিলেন।

বিভাকে দেখিয়া সহসা ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিলেন “বিভা, তবে তুই চলিলি? তা ভালোই হইল। তুই সুখে থাকিতে পারিবি। আশীর্বাদ করি লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়া স্বামীর ঘর উজ্জ্বল করিয়া থাক।”

বিভা উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া কাদিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, বিভার মাথায় হাত দিয়া তিনি কহিলেন, “কেন কাদিতেছিস? এখানে তোরা কী সুখ ছিল বিভা, চারিদিকে কেবল দুঃখ কষ্ট শোক। এ কারাগার হইতে পালাইলি—তুই ঠাচিলি।”

বিভা যখন উঠিল, তখন উদয়াদিত্য কহিলেন, “যাইতেছিস? তবে আয়। স্বামীগৃহে গিয়া আমাদের একেবারে ঘেন ভুলিয়া যাসনে। এক-একবার মনে করিস, মাঝে মাঝে ঘেন সংবাদ পাই।”

বিভা রামমোহনের কাছে গিয়া কহিল, “এখন আমি যাইতে পারিব না।”

রামমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল, “সে কী কথা মা।”

বিভা কহিল, “না, আমি যাইতে পারিব না। দাদাকে আমি এখন একলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমা হইতেই তাঁহার এত কষ্ট এত দুঃখ, আর আমি আজ তাঁহাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া সুখ ভোগ করিতে মাইব? যতদিন তাঁহার মনে তিলমাত্র কষ্ট থাকিবে, ততদিন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। এখানে আমার মতো তাঁহাকে কে যত্ন করিবে?” বলিয়া বিভা কাদিয়া চলিয়া গেল।

অন্তঃপুরে একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। মহিষী আসিয়া বিভাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহাকে অনেক ভয় দেখাইলেন, অনেক পরামর্শ দিলেন। বিভা কেবল কহিল, “না মা, আমি পারিব না।”

মহিষী রোষে বিরক্তিতে কাদিয়া কহিলেন, “এমন মেয়েও তো কোথাও দেখি নাই।” তিনি মহারাজের কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। মহারাজ প্রশান্তভাবে কহিলেন, “তা বেশ তো, বিভার যদি ইচ্ছা না হয় তো কেন যাইবে?”

মহিষী অবাক হইয়া, হাত উল্টাইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, “তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই করো, আমি আর কোনো কথাই থাকিব না।”

উদয়াদিত্য সমস্ত গুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বিভাকে আসিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন। বিভা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, ভালো বুঝিল না।

হতাশ্বাস রামমোহন আসিয়া স্নানমুখে কহিল, “মা, তবে চলিলাম। মহারাজকে গিয়া কী বলিব?”

বিভা কিছু বলিতে পারিল না, অনেকক্ষণ নিরুন্তর হইয়া রহিল।

রামমোহন কহিল, “তবে বিদায় হই মা।” বলিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল।

বিভা একেবারে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাতর স্বরে ডাকিল, “মোহন।”

মোহন কিরিয়া আসিয়া কহিল, “কী মা?”

বিভা কহিল, “মহারাজকে বলিয়ে, আমাকে যেন মার্জনা করেন। তিনি স্বয়ং ডাকিতেছেন, তবু আমি যাইতে পারিলাম না, সে কেবল নিতান্তই আমার দুর্দৃষ্ট।”

রামমোহন শুষ্কভাবে কহিল, “যে আজ্ঞা।”

রামমোহন আবার প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল। বিভা দেখিল, রামমোহন বিভার ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই তাহার ভারি গোলমাল ঠেকিয়াছে। একে তো বিভার প্রাণ যেখানে যাইতে চায়, বিভা সেখানে যাইতে পারিল না। তাহার উপর রামমোহন, যাহাকে সে ষষ্ঠার্থ স্নেহ করে, সে আজ রাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিভার প্রাণে যাহা হইল তাহা বিভাই জানে।

বিভা রহিল। চোখের জল মুছিয়া প্রাণের মধ্যে পাষাণভার বহিয়া সে তাহার দাদার কাছে পড়িয়া রহিল। স্নান শীর্ণ একখানি ছায়ার মতো সে নীরবে সমস্ত ঘরের কাজ করে। উদয়াদিত্য স্নেহ করিয়া আদর করিয়া কোনো কথা কহিলে চোখ নিচু করিয়া একটুখানি হাসে। সন্ধ্যাবেলায় উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে বসিয়া একটু কথা কহিতে চেষ্টা করে। যখন মহিষী তিরস্কার করিয়া কিছু বলেন, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে ও অবশেষে একখণ্ড মলিন মেঘের মতো ভাসিয়া চলিয়া যায়। যখন কেহ বিভার চিবুক ধরিয়া বলে, “বিভা, তুই এত রোগা হইতেছিস কেন?” বিভা কিছু বলে না, কেবল একটু হাসে।

এই সময়ে ভাগবত পূর্বোক্ত জাল দরখাস্তটি লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দেখায়, প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া উঠিলেন, পরে অনেক বিবেচনা করিয়া উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ, যুবরাজ যে এ কাজ করিয়াছেন, ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস হয় না। যে শোনে সেই জিভ কাটিয়া বলে, ও-কথা কানে আনিতে নাই। যুবরাজ এ কাজ করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৬৯

নহে।” প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আমারও তো বড়ো একটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কারাগারে থাকিতে দোষ কী? সেখানে কোনোপ্রকার কষ্ট না দিলেই হইল। কেবল গোপনে কিছু না করিতে পারে, তাহার জন্ত পাহারা নিযুক্ত থাকিবে।”

চতুবিংশ পরিচ্ছেদ

যখন রামমোহন চন্দ্রবীপে কিরিয়া গিয়া একাকী জোড়হস্তে অপরাধীর মতো রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তখন রামচন্দ্র রায়ের সর্বদ্ব জলিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন বিভা আসিলে পর তাহাকে প্রতাপাদিত্য ও তাহার বংশ সম্বন্ধে খুব দু-চারিটা খরধার কথা শুনাইয়া তাঁহার শব্দের উপর শোধ তুলিবেন। কী কী কথা বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন, কখন বলিবেন, সমস্ত তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রায় গৌয়ার নহেন, বিভাকে যে কোনোপ্রকারে পীড়ন করিবেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কেবল বিভাকে তাহার পিতার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খুব লজ্জা দিবেন এই আনন্দেই তিনি অধীর ছিলেন। এমন কি এই আনন্দের প্রভাবে তাঁহার মনেই হয় নাই যে, বিভার আসিবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিতে পারে। এমন সময়ে রামমোহনকে একাকী আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র রায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “কী হইল, রামমোহন?”

রামমোহন কহিল, “সকলই নিষ্ফল হইয়াছে।”

রাজা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, “আনিতে পারিলি না?”

রামমোহন। “আজ্ঞা না মহারাজ! কুলয়ে যাত্রা করিয়াছিলাম।”

রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বেটা তোকে যাত্রা করিতে কে বলিয়াছিল? তখন তোকে বার বার করিয়া বারণ করিলাম, তখন যে তুই বুক ফুলাইয়া গেলি, আর আজ—”

রামমোহন কপালে হাত দিয়া স্নানমুখে কহিল, “মহারাজ, আমার অদৃষ্টের দোষ।”

রামচন্দ্র রায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “রামচন্দ্র রায়ের অপমান! তুই বেটা আমার নাম করিয়া ভিক্ষা চাহিতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিল না। এত বড়ো অপমান আমাদের বংশে আর কখনো হয় নাই।”

তখন রামমোহন নতশির তুলিয়া ঈষৎ গর্বিতভাবে কহিল, “ও-কথা বলিবেন না। প্রতাপাদিত্য যদি না দিত, আমি কাড়িয়া আনিতাম। আপনার কাছে তাহা তো বলিয়াই গিয়াছিলাম। মহারাজ, যখন আপনার আদেশ পালন করিতে যাই, তখন কি আর প্রতাপাদিত্যকে ভয় করি? প্রতাপাদিত্য রাজা বটে, কিন্তু আমার রাজা তো সে নয়।”

রাজা কহিলেন, “তবে হইল না কেন?”

রামমোহন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার চোখে জল দেখা দিল।

রাজা অধীর হইয়া কহিলেন, “রামমোহন, শীঘ্র বল।”

রামমোহন জোড়হাতে কহিল, “মহারাজ—”

রাজা কহিলেন, “কী বল।”

রামমোহন। “মহারাজ, মা-ঠাক্করন আসিতে চাহিলেন না।” বলিয়া রামমোহনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বুঝি এ সম্বন্ধের অভিমানের অশ্রু। বোধ করি এ অশ্রুজলের অর্থ—“মায়ের প্রতি আমার এত বিশ্বাস ছিল যে, সেই বিশ্বাসের জোরে আমি বুক ফুলাইয়া আনন্দ করিয়া মাকে আনিতে গেলাম আর মা আসিলেন না, মা আমার সম্মান রাখিলেন না।” কী জানি কী মনে করিয়া বুদ্ধ রামমোহন চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

রাজা কথাটা শুনিয়াই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বটে।” অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার আর বাক্যস্মৃতি হইল না।

“আসিতে চাহিলেন না বটে! বোটা, তুই বেরো, বেরো, আমার সমুখ হইতে এখনই বেরো।”

রামমোহন একটি কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, অতএব সমুচিত দণ্ড পাওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে।

রাজা কী করিয়া যে ইহার শোধ তুলিবেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। প্রতাপাদিত্যের কিছু করিতে পারিবেন না, বিভাকেও হাতের কাছে পাইতেছেন না। রামচন্দ্র রায় অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিন-দুয়েকের মধ্যে সংবাদটা নানা আকারে নানা দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, প্রতিশোধ না লইলে আর মুখ রক্ষা হয় না। এমন কি, প্রজারা পর্যন্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহার কহিল, “আমাদের মহারাজার অপমান!” অপমানটা যেন সকলের গায়ে লাগিয়াছে। একে তো প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রামচন্দ্র রায়ের মনে স্বভাবতই বলবান আছে, তাহার উপরে

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৭১

ঠাহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিহিংসা না লইলে প্রজারা কী মনে করিবে, ভৃত্যেরা কী মনে করিবে, রমাই ভাঁড় কী মনে করিবে? তিনি যখন কল্পনায় মনে করেন, এই কথা লইয়া রমাই আর-একজন ব্যক্তির কাছে হাসি-টিটকারি করিতেছে তখন তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

এক দিন সভায় মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন, “মহারাজ, আপনি আর-একটি বিবাহ করুন।”

রমাই ভাঁড় কহিল, “আর প্রতাপাদিত্যের মেয়ে তাহার ভাইকে লইয়া থাকুক।”

রাজা রমাইয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, “ঠিক বলিয়াছ রমাই।” রাজাকে হাসিতে দেখিয়া সকল সভাসদই হাসিতে লাগিল। কেবল কর্ণাণ্ডিজ বিরক্ত হইল, সে হাসিল না। রামচন্দ্র রায়ের মতো লোকেরা সম্ভ্রম রক্ষার জন্ত সততই ব্যস্ত, কিন্তু সম্ভ্রম কাহাকে বলে ও কী করিয়া সম্ভ্রম রাখিতে হয় সে জ্ঞান তাহাদের নাই।

দেওয়ানজি কহিলেন, “মন্ত্রীমহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যকে ও ঠাহার কন্যাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইবে।”

রমাই ভাঁড় কহিল, “এ শুভকার্যে আপনার বর্তমান শ্বশুরমহাশয়কে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতে ভুলিবেন না, নহিলে কী জানি তিনি মনে দুঃখ করিতে পারেন।” বলিয়া রমাই চোখ টিপিল। সভাস্থ সকলে হাসিতে লাগিল। যাহারা ঘুরে বসিয়াছিল, কথাটা শুনিতে পায় নাই; তাহারাও না হাসিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না।

রমাই কহিল, “বরণ করিবার নিমিত্ত এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়ীঠাকরুনকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। আর মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একখাল মিষ্টান্ন পাঠাইবেন, তখন তাহার সঙ্গে দুটো কাঁচা রস্তা পাঠাইয়া দিবেন।”

রাজা হাসিয়া অস্থির হইলেন। সভাসদেরা মুখে চাদর দিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিতে লাগিল। কর্ণাণ্ডিজ অলক্ষিতভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেওয়ানজি একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, “মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে, তাহা হইলে তো যশোহরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হইয়া যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর মিষ্টান্ন খাইবার উপযুক্ত লোক থাকে না।”

কথাটা শুনিয়া কাহারও হাসি পাইল না। রাজা চুপ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন, সভাসদেরা গম্ভীর হইয়া রহিল, রমাই দেওয়ানের দিকে একবার অবাক

হইয়া চাহিল, এমন কি, এক জন অমাত্য বিষয় ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “সে কী কথা দেওয়ানজি মহাশয়? রাজার বিবাহে মিষ্টানের বন্দোবস্ত কি এত কম হইবে?” দেওয়ানজি মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

বিবাহের কথা সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যকে যেখানে রুদ্ধ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত কারাগার নহে; তাহা প্রাসাদসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা। বাটীর ঠিক ডানপাশেই এক রাজপথ ও তাহার পূর্বদিকে প্রশস্ত এক প্রাচীর আছে, তাহার উপর প্রহরীরা পায়চারি করিয়া পাহারা দিতেছে। ঘরেতে একটি অতি ক্ষুদ্র জানালা কাটা। তাহার মধ্য দিয়া খানিকটা আকাশ, একটা বাঁশঝাড় ও একটি শিবমন্দির দেখা যায়। উদয়াদিত্য প্রথম যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জানালার কাছে মুখ রাখিয়া ভূমিতে গিয়া বসিলেন। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দৈবাৎ দুই-একজন পথিক চলিতেছে, ছপ ছপ করিয়া তাহাদের পায়ের শব্দ হইতেছে। পূর্বদিক হইতে, কারাগারের হৃৎস্পন্দন ধনীর মতো প্রহরীদের পদশব্দ অনবরত কানে আসিতেছে। এক-এক প্রহর অতীত হইতে লাগিল, দূর হইতে এক-একটা হাঁক শুনা বাইতেছে। আকাশে একটিমাত্র তারা নাই। যে বাঁশঝাড়ের দিকে উদয়াদিত্য চাহিয়া আছেন তাহা জোনাকিতে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে-রাত্রে উদয়াদিত্য আর শয়ন করিলেন না, জানালার কাছে বসিয়া প্রহরীদের অবিরাম পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন।

বিভা আজ সন্ধ্যাবেলায় একবার অন্তঃপুরের বাগানে গিয়াছে। প্রাসাদে বোধ করি অনেক লোক। চারিদিকে দাসদাসী, চারিদিকেই পিসি মাসি, কথায় কথায় “কী হইয়াছে, কী বৃত্তান্ত” জিজ্ঞাসা করে, প্রতি অশ্রুবিন্দুর হিসাব দিতে হয়, প্রতি দীর্ঘনিশ্বাসের বিস্তৃত ভাষ্য ও সমালোচনা বাহির হইতে থাকে। বিভা বুঝি আর পারে নাই, ছুটিয়া বাগানে আসিয়াছে। সূর্য আজ মেঘের মধ্যেই উঠিয়াছে, মেঘের মধ্যেই অস্ত গেল। কখন যে দিনের অবসান হইল ও সন্ধ্যার আরম্ভ হইল বুঝা গেল না। বিকালের দিকে পশ্চিমের মুখে একটুখানি সোনার রেখা ফুটিয়াছিল, কিন্তু দিন শেষ হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। আধারের উপর আধার ঘনাইতে লাগিল। দিগন্ত হইতে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘনশ্রেণী বাউগাছগুলির মাথার উপর

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৭৩

অন্ধকার এমনি করিয়া জমিয়া আসিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান আর দেখা গেল না, ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীর্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত নিস্তব্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে। রাত হইতে লাগিল, রাজবাড়ির প্রদীপ একে একে নিবিয়া গেল। বিভা বাউগাছের তলায় বসিয়া আছে। বিভা স্বভাবতই ভীক, কিন্তু আজ তাহার ভয় নাই। কেবল যতই আধার বাড়িতেছে, ততই তাহার মনে হইতেছে যেন পৃথিবীকে কে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতেছে, যেন সুখ হইতে শাস্তি হইতে জগৎ-সংসারের উপকূল হইতে কে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, অতলস্পর্শ অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে সে পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমেই ডুবিতেছে, ক্রমেই নামিতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার ক্রমেই বাড়িতেছে, পদতলে ভূমি নাই; চারিদিকে কিছুই নাই। আশ্রয় উপকূল জগৎ-সংসার ক্রমেই দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন একটু একটু করিয়া তাহার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আকাশের দিকে উঠিতেছে। তাহার ওপারে কত কী পড়িয়া রহিল। প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল। যেন ওপারে সকলই দেখা যাইতেছে; সেখানকার স্বর্গালোক, খেলাধুলা, উৎসব সকলই দেখা যাইতেছে; কে যেন নিষ্ঠুরভাবে, কঠোর হস্তে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার কাছে বুকের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে যেন সেদিকে যাইতে দিবে না। বিভা যেন আজ দিব্যচক্ষু পাইয়াছে; এই চরাচরব্যাপী ঘনঘোর অন্ধকারের উপর বিধাতা যেন বিভার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন, অনন্ত জগৎ-সংসারে একাকী বসিয়া বিভা যেন তাহাই পাঠ করিতেছে; তাই তাহার চক্ষে জল নাই, দেহ নিম্পন্দ, নেত্র নির্নিমেষ। রাত্রি দুই প্রহরের পর একটা বাতাস উঠিল, অন্ধকারে গাছপালাগুলি হা হা করিয়া উঠিল। বাতাস অতিদূরে হু হু করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বিভার মনে হইতে লাগিল, যেন দূর দূর দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের স্নেহের প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা বিভাকে ডাকিতেছে, তাহারা কোলে আসিতে চায়, সম্মুখে তাহারা পথ দেখিতে পাইতেছে না, যেন তাহাদের ক্রন্দন এই শত যোজন লক্ষ যোজন গাঢ় স্তব্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিভার কানে আসিয়া পৌঁছিল। বিভার প্রাণ যেন কাতর হইয়া কহিল, “কে রে, তোরা কে, তোরা কে কাঁদিতেছিস, তোরা কোথায়।” বিভা মনে মনে যেন এই লক্ষ যোজন অন্ধকারের পথে একাকী যাত্রা করিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া যেন অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিল, পথ শেষ হইল না, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল সেই বায়ুহীন শব্দহীন দিনরাত্রিহীন জনশূন্য তারাশূন্য

দিগ্দিগন্তশূন্য মহাশঙ্করের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে চারিদিক হইতে জন্মন
শুনিতে পাইল, কেবল বাতাস দূর হইতে করিতে লাগিল হু হু !

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন বিভা কারাগারে উদয়াদিত্যের
নিকট যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল, সেখানে তাহার যাওয়া নিষেধ। সমস্ত
দিন ধরিয়া অনেক কঁাদাকাটি করিল। এমন কি স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল
বিভা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। অনেক কষ্টে সম্মতি পাইল। পরদিন প্রভাত
হইতে না হইতেই বিভা শয্যা হইতে উঠিয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখিল,
উদয়াদিত্য বিছানায় শোন নাই। ভূমিতলে বসিয়া বাতায়নের উপরে মাথা দিয়া
ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দেখিয়া বিভার প্রাণ ঘেন বুক ফাটিয়া কঁাদিয়া উঠিতে চাহিল।
অনেক কষ্টে রোদন সংবরণ করিল। অতি ধীরে নিঃশব্দে উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া
বসিল। ক্রমে প্রভাত পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিকটের বন হইতে পাখিয়া গাহিয়া
উঠিল। পাণের রাজপথ হইতে পাখেরা গান গাহিয়া উঠিল, দুই-একটি রাত্রি-
জাগরণে ক্লান্ত গ্রহরী আলো দেখিয়া মুহূর্ত্তে গান গাহিতে লাগিল। নিকটস্থ মন্দির
হইতে শাখ-শব্দটার শব্দ উঠিল। উদয়াদিত্য সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন।
বিভাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “এ কী বিভা, এত সকালে যে ?” ঘরের
চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, “এ কী, আমি কোথায় ?” মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে
পড়িল, তিনি কোথায়। বিভার দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “আঃ
বিভা, তুই আসিয়াছিস ? কাল তোকে সমস্তদিন দেখি নাই, মনে হইয়াছিল বুঝি
তোদের আর দেখিতে পাইব না।”

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, “দাদা, মাটিতে বসিয়া
কেন ? খাটে বিছানা পাতা রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, একবারও ভূমি
খাটে বস নাই। এ দুদিন কি তবে ভূমিতেই আসন করিয়াছ ?” বলিয়া বিভা
কঁাদিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, “খাটে বসিলে আমি যে আকাশ দেখিতে পাই
না বিভা। জানলার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখিদের উড়িতে
দেখি, তখন মনে হয়, আমারও একদিন খাঁচা ভাঙিবে, আমিও একদিন ওই পাখিদের
মতো ওই অনন্ত আকাশে প্রাণের সাথে সঁতার দিয়া বেড়াইব। এ জানালা হইতে
যখন সরিয়া যাই, তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখি, তখন ভুলিয়া যাই যে, আমার
একদিন মুক্তি হইবে, একদিন নিষ্কৃতি হইবে, মনে হয় না জীবনের বেড়ি একদিন
ভাঙিয়া যাইবে, এ কারাগার হইতে এক দিন খালাস পাইব। বিভা, এ কারাগারের

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৭৫

মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে, আমি স্বভাবতই স্বাধীন ; কোনো রাজা-মহারাজা আমাকে বন্দী করিতে পারে না। আর ওইখানে ওই ঘরের মধ্যে ওই কোমল শয্যা, ওইখানেই আমার কারাগার।”

আজ বিভাকে সহসা দেখিয়া উদয়াদিত্যের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। বিভা যখন তাঁহার চক্ষে পড়িল, তখন তাঁহার কারাগারের সমুদয় দ্বার ঘেন মুক্ত হইয়া গেল। সেদিন তিনি বিভাকে কাছে বসাইয়া আনন্দে এত কথা বলিয়াছিলেন যে কারা-প্রবেশের পূর্বে বোধ করি এত কথা কখনো বলেন নাই। বিভা উদয়াদিত্যের সে আনন্দ মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল। জানি না, এক প্রাণ হইতে আর-এক প্রাণে কী করিয়া বার্তা যায়, এক প্রাণে তরঙ্গ উঠিলে আর-এক প্রাণে কী নিয়মে তরঙ্গ উঠে। বিভার হৃদয় পুলকে পুরিয়া উঠিল। তাহার অনেক দিনের উদ্বেগ আজ স্কল হইল। বিভা সামান্য বালিকা, উদয়াদিত্যকে সে যে আনন্দ দিতে পারে অনেক দিনের পর ইহা সে সহসা আজ বুঝিতে পারিল। হৃদয়ে সে বল পাইল। এতদিন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছিল, কোথাও কিনারা পাইতেছিল না, নিরাশার গুরুভারে একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না ; অনবরত সে উদয়াদিত্যের কাজ করিত, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, তাঁহাকে মুখী করিতে পারিবে। আজ সে সহসা একটা পথ দেখিতে পাইয়াছে, এতদিনকার সমস্ত আশঙ্কি একেবারে তুলিয়া গেল। আজ তাহার চোখে প্রভাতের শিশিরের মতো অশ্রুজল দেখা দিল, আজ তাহার অধরে অরুণ-কিরণের নির্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিভাও প্রায় কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। গৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়া যখনই প্রভাত প্রবেশ করিত, কারাদ্বার খুলিয়া গিয়া তখনই বিভার বিমল মূর্তি দেখা দিত। বিভা বেতনভোগী ভৃত্যদের কিছুই করিতে দিত না, নিজের হাতে সমুদয় কাজ করিত, নিজে আহার আনিয়া দিত, নিজে শয্যা রচনা করিয়া দিত। একট টিয়াপাখি আনিয়া ঘরে টাঙাইয়া দিল ও প্রতিদিন সকালে অন্তঃপুরের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া দিত। ঘরে একখানি মহাভারত ছিল, উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে বসাইয়া তাহাই পড়িয়া শুনাইতেন।

কিন্তু উদয়াদিত্যের মনের ভিতরে একটি কষ্ট জাগিয়া আছে। তিনি তো ভূমিতে বসিয়াছেন, তবে কেন এমন সময়ে এই অসম্পূর্ণ-সুখ অতৃপ্ত-আশা স্নকুমার বিভাকে আশ্রয়স্বরূপে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে পৰ্বন্ত ডুবাইতেছেন ? প্রতিদিন মনে করেন, বিভাকে বলিবেন, “তুই যা বিভা।” কিন্তু বিভা যখন উয়ার বাতাস লইয়া

উষার আলোক লইয়া তরুণী উষার হাত ধরিয়া কারার মধ্যে প্রবেশ করে, যখন সেই স্নেহের ধন সুকুমার মুখখানি লইয়া কাছে আসিয়া বসে, কত যত্ন কত আদরের দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখে, কত মিষ্ট স্বরে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি আর কোনোমতেই প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারেন না, “বিভা, তুই যা, তুই আর আসিস না, তোকে আর দেখিব না।” প্রত্যহ মনে করেন, কাল বলিব। কিন্তু সে কাল আর কিছুতেই আসিতে চায় না। অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিভা আসিল, বিভাকে বলিলেন, “বিভা, তুই আর এখানে থাকিস নে। তুই না গেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই কারাগৃহের অন্ধকারে কে আসিয়া আমাকে যেন বলে, বিভার বিপদ কাছে আসিতেছে। বিভা, আমার কাছ হইতে তোরা শীঘ্র পালাইয়া যা। আমি শনিগ্রহ, আমার দেখা পাইলেই চারিদিক হইতে দেশের বিপদ ছুটিয়া আসে। তুই শগুণবাড়ি যা। মাঝে মাঝে যদি সংবাদ পাই, তাহা হইলেই আমি স্নেহে থাকিব।”

বিভা চূপ করিয়া রহিল।

উদয়াদিত্য মুখ নত করিয়া বিভার সেই মুখখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, “আমি কারাগার হইতে না মুক্ত হইলে বিভা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না, কী করিয়া মুক্ত হইতে পারিব।”

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র রায় ভাবিলেন, বিভা যে চন্দ্রদ্বীপে আসিল না, সে কেবল প্রতাপাদিত্যের শাসনে ও উদয়াদিত্যের মন্ত্রণায়। বিভা যে নিজের ইচ্ছায় আসিল না, তাহা মনে করিলে তাঁহার আত্মগোঁরবে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি ভাবিলেন প্রতাপাদিত্য আমাকে অপমান করিতে চাহে, অতএব সে কখনো বিভাকে আমার কাছে পাঠাইবে না। কিন্তু এ অপমান আমিই তাহাকে ফিরাইয়া দিই না কেন। আমিই তাহাকে এক পত্র লিখি না কেন যে তোমার মেয়েকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহাকে যেন আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠানো না হয়। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া পাঁচজনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে ওই মর্মে এক পত্র লেখা হইল। প্রতাপাদিত্যকে এরূপ চিঠি লেখা বড়ো সাধারণ সাহসের কর্ম নহে। রামচন্দ্র

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৭৭

রায়ের মনে মনে বিলক্ষণ ভয় হইতেছিল। কিন্তু ঢালু পর্বতে বেগে নামিতে নামিতে হাজার ভয় হইলেও যেমন মাঝে মাঝে থামা যায় না, রামচন্দ্র রায়ের মনেও সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। সহসা একটা দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শেষ পর্বন্ত না পৌছিয়া যেন দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। রামমোহনকে ডাকিয়া কহিলেন, “এই পত্র যশোহরে লইয়া যা।” রামমোহন জোড়হস্তে কহিল, “আজ্ঞা না মহারাজ, আমি পারিব না। আমি স্থির করিয়াছি আর যশোহরে যাইব না। এক যদি পুনরায় মা-ঠাকুরানীকে আনিতে যাইতে বলেন তো আর-একবার যাইতে পারি, নতুবা এ চিঠি লইয়া যাইতে পারিব না।” রামমোহনকে আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধ নয়ানটাদের হাতে রাজা সেই পত্রখানি দিলেন। সে সেই পত্র লইয়া যশোহরে যাত্রা করিল।

পত্র লইয়া গেল বটে, কিন্তু নয়ানটাদের মনে বড়ো ভয় হইল। প্রতাপাদিত্যের হাতে এ পত্র পড়িলে না জানি তিনি কী করিয়া বসেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহিষীর হাতে সে এই পত্র দিতে সংকল্প করিল। মহিষীর মনের অবস্থা বড়ো ভালো নয়। একদিকে বিভার জন্ম তাঁহার ভাবনা, আর-একদিকে উদয়াদিত্যের জন্ম তাঁহার কষ্ট। সংসারের গোলমালে তিনি যেন একেবারে ঝালাপালা হইয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে প্রায় তাঁহাকে কঁাদিতে দেখা যায়। তাঁহার যেন আর স্বরকন্য়ার মন লাগে না। এইরূপ অবস্থায় তিনি এই পত্রখানি পাইলেন কী যে করিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। বিভাকে কিছু বলিতে পারেন না, তাহা হইলে স্নহুমার বিভা আর ঝাঁচিবে না। মহারাজের কানে এ চিঠির কথা উঠিলে কী যে অনর্থপাত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। অথচ এমন সংকটের অবস্থায় কাহাকে কিছু না বলিয়া, কাহারও নিকট কোনো পরামর্শ না লইয়া মহিষী ঝাঁচিতে পারেন না, চারিদিক অকুল পাথার দেখিয়া কঁাদিতে কঁাদিতে প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কহিলেন, “মহারাজ, বিভার তো যাহা হয় একটা কিছু করিতে হইবে।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “কেন বলো দেখি?”

মহিষী কহিলেন, “নাঃ, কিছু যে হইয়াছে তাহা নহে তবে বিভাকে তো এক সময়ে শব্দরবাড়ি পাঠাইতেই হইবে।”

প্রতাপাদিত্য। সে তো বুঝিলাম, তবে এতদিন পরে আজ যে সহসা তাহা মনে পড়িল?”

মহিষী ভীত হইয়া কহিলেন, “ওই তোমার এক কথা, আমি কি বলিতেছি যে কিছু হইয়াছে? যদি কিছু হয়—”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “হইবে আর কী?”

মহিষী। “এই মনে করো যদি জামাই বিভাকে একেবারে ত্যাগ করে।” বলিয়া মহিষী রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কাদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইল।

মহারাজের সেই মূর্তি দেখিয়া মহিষী চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, “তাই বলিয়া জামাই কি আর সত্য সত্যই লিখিয়াছে যে, ওগো ভোমাদের বিভাকে আমি ত্যাগ করিলাম, তাহাকে আর চন্দ্রদীপে পাঠাইয়ো না, তাহা নহে—তবে কথা এই, যদি কোনোদিন তাই লিখিয়া বসে!”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “তখন তাহার বিহিত বিধান করিব, এখন তাহার জ্ঞাত ভাবিবার অবসর নাই।”

মহিষী কাদিয়া কহিলেন, “মহারাজ তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা রাখো, একবার ভাবিয়া দেখো বিভার কী হইবে। আমার পাষণ প্রাণ বলিয়া আজও রহিয়াছে, নহিলে আমাকে যত দূর যত্ন দিবার তা দিয়াছ। উদয়কে— আমার বাছাকে—রাজার ছেলেকে সামান্য অপরাধীর মতো রুদ্ধ করিয়াছ। সে আমার কাহারও কোনো অপরাধ করে না, কিছুতেই লিপ্ত থাকে না, দোষের মধ্যে সে কিছু বোঝে সোঝে না, রাজকাৰ্য শেখে নাই, প্রজা শাসন করিতে জানে না, তাহার বুদ্ধি নাই, তা ভগবান তাহাকে যা করিয়াছেন, তাহার দোষ কী।” বলিয়া মহিষী দ্বিগুণ কাদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “ও-কথা তো অনেকবার হইয়া গিয়াছে। যে-কথা হইতেছিল তাহাই বলো না।”

মহিষী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, “আমারই পোড়া কপাল! বলিব আর কী? বলিলে কি তুমি কিছু শোন? একবার বিভার মুখপানে চাও মহারাজ। সে যে কাহাকেও কিছু বলে না—সে কেবল দিনে দিনে শুকাইয়া যায়, ছায়ার মতো হইয়া আসে, কিন্তু সে কথা কহিতে জানে না। তাহার একটা উপায় করো।”

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মহিষী আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৭৯

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটয়াছে। যখন সীতারাম দেখিল, উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তখন সে আর হাত-পা আছড়াইয়া বাঁচেনা। প্রথমেই তঁা সে ক্লিষ্টগীর বাড়ি গেল। তাহাকে বাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। তাহাকে মারিতে যায় আর কি। কহিল, “সর্বনাশী, তোর ঘরে আশুন জালাইয়া দিব, তোর ভিটায় ঘুঘু চরাইব, আর যুবরাজকে খালাস করিব, তবে আমার নাম সীতারাম। আজই আমি রায়গড়ে চলিলাম, রায়গড় হইতে আসি, তার পরে তোর ওই কালামুখ লইয়া এই শানের উপর বসিব, তোর মুখে চুনকালি মাখাইয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে জলগ্রহণ করিব।”

ক্লিষ্টগীর কিয়ৎক্ষণ অনিমেঘনে ত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া শুনি, ক্রমে তাহার দাঁতে দাঁতে লাগিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিল, তাহার হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল, তাহার ঘনকৃষ্ণ অঙ্গুলের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল। তাহার ঘনকৃষ্ণ চক্ষুতীরকায় বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর নিষ্পন্দ হইয়া গেল; ক্রমে তাহার স্থল অধরৌষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, ঘন অঙ্গ তরঙ্গিত হইল, অন্ধকার চক্ষে বিদ্যুৎ খেলাইতে লাগিল, কেশরাশি ফুলিয়া উঠিল, হাত-পা ধর ধর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। একটা পৈশাচিক অভিশাপ, একটা সর্বাদক্ষীত কম্পমান হিংসা সীতারামের মাথার উপরে যেন পড়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রমে যখন ক্লিষ্টগীর মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, দাঁত খুলিয়া গেল, অধরৌষ্ঠ পৃথক হইল, সঞ্চিত অঙ্গ প্রসারিত হইল, তখন সে বসিয়া পড়িল, কহিল, “বটে। যুবরাজ তোমারই বটে। যুবরাজের বিপদ হইয়াছে বলিয়া তোমার গায়ে বড়ো লাগিয়াছে—যেন যুবরাজ আমার কেহ নয়। পোড়ারমুখো, এটা জানিস না যে সে আমারই যুবরাজ, আমিই তাহার ভালো করিতে পারি আর আমিই তাহার মন্দ করিতে পারি। আমার যুবরাজকে তুই কারামুক্ত করিতে চাহিস। দেখিব কেমন তাহা পারিস।

সীতারাম সেই দিনই রায়গড়ে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা বসন্ত রায় রায়গড়ের প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে এক প্রশস্ত মাঠ দেখা যাইতেছে। মাঠের প্রান্তে খালের পরপারে একটি আশ্রবনের মধ্যে সূর্য অস্ত যাইতেছেন। বসন্ত রায়ের হাতে তাঁহার চিরসহচর সেতারটি আর নাই। বৃদ্ধ সেই অন্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া আপনার মনে গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছেন—

আমিই শুধু রইছ বাকি।

যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি।

আমার ব'লে ছিল যারা

আর তো তারা দেয় না সাড়া,

কোথায় তারা, কোথায় তারা? কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।

বল্ দেখি মা, শুধাই তোরে,

আমার কিছু রাখলি নে রে?

আমি কেবল আমার নিয়ে কোন প্রাণেতে বেঁচে থাকি।

কে জানে কী ভাবিয়া বৃদ্ধ এই গান গাহিতেছিলেন। বুঝি তাঁহার মনে হইতেছিল, গান গাহিতেছি, কিন্তু যাহাদের গান শুনাইতাম, তাহারা যে নাই। গান আপনি আসে, কিন্তু গান গাহিয়া যে আর সুখ নাই। এখনো আনন্দ ভুলি নাই, কিন্তু যখনই আনন্দ জন্মিত, তখনই যাহাদের আলিঙ্গন করিতে সাধ যাইত, তাহারা কোথায়? যেদিন প্রভাতে রায়গড়ে ওই তালগাছটার উপরে মেঘ করিত, মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত সেই দিনই আমি যাহাদের দেখিতে যশোরে যাত্রা করিতাম, তাহাদের কি আর দেখিতে পাইব না? এখনো এক-একবার মনটা তেমনি আনন্দে নাচিয়া উঠে কিন্তু হায়—এই সব বুঝি ভাবিয়া আজ বিকালবেলায় অন্তমান সূর্যের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের মুখে আপনা-আপনি গান উঠিতেছে—আমিই শুধু রইছ বাকি।

এমন সময়ে খাঁ সাহেব আসিয়া এক মস্ত সেলাম করিল। খাঁ সাহেবকে দেখিয়া বসন্ত রায় উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, “খাঁ সাহেব, এস এস।” অধিকতর নিকটে গিয়া ব্যস্তমস্ত হইয়া কহিলেন, “সাহেব, তোমার মুখ অমন মলিন দেখিতেছি কেন? মেজাজ ভালো আছে তো?”

খাঁ সাহেব। “মেজাজের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, মহারাজ। আপনাকে মলিন দেখিয়া আমাদের মনে আর সুখ নাই। একটি বয়েত আছে—রাত্রি বলে আমি কেঁহই নই, আমি যাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি সেই চাঁদ, তাহারই সহিত আমি একত্রে হাসি, একত্রে স্নান হইয়া যাই!—মহারাজ, আমরাই বা কে, আপনি না হাসিলে আমাদের হাসিবার ক্ষমতা কী? আমাদের আর সুখ নাই, জনাব।”

বসন্ত রায় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “সে কী কথা সাহেব? আমার তো অসুখ কিছুই নাই, আমি নিজেকে দেখিয়া নিজে হাসি, নিজের আনন্দে নিজে থাকি, আমার অসুখ কী খাঁ সাহেব?”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৮১

খাঁ সাহেব। “মহারাজ এখন আপনার আর তেমন গান বাজ শুনা যায় না।”

বসন্ত রায় সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “আমার গান শুনিবে সাহেব ?
আমিই শুধু রইলু বাকি।

যা ছিল তা গেল চলে,
রইল যা তা কেবল কঁাকি।”

খাঁ সাহেব। “আপনি আর সে সেতার বাজান কই ? আপনার সে সেতার কোথায় ?”

বসন্ত রায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “সে সেতার যে নাই, তাহা নয়। সেতার আছে শুধু তাহার তার ছিঁড়িয়া গেছে, তাহাতে আর সুর মেলে না।” বলিয়া আশ্র-বনের দিকে চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, “খাঁ সাহেব একটা গান গাও না— একটা গান গাও, গাও তাজবে তাজ নওবে নও।”

খাঁ সাহেব গান ধরিলেন,
তাজবে তাজ নওবে নও।

দেখিতে দেখিতে বসন্ত রায় মাতিয়া উঠিলেন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলেন একত্রে গাহিতে লাগিলেন—তাজবে তাজ নওবে নও। ঘন ঘন তাল দিতে লাগিলেন এবং বারবার করিয়া গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার হইয়া আসিল, রাখালের বাড়িমুখে আসিতে আসিতে গান ধরিল : এমন সময়ে আসিয়া সীতারাম “মহারাজের জয় হউক” বলিয়া প্রণাম করিল। বসন্ত রায় একেবারে চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, “আরে সীতারাম যে। ভালো আছিস তো ? দাদা কেমন আছে ? দিদি কোথায় ? খবর ভালো তো ?”

খাঁ সাহেব চলিয়া গেল। সীতারাম কহিল, “একে একে নিবেদন করিতেছি মহারাজ।” বলিয়া একে একে যুবরাজের কারারোধের কথা কহিল। সীতারাম আগাগোড়া সত্য কথা বলে নাই। যে-কারণে উদয়াদিত্যের কারারোধ ঘটয়াছিল, সে-কারণটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলে নাই।

বসন্ত রায়ের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, তিনি সীতারামের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। তাহার লব উর্ধ্বে উঠিল, তাহার চক্ষু প্রসারিত হইয়া গেল, তাহার অধরোষ্ঠ বিভিন্ন হইয়া গেল—নির্নিমেষ নেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “জ্যা ?”

সীতারাম কহিল, “আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।”

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসন্ত রায় কহিলেন, “সীতারাম।”

সীতারাম। “মহারাজ।”

বসন্ত রায়। “তাহা হইলে দাদা এখন কোথায়?”

সীতারাম। “আজ্ঞা তিনি কারাগারে।”

বসন্ত রায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য কারাগারে, এ-কথাটা বুঝি তাঁহার মাথায় ভালো করিয়া বসিতেছে না কিছুতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আবার কিছুক্ষণ বাদে সীতারামের হাত ধরিয়া কহিলেন, “সীতারাম।”

সীতারাম। “আজ্ঞা মহারাজ।”

বসন্ত রায়। “তাহা হইলে দাদা এখন কী করিতেছে?”

সীতারাম। “কী আর করিবেন। তিনি কারাগারেই আছেন।”

বসন্ত রায়। “তাহাকে কি সকলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে?”

সীতারাম। “আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।”

বসন্ত রায়। “তাহাকে কি কেহ একবার বাহির হইতে দেয় না?”

সীতারাম। “আজ্ঞা না।”

বসন্ত রায়। “সে একলা কারাগারে বসিয়া আছে?”

বসন্ত রায় এ-কথাগুলি বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই—আপনা-আপনি বলিতেছিলেন। সীতারাম তাহা বুঝিতে পারে নাই—সে উত্তর করিল, “হাঁ মহারাজ।”

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, “দাদা, তুই আমার কাছে আয় রে, তোকে কেহ চিনিল না।”

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত রায় তাহার পরদিনই যশোহরে যাত্রা করিলেন। কাহারও নিবেদন নাই। যশোহরে পৌঁছিয়াই একেবারে রাজবাটীর অন্তঃপুরে গেলেন। বিভা সহস্রা তাহার দাদামহাশয়কে দেখিয়া যেন কী হইয়া গেল। কিছুক্ষণ কী যে করিবে কিছু যেন ভাবিয়া পাইল না। কেবল চোখে বিষ্ময়, অধরে আনন্দ, মুখে কথা নাই, শরীর নিম্পন্দ—খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর তাঁহার পায়ের কাছে

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৮৩

পড়িয়া প্রশ্নাম করিল, পায়ের ধূলা মাথায় লইল। বিভা উঠিয়া দাঁড়াইলে পর বসন্ত রায় একবার নিতান্ত একাগ্রদৃষ্টে বিভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিভা?” আর কিছু বলিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিভা?” যেন তাঁহার মনে একটি অতি ক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল যে, সীতারাম বাহা বলিয়াছিল, তাহা সত্য না হইতেও পারে। সমস্তটা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হইতেছে পাছে বিভা তাহার উত্তর দিয়া কেলে। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে বিভা তৎক্ষণাৎ তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। তাই তিনি অতি ভয়ে ভয়ে বিভার মুখখানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিভা?” তাই তিনি অতি একাগ্রদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বিভা বুঝিল এবং বিভা উত্তর দিতেও পারিল না। তাহার প্রথম আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুরাইয়া গেছে। আগে যখন দাদামহাশয় আসিতেন, সেই সব দিন তাহার মনে পড়িয়াছে। সে এক কী উৎসবের দিনই গিয়াছে। তিনি আসিলে কী একটা আনন্দই পড়িত। সুরমা হাসিয়া তামাশা করিত, বিভা হাসিত কিন্তু তামাশা করিতে পারিত না, দাদা প্রশান্ত আনন্দমূর্তিতে দাদামহাশয়ের গান গুনিতেন। আজ দাদামহাশয় আসিলেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার কাছে আসিল না, কেবল এই আঁধার সংসারে একলা বিভা—স্বপ্নের সংসারের একমাত্র ভগ্নাবশেষের মতো একলা দাদামহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাদামহাশয় আসিলে যে-যে আনন্দ-ধ্বনি উঠিত—সেই সুরমার ঘর আজ এমন কেন? সে আজ শুষ্ক, অন্ধকার, শূন্য দাদামহাশয়কে দেখিলেই সে ঘরটা যেন এখনই কাদিয়া উঠবে। বসন্ত রায় একবার কী যেন কিসের আশ্বাসে সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন—দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে মাথা লইয়া একবার চারিদিক দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া বুকফাটা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি, ঘরে কি কেহই নাই?”

বিভা কাদিয়া উঠিয়া কহিল, “না দাদামহাশয়, কেহই নাই।”

শুষ্ক ঘরটা যেন, হা হা করিয়া বলিয়া উঠিল, “আগে বাহারা ছিল তাহার কেহই নাই।”

বসন্ত রায় অনেকক্ষণ পর্বস্ত চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে বিভার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গাহিয়া উঠিলেন,

আমিই শুধু রইছ বাকি।

বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া নিতান্ত মিনতি করিয়া কহিলেন, “বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও—সে তোমাদের কী করিয়াছে? তাহাকে যদি তোমরা ভালো না বাস, পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে তবে

তাহাকে এই বুড়ার কাছে দাও না। আমি তাহাকে লইয়া যাই—আমি তাহাকে রাখিয়া দিই। তাহাকে আর তোমাদের দেখিতে হইবে না—সে আমার কাছে থাকিবে।”

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া চূপ করিয়া বসন্ত রায়ের কথা শুনিলেন, অবশেষে বলিলেন, “খুঁড়ামহাশয়, আমি যাহা করিয়াছি তাহা অনেক বিবেচনা করিয়াই করিয়াছি, এ-বিষয়ে আপনি অবশ্যই আমার অপেক্ষা অনেক অল্প জানেন—অথচ আপনি পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন, আপনার এ-সকল কথা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না।”

তখন বসন্ত রায় উঠিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, “বাবা প্রতাপ, মনে কি নাই! তোকে যে আমি ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করিয়া মাছুষ করিলাম, সে কি আর মনে পড়ে না? স্বর্গীয় দাদা যেদিন তোকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সেদিন হইতে আমি কি এক মুহূর্তের জন্য তোকে কষ্ট দিয়াছি? অসহায় অবস্থায় যখন তুই আমার হাতে ছিলি, একদিনও কি তুই আপনাকে পিছুহীন বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলি? প্রতাপ, বল দেখি, আমি তোমার কী অপরাধ করিয়াছিলাম যাহাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুই আমাকে এত কষ্ট দিতে পারিলি? এমন কথা আমি বলি না যে, তোকে পালন করিয়াছিলাম বলিয়া তুই আমার কাছে ঋণী—তোদের মাছুষ করিয়া আমিই আমার দাদার স্নেহ-ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতএব প্রতাপ, আমি প্রাণ্য বলিয়া তোমার কাছে কিছুই চাহি না, কখনো চাহিও নাই, আমি কেবল তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি—তাও দিবি না?”

বসন্ত রায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য পাষাণমূর্তির তায় বসিয়া রহিলেন।

বসন্ত রায় আবার কহিলেন, “তবে আমার কথা শুনিবি না, আমার ভিক্ষা রাখিবি না? কথার উত্তর দিবি নে প্রতাপ?” দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “ভালো, আমার আর-একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, একবার আমি উদয়কে দেখিতে চাই। আমাকে তাহার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করিতে কেহ যেন নিষেধ না করে এই অনুমতি দাও।”

প্রতাপাদিত্য তাহাও দিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে উদয়াদিত্যের প্রতি এতখানি স্নেহ প্রকাশ করিতে প্রতাপাদিত্য মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার যতই মনে হয় লোকে তাঁহাকেই অপরাধী করিয়া তুলিতেছে, ততই তিনি আরও বাঁকিয়া দাঁড়ান।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৮৫

বসন্ত রায় নিতান্ত স্নানমুখে অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া বিভার অত্যন্ত কষ্ট হইল। বিভা দাদামহাশয়ের হাত ধরিয়া কহিল, “দাদামহাশয়, আমার ঘরে এস।” বসন্ত রায় নীরবে বিভার সঙ্গে সঙ্গে বিভার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ঘরে বসিলে পর বিভা তাহার কোমল অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার পাকা চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া কহিল, “দাদামহাশয়, এস, তোমার পাকা চুল তুলিয়া দিই।” বসন্ত রায় কহিলেন, “দিদি সে পাকাচুল কি আর আছে? যখন বয়স হয় নাই তখন সে-সব ছিল, তখন তোদের পাকা চুল তুলিতে বলিতাম। আজ আমি বুড়া হইয়া গিয়াছি, আজ আর আমার পাকা চুল নাই।”

বসন্ত রায় দেখিলেন বিভার মুখখানি মলিন হইয়া আসিল, তাহার চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল। অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন, “আয় বিভা আয়। গোটাকতক চুল তুলিয়া দে। তোদের পাকাচুল সরবরাহ করিয়া উঠিতে আর তো আমি পারি না ভাই। বয়স হইতে চলিল, ক্রমেই মাথার টাক পড়িতে চলিল। এখন আর-একটা মাথার অল্পসন্ধান কর, আমি জবাব দিলাম।” বলিয়া বসন্ত রায় হাসিতে লাগিলেন।

একজন দাসী আসিয়া বসন্ত রায়কে কহিল, “রানীমা আপনাকে একবার প্রণাম করিতে চান।”

বসন্ত রায় মহিষীর ঘরে গেলেন, বিভা কারাগারে গেল।

মহিষী বসন্ত রায়কে প্রণাম করিলেন। বসন্ত রায় আশীর্বাদ করিলেন, “মা, আয়ুস্বতী হও।”

মহিষী কহিলেন, “কাকামহাশয়, ও আশীর্বাদ আর করিবেন না। এখন আমার মরণ হইলেই আমি বাঁচি।”

বসন্ত রায় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, “রাম, রাম। ও-কথা মুখে আনিতে নাই।”

মহিষী কহিলেন, “আর কী বলিব কাকামহাশয়, আমার ঘরকন্নার যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।”

বসন্ত রায় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মহিষী কহিলেন, “বিভার মুখখানি দেখিয়া আমার মুখে আর অন্নজল রুচে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলে না, কেবল দিনে দিনে তাহার শরীর ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। তাহাকে লইয়া যে আমি কী করিব কিছু ভাবিয়া পাই না।”

বসন্ত রায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

“এই দেখুন কাকামহাশয়, এক সর্বনেশে চিঠি আসিয়াছে।” বলিয়া এক চিঠি বসন্ত রায়ের হাতে দিলেন।

বসন্ত রায় সে চিঠি পড়িতে না পড়িতে মহিষী কাদিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমার কিসের সুখ আছে? উদয়—বাছা আমার কিছু জানে না। তাহাকে তো মহারাজ—সে যেন রাজ্যের মতোই হয় নাই, কিন্তু তাহাকে তো আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, সে তো আমার আপনার সন্তান বটে। জানি না, বাছা সেখানে কী করিয়া থাকে, একবার আমাকে দেখিতেও দেয় না।” মহিষী আজকাল যে কথাই পাড়েন, উদয়াদিত্যের কথা তাহার মধ্যে এক স্থলে আসিয়া পড়ে। ওই কষ্টটাই তাহার প্রাণের মধ্যে যেন দিনরাত জাগিয়া আছে।

চিঠি পড়িয়া বসন্ত রায় একেবারে অবাক হইয়া গেলেন, চুপ করিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্ত রায় মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চিঠি তো কাহাকেও দেখাও নি মা!”

মহিষী কহিলেন, “মহারাজ এ চিঠির কথা শুনিলে কি আর রক্ষা রাখিবেন, বিভাও কি তাহা হইলে আর বাঁচিবে।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “ভালো করিয়াছ। এ চিঠি আর কাহাকেও দেখাইয়ো না বউমা। তুমি বিভাকে শীঘ্র তাহার শস্তুরবাড়ি পাঠাইয়া দাও। মান-অপমানের কথা ভাবিয়ো না।”

মহিষী কহিলেন, “আমিও তাই মনে করিয়াছি। মান লইয়া আমার কাজ নাই, আমার বিভা সুখী হইলেই হইল। কেবল ভয় হয় পাছে বিভাকে তাহার অশ্রু করে।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “বিভাকে অশ্রু করিবে! বিভা কি অশ্রুর ধন। বিভা যেখানে যাইবে সেইখানেই আদর পাইবে। অমন লক্ষ্মী অমন সোনার প্রতিমা আর কোথায় আছে। রামচন্দ্র কেবল তোমাদের উপর রাগ করিয়াই এই চিঠি লিখিয়াছে, আবার পাঠাইয়া দিলেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে।” বসন্ত রায় তাহার সরল হৃদয়ে সরল বুদ্ধিতে এই বুঝিলেন। মহিষীও তাহাই বুঝিলেন।

বসন্ত রায় কহিলেন, “বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দাও যে বিভাকে চন্দ্রবীপে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র এক চিঠি লিখিয়াছে। তাহা হইলে বিভা নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে আর অমত করিবে না।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৮৭

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর বসন্ত রায় একাকী বহির্বাটতে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সীতারাম তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিল।

বসন্ত রায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী সীতারাম, কী খবর?”

সীতারাম কহিল, “সে পরে বলিব, আপনাকে আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “কেন, কোথায় সীতারাম?”

সীতারাম তখন কাছে আসিয়া বসিল। চুপি চুপি ফিস ফিস করিয়া কী বলিল।

বসন্ত রায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, “সত্য নাকি?”

সীতারাম কহিল, “আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।”

বসন্ত রায় মনে মনে অনেক ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কহিলেন, “এখনই যাইতে হইবে নাকি।”

সীতারাম। “আজ্ঞা হাঁ।”

বসন্ত রায়। “একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব না?”

সীতারাম। “আজ্ঞা না, আর সময় নাই।”

বসন্ত রায়। “কোথায় যাইতে হইবে?”

সীতারাম। “আমার সঙ্গে আসুন, আমি লইয়া যাইতেছি।”

বসন্ত রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, “একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি না কেন?”

সীতারাম। “আজ্ঞা না মহারাজ। দেরি হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে।”

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি কহিলেন, “তবে কাজ নাই—কাজ নাই।” উভয়ে চলিলেন।

আবার কিছু দূর গিয়া কহিলেন, “একটু বিলম্ব করিলে কি চলে না?”

সীতারাম। “না মহারাজ, তাহা হইলে বিপদ হইবে।”

“দুর্গা বলো” বলিয়া বসন্ত রায় প্রাসাদের বাহির হইয়া গেলেন।

বসন্ত রায় যে আসিয়াছেন, তাহা উদয়াদিত্য জানেন না। বিভা তাঁহাকে বলে নাই। কেননা যখন উভয়ের দেখা হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তখন এ সংবাদ তাঁহার কষ্টের কারণ হইত। সন্ধ্যার পর বিধায় লইয়া বিভা কারাগার হইতে চলিয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য একটি শ্রদ্ধীপ লইয়া একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতেছেন। জানালায় ভিতর দিয়া বাতাস আসিতেছে, দীপের ক্ষীণ শিখা কাপিতেছে, অক্ষর

ভালো দেখা যাইতেছে না। কীটপতঙ্গ আসিয়া দীপের উপর পড়িতেছে। এক-
 একবার দীপ নিবো-নিবো হইতেছে। একবার বাতাস বেগে আসিল—দীপ নিবিয়া
 গেল। উদয়াদিত্য পুঁথি ঝাঁপিয়া তাঁহার খাটে গিয়া বসিলেন। একে একে কত
 কী ভাবনা আসিয়া পড়িল। বিভার কথা মনে আসিল। আজ বিভা কিছু দেরি
 করিয়া আসিয়াছিল, কিছু সকাল সকাল চলিয়া গিয়াছিল। আজ বিভাকে কিছু
 বিশেষ গ্লান দেখিয়াছিলেন; তাহাই লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন।
 পৃথিবীতে যেন তাঁহার আর কেহ নাই। সমস্ত দিন বিভাকে ছাড়া আর কাহাকেও
 দেখিতে পান না। বিভাই তাঁহার একমাত্র আলোচ্য। বিভার প্রত্যেক হাসিটি
 প্রত্যেক কথাটি তাঁহার মনে সঞ্চিত হইতে থাকে। তুষিত ব্যক্তি তাহার পানীয়ের
 প্রত্যেক বিন্দুটি পর্যন্ত যেমন উপভোগ করে, তেমনি বিভার শ্রীতির অতি সামান্য
 চিহ্নটুকু পর্যন্ত তিনি প্রাণ-মনে উপভোগ করেন। আজ তাই এই বিজন ক্ষুদ্র অন্ধকার
 ঘরের মধ্যে একলা শুইয়া স্নেহের প্রতিমা বিভার গ্লান মুখখানি ভাবিতেছিলেন।
 সেই অন্ধকারে বসিয়া তাঁহার একবার মনে হইল, “বিভার কি ক্রমেই বিরক্তি
 ধরিতেছে? এই নিরানন্দ কায়াগারের মধ্যে এক বিষন্ন অন্ধকার মূর্তির সেবা
 করিতে আর কি তাহার ভালো লাগিতেছে না? আমাকে কি ক্রমেই সে তাহার
 স্নেহের বাধা তাহার সংসার-পথের কণ্টক বলিয়া দেখিবে? আজ দেরি করিয়া
 আসিয়াছে, কাল হয়তো আরো দেরি করিয়া আসিবে, তাহার পরে একদিন হয়তো
 সমস্ত দিন বসিয়া আছি কখন বিভা আসিবে—বিকাল হইল সন্ধ্যা হইল—রাত্রি
 হইল, বিভা আর আসিল না।—তাহার পর হইতে আর হয়তো বিভা আসিবে না।”
 উদয়াদিত্যের মনে যতই এই কথা উদয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনটা হা হা
 করিতে লাগিল—তাঁহার কল্পনারাজ্যের চারিদিক কী ভয়ানক শূন্যময় দেখিতে
 লাগিলেন। একদিন আসিবে যেদিন বিভা তাঁহাকে স্নেহশূন্য নয়নে তাহার স্নেহের
 কণ্টক বলিয়া দেখিবে—সেই অতিদূর কল্পনার আভাসমাত্র লাগিয়া তাঁহার হৃদয়
 একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একবার মনে করিতেছেন, “আমি কী ভয়ানক
 স্বার্থপর। আমি বিভাকে ভালোবাসি বলিয়া তাহার যে ঘোরতর শত্রুতা করিতেছি,
 কোনো শত্রুও বোধ করি এমন পারে না।” বার বার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন
 আর বিভার উপর নির্ভর করিবেন না কিন্তু যখনই কল্পনা করিতেন তিনি বিভাকে
 হারায়াছেন, তখনই তাঁহার মনে সে বল চলিয়া যাইতেছে, তখনই তিনি অকুল
 পাথারে পড়িয়া যাইতেছেন—মরণাপন্ন মজ্জমান ব্যক্তির মতো বিভার কাল্পনিক মূর্তিকে
 আকুলভাবে আঁকড়িয়া ধরিতেছেন।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৮৯

এমন সময়ে বহির্দর্শে সহসা “আগুন—আগুন” বলিয়া এক ঘোরতর কোলাহল উঠিল। উদয়াদিত্যের বুক কাঁপিয়া উঠিল, বাহিরে শত শত কণ্ঠরোল একত্রে উঠিল, সহসা নানা কণ্ঠের নানাবিধ চীংকার সহিত আকাশে শত লোকের দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, প্রাসাদের কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গোলমাল চলিতে লাগিল—তাহার মন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। সহসা দ্রুতবেগে তাহার কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। কে একজন তাহার অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল—তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ও?”

সে উত্তর করিল, “আমি সীতারাম, আপনি বাহির হইয়া আসুন।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “কেন?”

সীতারাম কহিল, “যুবরাজ, কারাগৃহে আগুন লাগিয়াছে, শীঘ্র বাহির হইয়া আসুন।” বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া প্রায় তাঁহাকে বহন করিয়া কারাগারের বাহিরে লইয়া গেল।

অনেকদিনের পর উদয়াদিত্য আজ মুক্ত স্থানে আসিলেন—মাথার উপরে সহসা অনেকটা আকাশ দেখিতে পাইলেন, বাতাস যেন তাহার বিস্তৃত বক্ষ প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। চোখের বাধা চারিদিক হইতে খুলিয়া গেল। সেই অন্ধকার রাত্রে, আকাশের অসংখ্য তারকার দৃষ্টির নিম্নে, বিস্তৃত মাঠের মধ্যে কোমল তৃণজালের উপর দাঁড়াইয়া সহসা তাঁহার মনের মধ্যে এক অপরিসীম অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। সেই আনন্দে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী করিব, কোথায় যাইব?” অনেকদিন সংকীর্ণ স্থানে বদ্ধ ছিলেন, চলেন ফেরেন নাই—আজ এই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে আসিয়া অসহায়ভাবে সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী করিব? কোথায় যাইব?” সীতারাম কহিল, “আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।”

এদিকে আগুন খুব জ্বলিতেছে। বৈকালে কতকগুলি প্রজা প্রধান কর্মচারীদের নিকট কী একটা নিবেদন করিবার জন্ত আসিয়াছিল। তাহারা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে একত্র বসিয়াছিল, তাহারাই প্রথমে আগুনের গোল তোলে। প্রহরীদের বাসের জন্ত কারাগারের কাছে একটি দীর্ঘ কুটিরশ্রেণী ছিল—সেইখানেই তাহাদের চারপাই বাসন কাপড়চোপড় জিনিসপত্র সমস্তই থাকে। অগ্নির সংবাদ পাইয়াই যত প্রহরী পারিল, সকলেই ছুটিয়া গেল, যাহারা নিতান্তই পারিল না, তাহারা হাত-পা আঁড়াইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের গৃহদ্বারেও দুই-এক জন প্রহরী ছিল বটে,

কিন্তু সেখানে কড়াকড় পাহারা দিবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। দস্তুর ছিল বলিয়া তাহারা পাহারা দিত মাত্র। কারণ উদয়াদিত্য এমন শাস্ত্রভাবে তাঁহার গৃহে বসিয়া থাকিতেন যে, বোধ হইত না যে তিনি কখনো পলাইবার চেষ্টা করিবেন বা তাঁহার পলাইবার ইচ্ছা আছে। এইজন্য তাঁহার দ্বারের প্রহরীরা সর্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। রাত হইতে লাগিল, আশুন নেবে না—কেহ বা জিনিসপত্র সরাইতে লাগিল, কেহ বা জল ঢালিতে লাগিল। কেহ বা কিছুই না করিয়া কেবল গোলমাল করিয়া বেড়াইতে লাগিল; আশুন নিবিলে পর তাহারাই সকলের অপেক্ষা অধিক বাহবা পাইয়াছিল। এইরূপ সকলে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিল, সে কী একটা বলিতে চায় কিন্তু তাহার কথা শোনে কে? কেহ তাহাকে গালাগালি দিল, কেহ তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল কেহই তাহার কথা শুনিল না। যে শুনিল সে কহিল, “যুবরাজ পলাইলেন তাতে আমার কী মাগী, তোরই বা কী? সে দয়াল সিং জানে। আমার ঘর ফেলিয়া এখন আমি কোথাও যাইতে পারি না।” বলিয়া সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। এইরূপ বার বার প্রতিহত হইয়া সেই রমণী অতি প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। একজন যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই সবলে ধরিয়া কহিল, “পোড়ারমুণো, তোমরা কি চোখের মাথা খাইয়াছ? রাজার চাকরি কর সে জ্ঞান কি নাই? কাল রাজাকে বলিয়া হেঁটোর কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া তোমাদের মাটিতে পুঁতিব তবে ছাড়িব। যুবরাজ যে পলাইয়া গেল।”

“ভালোই হইয়াছে, তোর তাহাতে কী?” বলিয়া তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করিল। যাহারা ঘরে আশুন লাগাইয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজন। প্রহার খাইয়া সেই রমণীর মূর্তি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। জ্রুব বাঘিনীর মতো তাহার চোখ দুটো জ্বলিতে লাগিল, তাহার চুলগুলো ফুলিয়া উঠিল; সে দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিতে লাগিল, তাহার সেই মুখের উপর বহ্নিশিখার আভা পড়িয়া তাহার মুখ পিশাচীর মতো দেখিতে হইল। সম্মুখে একটি কাষ্ঠখণ্ড জ্বলিতেছিল, সেইট তুলিয়া লইল, হাত পুড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা ফেলিল না, সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিছুতে ধরিতে না পারিয়া সেই কাষ্ঠ তাহার প্রতি ছুঁড়িয়া মারিল।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৯১

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সীতারাম যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া খালের ধারে লইয়া গেল। সেখানে একখানা নৌকা বাঁধা ছিল, সেই নৌকার সম্মুখে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া নৌকা হইতে এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, “দাদা, আসিয়াছিস?” উদয়াদিত্য একেবারে চমকিয়া উঠিলেন—সেই চিরপরিচিত স্বর, যে-স্বর বাল্যের স্মৃতির সহিত, যৌবনের সুখদুঃখের সহিত জড়িত, পৃথিবীতে বস্তুকু সুখ আছে, যতটুকু আনন্দ আছে যে-স্বর তাহারই সহিত অবিচ্ছিন্ন। এক-একদিন কাবাগারে গভীররাত্রে বিনিদ্রনয়নে বসিয়া সহসা স্বপ্নে বংশীধ্বনির শ্রাব্য যে-স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন—সেই স্বর। বিশ্বয় ভাঙিতে না ভাঙিতে বসন্ত রায় আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উভয়ের দুই চক্ষু বাষ্পে পুরিয়া গেল। উভয় সেইখানে তুণের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য কহিলেন, “দাদামহাশয়।” বসন্ত রায় কহিলেন, “কী দাদা।” আর কিছু কথা হইল না। আবার অনেকক্ষণের পর উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসন্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন, “দাদামহাশয়, আজ আমি স্বাধীনতা পাইয়াছি, তোমাকে পাইয়াছি, আমার আর স্নেহের কী অবশিষ্ট আছে? এ-মুহূর্ত আর কতক্ষণ থাকিবে?” কিয়ৎক্ষণ পরে সীতারাম জোড়হাত করিয়া কহিল, “যুবরাজ, নৌকায় উঠুন।”

যুবরাজ চমক ভাঙিয়া কহিলেন, “কেন, নে কায় কেন?”

সীতারাম কহিল, “নহিলে এখনই আবার গৃহরীরা আসিবে।”

উদয়াদিত্য বিস্মিত হইয়া বসন্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদামহাশয়, আমরা কি পলাইয়া যাইতেছি?”

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, “হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি। এ যে পায়াল-হৃদয়ের দেশ—এরা যে তোকে ভালোবাসে না। তুই হরিণ-শিশু এ ব্যাধের রাজ্যে বাস করিস, আমি তোকে প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব, সেখানে নিরাপদে থাকিবি।” বলিয়া উদয়াদিত্যকে বুকের কাছে গুনিয়া আনিলেন যেন তাঁহাকে কঠোর সংসার হইতে কাড়িয়া আনিয়া স্নেহের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান।

উদয়াদিত্য অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, “না দাদামহাশয়, আমি পলাইতে পারিব না।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “কেন দাদা, এ বুড়াকে কি ভুলিয়া গেছিস।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি যাই—একবার পিতার পা ধরিয়া কাদিয়া ভিক্ষা চাই গে, তিনি হয়তো রায়গড়ে যাইতে সম্মতি দিবেন।”

বসন্ত রায় অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “দাদা আমার কথা শোন—সেখানে যাস নে, সে-চেষ্টা করা নিষ্ফল।”

উদয়াদিত্য নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “তবে যাই। আমি কারাগারে কিরিয়া যাই।”

বসন্ত রায় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “কেমন যাইবি যা দেখি। আমি যাইতে দিব না।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “দাদামহাশয়, এ-হতভাগ্যকে লইয়া কেন বিপদকে ডাকিতেছ। আমি যেখানে থাকি সেখানে কি তিলেক শাস্তির সম্ভাবনা আছে?”

বসন্ত রায় কহিলেন, “দাদা, তোর জ্ঞাত যে বিভাও কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। এই তাহার নবীন বয়সে সে কি তাহার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দিবে?” বসন্ত রায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তখন উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন, “তবে চলো চলো দাদামহাশয়।” সীতারামের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “সীতারাম, প্রাসাদে তিনখানি পত্র পাঠাইতে চাই।”

সীতারাম কহিল, “নৌকাতেই কাগজ কলম আছে, আনিয়া দিতেছি। শীঘ্র করিয়া লিখিবেন, অধিক সময় নাই।”

উদয়াদিত্য পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিলেন। মাতাকে লিখিলেন, “মা, আমাকে গর্তে ধরিয়া ভূমি কখনো সুখী হইতে পার নাই। এইবার নিশ্চিন্ত হও মা—আমি দাদামহাশয়ের কাছে যাইতেছি, সেখানে আমি সুখে থাকিব, সেহে থাকিব, তোমার কোনো ভাবনার কারণ থাকিবে না।” বিভাকে লিখিলেন, “চিরায়ুস্বতীষু—তোমাকে আর কী লিখিব—ভূমি জন্ম জন্ম সুখে থাকো—স্বামিগৃহে গিয়া সুখের সংসার পাতিয়া সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাও।” লিখিতে লিখিতে উদয়াদিত্যের চোখ জলে পুরিয়া আসিল। সীতারাম সেই চিঠি তিনখানি একজন দাঁড়ির হাত দিয়া প্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। সকলে নৌকাতে উঠিতেছেন—এমন সময়ে দেখিলেন, কে একজন ছুটিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছে। সীতারাম চমকিয়া বলিয়া উঠিল, “ওই রে—সেই ডাকিনী আসিতেছে।” দেখিতে দেখিতে রুক্মিণী কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চুল এলোথেলো, তাহার অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে,

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৯৩

তাহার জলন্ত অন্ধারের মতো চোখ দুটা অগ্নি উদগার করিতেছে—তাহার বার বার প্রতিহত বাসনা, অপরিতুষ্ট প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে যেন যাহাকে সন্মুখে পায় তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঘোষ মিটাইতে চায়। যেখানে প্রহরীরা আগুন নিবাইতেছিল, সেখানে বার বার ধাক্কা খাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পাগলের মতো প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে—একেবারে প্রতাপাদিত্যের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জ্ঞান বার বার নিষ্ফল চেষ্টা করে, প্রহরীরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দেয়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে প্রাসাদ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঘিনীর মতো সে উদয়াদিত্যের উপর লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সীতারাম মাঝে আসিয়া পড়িল চীংকার করিয়া সে সীতারামের উপর কাঁপাইয়া পড়িল, প্রাণপণে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল—সহসা সীতারাম চীংকার করিয়া উঠিল, দাঁড়ি-মাঝিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলপূর্বক রুক্মিণীকে ছাড়াইয়া লইল। আত্মঘাতী বশ্চিক যেমন নিজের সর্বাঙ্গে ছল ফুটাইতে থাকে, তেমনি সে অধীর হইয়া নিজের বক্ষ নখে আঁচড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া চীংকার করিয়া কহিল, “কিছুই হইল না, কিছুই হইল না,—এই আমি মরিলাম, এ স্ত্রীহত্যার পাপ তোদের হইবে।” সেই অন্ধকার রাত্রে এই অভিশাপ দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুৎবেগে রুক্মিণী জলে কাঁপাইয়া পড়িল। বর্ষায় খালের জল অত্যন্ত বাড়িয়াছিল—কোথায় সে তলাইয়া গেল ঠিকানা রহিল না। সীতারামের কাঁধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল, চাদর জলে ভিজাইয়া কাঁধে বাঁধিল। নিকটে গিয়া দেখিল উদয়াদিত্যের কপালে ধর্মবিন্দু দেখা দিয়াছে, তাহার হাত-পা শীতল হইয়া গিয়াছে, তিনি প্রাণ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন—বসন্ত রায়ও যেন দিশাহারা হইয়া অবাঁক হইয়া গিয়াছেন। দাঁড়িগণ উভয়কে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিল। সীতারাম ভীত হইয়া কহিল, “যাত্রার সময় কী অমঙ্গল।”

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্যের নৌকা খাল অতিক্রম করিয়া নদীতে গিয়া পৌঁছিল; তখন সীতারাম নৌকা হইতে নামিয়া শহরে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় যুবরাজের নিকট হইতে তাহার তলোয়ারট চাহিয়া লইল।

উদয়াদিত্যের তিনখানি পত্র একটি লোকের হাত দিয়া সীতারাম প্রাসাদে প্রেরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চিঠি কয়খানি কাহারও হাতে দিতে তাহাকে

গোপনে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিল। নৌকা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম সেই চিঠি কয়খানি ফিরাইয়া লইল। কেবল মহিষী ও খিভার চিঠিখানি রাখিয়া বাকি পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।

তখন আগুন আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া কৌতুক দেখিবার জন্ত অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। তাহাতে নির্বাণের ব্যাঘাত হইতেছে বই সুবিধা হইতেছে না।

এই অগ্নিকাণ্ডে যে সীতারামের হাত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। উদয়াদিত্যের প্রতি আসক্ত কয়েকজন প্রজা ও প্রাসাদের ভূত্যের সাহায্যে সে-ই এই কীতি করিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় একেবারে পাঁচ-ছয়টা ঘরে যে বিনা কারণে আগুন ধরিয়া উঠিল, ইহা কখনো দৈবের কর্ম নহে, এতক্ষণ এত চেষ্টা করিয়া আগুন নিবিয়াও যে নিবিতোছে না, তাহারও কারণ আছে। যাহারা আগুন নিবাইতে যোগ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই দুই-একজন করিয়া সীতারামের লোক আছে। যেখানে আগুন নাই তাহারা সেইখানে জল ঢালে, জল আনিতে গিয়া আনে না, কোঁশলে কলসী ভাঙিয়া ফেলে, গোলমাল করিয়া এ ওর ঘাড়ের উপর গিয়া পড়ে। আগুন আর নেবে না।

এদিকে যখন এইরূপ গোলযোগ চলিতেছে, তখন সীতারামের দলস্থ লোকেরা উদয়াদিত্যের শূন্য কারাগারে আগুন লাগাইয়া দিল। একে একে জানালা দরজা কড়ি-বরগা চোকাঠি কাঠের বেড়া প্রভৃতিতে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই কারাগৃহে যে, কোনো সূত্রে আগুন ধরিতে পারে, ইহা সকলের স্বপ্নেরও অগোচর, সূত্রহীন সেদিকে আর কাহারও মনোযোগ পড়ে নাই। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আগুন বেশ রীতিমতো ধরিয়াছে। কতকগুলো হাড়, মড়ার মাথা ও উদয়াদিত্যের তলোয়ারটি সীতারাম কোনপ্রকারে উদয়াদিত্যের সেই ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

এদিকে যাহারা প্রহরিশালার আগুন নিবাইতেছিল, কারাগারের দিক হইতে সহসা তাহারা এক টাংকার শুনিতে পাইল। সকলে চমকিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “ও কী রে।” একজন ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “ওরে যুবরাজের ঘরে আগুন ধরিয়াছে।” প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়াল সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল। কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল, জিনিসপত্র ভূমিতে ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে আর একজন সেই দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “কারাগৃহের মধ্য হইতে যুবরাজ টাংকার করিতেছেন শুনা গেল।” তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সীতারাম ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “ওরে তোরা শীঘ্র আয়। যুবরাজের ঘরের ছাদ

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৯৫

ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আর তো তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।” যুবরাজের কারাগৃহের দিকে সকলে ছুটিল। গিয়া দেখিল গৃহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে—চারিদিকে আশুন—ঘরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। কাহার অসাবধানতায় এই ঘটনাটি ঘটিল, সকলেই তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল, পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগিল। এমন কি, মারামারি হইবার উপক্রম হইল।

সীতারাম ভাবিল, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে, এই সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া আপাতত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। যখন সে দেখিল, ঘরে বেশ করিয়া আশুন লাগিয়াছে, তখন সে মাথায় চাদর বাধিয়া আনন্দমনে তাহার কুটীরভিমুখে চলিল। প্রাসাদ হইতে অনেক দূরে আসিল। তখন রাত্রি অনেক, পথে লোক নাই, চারিদিক স্তব্ধ। বাঁশ গাছের পাতা ঝর ঝর করিয়া মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে, সীতারামের শাখিন প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে, সে একটি রসগর্ভ গান ধরিয়াছে। সেই জনশ্রুত স্তব্ধ পথ দিয়া একাকী পাছ মনের উল্লাসে গান গাহিতে গাহিতে চলিল। কিছুদূর গিয়া তাহার মনের মধ্যে এক ভাবনা উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, যশোহর হইতে তো সপরিবারে পলাইতেই হইবে, অমনি বিনা মেহনতে কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান করিয়া লওয়া যাক না। মজলা পোড়ামুখী তো মরিয়াছে, বালাই গিয়াছে, একবার তাহার বাড়ি হইয়া যাওয়া যাক। বেটির টাকা আছে ডের, তাহার ত্রিসংসারে কেহই নাই, সে-টাকা আমি না লই তো আর-একজন লইবে,—তায় কাজ কী, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া সীতারাম কল্লিগীর বাড়ির মুখে চলিল, প্রফুল্লমনে আবার গান ধরিল। যাইতে যাইতে পথে একজন অভিসারিণীকে দেখিতে পাইল। সীতারামের নজরে এসকল কিছুই এড়াইতে পায় না। দুইটা রসিকতা করিবার জন্ত তাহার মনে অনিবার্য আবেগ উপস্থিত হইল—কিন্তু সময় নাই দেখিয়া সে আবেগ দমন করিয়া হন হন করিয়া চলিল।

সীতারাম কল্লিগীর কুটিরের নিকটে গিয়া দেখিল, দ্বার খোলাই আছে। হঠাৎ চিন্তে কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল। ঘোরতর অন্ধকার, কিছুই দেখা যাইতেছে না। একবার চারিদিক হাতড়াইয়া দেখিল। একটা সিঁদুকের উপর হুঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, দুই-একবার দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেল। সীতারামের গা ছম ছম করিতে লাগিল। মনে হইল, কে যেন ঘরে আছে।

কাহার যেন নিশাসপ্রশ্বাস শুনা যাইতেছে—আন্তে আন্তে পাশের ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, রুক্মিণীর শয়নগৃহ হইতে আলো আসিতেছে। প্রদীপটা এখনো জলিতেছে মনে করিয়া সীতারামের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে গেল। ও কে ও! ঘরে বসিয়া কে! বিনিম্রনয়নে চুপ করিয়া বসিয়া কে ও রমণী ধরধর করিয়া কাঁপিতেছে! অর্ধাবৃত দেহে ভিজা কাপড় জড়ানো, এলোচুল দিয়া কোঁটা কোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার দাঁত ঠক ঠক করিতেছে। ঘরে একটিমাত্র প্রদীপ জলিতেছে। সেই প্রদীপের ক্ষীণ আলো তাহার পাংশুবর্ণ মুখের উপর পড়িতেছে পশ্চাতে সেই রমণীর অতিবৃহৎ এক ছায়া দেয়ালের উপর পড়িয়াছে—ঘরে আর কিছুই নাই—কেবল সেই পাংশু মুখশ্রী, সেই দীর্ঘ ছায়া আর এক ভীষণ নিস্তব্ধতা। ঘরে প্রবেশ করিয়াই সীতারামের শরীর হিম হইয়া গেল। দেখিল ক্ষীণ আলোক, এলোচুল, ভিজা কাপড়ে সেই মঙ্গলা বসিয়া আছে। সহসা দেখিয়া তাহাকে প্রেতিনী বলিয়া বোধ হইল। অগ্রসর হইতেও সীতারামের সাহস হইল না—ভরসা বাঁধিয়া পিছন ফিরিতেও পারিল না। সীতারাম নিতান্ত ভীক ছিল না, অল্পক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া অবশেষে একপ্রকার বাহ্যিক সাহস ও মৌখিক উপহাসের স্বরে কহিল, “তুই কোথা হইতে মাগী। তোর মরণ নাই নাকি।” রুক্মিণী কটমট করিয়া খানিকক্ষণ সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তখন সীতারামের প্রাণটা তাহার কণ্ঠের কাছে আসিয়া ধুকধুক করিতে লাগিল। অবশেষে রুক্মিণী সহসা বলিয়া উঠিল, “বটে। তোদের এখনও সর্বনাশ হইল না, আর আমি মরিব।” উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, “যমের ছুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আগে তোকে আর যুবরাজকে চুলায় গুয়াইব, তোদের চুলা হইতে ছু-মুঠা ছাই লইয়া গায়ে মাখিয়া দেহ সার্থক করিব—তার পরে যমের সাধ মিটাইব। তাহার আগে যমালয়ে আমার ঠাই নাই।”

রুক্মিণীর গলা শুনিয়া সীতারামের অত্যন্ত সাহস হইল। সে সহসা অত্যন্ত অমুরাগ দেখাইয়া রুক্মিণীর সহিত ভাব করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খুব যে কাছে ঘেষিয়া গেল তাহা নহে, অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া কোমলস্বরে কহিল, “মাইরি ভাই ওইজন্তাই তো রাগ ধরে। তোমার কখন যে কী মতি হয়, ভালো বুঝতে পারি না। বল তো মঙ্গলা, আমি তোর কী করেছি। অধীনের প্রতি এত অপ্রসন্ন কেন? মান করেছিস বুঝি ভাই? সেই গানটা গাব?”

সীতারাম যতই অমুরাগের ভান করিতে লাগিল, রুক্মিণী ততই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার আপাদমস্তক রাগে জলিতে লাগিল—সীতারাম যদি তাহার নিজের

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৯৭

মাথার চুল হইত, তবে তাহা দুই হাতে পটপট করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিত। সীতারাম যদি তাহার নিজের চোখ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা নথ দিয়া উপড়াইয়া পা দিয়া দলিয়া ফেলিতে পারিত। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কিছুই হাতের কাছে পাইল না। দাঁতে দাঁতে লাগাইয়া কহিল, “একটু র’সো ; তোমার মৃগুপাত করিতেছি” বলিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাঁটির অঘেষণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। এই কিছুক্ষণ হইল, সীতারাম গলায় চাদর বাঁধিয়া রূপক অলংকারে মরিবার প্রস্তাব উপাধিত করিয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীর চেহারা দেখিয়া তাহার রূপক ঘুরিয়া গেল এবং চৈতন্য হইল যে সত্যকার বাঁটির আঘাতে মরিতে এখনো সে প্রস্তুত হইতে পারে নাই, এই নিমিত্ত অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কুটিরের বাহিরে সরিয়া পড়িল। রুক্মিণী বাঁটহস্তে শূণ্ণগৃহে আসিয়া ঘরের মেঝেতে সীতারামের উদ্দেশে বার বার আঘাত করিল।

রুক্মিণী এখন মরিয়া হইয়াছে। যুবরাজের আচরণে তাহার দুরাশা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে—তাহার সমস্ত উপায় সমস্ত উদ্দেশ্য একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন রুক্মিণীর আর সেই তীক্ষ্ণ-শাণিত হাস্য নাই, বিদ্রোহী কটাক্ষ নাই, তাহার সেই ভাদ্র মাসের জাহ্নবীর ঢলঢল তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নাই—রাজবাটীর যে সকল ভৃত্যেরা তাহার কাছে আসিত, তাহাদের সহিত বগড়া করিয়া তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া ভগাইয়া দিয়াছে। দেওয়ানজির জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সেদিন পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার সহিত রসিকতা করিতে আসিয়াছিল, রুক্মিণী তাহাকে বাঁটাইয়া তাড়াইয়াছে। এখন আর কেহ তাহার কাছে বৈষিতে পারে না। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করে।

সীতারাম কুটির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভাবিল, মঙ্গলা যুবরাজের পলায়ন-বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইয়াছে ; অতএব ইহার দ্বারাই সব ফাঁস হইবে। সর্বনাশীকে গলা টিপিয়া মারিয়া আসিলাম না কেন। যাহা হউক, আমার আর যশোহরে একমুহূর্ত থাকা শ্রেয় নয়। আমি এখনই পালাই। সেই রাত্রেই সীতারাম সপরিবারে যশোহর ছাড়িয়া রায়গড়ে পলাইল।

শেষরাত্রে মেঘ করিয়া মুঘলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, আশুনও ক্রমে নিবিয়া গেল। যুবরাজের মৃত্যুর জনরব প্রতাপাদিত্যের কানে গেল। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতাপাদিত্য বহির্দেশে তাঁহার সভাভবনে আসিয়া বসিলেন। প্রহরীদের ডাকাইয়া আনিলেন, মন্ত্রী আসিল, আর দুই-একজন সভাসদ আসিল। একজন সাক্ষ্য দিল, যখন আশুন ধুধু করিয়া জ্বলিতেছিল, তখন সে যুবরাজকে জানালার মধ্য হইতে

দেখিয়াছে। আর-কয়েকজন-কহিল, তাহার যুবরাজের চাঁৎকার শুনিতে পাইয়াছিল। আর-একজন যুবরাজের গৃহ হইতে তাহার গলিত দধি তলোয়ারের অবশিষ্টাংশ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “খুড়া কোথায়?” রাজবাটী অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। কেহ কহিল “যখন আশুন লাগিয়াছিল, তখন তিনিও কারাগারে ছিলেন।” কেহ কহিল, “না, রাত্রিই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে ও তাহা শুনিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ যশোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।” প্রতাপাদিত্য এইরূপে যখন সভায় বসিয়া সকলের সাক্ষ্য শুনিতেছেন, এমন সময়ে গৃহদ্বারে এক কলরব উঠিল। একজন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে নিষেধ করিতেছে। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য তাহাকে ঘরে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। একজন প্রহরী রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কী চাও?” সে হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “আমি আর কিছু চাই না—তোমার ওই প্রহরীদিগকে, সকলকে একে একে ছয় মাস গারদে পচাইয়া ডালকুস্তা দিয়া খাওয়াও, এই আমি দেখিতে চাই। ওরা কি তোমাকে মানে, না তোমাকে ভয় করে!” এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা চারিদিক হইতে গোল করিয়া উঠিল। রুক্মিণী পিছন ফিরিয়া চোখ পাকাইয়া তীব্র এক ধমক দিয়া কহিল, “চূপ কর মিন্সেরা। কাল যখন তোদের হাতে-পায়ে ধরিয়া, পই পই করিয়া বলিলাম, ওগো তোমাদের যুবরাজ তোমাদের রায়গড়ের বুড়া রাজার সঙ্গে পালায়, তখন যে তোরা পোড়ারমুখোরা আমার কথায় কান দিলি নে?—রাজার বাড়ি চাকরি কর, তোমাদের বড়ো অহংকার হইয়াছে, তোমরা সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ! পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত বলো।”

রুক্মিণী কহিল, “বলিব আর কী। তোমাদের যুবরাজ কাল রাত্রে বুড়া রাজার সঙ্গে পলাইয়াছে।”

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘরে কে আশুন দিয়াছে জান?”

রুক্মিণী কহিল, “আমি আর জানি না! সেই যে তোমাদের সীতারাম। তোমাদের যুবরাজের সঙ্গে যে তার বড়ো পিরিত, আর কেউ যেন তাঁর কেউ নয় সীতারামই যেন তাঁর সব। এ-সমস্ত সেই সীতারামের কাজ। বুড়া রাজা, সীতারাম আর তোমাদের যুবরাজ, এই তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ইহা করিয়াছে, এই তোমাকে স্পষ্ট বলিলাম।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৪৯৯

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এ-সব কী করিয়া জানিতে পারিলে? রুক্মিণী কহিল, “সে-কথায় কাজ কী গা! জামার সঙ্গে লোক দাও, আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিব। তোমার রাজবাড়ির চাকররা সব ভেড়া, উহারা এ-কাজ করিবে না।”

প্রতাপাদিত্য রুক্মিণীর সহিত লোক দিতে আদেশ করিলেন ও গ্রহরীদিগের প্রতি বধাবিহিত শাস্তির বিধান করিলেন। একে একে সভাগৃহ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মন্ত্রী ও মহারাজ অবশিষ্ট রহিলেন। মন্ত্রী মনে করিলেন, মহারাজ অবশ্য তাঁহাকে কিছু বলিবেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কিছুই বলিলেন না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রী একবার কী বলিবার অভিপ্রায়ে অতি ধীরে ধীরে কহিলেন, “মহারাজ।” মহারাজ তাহার কোনো উত্তর করিলেন না। মন্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্বে প্রতাপাদিত্য একজন জেলের মুখে উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ পাইলেন। নৌকা করিয়া নদী বাহিয়া উদয়াদিত্য চলিয়াছেন, সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অগ্ন্যান্ত নানা লোকের মুখ হইতে সংবাদ পাইতে লাগিলেন। রুক্মিণীর সহিত যে লোকেরা গিয়াছিল তাহারা এক সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, যুবরাজকে রায়গড়ে দেখিয়া আসিলাম। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়?” তাহারা কহিল, “সে আর ফিরিয়া আসিল না, সে সেইখানেই রহিল।”

তখন প্রতাপাদিত্য মুক্তিয়ার খাঁ নামক তাহার এক পাঠান সেনাপতিকে ডাকিয়া তাহার প্রতি গোপনে কী একটা আদেশ করিলেন। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্যের পূর্বেই মহিষী ও বিভা উদয়াদিত্যের পলায়ন-সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। উভয়েই ভয়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছিলেন যে, মহারাজ যখন জানিতে পারিবেন, তখন না জানি কী করিবেন। প্রতিদিন মহারাজ যখন এক-একটি করিয়া সংবাদ পাইতেছিলেন, আশঙ্কায় উভয়ের প্রাণ ততই আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে সপ্তাহ গেল, অবশেষে মহারাজ বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। ক্রোধের আভাস মাত্র প্রকাশ করিলেন না। মহিষী আর সংশয়ে থাকিতে না পারিয়া একবার প্রতাপাদিত্যের কাছে

গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ উদয়াদিত্য সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। মহারাজও সে-বিষয়ে কোনো কথা উত্থাপিত করিলেন না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া মহিষী বলিয়া উঠিলেন, মহারাজ, আমার এক ভিক্ষা রাখো, এবার উদয়কে মাপ করো। বাছাকে আরো যদি কষ্ট দাও তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব।”

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্তিভাবে কহিলেন, “আগে হইতে যে তুমি কাঁদিতে বসিলে! আমি তো কিছুই করি নাই।”

পাছে প্রতাপাদিত্য আবার সহসা ঝাঁকিয়া দাঁড়ান এই নিমিত্ত মহিষী ও-কথা আর দ্বিতীয় বার উত্থাপিত করিতে সাহস করিলেন না। ভীত মনে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, মহারাজের কোনো প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। তাহাই দেখিয়া মহিষী ও বিভা আশঙ্কিত হইলেন। মনে করিলেন, উদয়াদিত্য স্থানান্তরে যাওয়ার মহারাজ মনে মনে বুঝি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এখন কিছুদিনের জন্ত মহিষী একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

ইতিপূর্বেই মহিষী বিভাকে বলিয়াছেন ও বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন যে বিভাকে শগুনবাড়ি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র রায় এক পত্র লিখিয়াছেন। বিভার মনে আর আহলাদ ধরে না। রামমোহনকে বিদায় করিয়া অবধি বিভার মনে আর এক মুহূর্তের জন্ত স্বস্তি ছিল না। যখনই সে অবসর পাইত তখনই ভাবিত “তিনি কী মনে করিতেছেন? তিনি কি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন? হয়তো তিনি রাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি আমাকে কি মাপ করিবেন না? হা জগদীশ্বর, বুঝাইয়া বলিব কবে? কবে আবার দেখা হইবে?” উল্টিয়া পাল্টিয়া বিভা ক্রমাগত এই কথাই ভাবিত। দিবানিশি তাহার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা চাপিয়া ছিল। মহিষীর কথা শুনিয়া বিভার কী অপরিণীত আনন্দ হইল, তাহার মন হইতে কী ভয়ানক একটা গুরুভার তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। লজ্জা-শরম দূর করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সে তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কতকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মা কাঁদিতে লাগিলেন। বিভা যখন মনে করিল তাহার স্বামী তাহাকে ভুল বুঝেন নাই, তাহার মনের কথা ঠিক বুঝিয়াছেন—তখন তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ নন্দনকানন হইয়া উঠিল। তাহার স্বামীর হৃদয়কে কী প্রশস্ত বলিয়াই মনে হইল! তাহার স্বামীর ভালোবাসার উপর কতখানি বিশ্বাস, কতখানি আস্থা জন্মিল! সে মনে করিল, তাহার স্বামীর

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৫০১

ভালোবাসা এ জগতে তাহার অটল আশ্রয়। সে যে এক বলিষ্ঠ মহাপুরুষের বিশাল হৃদয়ে তাহার ক্ষুদ্র স্বকুমার লতাটির মতো বাহু জড়াইয়া নির্ভয়ে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সে নির্ভর হইতে কিছুতেই সে বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মতো প্রশান্ত, নির্মল হইয়া গেল। সে এখন তাহার ভাই সমরাদিত্যের সঙ্গে ছেলেমাছুষের মতো কত কী খেলা করে। ছোটো মেয়ের মেয়েটির মতো তাহার মায়ের কাছে কত কী আবদার করে, তাহার মায়ের গৃহকার্ঘ্যে সাহায্য করে। আগে যে তাহার একটি বাক্যহীন নিতর বিষন্ন ছায়ার মতো ভাব ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেছে—এখন তাহার প্রফুল্ল হৃদয়খানি পরিষ্কৃত প্রভাতের তায় তাহার সর্বদেহে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার মতো সে সংকোচ, সে লজ্জা, সে বিবাদ, সে অভিমান, সেই নীরব ভাব আর নাই; সে এখন আনন্দভরে বিশ্বস্তভাবে মায়ের সহিত এত কথা বলে যে আগে হইলে বলিতে লজ্জা করিত, ইচ্ছাই হইত না। মেয়ের এই আনন্দ দেখিয়া মায়ের অসীম স্নেহ উখলিয়া উঠিল। মনের ভিতরে ভিতরে একটা ভাবনা জাগিতেছে বটে, কিন্তু বিভার নিকট আভাসেও সে ভাবনা কখনো প্রকাশ করেন নাই। মা হইয়া আবার কোন্ প্রাণে বিভার সেই বিমল প্রশান্ত হাসিটুকু একতিল মলিন করিবেন। এইজন্ত মেয়েটি প্রতিদিন চোখের সামনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, মা হস্তমুখে অপরিতুষ্ট নয়নে তাহাই দেখেন।

মহিষীর মনের ভিতর নাকি একটা ভয়, একটা সন্দেহ বর্তমান ছিল, তারই জন্ত আজ কাল করিয়া এ-পর্যন্ত বিভাকে আর প্রাণ ধরিয়া খণ্ডরালয়ে পাঠাইতে পারিতেছেন না। দুই-এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, উদয়াদিত্যের বিষয়ে সকলেই একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কেবল বিভার সম্বন্ধে যে কী করিবেন, মহিষী এখনো তাহার একটা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন আরো কিছু দিন গেল। যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই বিভার অধীরতা বাড়িতেছে। বিভা মনে করিতেছে, যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই সে যেন তাহার স্বামীর নিকট অপরাধী হইতেছে। তিনি যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আর কিসের জন্ত বিলম্ব করা। একবার তিনি বার্দনা করিয়াছেন, আবার। কয়েক দিন বিভা আর কিছু বলিল না, অবশেষে একদিন আর থাকিতে পারিল না; মায়ের কাছে গিয়া মায়ের গলা ধরিয়া মায়ের হৃদয় দিকে চাহিয়া বিভা কহিল, “মা।” ওই কথাতেই তাহার মা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, বিভাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “কী বাছ।” বিভা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কহিল, “মা, তুমি আমাকে কবে পাঠাইবি মা।” বলিতে

বলিতে বিভার মুখ কান লাল হইয়া উঠিল। মা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় পাঠাইব বিত্ত।” বিভা মিনতিস্বরে কহিল, “বলো না মা।” মহিষী কহিলেন, “আর কিছুদিন সবুয় করো বাছা। শীঘ্রই পাঠাইব।” বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বহুদিনের পর উদয়াদিত্য রায়গড়ে আসিলেন, কিন্তু আগেকার মতো তেমন আনন্দ আর পাইলেন না। মনের মধ্যে একটা ভাবনা চাপিয়া ছিল, তাই কিছুই তেমন ভালো লাগিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, দাদামহাশয় যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহার যে কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই, পিতা যে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন এমন তো বোধ হয় না। আমার কী কুস্কণেই জন্ম হইয়াছিল। তিনি বসন্ত রায়ের কাছে গিয়া কহিলেন, “দাদামহাশয়, আমি যাই, যশোহরে কিরিয়া যাই। প্রথম প্রথম বসন্ত রায় গান গাহিয়া হাসিয়া এ-কথা উড়াইয়া দিলেন ; তিনি গাহিলেন,

আর কি আমি ছাড়ব তোরে।

মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম

জোর করে রাখিব ধরে।

শূন্য করে হৃদয়-পুরী প্রাণ যদি করিলে চুরি

তুমিই তবে থাকো সেথায়

শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।

অবশেষে উদয়াদিত্য বার বার কহিলে পর বসন্ত রায়ের মনে আঘাত লাগিল, তিনি গান বন্ধ করিয়া বিষণ্ণমুখে কহিলেন, “কেন দাদা, আমি কাছে থাকিলে তোর কিসের অসুখ?” উদয়াদিত্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

উদয়াদিত্যকে উন্ননা দেখিয়া বসন্ত রায় তাঁহাকে সুখী করিবার জন্ত দিনরাত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সেতার বাজাইতেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, উদয়াদিত্যের জন্ত প্রায় তাঁহার রাজকার্য বন্ধ হইল। বসন্ত রায়ের ভয় পাছে উদয়াদিত্যকে না রাখিতে পারেন, পাছে উদয়াদিত্য আবার যশোহরে চলিয়া যান। দিনরাত তাঁহাকে চোখে চোখে রাখেন, তাঁহাকে বলেন. “দাদা, তোকে আর সে পাষণহৃদয়ের দেশে যাইতে দিব না।”

দিনকতক থাকিতে থাকিতে উদয়াদিত্যের মনের ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৫০৩

আসিল। অনেকদিনের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া সংকীর্ণপ্রসর পাষণময় চারিটি কারাভিত্তি হইতে মুক্ত হইয়া বসন্ত রায়ের কোমল হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার অসীম স্নেহের মধ্যে বাস করিতেছেন। অনেকদিনের পর চারিদিকে গাছপালা দেখিতেছেন, আকাশ দেখিতেছেন, দিগ্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত উন্মুক্ত উষার আলো দেখিতেছেন, পাখির গান শুনিতেছেন, দূর দিগন্ত হইতে হু হু করিয়া সর্বাঙ্গে বাতাস লাগিতেছে, রাত্রি হইলে সমস্ত আকাশময় তারা দেখিতে পান, জ্যোৎস্নার প্রবাহের মধ্যে ভুবিনা যান, ঘুমন্ত স্তব্ধতার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন। যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আর বাধা নাই। ছেলেবেলা যে-সকল প্রজারা উদয়াদিত্যকে চিনিত, তাহারা দূর-দূরান্তর হইতে উদয়াদিত্যকে দেখিবার জন্য আসিল। গন্ধাধর আসিল, কটিক আসিল, হবিচাচা ও করিমউল্লা আসিল, মথুর তাহার তিনটি ছেলে সঙ্গে করিয়া আসিল, পরান ও হরি দুই ভাই আসিল, শীতল সর্দার খেলা দেখাইবার জন্য পাঁচজন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া আসিল। প্রত্যহ যুবরাজের কাছে প্রজারা আসিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাদের কত কী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এখনো যে উদয়াদিত্য তাহাদিগকে ভোলেন নাই তাহা দেখিয়া প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইল। মথুর কহিল, “মহারাজ, আপনি যে-মাসে রায়গড়ে আসিয়াছিলেন সেই মাসে আমার এই ছেলেটি জন্মায়, আপনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, তার পরে আপনার আশীর্বাদে আমার আরো দুটি সন্তান জন্মিয়াছে।” বলিয়া সে তাহার তিন ছেলেকে যুবরাজের কাছে আনিয়া কহিল, “প্রণাম করো।” তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরান আসিয়া কহিল, “এখান হইতে যশোরে যাইবার সময় হজুর যে-নৌকায় গিয়াছিলেন, আমি সেই নৌকায় মাঝি ছিলাম, মহারাজ।” শীতল সর্দার আসিয়া কহিল, “মহারাজ, আপনি যখন রায়গড়ে ছিলেন, তখন আমার লাঠিখেলা দেখিয়া বকশিশ দিয়াছিলেন, আজ ইচ্ছা আছে একবার আমার ছেলেদের খেলা মহারাজকে দেখাইব। এস তো বাপধন, তোমরা এগোও তো।” বলিয়া ছেলেদের ডাকিল। এইরূপ তাহ সকাল হইলে উদয়াদিত্যের কাছে দলে দলে প্রজারা আসিত ও সকলে একত্রে মিলিয়া কথা কহিত।

এইরূপ স্নেহের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, গীতোচ্ছ্বাসের মধ্যে থাকিয়া স্বভাবতই উদয়াদিত্যের মন হইতে ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। তিনি চোখ বুজিয়া মনে করিলেন, পিতা হয়তো রাগ করেন নাই, তিনি হয়তো সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নহিলে এত দিন আর কি কিছু করিতেন না।

কিন্তু একরূপ চোখ বাঁধা বিশ্বাসে বেশিদিন মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার দাদামহাশয়ের জন্ত মনে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল। যশোহরে কিরিয়া যাইবার কথা দাদামহাশয়কে বলা বুধা; তিনি স্থির করিলেন—একদিন লুকাইয়া যশোহরে পলাইয়া যাইব। আবার সেই কারাগার মনে পড়িল। কোথায় এই আনন্দের স্বাধীনতা আর কোথায় সেই সংকীর্ণ ক্ষুদ্র কারাগারের একঘেয়ে জীবন। কারাগারের সেই প্রতিমুহূর্তকে এক-এক বৎসর রূপে মনে পড়িতে লাগিল। সেই নিরালোক, নির্জন, বায়ুহীন, বন্ধ ঘরটি কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শরীর শিহরিয়া উঠিল। তবুও স্থির করিলেন, এখান হইতে একদিন সেই কারাগারের অভিমুখে পলাইতে হইবে। আজই পলাইব—এমন কথা মনে করিতে পারিলেন না। একদিন পলাইব—মনে করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আজ বৃহস্পতিবার, বারবেলা, আজ যাত্রা হইতে পারে না, কাল হইবে। আজ দিন বড়ো খারাপ। সকাল হইতে ক্রমাগত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত আকাশ লেপিয়া মেঘ করিয়া আছে। আজ সন্ধ্যাবেলার রায়গড় ছাড়িয়া যাইতেই হইবে বলিয়া উদয়াদিত্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সকালে যখন বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, তখন বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, “দাদা, কাল রাত্রে আমি একটা বড়ো দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটা ভালো মনে পড়িতেছে না, কেবল মনে আছে, তোতে আমাতে যেন জন্মের মতো ছাড়া-ছাড়ি হইতেছে।”

উদয়াদিত্য বসন্ত রায়ের হাতে ধরিয়া কহিলেন, “না, দাদামহাশয়। ছাড়াছাড়ি যদি বা হয় তো জন্মের মতো কেন হইবে?”

বসন্ত রায় অগ্রদিকে চাহিয়া ভাবনার ভাবে কহিলেন, “তা নয় তো জ্ঞান কী। কতদিন আর বাঁচিব বল, বুড়া হইয়াছি।”

গত রাত্রে দুঃস্বপ্নের শেষ তান এখনো বসন্ত রায়ের মনের গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাই তিনি অগ্রমনস্ক হইয়া কী ভাবিতেছিলেন।

উদয়াদিত্য কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “দাদামহাশয়, আবার যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় তো কী হইবে।”

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের গলা ধরিয়া বলিলেন, “কেন ভাই, কেন ছাড়াছাড়ি হইবে? তুই আমাকে ছাড়িয়া যাস নে। এ বুড়া বয়সে তুই আমাকে কেলিয়া পালাস নে ভাই।”

উদয়াদিত্যের চোখে জল আসিল। তিনি বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনের

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৫০৫

অভিসন্ধি যেন বসন্ত রায় কী করিয়া টের পাইয়াছেন। নিখাস ফেলিয়া কহিলেন, “আমি কাছে থাকিলেই যে তোমার বিপদ ঘটবে দাদামহাশয়।”

বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, “কিসের বিপদ ভাই? এ-বয়সে কি আর বিপদকে ভয় করি। মরণের বাড়ি তো আর বিপদ নাই। তা মরণ যে আমার প্রতিবেশী। সে নিত্য আমার তত্ত্ব লইতে পাঠায়, তাহাকে আমি ভয় করি না। যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধা বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাঁরে আসিয়া তাহার নৌকাডুবি হইলই বা।”

উদয়াদিত্য আজ সমস্ত দিন বসন্ত রায়ের সঙ্গে রহিলেন। সমস্ত দিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

বিকালবেলায় বৃষ্টি ধরিয়া গেল, উদয়াদিত্য উঠিলেন। বসন্ত রায় কহিলেন, “দাদা, কোথায় যাস?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “একটু বেড়াইয়া আসি।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “আজ নাই বা গেলি।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “কেন দাদামহাশয়?”

বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, “আজ তুই বাড়ি হইতে বাহির হস নে, আজ তুই আমার কাছে থাক ভাই।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “আমি অধিক দূর যাইব না দাদামহাশয়, এখনই ফিরিয়া আসিব।” বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাসাদের বহির্দ্বারে যাইতেই একজন গ্রহরী কহিল, “মহারাজ আপনার সঙ্গে যাইব?”

যুবরাজ কহিলেন, “না আবশ্যক নাই।”

গ্রহরী কহিল, “মহারাজের হাতে অস্ত্র নাই।”

যুবরাজ কহিলেন, “অস্ত্রের প্রয়োজন কী?”

উদয়াদিত্য প্রাসাদের বাহিরে গেলেন। একটি দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠ আছে, সেই মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। একলা বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে দিনের আলো মিলাইয়া আসিতে লাগিল। মনে কত কী ভাবনা উঠিল। যুবরাজ তাঁহার এই লক্ষ্যহীন উদ্বেগহীন জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কিছু স্থির নাই, কোথাও স্থিতি নাই—পরের মুহূর্তেই কী হইবে তাহার ঠিকানা নাই। বয়স অল্প, এখনো জীবনের অনেক অবশিষ্ট আছে—কোথাও ঘরবাড়ি না বাধিয়া কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পাইয়া এই স্নদূর-বিস্তৃত ভবিষ্যৎ এমন করিয়া

কিরূপে কাটিবে? তাহার পর মনে পড়িল—বিভা। বিভা এখন কোথায় আছে? এতকাল আমিই তাহার স্নেহের সূর্য আড়াল করিয়া বসিয়া ছিলাম, এখন কি সে স্নেহী হইয়াছে? বিভাকে মনে মনে কত আশীর্বাদ করিলেন।

মাঠের মধ্যে রৌদ্রে রাখালদের বসিবার নিমিত্ত অশথ বট থেজুর সুপারি প্রভৃতির এক বন আছে—যুবরাজ তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার করিয়াছে। যুবরাজের আজ পলাইবার কথা ছিল—সেই সংকল্প লইয়া তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। বসন্ত রায় যখন গুনিবেন উদয়াদিত্য পলাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে, তখন তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া করুণ মুখে কেমন করিয়া বলিবেন, “জ্যা, দাদা আমার কাছ হইতে পলাইয়া গেল!” সে ছবি তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

এমন সময়ে একজন রমণী কর্ণশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “এই যে গা এইখানে তোমাদের যুবরাজ—এইখানে।”

দুইজন সৈন্ত মশাল হাতে করিয়া যুবরাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে আরো অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন সেই রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া কহিল, “আমাকে চিনিতে পার কি গা। একবার এইদিকে তাকাও। একবার এইদিকে তাকাও।” যুবরাজ মশালের আলোকে দেখিলেন, রুক্মিণী। সৈন্তগণ রুক্মিণীর ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, “দূর হ মাগী।” সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া কহিতে লাগিল, “এ সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ সব সৈন্তদের এখানে কে আনিয়াছে? আমি আনিয়াছি। আমি তোমার লাগিয়া এত করিলাম, আর তুমি—” যুবরাজ স্তম্ভাৎ রুক্মিণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্তগণ রুক্মিণীকে বলপূর্বক ধরিয়া তফাত করিয়া দিল। তখন মুক্তিয়ার খাঁ সম্মুখে আসিয়া যুবরাজকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “মুক্তিয়ার খাঁ, কী খবর?”

মুক্তিয়ার খাঁ বিনীতভাবে কহিল, “জনাব, আমাদের মহারাজের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আসিতেছি।”

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী আদেশ।”

মুক্তিয়ার খাঁ প্রতাপাদিত্যের স্বাক্ষরিত আদেশপত্র বাহির করিয়া যুবরাজের হাতে দিল।

যুবরাজ পড়িয়া কহিলেন, “ইহার জন্ত এত সৈন্তের প্রয়োজন কী? আমাকে একখানা পত্র লিখিয়া আদেশ করিলেই তো আমি যাইতাম। আমি তো আপনিই

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৫০৭

বাইতেছিলাম, যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কী? এখনই চলো। এখনই যশোহরে ফিরিয়া যাই।” মুক্তিরার খাঁ হাত জোড় করিয়া দিল, “এখনই ফিরিতে পারিব না।” যুবরাজ ভীত হইয়া কহিলেন, “কেন?” মুক্তিরার খাঁ কহিল, “আর-একটি আদেশ আছে, তাহা পালন না করিয়া বাইতে পারিব না।”

যুবরাজ ভীতস্বরে কহিলেন, “কী আদেশ!”

মুক্তিরার খাঁ কহিল, রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজা প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।”

যুবরাজ চমকিয়া উচ্চস্বরে কহিয়া উঠিলেন, “না, করেন নাই, মিথ্যা কথা।”

মুক্তিরার খাঁ কহিল, “আজ্ঞা যুবরাজ, মিথ্যা নহে। আমার নিকট মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।”

যুবরাজ সেনাপতির হাত ধরিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, “মুক্তিরার খাঁ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। মহারাজ আদেশ করিয়াছেন যে, যদি উদয়াদিত্যকে না পাও, তাহা হইলে বসন্ত রায়ের—আমি বখন আপনি ধরা দিতেছি তখন আর কী! আমাকে এখনই লইয়া চলো, এখনই লইয়া চলো—আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চলো, আর বিলম্ব করিয়ো না।”

মুক্তিরার খাঁ কহিল, “যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নাই। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন।”

যুবরাজ অধীর হইয়া কহিলেন, “তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছ। তাঁহার অভিপ্রায় এরূপ নহে। আচ্ছা চলো, যশোহরে চলো। আমি মহারাজের সম্মুখে তোমাদের ধোঁইয়া দিব, তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন, তবে আদেশ সম্পন্ন করিয়ো।”

মুক্তিরার জোড়হস্তে কহিল, “যুবরাজ, মার্জনা করুন, তাহা পারিব না।”

যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া কহিলেন, “মুক্তিরার, মনে আছে, আমি এক গলে সিংহাসন পাইব। আমার কথা রাখো, আমাকে সন্তুষ্ট করো।”

মুক্তিরার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবরাজের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিল। তিনি সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কহিলেন, “মুক্তিরার খাঁ, বৃদ্ধ নিরপরাধ পুণ্যাত্মাকে বধ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না।”

মুক্তিরার খাঁ কহিল, “মনিবের আদেশ পালন করিতে পাপ নাই।”

উদয়াদিত্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, “মিথ্যা কথা। যে ধর্মশাস্ত্রে তাহা

বলে, সে ধর্মশাস্ত্র মিথ্যা। নিশ্চয়ই জানিয়ে মুক্তিরার, পাপ আদেশ পালন করিলে পাপ।”

মুক্তিরার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি গড়ে ফিরিয়া যাই। তোমার সৈন্তসামন্ত লইয়া সেখানে যাও, আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া তার পরে তোমার আদেশ পালন করিযো।”

মুক্তিরার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সৈন্তগণ অধিকতর ঘেসিয়া আসিয়া যুবরাজকে ঘিরিল। যুবরাজ কোনো উপায় না দেখিয়া সেই অন্ধকারে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “দাদামহাশয়, সাবধান।” বন কাঁপিয়া উঠিল, মাঠের প্রান্তে গিয়া সে সুর মলাইয়া গেল। সৈন্তেরা আসিয়া উদয়াদিত্যকে ঘিরিল। উদয়াদিত্য আর-একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “দাদামহাশয়, সাবধান।” এক জন পথিক মাঠ দিয়া যাইতেছিল শব্দ শুনিয়া কাছে আসিয়া কহিল, “কে গা।” উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন “যাও যাও, গড়ে ছুটিয়া যাও, মহারাজকে সাবধান করিয়া দাও।” দেখিতে দেখিতে সেই পথিককে সৈন্তেরা গ্রেপ্তার করিল। যে-কেহ সেই মাঠ দিয়া চলিয়াছিল, সৈন্তেরা অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করিল।

কয়েকজন সৈন্ত উদয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া রহিল, মুক্তিরার খা এবং অবশিষ্ট সৈন্তগণ সৈনিকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া সহজ বেশে গড়ের অভিমুখে গেল। রায়গড়ের শতাব্দিক দ্বার ছিল, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া তাহার গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন সন্ধ্যাকালে বসন্ত রায় বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। ওদিকে রাজবাড়ির ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপূজার শাঁখ ঘণ্টা বাজিতেছে। বৃহৎ রাজবাটিতে কোনো কোলাহল নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ। বসন্ত রায়ের নিয়মাহুসারে অধিকাংশ ভৃত্য সন্ধ্যাবেলায় কিছুক্ষণের জন্ত ছুটি পাইয়াছে।

আহ্নিক করিতে করিতে বসন্ত রায় সহসা দেখিলেন, তাঁহার ঘরের মধ্যে মুক্তিরার খা প্রবেশ করিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “খা সাহেব, এ ঘরে প্রবেশ করিযো না। আমি এখনই আহ্নিক সারিয়া আসিতেছি।”

মুক্তিরার খা ঘরের বাহিরে গিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্ত রায় আহ্নিক সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মুক্তিরার খার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “খা সাহেব, ভালো আছ তো?”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৫০৯

মুক্তিয়ার সেলাম করিয়া সংক্ষেপে কহিল, “হাঁ মহারাজ।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “আহারাদি হইয়াছে?”

মুক্তিয়ার। “আজ্ঞা হাঁ।”

বসন্ত রায়। “আজ তবে তোমার এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই।”

মুক্তিয়ার কহিল, “আজ্ঞা না, প্রয়োজন নাই। কাজ সারিয়া এখনি যাইতে হইবে।”

বসন্ত রায়। “না, তা হইবে না খাঁ সাহেব, আজ তোমাদের ছাড়িব না, আজ এখানে থাকিতেই হইবে।”

মুক্তিয়ার। “না মহারাজ, শীঘ্রই যাইতে হইবে।”

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন বলো দেখি? বিশেষ কাজ আছে বুঝি? প্রতাপ ভালো আছে তো?”

মুক্তিয়ার। “মহারাজ ভালো আছেন।”

বসন্ত রায়। “তবে কী তোমার কাজ, শীঘ্র বলো। বিশেষ জরুরি গুনিয়া উদ্বেগ হইতেছে। প্রতাপের তো কোনো বিপদ ঘটে নাই?”

মুক্তিয়ার। “আজ্ঞে না, তাঁহার কোনো বিপদ ঘটে নাই। মহারাজার একটি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।”

বসন্ত রায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী আদেশ? এখনই বলো।”

মুক্তিয়ার খাঁ এক আদেশপত্র বাহির করিয়া বসন্ত রায়ের হাতে দিল। বসন্ত রায় আলোর কাছে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একে একে সমুদয় সৈন্য দরজার নিকট আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

পড়া শেষ করিয়া বসন্ত রায় ধীরে ধীরে মুক্তিয়ার খাঁর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি প্রতাপের লেখা?”

মুক্তিয়ার কহিল, “হাঁ।”

বসন্ত রায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “খাঁ সাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?”

মুক্তিয়ার কহিল, “হাঁ মহারাজ।”

তখন বসন্ত রায় কাদিয়া বলিয়া উঠিলেন, “খাঁ সাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মারিয়া করিয়াছি।”

কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, অবশেষে আবার কহিলেন, “প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল আমি তাহাকে দিনরাত কোলে করিয়া থাকিতাম, সে আমাকে একমুহূর্ত

ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। সেই প্রতাপ বড়ো হইল, তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলাম, তাহার সন্তানদের কোলে লইলাম—সেই প্রতাপ আজ স্বহস্তে এই লেখা লিখিয়াছে খাঁ সাহেব ?”

মুক্তিয়ার খাঁর চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, সে অধোবদনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “দাদা কোথায় ? উদয় কোথায় ?”

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, “তিনি বন্দী হইয়াছেন। মহারাজের নিকট বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছেন।”

বসন্ত রায় বলিয়া উঠিলেন, “উদয় বন্দী হইয়াছে ? বন্দী হইয়াছে খাঁ সাহেব ? আমি একবার তাহাকে কি দেখিতে পাইব না ?”

মুক্তিয়ার খাঁ জোড়হাত করিয়া কহিল, “না, জনাব, হুকুম নাই।”

বসন্ত রায় শাস্ত্রনেত্রে মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া কহিলেন, “একবার আমাকে দেখিতে দিবে না খাঁ সাহেব !”

মুক্তিয়ার কহিল, “আমি আদেশপালক ভৃত্য মাত্র।”

বসন্ত রায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “এ সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এস সাহেব, তোমার আদেশ পালন করো।”

মুক্তিয়ার তখন মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড়হস্তে কহিল, “মহারাজ, আমাকে মার্জনা করিবেন—আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নাই।”

বসন্ত রায় কহিলেন, “না সাহেব, তোমার দোষ কী ? তোমার কোনো দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জনা করিব কী ?” বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাহুলি করিলেন, কহিলেন, “প্রতাপকে বলিয়ে, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখো খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধ—দেখিয়ে অন্ডায় বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়।”

বলিয়া বসন্ত রায় চোখ বুঁজিয়া ইষ্টদেবতার নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিলেন, দক্ষিণ হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন ও কহিলেন, “সাহেব এইবার।”

মুক্তিয়ার খাঁ ডাকিল, “আবতুল।” আবতুল মুক্ত তলোয়ার হস্তে আসিল। মুক্তিয়ার মুখ কিরাইয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত পরেই রক্তাক্ত অসি হস্তে আবতুল গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। গৃহে রক্তশ্রোত বহিতে লাগিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মুক্তিয়ার খাঁ ফিরিয়া আসিল। রায়গড়ে অধিকাংশ সৈন্য রাখিয়া উদয়াদিত্যকে লইয়া তৎক্ষণাৎ যশোহরে যাত্রা করিল। পথে যাইতে দুই দিন উদয়াদিত্য খাত্ত দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না, কাহারও সহিত একটি কথাও কহিলেন না, কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাবাণমূর্তির ত্রায় স্থির—তাঁহার নেত্রে নিদ্রা নাই, নিমেষ নাই, অশ্রু নাই, দৃষ্টি নাই—কেবলই ভাবিতেছিলেন। নৌকায় উঠিলেন, নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নৌকা চলিতে লাগিল—দাঁড়ের শব্দ শুনিতে লাগিলেন, জলের কল্লোল কানে প্রবেশ করিল। তবুও কিছুই শুনিলেন না, কিছুই দেখিলেন না, কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল, আকাশে তারা উঠিল, মাঝিরা নৌকা বাঁধিয়া রাখিল, নৌকায় সকলেই ঘুমাইল। কেবল জলের শব্দ শুনা যাইতেছে, নৌকার উপর ছোটো ছোটো তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে—যুবরাজ একদৃষ্টে সম্মুখে চাহিয়া সুদূরপ্রসারিত শুভ্র বালির চড়ার দিকে চাহিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে মাঝিরা জাগিয়া উঠিল, নৌকা খুলিয়া দিল, উষার বাতাস বহিল, পূর্বদিক রাঙা হইয়া উঠিল, যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে যুবরাজের দুই চক্ষু ভাসিয়া ছ ছ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল—হাতের উপর মাথা রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল—তীরে গাছপালাগুলি মেঘের মতো চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, চোখ দিয়া সহস্র ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর অবসর বুঝিয়া মুক্তিয়ার খাঁ ব্যথিত হৃদয়ে যুবরাজের নিকট আসিয়া বসিল, বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “যুবরাজ, কী ভাবিতেছেন।” যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন, অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে অবাক হইয়া মুক্তিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুক্তিয়ারের মুখে ‘মমতার ভাব দেখিয়া সহসা রুদ্ধ প্রাণ খুলিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, “ভাবিতেছি, পৃথিবীতে জন্মাইয়া আমি কী করিলাম। আমার জন্ম কী সর্বনাশই হইল। হে বিধাতা, যাহারা দুর্বল এ পৃথিবীতে তাহারা কেন জন্মায়? যাহারা নিজের বলে সংসারে দাঁড়াইতে পারে না, যাহারা পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরে, তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর কী উপকার হয়? তাহারা যাহাকে ধরে, তাহাকেই ডুবায়, পৃথিবীর সকল কাজে বাধা দেয়—নিজেও দাঁড়াইতে পারে না, আর সকলকেও ভারাক্রান্ত করে। আমি একজন দুর্বল ভীক, ঈশ্বর আমাকেই বাঁচাইলেন, আর যাহারা সংসারের আনন্দ ছিল, সংসারের

ভরসা ছিল—আমার জ্ঞাত তাহাদেরই বিনাশ করিলেন। আর না, এ সংসার হইতে আমি বিদায় লইলাম।”

উদয়াদিত্য বন্দিভাবে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে আনীত হইলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহারকে অন্তঃপুরের কক্ষে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিতেই উদয়াদিত্যের শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল, অনিবার্য স্থণায় তাহার সর্ব শরীরের মাংস যেন কুঞ্চিত হইয়া আসিল—তিনি পিতার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্য গভীর স্বরে কহিলেন, “কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?”

উদয়াদিত্য অবিচলিত ভাবে কহিলেন, “আপনি যাহা আদেশ করেন।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নহ।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “না মহারাজ, আমি যোগ্য নহি। আমি আপনার রাজ্য চাহি না। আপনার সিংহাসন-হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।”

প্রতাপাদিত্যও তাহাই চান, তিনি কহিলেন, “তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তাহা কী করিয়া জানিব?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “দুর্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত নিজের স্বার্থের জ্ঞাত কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। বিশ্বাস না করেন যদি, আজ আমি মা কালীর চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিব—আপনার রাজ্যের এক সূচ্যগ্রভূমিও আমি কখনো শাসন করিব না। সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।”

প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “তুমি তবে কী চাও?”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই না, কেবল আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো গারদে পুরিয়া রাখিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি এখনই কাশী চলিয়া যাই। আর-একটি ভিক্ষা—আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন। আমি সেখানে দাদামহাশয়ের নামে এক অতিথিশালা ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।”

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, “আচ্ছা, তাহাই স্বীকার করিতেছি।”

সেইদিনই উদয়াদিত্য মন্দিরে গিয়া প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে শপথ করিয়া কহিলেন, “মা কালী, তুমি সাক্ষী থাকো, তোমার পা ছুঁইয়া আমি শপথ করিতেছি—যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, যশোহরের মহারাজের রাজ্যের এক তিলও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিব না। যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনো করি, তবে এই দাদামহাশয়ের হত্যার পাপ সমস্ত যেন আমারই হয়।” বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৫১৩

মহারানী যখন শুনিলেন, উদয়াদিত্য কান্দী চলিয়া যাইতেছেন, তখন উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহিলেন, “বাবা উদয়, আমাকেও তোর সঙ্গে লইয়া চল।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “সে কী কথা মা। তোমার সমরাদিত্য আছে, তোমার সমস্ত সংসার এখানে রহিল, তুমি যদি এখান হইতে যাও, তবে যশোরে রাজলক্ষ্মী থাকিবে না।”

মহিষী কান্দিয়া কহিলেন, “বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছাড়িয়া গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার লইয়া থাকিব? রাজ্যসংসার পরিত্যাগ করিয়া তুই সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, তোকে সেখানে কে দেখিবে? তোর পিতা পাষণ বলিয়া আমি তোকে ছাড়িতে পারিব না।” মহিষী তাঁহার সকল সম্ভানের মধ্যে উদয়াদিত্যকে অধিক ভালোবাসিতেন, উদয়াদিত্যের জন্ত তিনি বুক কাটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উদয়াদিত্য মায়ের হাত ধরিয়া অশ্রুনেত্রে কহিলেন, “মা, তুমি তো জানই রাজবাড়িতে থাকিলে আমার পদে পদে আশঙ্কার কারণ থাকিবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও মা, আমি বিশ্বেশ্বরের চরণে গিয়া নিরাপদ হই।”

উদয়াদিত্য বিভার কাছে গিয়া কহিলেন, “বিভা, দিদি আমার, কান্দী যাইবার আগে তোকে সুখী করিয়া যাইব। আমি নিজে সঙ্গে করিয়া তোকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইব, এই আমার একমাত্র সাধ আছে।”

বিভা উদয়াদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদামহাশয় কেমন আছেন?”

“দাদামহাশয় ভালো আছেন।” বলিয়াই উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

উদয়াদিত্য ও বিভার যাত্রার উত্তোগ হইতে লাগিল। বিভা মায়ের গলা ধরিয়া কান্দিল। অন্তঃপুরে যে যেখানে ছিল, শ্বশুরালয়ে যাইবার আগে সকলেই বিভাকে নানাপ্রকার সত্বপদেশ দিতে লাগিল।

মহিষী একবার উদয়াদিত্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন, “বাবা, বিভাকে তো লইয়া যাইতেছ, যদি তাহারা অস্বস্ত করে।”

উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, “কেন মা, তাহারা অস্বস্ত করিবে কেন?”

মহিষী কহিলেন, “কী জানি তাহারা যদি বিভার উপর রাগ করিয়া থাকে।”

উদয়াদিত্য কহিলেন, “না মা, বিভা ছেলেমানুষ, বিভার উপর কি তাহার কখনো রাগ করিতে পারে?”

মহিষী কাদিয়া কহিলেন, “বাহা, সাবধানে লইয়া যাইয়ো, যদি তাহার অনাদর করে তবে আর বিভা ঝাটিবে না।”

উদয়াদিত্যের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। বিভাকে যে শ্বশুরালয়ে অনাদর করিতে পারে, আগে তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই। উদয়াদিত্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্মফল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে, দেখিলেন এখনো শেষ হয় নাই। বিভাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিণামস্বরূপে বিভার অদৃষ্টে কী আছে তা কে জানে।

যাত্রার সময় উদয়াদিত্য ও বিভা মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। পাছে যাত্রার বিঘ্ন হয়, মহিষী তখন কাদিলেন না, তাঁহার চলিয়া যাইতেই তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য ও বিভা পিতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন, বাড়ির অগ্রাগ্র গুরুজনদের প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য সমরাদিত্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আপনার মনে কহিলেন, “বৎস, যে সিংহাসনে তুমি বসিবে, সে সিংহাসনের অভিশাপ তোমাকে স্পর্শ যেন না করে।” রাজ-বাড়ির ভৃত্যেরা উদয়াদিত্যকে বড়ো ভালোবাসিত, তাহার একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সকলে কাদিতে লাগিল। অবশেষে মন্দিরে গিয়া উভয়ে দেবতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

শোক বিপদ অত্যাচারের রক্তভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন এ-বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোরহৃদয় রাজবাটী আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের তায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে বড়ঘর, যথেষ্টাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহমমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত দুই হাত বাড়াইয়া দিল। তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। নদীর পূর্ব পারে বনাস্তের মধ্য হইতে কিরণের ছটা উর্ধ্বশিখা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালার মাথার উপরে সোনার আভা পড়িয়াছে। লোকজন জাগিয়া উঠিয়াছে, মাঝিরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, “জন্ম

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৫১৫

জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্রামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাই, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।”

নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝিদের গান ও জলের কল্লোল শুনিতে শুনিতে উভয়ে অগ্রসর হইলেন। বিভার প্রশান্তহৃদয়ে আনন্দের উবালোক বিরাজ করিতেছিল, তাহার মুখে-চোখে অকণ্ঠের দীপ্তি। সে যেন এতদিনের পর একটা দুঃস্থ হইতে জাগিয়া উঠিয়া জগতের মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। বিভা যাইতেছে। কাহার কাছে যাইতেছে? কে তাহাকে ডাকিতেছে? অনন্ত অচল প্রেম তাহাকে ডাকিয়াছে, বিভা ছোট পাখিদের মতো ডানা ঢাকিয়া সেই কোমল প্রেমের স্তরের মধ্যে আরামে বিশ্বস্তহৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে। জগতের চারিদিকে সে আজ স্নেহের সমুদ্র দেখিতে পাইতেছে। উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে ডাকিয়া জলের কল্লোলের ত্রাস হৃদয়ে তাহাকে কত কী কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। বাহা শুনিল, বিভার তাহাই ভালো লাগিল।

রামচন্দ্র রায়ের রাজ্যের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিল। চারিদিক দেখিয়া বিভার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হইল। কী সুন্দর শোভা। কুটিরগুলি দেখিয়া লোকজনদের দেখিয়া বিভার মনে হইল সকলে কী সুখেই আছে। বিভার ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রজাদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের রাজার কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। প্রজাদিগকে দেখিয়া তাহার মনে মনে কেমন একপ্রকার অপূর্ব স্নেহের উদয় হইল। যাহাকে দেখিল, সকলকেই তাহার ভালো লাগিল। মাঝে মাঝে দুই-একজন দরিদ্র দেখিতে পাইল; বিভা মনে মনে কহিল, “আহা, ইহার এমন দশা কেন? আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইহাকে ডাকাইয়া পাঠাইব। যাহাতে ইহার দুঃখ মোচন হয়, তাহাই করিব।” সকলই তাহার আপনার বলিয়া মনে হইল। এ-রাজ্যে যে দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। বিভার ইচ্ছা করিতে লাগিল প্রজারা তাহার কাছে আসিয়া একবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকে, তাহার কাছে নিজের নিজের দুঃখ নিবেদন করে ও সে সেই দুঃখ দূর করিয়া দেয়।

রাজধানীর নিকটবর্তী গ্রামে উদয়াদিত্য নৌকা লাগাইলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, রাজবাটীতে তাঁহাদের আগমন-বার্তা বলিয়া পাঠাইবেন ও তাহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে। যখন নৌকা লাগাইলেন, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য মনে করিলেন কাল প্রাতে লোক পাঠানো যাইবে। বিভার মনের ইচ্ছা আজই সংবাদ দেওয়া হয়।

উদয়াদিত্য কহিলেন, “না মা, বিভা ছেলেমানুষ, বিভার উপর কি তাহারা কখনো রাগ করিতে পারে?”

মহিষী কাদিয়া কহিলেন, “বাহা, সাবধানে লইয়া যাইয়ো, যদি তাহারা অনাদর করে তঁবে আর বিভা ঝাঁচিবে না।”

উদয়াদিত্যের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। বিভাকে যে শ্বশুরালয়ে অনাদর করিতে পারে, আগে তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই। উদয়াদিত্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্মকল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে, দেখিলেন এখনো শেষ হয় নাই। বিভাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিণামস্বরূপে বিভার অদৃষ্টে কী আছে তা কে জানে।

যাত্রার সময় উদয়াদিত্য ও বিভা মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। পাছে যাত্রার বিঘ্ন হয়, মহিষী তখন কাদিলেন না, তাহারা চলিয়া যাইতেই তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য ও বিভা পিতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন, বাড়ির অগ্রাঙ্গ গুরুজনদের প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য সমরাদিত্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আপনার মনে কহিলেন, “বৎস, যে সিংহাসনে ভূমি বসিবে, সে সিংহাসনের অভিশাপ তোমাকে স্পর্শ যেন না করে।” রাজ-বাড়ির ভৃত্যেরা উদয়াদিত্যকে বড়ো ভালোবাসিত, তাহারা একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সকলে কাদিতে লাগিল। অবশেষে মন্দিরে গিয়া উভয়ে দেবতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

শোক বিপদ অত্যাচারের রক্তভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন এ-বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোরহৃদয় রাজবাটী আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ত্রায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে বড়ঘন, ষথেষ্টচারিতা, রক্তলালসা, দুর্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহমমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত দুই হাত বাড়াইয়া দিল। তখন সবে প্রভাত হইয়াছে। নদীর পূর্ব পারে বনাস্তের মধ্য হইতে কিরণের ছটা উর্ধ্বশিখা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালার মাথার উপরে সোনার আভা পড়িয়াছে। লোকজন জাগিয়া উঠিয়াছে, মাঝিরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, “জন্ম

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৫১৫

কিন্তু যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্রামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাই, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।”

নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝিদের গান ও জলের কল্লোল শুনিতে শুনিতে উভয়ে অগ্রসর হইলেন। বিভার প্রশান্তহৃদয়ে আনন্দের উবালোক বিরাজ করিতেছিল, তাহার মুখে-চোখে অকণ্ঠের দীপ্তি। সে যেন এতদিনের পর একটা দুঃখপূর্ণ হইতে হ্রাসিয়া উঠিয়া জগতের মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। বিভা যাইতেছে। কাহার কাছে যাইতেছে? কে তাহাকে ডাকিতেছে? অনন্ত অচল প্রেম তাহাকে ডাকিয়াছে, বিভা ছোট পাখিদের মতো ডানা ঢাকিয়া সেই কোমল প্রেমের স্তরের মধ্যে আরামে বিশ্বস্তহৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে। জগতের চারিদিকে সে আজ স্নেহের সমুদ্র দেখিতে পাইতেছে। উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে ডাকিয়া জলের কল্লোলের গায় যুদ্ধের তাহাকে কত কী কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। যাহা শুনিল, বিভার তাহাই ভালো লাগিল।

রামচন্দ্র রায়ের রাজ্যের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিল। চারিদিক দেখিয়া বিভার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হইল। কী সুন্দর শোভা। কুটিরগুলি দেখিয়া লোকজনদের দেখিয়া বিভার মনে হইল সকলে কী সুখেই আছে। বিভার ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রজাদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের রাজার কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। প্রজাদিগকে দেখিয়া তাহার মনে মনে কেমন একপ্রকার অপূর্ব স্নেহের উদয় হইল। যাহাকে দেখিল, সকলকেই তাহার ভালো লাগিল। মাঝে মাঝে দুই-একজন দরিদ্র দেখিতে পাইল; বিভা মনে মনে কহিল, “আহা, ইহার এমন দশা কেন? আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইহাকে ডাকাইয়া পাঠাইব। যাহাতে ইহার দুঃখ মোচন হয়, তাহাই করিব।” সকলই তাহার আপনার বলিয়া মনে হইল। এ-রাজ্যে যে দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। বিভার ইচ্ছা করিতে লাগিল প্রজারা তাহার কাছে আসিয়া একবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকে, তাহার কাছে নিজের নিজের দুঃখ নিবেদন করে ও সে সেই দুঃখ দূর করিয়া দেয়।

রাজধানীর নিকটবর্তী গ্রামে উদয়াদিত্য নৌকা লাগাইলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, রাজবাটীতে তাঁহাদের আগমন-বার্তা বলিয়া পাঠাইবেন ও তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে। যখন নৌকা লাগাইলেন, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য মনে করিলেন কাল প্রাতে লোক পাঠানো যাইবে। বিভার মনের ইচ্ছা আত্মই সংবাদ দেওয়া হয়।

ষট্টিত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আজ লোকজনেরা ভারি ব্যস্ত। চারিদিকে বাজনা বাজিতেছে। গ্রামে যেন একটি উৎসব পড়িয়াছে। একে বিভার প্রাণে অধীর আনন্দ জাগিতেছে, তাহার পরে চারিদিকে বাজনার শব্দ শুনিয়া তাহার হৃদয় যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পাছে উদয়াদিত্যের কাছে তাহার এই অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এইজন্য কত কষ্টে সে হাসি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে। উদয়াদিত্য নদীতীরে উৎসবের ভাব দেখিয়া কী হইতেছে জানিবার জন্য গ্রামে বেড়াইতে গেলেন।

এমন কিছুক্ষণ গেল। একজন তীর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, “কাহাদের নৌকা না?” নৌকা হইতে রাজবাটীর ভৃত্যেরা বলিয়া উঠিল, “কে ও? রামমোহন যে? আরে, এস এস।” রামমোহন তাড়াতাড়ি নৌকার প্রবেশ করিল। নৌকার একলা বিভা বসিয়া আছে, রামমোহনকে দেখিয়া হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, “মোহন।”

রামমোহন। “মা।”

রামমোহন বিভার সেই সরল আনন্দে পরিপূর্ণ হাসিহাসি মুখখানি অনেকক্ষণ দেখিয়া স্নানমুখে কহিল, “মা তুমি আসিলে?”

বিভা তাড়াতাড়ি কহিল, “হাঁ, মোহন। মহারাজ কি ইহারই মধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন? তুই কি আমাকে লইতে আসিয়াছিস?”

রামমোহন কহিল, “না মা, অত ব্যস্ত হইয়ো না। আজ থাক, আর-একদিন লইয়া যাইব।”

রামমোহনের ভাব দেখিয়া বিভা একেবারে মলিন হইয়া গিয়া কহিল, “কেন মোহন, আজ কেন যাইব না।”

রামমোহন কহিল, “আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—আজ থাক মা।”

বিভা নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, “সত্য করিয়া বল মোহন কী হইয়াছে?”

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না। আত্মগোপন করা তাহার অভ্যাস নাই। সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল, কান্দিয়া কহিল, “মা জননী, আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই; তোমার রাজবাটীতে তোমার গৃহ নাই। আজ মহারাজ বিবাহ করিতেছেন।”

বিভার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার হাত-পা হিম হইয়া গেল।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৫১৭

রামমোহন কহিতে লাগিল, “মা, যখন তোর এই অধম সন্তান তোকে ডাকিতে গিয়াছিল, তখন তুই কেন আসিলি না মা ? তখন তুই নিষ্ঠুর পাষাণী হইয়া আমাকে কেন ফিরাইয়া দিলি মা ? মহারাজের কাছে আমার যে আর মুখ রহিল না। বুক কাটিয়া গেল, তবু যে তোর হইয়া একটি কথাও কহিতে পারিলাম না।”

বিভা আর চোখে কিছু দেখিতে পাইল না, মাথা ঘুরিয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। রামমোহন তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বিভার মুখে-চোখে ছিটা দিল। কিছুক্ষণ পরে বিভা উঠিয়া বসিল। এক আঘাতে বিভার সমস্ত জগৎ ভাঙিয়া গেছে। স্বামীর রাজ্যের মধ্যে আসিয়া রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া, রাজপুরীর দুয়ারে আসিয়া তুষার্ত-হৃদয় বিভার সমস্ত স্নেহের আশা মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল।

বিভা আকুলভাবে কহিল, “মোহন, তিনি যে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন— আমার আসিতে কি বড়ো বিলম্ব হইয়াছে ?”

মোহন কহিল, “বিলম্ব হইয়াছে বই কি।”

বিভা অধীর হইয়া কহিল, “আর কি মার্জনা করিবেন না ?”

মোহন কহিল, “মার্জনা আর করিলেন কই।”

বিভা কহিল, “মোহন, আমি কেবল একবার তাঁহাকে দেখিতে যাইব।” বলিয়া উর্ধ্বাঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল।

রামমোহন চোখ মুছিয়া কহিল, “আজ থাক না, মা।”

বিভা কহিল, “না মোহন, আমি আজই একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।”

রামমোহন কহিল, “যুবরাজ আগে গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসুন।”

বিভা কহিল, “না মোহন, আমি এখনই একবার যাই।”

বিভা মনে করিয়াছিল, উদয়াদিত্য এ সংবাদ শুনিলে অপমানের ভয়ে পাছে না যাইতে দেন।

রামমোহন কহিল, “তবে একখানি শিবিকা আনাই।”

বিভা কহিল, “শিবিকা কেন ? আমি কি রানী যে শিবিকা চাই। আমি একজন সামান্ত প্রজার মতো, একজন ভিখারিনীর মতো যাইব, আমার শিবিকায় রাজ কী ?”

রামমোহন কহিল, “আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা দেখিতে পারিব না।”

বিভা কাতর স্বরে কহিল, “মোহন, তোর পায়ে পড়ি আমাকে আর বাধা দিও না, বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।”

রামমোহন ব্যথিতহৃদয়ে কহিল, “আচ্ছা মা, তাহাই হউক।”

বিভা সামান্ত রমণীর বেশে নৌকা হইতে বাহির হইল। নৌকার ভৃত্যরা আসিয়া কহিল, “এ কী মা, এমন করিয়া এ-বেশে কোথায় যাও !”

রামমোহন কহিল, “এ তো মায়েরই রাজ্য, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারেন।”

ভৃত্যরা আপত্তি করিতে লাগিল, রামমোহন তাহাদের ভাগাইয়া দিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চারিদিকে লোকজন, চারিদিকেই ভিড়। আগে হইলে বিভা সংকেতে মরিয়া যাইত, আজ কিছুই যেন তাহার চোখে পড়িতেছে না। যাহা কিছু দেখিতেছে সমস্তই যেন বিভার মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে। চারিদিকে যেন একটা কোলাহলময় স্বপ্নের ঘেঁষাঘেঁষি—কিছুই যেন কিছু নয়। চারিদিকে একটা ভিড় চোখে পড়িতেছে এই পর্বন্ত, চারিদিক হইতে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে এই পর্বন্ত, তাহার যেন একটা কোনো অর্থ নাই।

ভিড়ের মধ্য দিয়া রাজপুত্রীর ঘরের নিকট আসিতেই একজন দ্বারী সহসা বিভার হাত ধরিয়া বিভাকে নিবারণ করিল, তখন সহসা বিভা একমুহুর্তে বাহু জগতের মধ্যে আসিয়া পড়িল, চারিদিক দেখিতে পাইল, লজ্জায় মরিয়া গেল। তাহার বোমটা খুলিয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি মাথার বোমটা তুলিয়া দিল। রামমোহন আগে আগে যাইতেছিল, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারীর প্রতি চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইল। অদূরে কর্ণাণ্ডিজ ছিল, সে আসিয়া দ্বারীকে ধরিয়া বিলক্ষণ শাসন করিল। বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অগ্ন্যগ্ন দাসদাসীর দ্বারা বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল, কেহ তাহাকে সমাদর করিল না।

ঘরে কেবল রাজা ও রমাই ভাঁড় বসিয়াছিলেন। বিভা গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজার পায়ের কাছে ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাজা শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুই? ভিথারিনী? ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিস?”

বিভা নত মুখ তুলিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, “না মহারাজ, আমার সর্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি।”

বউ-ঠাকুরানীর হাট

৫১৯

রামমোহন থাকিতে পারিল না, কাছে আসিয়া কহিল, “মহারাজ, আপনার মহিষী—যশোহরের রাজকুমারী।”

সহসা রামচন্দ্র রায়ের প্রাণ যেন কেমন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমাই ভাঁড় হাসিয়া রাজার দিকে কটাক্ষ করিয়া কঠোরকণ্ঠে কহিল, “কেন, এখন কি আর দাদাকে মনে ধরে না নাকি?”

রামচন্দ্র রায়ের হৃদয়ে করুণার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি রমাইয়ের কথায় তিনি নিষ্ঠুর হাস্য করিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিভাকে এখন মমতা দেখাইলে পাছে উপহাসাসম্পদ হইতে হয়।

বিভার মাথায় একেবারে সহস্র বজ্রঘাত হইল, সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। চোখ বুজিয়া মনে মনে কহিল, —মা গো, বসুন্ধরা, তুমি বিধা হও। কাতর হইয়া চারিদিকে চাহিল, রামমোহনের মুখের দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

রামমোহন ছুটিয়া আসিয়া সবলে রমাই ভাঁড়ের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ধর হইতে বাহির করিয়া দিল।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “রামমোহন, তুই আমার সম্মুখে বেয়াদবি করিস।”

রামমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, “মহারাজ, আমি বেয়াদবি করিলাম! তোমার মহিষীকে—আমার মা-ঠাকরুনকে বেটা অপমান করিল—উহার হইয়াছে কী, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম রামমোহন।”

রাজা রামমোহনকে ধমক দিয়া কহিলেন, “কে আমার মহিষী? আমি উহাকে চিনি না।”

বিভার মুখ নীল হইয়া গেল, সে মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল, থর থর করিয়া তাহার সর্বদ্র কাঁপিতে লাগিল, অবশেষে কাঁপিতে কাঁপিতে বিভা মুহুঁর্তা হইয়া ভূমিতে পড়িল। তখন রামমোহন জোড়হস্তে রাজাকে কহিল, “মহারাজ, আজ চারপুরুষে তোমার বংশে আমরা চাকরি করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি। আজ তুমি আমার মা-ঠাকরুনকে অপমান করিলে, তোমার রাজ্যলক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিলে, আজ আমিও তোমার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম। আমার মা-ঠাকরুনের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও এ রাজবাটীর ছায়া মাড়াইব না।” বলিয়া রামমোহন রাজাকে প্রণাম করিল ও বিভাকে কহিল, “আয় মা, আয়। এখান হইতে নীচ চলিয়া আয়। আর একমুহূর্তও

৫২০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

এখানে থাকা নয়।" বলিয়া বিভাকে ধরিয়া তুলিয়া আনিল। দ্বারের নিকট অনেকগুলি শিবিকা ছিল, তাহার মধ্যে একটিতে হতজ্ঞান অবসন্ন বিভাকে তুলিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

বিভা উদয়াদিত্যের সহিত কানী চলিয়া গেল। সেইখানে দানধ্যান, দেবসেবা ও তাহার ভ্রাতার সেবায় জীবন কাটাইতে লাগিল। রামমোহন যতদিন বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের সঙ্গে ছিল। সীতারামও সপরিবারে কানীতে আসিয়া উদয়াদিত্যের আশ্রয় লইল।

চন্দ্রদ্বীপের যে-হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অত্যাঁপি তাহার নাম রহিয়াছে—

“বউ-ঠাকুরানীর হাট।”

প্রবন্ধ



যুরোপ-প্রবাসীর পত্র যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি



শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত বন্ধুবরেন্দ্র

আমার বয়স ছিল সতেরো। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে গুরুজনের উদ্বেগভাজন হয়েছি। মেজদাদা তখন আমেদাবাদে জজিয়তি করছেন। ভদ্রঘরের ছেলের মানরক্ষার উপযুক্ত ইংরেজি যে-করে-হোক জানা চাই; সেজন্তে আমার বিলেত নির্বাসন ধার্য হয়েছে। মেজদাদার ওখানে কিছু দিন থেকে পল্লন করতে হবে তার প্রথম ভিত, হিতৈষীরা এই স্থির করেছেন। সিভিল সার্ভিসের রঙ্গভূমিতে আমার বিলিতি কায়দার নেপথ্যবিধান হল।

বালক-বয়সে আত্মপ্রকাশটা থাকে চাপা। জীবনে তখন উপর-ওআলাদেরই আধিপত্য; চলৎশক্তির স্বাভাবিকতা দখল করে আদেশ উপদেশ অনুশাসন। স্বভাবত মেনে-চলবার মন আমার নয়, কিন্তু আমি ছিলাম ভোলা মনের মানুষ, আপন খেয়াল নিয়ে থাকতুম, আমাকে দেখতে হত নেহাত ভালোমানুষের মতো। ভাবীকালে বিস্তার কথাই কইতে হয়েছে, তার অঙ্কুরোদগম ছিল নিঃশব্দে। একদিন যখন বারান্দার রেলিং ধরে একলা চুপ করে বসে ছিলাম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে বড়দাদা আমার মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, রবি হবে ফিলজফর। চুপ করে থাকার খেতে ফিলজফি ছাড়াও অন্য ফসল ফলে।

খেতে প্রথম দেখা দিল কাঁটাগাছ, চাষ-না-করা জমিতে। বিশ্বকে খোঁচা মেরে আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করবার সেই ঔদ্ধত্য। হরিণ-বালকের প্রথম শিং উঠলে তার যে চাল হয় সেই উগ্র চাল প্রথমে কৈশোরের। বালক আপন বাল্যসীমা পেরোবার সময় সীমা লঙ্ঘন করতে চায় লাফ দিয়ে। তার পরিচয় শুরু হয়েছিল মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা যখন লিখেছিলাম পনেরো বছর বয়সে। এই সময়েই যাত্রা করেছি বিলেতে। চিঠি যেগুলো লিখেছিলাম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে খাঁটি স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে। বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেতে গেলে তার ভালো লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাহুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্টোটা মূর্তি ধরতে হয়। বলতে হয়, আমি অন্য পাঁচজনের মতো নই,

৫২৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আমার ভালো লাগবার যোগ্য কোথাও কিছুই নেই। সেটা যে চিন্তাদৈন্তের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয় নি।

সাহিত্যে সাবালক হওয়ার পর থেকেই ওই বইটার 'পরে আমার খিক্কার জন্মেছিল। বুঝেছি, যে-দেশে গিয়েছিলুম সেখানকারই যে সন্মানহানি করা হয়েছে তা নয়, ওটাতে নিজেরই সন্মানহানি। বিস্তর লোকের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও বইটা প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমি প্রকাশে বাধা দিলেই ওটা যে অপ্রকাশিত থাকবে এই কৌতূহলমুখর যুগে তা আশা করা যায় না। সেইজন্তে এ লেখার কোন্ কোন্ অংশকে লেখক স্বয়ং গ্রাহ্য এবং ত্যাজ্য বলে স্বীকার করেছে সেটা জানিয়ে রেখে দিলুম। যথাসময়ে ময়লার ঝুলি হাতে আবর্জনা কুড়োবার লোক আসবে, বাজারে সেগুলো বিক্রি হবার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। অনেক অপরাধের অনেক প্রায়শ্চিত্ত বাকি থাকে ইহলোকে, প্রেতলোকে সেগুলো সম্পূর্ণ হতে থাকে।

এ বইটাকে সাহিত্যের পংক্তিতে আমি বসাতে চাই, ইতিহাসের পংক্তিতে নয়। পাঠ্য জিনিসেরই মূল্য সাহিত্যে, অপাঠ্য জিনিসেরও মূল্য ইতিহাসে। ঐতিহাসিককে যদি সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারতুম তবে আমার পক্ষে সেটা পুণ্যকর্ম, স্মরণীয় মুক্তির পথ হত। নিজের কাব্য সম্বন্ধে এই ত্যাগের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে বার বার সংকল্প করেছি। কিন্তু দুর্বল মন, সংঘবদ্ধ আপত্তির বিরুদ্ধে ব্রতপালন করতে পারিনি। বাছাই করবার ভার দিতে হল পরশুপাণি মহাকালের হাতে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগে মহাকালেরও কর্তব্যে ত্রুটি ঘটেছে। বইগুলির বৈষয়িক স্বত্ব হারিয়েছি বলে আরো দুর্বল হতে হল আমাকে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয় নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম। আজ এর বয়স হল প্রায় ষাট। সে-ক্ষেত্রেও আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ত দাখিল করব না। আমার বিশ্বাস বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫২৭

তার পরে লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল, এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিসটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করে নি। এইটে আবিষ্কার করে আমার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে। কেন না, নিন্দানৈপুণ্যের প্রার্থ্য ও চাতুর্যকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। ভালো লাগবার শক্তিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার মানবজীবনে। সাহিত্যে কুৎসাবিলাসীদের ভোজের দাদন আমি নিই নি, আর কিছু না হ'ক, এই পরিচয়টুকু আমি রেখে যেতে চাই।

একটা কথা আপনাকে বলা বাহুল্য। ইংরেজের চেহারা সেদিন আমার চোখে যেমনটা ধরা পড়েছিল সেটা যে নেহাত আমার বাল্যবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞতার সৃষ্টি সে-কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এই প্রাক্কর্ষ ঘটবছরের মধ্যে সেখানকার মানুষের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে ক্রমশ অভিব্যক্তির আখ্যা দেওয়া যায় না। এক-এক সময়ে ইতিহাস-শতরংগের বোড়ে তার এক পা চাল ছেড়ে দিয়ে লম্বা চালে চলতে শুরু করে। পাশ্চাত্যে তাই ঘটেছে। সেদিনকার পাসপোর্টে তার যে ছবিটা ছিল সে ছবি আজ একেবারেই চলবে না।

সেই প্রথম-বয়সে যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলুম ঠিক মুসাফেরের মতো যাই নি। অর্থাৎ রাস্তা থেকে চলতে চলতে বাহির থেকে চোখ বুলিয়ে যাওয়া বরাদ্দ ছিল না। ছিলেম অতিথির মতো, ঘরের মধ্যে প্রবেশ পেয়েছিলুম। সেবা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি, কোথাও কোথাও ঠেকেছি, ছুঁতে পেয়েছি। কিন্তু তার পরে আবার যখন সেখানে গিয়েছি, তখন সভায় থেকেছি, ঘরে নয়। আমার তৎপূর্বকালের অভিজ্ঞতা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ যদি না হয় তবু সত্য। যে ডাক্তারের বাড়িতে ছিলুম তিনি ভদ্রশ্রেণীর এবং শ্রদ্ধেয়, কিন্তু সমুদয় ভদ্রশ্রেণীর প্রতীক তিনি না হতে পারেন। ইংলণ্ডে আজও বর্ণসাম্য যতই থাক্ শ্রেণীভেদ যথেষ্ট। সেখানে এক শ্রেণীর সঙ্গে আর-এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি ও ব্যবহারের মিল না থাকাই স্বাভাবিক। সেদিনও নিঃসন্দেহ ছিল না। আমি সেদিনকার সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের এবং একটি বিলাসিনী-ঘরের পরিচয় কাছে থেকেই পেয়েছি। তার কিছু কিছু বর্ণনা চিঠিগুলির মধ্যে আছে।

কয়েকটি চিঠিতে তখনকার দিনের ইঙ্গবঙ্গের বিবরণ কিছু বিস্তারিত করেই দিয়েছি। আজ এরা লুপ্ত জীব। কোথাও কোথাও তার বর্তমান অভিব্যক্তির কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়, এমন কি যারা বিলেতে যান নি তাঁদেরও কারো কারো চালচলনে ইঙ্গবঙ্গী লক্ষণ অকস্মাৎ ফুটে ওঠে। সেকালের ইঙ্গবঙ্গদের অনেককে আমি প্রত্যক্ষ জানতুম। তাঁদের অনেকখানি পরিচয় পেয়েছি তাঁদের নিজেরই মুখ থেকে। যদি এর মধ্যে কোনো অত্যাঙ্ক থাকে সে তাঁদেরই স্বকৃত। আমার সামনে বর্ণনায় নিজেদেরও বে-আবরু করতে ভয় পান নি, যেহেতু মুখচোরা ভালোমানুষ বালকটিকে তাঁরা বিপদজনক বলে সন্দেহ করেন নি। আজ তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। তাঁরা আছেন বৈতরণীর পরপারে।

আমার বিলাতের চিঠিতে “এবার মলে সাহেব হব” গানটি উদ্ধৃত করেছিলাম। আমার স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ-সাহিত্যে হাশুরসের দৃষ্টান্তস্বরূপ ওই গানটি আমার রচনা বলে প্রচার করেছেন। তাতে অনামা রচয়িতার মান বেঁচে গেছে, কিন্তু আমার বাঁচে নি। আমার বিশ্বাস যথোচিত গবেষণা করলে আমার লেখা থেকে ওর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতেও পারে।

এই পত্রগুলি যখন লেখা হয়েছিল তার বারো বছর পরে আর-এক বার বিলেতে গিয়েছিলাম। তখনো দেশের বদল খুব বেশি হয় নি। সেদিন যে ডায়ারি লিখেছি তাতে আছে আঁচড়কাটা ছবি— একাগাড়িতে চলতে চলতে আশেপাশে এক-নজরে দেখার দৃশ্য।

বইগুলির পুনঃসংস্করণের মুখবন্ধে এই চিঠিখানি আপনাকে সম্বোধন করে লিখেছি। তার কারণ, বিলেত সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক প্রশস্ত ও গভীর—সেই ভূমিকার উপর রেখে এই চিঠিগুলি ও ডায়ারির যথাযোগ্য স্থান নির্ণয় করতে পারবেন এবং ভুলত্রুটি ও অতিভাষণের অপরিহার্যতা অনুমান করে ক্ষমা করাও আপনার পক্ষে কঠিন হবে না। ইতি, ২৯ আগস্ট, ১৯৩৬।

আপনাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুরোপ প্রবাসীর পত্র



উপহার

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই
পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন

রবি

যুবোপ-প্রবাসীর পত্র

প্রথম পত্র

বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা 'পুনা' স্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আন্তে আন্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারদিকের লোকের কোলাহল মইতে না পেয়ে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছিনে, আমার মনটা বড়োই কেমন নির্জীব, অবসন্ন, ত্রিয়মান হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হ'ক গে—ও-সব করুণরসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখলেও হয় তোমার চোখের জল থাকবে না, নয় তোমার ধৈর্য থাকবে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত যে করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিশ্রি জান কিন্তু কী রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পড়েছিলেম, সে-কথা বিস্তারিত করে লিখলে পাষাণেরও চোখে জল আসবে। ছটা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠি নি। যে ঘরে থাকতেন, সেটা অতি অন্ধকার, ছোটো, পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারদিকের জানলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অস্বর্ষস্পর্শরূপ ও অবায়ুস্পর্শ্যদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর করে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন আমার মাথার ভিতর যা-কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করে দিলে, চোখে দেখতে পাই নে, পা চলে না, সর্বাঙ্গ টলমল করে! দু-পা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি করে জাহাজের ডেক-এ নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই নিরাশ্রয় অকুল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে আমাদের জাহাজ একলা চলেছে, যেখানে চাই সেইদিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে—সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য।

সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেম না। মাথা ঘুরতে লাগল। ধরাধরি করে আবার আমার ক্যাবিনে এলেম। সেই যে বিছানায় পড়লেম, ছ-দিন আর এক মুহূর্তের জন্তও মাথা তুলি নি। আমাদের যে স্টুঅর্ড ছিল (যাত্রীদের সেবক)— কারণ জানি নে—আমার উপর তার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্তে খাবার নিয়ে উপস্থিত করত; না খেলে কোনোমতেই ছাড়ত না। সে বলত, না খেলে আমি ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়ব (weak as a rat)। সে বলত, সে আমার জন্তে সব কাজ করতে পারে। আমি তাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ ছেড়ে আসবার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ সারবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছ-দিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম, তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হল। সেদিন আমার স্টুঅর্ড এসে নড়ে চড়ে বেড়াবার জন্তে আমাকে বার বার অতুরোধ করতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে তো উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছি। মাথা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালো রকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মতো শরীরটা যেন আমার ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। ছপুরবেলা দেখি একটা ছোটো নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চলেছে। চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত আর ভাঙা নেই, জাহাজস্বক লোক অবাক। তারা আমাদের স্টীমারকে ডাকতে আরম্ভ করলে, জাহাজ থামল। তারা একটি ছোটো নৌকায় করে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরবদেশীয়, এডেন থেকে মস্কটে যাচ্ছে। পথের মধ্যে দিকভ্রম হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল, তা ভেঙে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন্ দিকে ও কত দূর মস্কট, তাদের দেখিয়ে দিলে, তারা আবার চলতে লাগল। সে নৌকো যে মস্কট পর্যন্ত পৌঁছবে তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল।

২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সমুদ্রে সব পাড়া-পর্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত, সূর্য সবোমাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্বতময় ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কী বলব। পর্বতের উপরে রঙিন মেঘগুলি এমন নত হয়ে পড়েছে যে, মনে হয় যেন অপরিমিত সূর্যকিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৩৩

দুপুরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আয়নার মতো পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোটো ছোটো পাল তোলা নৌকাগুলি আবার কেমন ছবির মতো দেখাচ্ছে।

এডেনে পৌঁছে বাড়ীতে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেম কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি যে এই ক-দিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে, বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে। কী করে লিখব, ভালো মনে আসছে না। ভাবগুলো যেন মাকড়সার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্ছে। কিসের পর কী লিখব, তার একটা ভালোয়কম বন্দোবস্ত করতে পারছি নে। এই অবস্থায় লিখতে আরম্ভ করলেম, এমন বিপদে পড়ে তোমাকে যে লিখতে পারি নি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নেই।

দেখো, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে; আমি যখন বনের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম, তখন দেখতেম দূরদিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, এক বার যদি ওই দিগন্তের আবরণ ভেদ করতে পারি, ওই দিগন্তের যবনিকা ওঠাতে পারি, অমনি আমার স্মৃতিতে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথলে উঠবে। ওই দিগন্তের পরে যে কী আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকত; তখন মনে হত না, ওই দিগন্তের পরে আর-এক দিগন্ত আসবে। কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চলছে না, কেবল একটি দিগন্তের গতির মধ্যে বাঁধা আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সংকীর্ণ যে কেমন ভূখণ্ড হয় না। কিন্তু দেখো, এ-কথা বড়ো গোপনে রাখা উচিত; বান্ধীকি থেকে বায়রন পর্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে-আমার না লাগলে দশজনে যে হেসে উঠবে; গ্যালিলিওর সময়ে এ-কথা বললে হয়তো আমাকে কয়েক ঘেতে হত। এত কবি সমুদ্রের স্তুতিবাদ করেছেন যে আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড়ো একটা গায়ে লাগবে না। যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন বোধ করি সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রের তরঙ্গ উঠলেই আমার এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখাশুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম, তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পড়ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পড়ল। আমি স্বভাবতই 'লেডি' জাতিকে বড়ো ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁষতে গেলে এত প্রকার

বিপদের সম্ভাবনা যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকলে লেড়িদের কাছ থেকে দশ সহস্র হুত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। এক তো মনোরাজ্যে নানাপ্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা—তা ছাড়া সর্বদাই ভয় হয় পাছে কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু লেডি তাঁদের আদবকাঁদার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সহিতে না পেয়ে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে অভিভূত হন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভেবাচেকা খেয়ে যাই, পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগির মাংস কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি—এইরকম সাত-পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাকতাম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেন্টলম্যানেরা সর্বদা খুঁত খুঁত করতেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্ক বা স্ত্রী এক জনও ছিল না।

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। ব—মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসিতামাশা করে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনো বিবেচনা করে, মেজে ঘষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, সকল সময়ে তার মানে না থাকুক, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাভীর্ষ বুঝে হিসাব করে কথা কন না, মেপে জুকে হাসেন না ও দু-দিক বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই সকল কারণে তাঁকে আমার ভালো লাগত। কত প্রকার যে ছেলেমানুষি করেন তার ঠিক নেই। বুদ্ধি বুদ্ধি ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখলে আমার বড়ো ভালো লাগে। আমাকে তিনি 'অবতার' বলতেন, গ্রেগরি সাহেবকে 'গড়গড়ি' বলতেন, আর-এক যাত্রীকে 'রুহি মংস্ত' বলে ডাকতেন; সে-বেচারির অপরাধ কী তা জানি? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বললেও হয়। এই জন্তে ব—মহাশয় তাকে মংস্তশ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আমি যে কেন অবতারশ্রেণীর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম, তার কারণ সহজে নির্দেশ করা যায় না।

আমাদের জাহাজের T—মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতর ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে শুনি নি। তিনি কথা কইতেন না, বক্তৃতা দিতেন। একদিন আমরা দু-চার জনে মিলে জাহাজের ছাতে দু-দুও আমোদপ্রমোদ করছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব—মহাশয় তাঁকে বললেন, 'কেমন সুন্দর তারা উঠেছে'। এই আমাদের ফিলজফর তারার সঙ্গে মনুষ্য-

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৩৫

জীবনের সঙ্গে একটা গভীর সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন—“আমরা ‘মুখের’
চাহিয়া থাকে ক্যাল ক্যাল করিয়া” রইলেম।

আমাদের জাহাজে একটি আশু জনবুল ছিলেন। তাঁর তালবুকের মতো শরীর,
কাঁটার মতো গৌক, শজারুর কাঁটার মতো চুল, হাঁড়ির মতো মুখ, মাছের চোঁথের
মতো ম্যাডমেডে চোখ, তাঁকে দেখলেই আমার গা কেমন করত, আমি পাঁচ হাত
তকাত্তে সরে যেতাম। এক-এক জন কোনো অপরাধ না করলেও তার মুখশ্রী যেন সর্বদা
অপরাধ করতে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুনতে পেতাম তিনি ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ,
হিন্দুস্থানি প্রভৃতি বহু ভাষা জ্ঞানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকরবাকরদের
অজস্র গাল দিতে আরম্ভ করেছেন, ও দশ দিকে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে
কখনো হাসতে দেখি নি; কারো সঙ্গে কথা নেই বার্তা নেই, আপনার ক্যাঁবিনে
গোঁ হয়ে বসে আছেন। কোনো কোনো দিন ডেক-এ বেড়াতে আসতেন, বেড়াতে
বেড়াতে-মাত্র দিকে একবার ক্রপাকটাক্ষে নেত্রপাত করতেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির
মতো মনে করতেন।

প্রত্যহ খাবার সময় ঠিক আমার পাশেই B— বসতেন। তিনি একটি ইয়ুরাশীয়।
কিন্তু তিনি ইংরেজের মতো শিস দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে
সম্পূর্ণরূপে লিখেছেন। তিনি আমাকে বড়োই অল্পগ্রহের চোখে দেখতেন। একদিন
এসে মহাগম্ভীর স্বরে বললেন, “ইয়ং ম্যান, তুমি অক্সফোর্ড যাচ্ছ? অক্সফোর্ড
ইনিভার্সিটি বড়ো ভালো বিদ্যালয়।” আমি একদিন ট্রেঞ্চ সাহেবের “Proverbs
and their lessons” বইখানি পড়ছিলাম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিস দিতে
দিতে দু-চার পাত উলটিয়ে পালটিয়ে বললেন, “হাঁ, ভালো বই বটে!”

এডেন থেকে সুরেজে যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল। যারা ব্রিটিশ-পথ দিয়ে
ইংলণ্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুরেজে রেলওয়ের গাড়িতে উঠে আলেক-
জান্দ্রিয়াতে যেতে হয়; আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জাহাজে একটা স্টীমার অপেক্ষা
করে—সেই স্টীমারে চড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালিতে পৌঁছতে হয়। আমরা over-
land ভাঙা-পেরোনো যাত্রী, সুরেজাং আমাদের সুরেজে নাবতে হল। আমরা তিনজন
বাঙালি ও একজন ইংরেজ একখানি আরব নৌকো ভাড়া করলাম। মাল্ভের
“divine” মুখশ্রী কতদূর পণ্ডত্বের দিকে নাবতে পারে, তা সেই নৌকোর মাঝিটার
মুখ দেখলে জানতে পারতে। তার চোখ দুটো যেন বাঘের মতো, কালো কুচকুচে
রং, কপাল নিচু, ঠোঁট পুরু, সবসমুদ্র মুখের ভাব অতি ভয়ানক। অন্তরা নৌকোর
সঙ্গে দরে বনল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হল। ব— মহাশয় তো

সে নৌকোয় বড়ো সহজে যেতে রাজি নন ; তিনি বললেন আরবদের বিশ্বাস করতে নেই—ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুরেজের দুই-একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প করলেন। কিন্তু যা হ'ক, আমরা সেই নৌকোয় গৌ উঠলেম। মাঝিরা ভাড়া ভাড়া ইংরেজি কর, ও অল্পসল্প ইংরেজি বুঝতে পারে। আমরা তো কতক দূর নির্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরেজ যাত্রীটির সুরেজের পোস্ট আপিসে নাববার দরকার ছিল। পোস্ট আপিস অনেক দূর এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝি একটু আপত্তি করলে ; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে “পোস্ট আপিসে যেতে হবে কি ? সে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব।”—আমাদের রক্ষণভাব সাহেবটি মহা ক্ষাপা হয়ে চোঁচিয়ে উঠলেন, “Your grandmother”। এই তো আমাদের মাঝি রূপে উঠলেন, “What ? mother ? mother ? what mother, don't say mother”। আমরা মনে করলুম সাহেবটাকে ধমকে বুঝি জলে ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা করলে, “What did say ? (কী বললি ?)” সাহেব তাঁর যোথ ছাড়লেন না। আবার বললেন “Your grandmother”। এই তো আর রক্ষা নেই, মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভালো নয় দেখে নরম হয়ে বললেন, “You don't seem to understand what I say” অর্থাৎ তিনি তখন grandmother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরেজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চোঁচিয়ে উঠল “বদ—চুপ।”। সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্যস্মৃতি হল না। আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন “কত দূর বাকি আছে ?” মাঝি অগ্নিশর্মা হয়ে চোঁচিয়ে উঠল, “Two shillings give, ask what distance !” আমরা এই রকম বুঝে গেলেম যে, দু-শিলিং ভাড়া দিলে সুরেজ-রাজ্যে এইরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আইনে নেই ! মাঝিটা যখন আমাদের এইরকম ধমক দিচ্ছে তখন অল্প অল্প দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে, তারা তো পরস্পর মুখ-চাঁওগাচাওগি করে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ করলে। মাঝিমহাশয়ের বিষম বদমেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠেছিল। একদিকে মাঝি ধমকাচ্ছে, একদিকে দাঁড়িগুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, মাঝিটির উপর প্রতিহিংসা তোলবার আর কোনো উপায় না দেখে আমরাও তিনজনে মিলে হাসি জুড়ে দিলেম—এ রকম স্মৃতি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুরেজ শহরে গিয়ে তো পৌঁছলেম। সুরেজ শহর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই,



বিলাতে রবীন্দ্রনাথ

সুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৩৩৭

কারণ আমি সুরেজের আধ মাইল জায়গার বেশি আর দেখি নি। শহরের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যারা পূর্বে সুরেজ দেখেছিলেন, তাঁরা বললেন, “এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অণু কোনো ফললাভের সম্ভাবনা নেই।” তাতেও আমি নিরুৎসাহ হই নি কিন্তু শুনলেম গাধায় চড়ে বেড়ানো ছাড়া শহরে বেড়াবার আর কোনো উপায় নেই। শুনে শহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কমে গেল, তার পরে শে না গেল, এ-দেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না, তারও একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে; এইজন্তে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায়, গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়। সুরেজে একপ্রকার জঘন্য চোখের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব—রাস্তায় এমন শত শত লোকের চোখ ওইরকম রোগগ্রস্ত দেখতে পাবে। এখানকার মাছিয়া ওই রোগ চারদিকে বিতরণ করে বেড়ায়। রোগগ্রস্ত চোখ থেকে ওই রোগের বীজ আহরণ করে তারা অল্প চোখে গিয়ে বসে, চার দিকে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সুরেজে আমরা রেলগাড়িতে উঠলেম। এ রেলগাড়ির অনেকপ্রকার রোগ আছে, প্রথমত শোবার কোনো বন্দোবস্ত নেই, কেন না বসবার জায়গাগুলি অংশে অংশে বিভক্ত, দ্বিতীয়ত এমন গজগামিনী রেলগাড়ি সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠলেম তখন দেখলেম ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জমেছে যে, মাথায় অন্যাসে ধান চাষ করা যায়। এইরকম ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা আলেক-জান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দু-ধারে সবুজ শস্তক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফলে রয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুয়ো। মাঝে মাঝে দুই-একটা কোঠাবাড়ি—বাড়িগুলো চৌকোনা, খাম নেই, বারান্দা নেই—সমস্তটাই দেয়ালের মতো, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই-একটা জানলা। এই সকল কারণে বাড়িগুলোর যেন শ্রী নেই। যা হ’ক আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে রকম অল্পবয়সী মনে করে রেখেছিলুম, চার দিক দেখে তা কিছুই মনে হল না। বরং চার দিককার সেই হরিৎ ক্ষেত্রের উপর খেজুরকুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল।

আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্য ‘মন্সোলিয়া’ স্টীমার অপেক্ষা করছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ করলেম। আমার একটু শীত-শীত করতে লাগল। জাহাজে গিয়ে খুব ভালো করে স্নান করলেম, আমার তো হাড়ে

হাড়ে ধুলো প্রবেশ করেছিল। দ্বান করার পর আলেকজান্দ্রিয়া শহর দেখতে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙা পর্যন্ত যাবার জন্তে একটা নৌকো ভাড়া হল। এখানকার এক-একটা মাঝি সার উইলিয়ম জোনসের দ্বিতীয় সংস্করণ বললেই হয়। তারা গ্রীক, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কহিতে পারে। গুনলেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তাঘাটের নাম, সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়, অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখা। আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকানবাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো, তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড়ো বেশি রকম হয়। খুব বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো দোকান, শহরটি খুব জমকালো বটে। আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। বিস্তার জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। যুরোপীয়, মুসলমান, সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার-পাঁচ দিনে আমরা ইটালিতে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন রাত্রি একটা-দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ করে, জিনিসপত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠলেম। জ্যোৎস্নারাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড়ো একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত করছিল। আমাদের সন্মুখে নিস্তব্ধ শহর, বাড়িগুলির জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ—সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পড়ে গেল, কখনো গুনি ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো গুনি পাওয়া যাবে না। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাকব কি বেরোব কিছুই স্থির নেই। একজন ইটালিয়ান অফিসার এসে আমাদের গুনতে আরম্ভ করলে—কিন্তু কেন গুনতে আরম্ভ করলে তা ভেবে পাওয়া গেল না। জাহাজের মধ্যে এইরকম একটা অশুভ জনশ্রুতি প্রচারিত হল যে, এই গণনার সঙ্গে আমাদের ট্রেনে চড়ার একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে-রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে সে-রাত্রে ব্রিন্দিসির হোটেলে আশ্রয় নিতে হল।

এই তো প্রথম যুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। কোনো নূতন দেশে আসবার আগে আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বলে মনেই হয় না। যুরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয় নি শুনে সকলেই অবাক।

আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিসির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। সকালে একটা আধমরা বোড়া ও আধভাঙা গাড়ি চড়ে শহর দেখতে বের হলেম। সারথির

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৩৯

সঙ্গে গাড়িবোড়ার এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলব! সারথির বয়স চোন্ধো হবে—কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে—আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হল। ছোটোখাটো শহর যেমন হয়ে থাকে ব্রিন্সিসিও তাই। কতকগুলি কোঠাবাড়ি, দোকানবাজার, রাস্তাঘাট আছে। ভিক্ষুরা ভিক্ষা করে ফিরছে, দু-চার জন লোক মদের দোকানে বসে গল্পগুজব করছে, দু-চার জন রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে হাসিতামাশা করছে; লোকজনেরা অতি নিশ্চিন্তমুখে গজেন্দ্রগমনে গমন করছে; যেন কারও কোনো কাজ নেই, কারও কোনো ভাবনা নেই—যেন শহরসুদ্ধ ছুটি। রাস্তার গাড়িবোড়ার সমারোহ নেই, লোকজনের সমাগম নেই। আমরা খানিক দূর যেতেই এক জন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বসল। ব—মহাশয় বললেন, “বিনা আয়াসে এঁর কিছু রোজগার করবার বাসনা আছে।” লোকটা এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগল, “ওইটে চার্চ, ওইটে বাগান, ওইটে মাঠ” ইত্যাদি। তার টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানবুদ্ধি হলনি, আর তার টীকা না হলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হত না। তাকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠতে বলে নি, কেউ তাকে কোনো বিষয় জিজ্ঞাসাও করে নি, কিন্তু তবু এই অবাচিত অনুগ্রহের জন্য তার যাক্সা পূর্ণ করতে হল। তারা আমাদের একটা ফলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কত প্রকার ফলের গাছ, তার সংখ্যা নেই। চার দিকে খোলো খোলো আঙুর ফলে রয়েছে। দু-রকম আঙুর আছে কালো আর সাদা। তার মধ্যে কালোগুলিই আমার বেশি মিষ্টি লাগল। বড়ো বড়ো গাছে আপেল পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধরে আছে। একজন বুড়ি (বোধ হয় উগানপালিকা) কতকগুলি ফলফুল নিয়ে উপস্থিত করলে। আমরা সেদিকে নজর করলেম না; কিন্তু ফল বিক্রয় করবার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্তত বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে দেখি একটা সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হল, তখন আর অগ্রাহ্য করবার সাধ্য রইল না।

ইটালির মেয়েদের বড়ো সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন চমৎকার।

তিনটের ট্রেনে ব্রিন্সিসি ছাড়লেম। রেলোয়ে পথের দু-ধারে আঙুরের খেত, চমৎকার দেখতে। পর্বত, নদী, হ্রদ, কুটির, শস্তক্ষেত্র, ছোটো ছোটো গ্রাম প্রভৃতি যত কিছু কবির স্বপ্নের ধন, সমস্ত চার দিকে শোভা পাচ্ছে। গাছপালার মধ্যে থেকে

যখন কোনো একটি দূরস্থ নগর, তার প্রাসাদচূড়া, তার চার্চের শিখর, তার হবির মতো বাড়িগুলি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে তখন বড়ো ভালো লাগে। সন্ধ্যাবেলায় একটি পাহাড়ের নিচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলাম, তা আর আমি ভুলতে পারব না, তার চার দিকে গাছপালা, জলে সন্ধ্যার ছায়া সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা করতে চাইনে।

রেলোয়ে করে যেতে যেতে আমরা Mont Genis-এর বিখ্যাত স্তূরঙ্গ দেখেছিলাম। এই পর্বতের এ-পাশ থেকে ফরাসিরা ও-পাশ থেকে ইটালিয়নরা, এক সঙ্গে খুঁদতে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুঁদতে খুঁদতে দুই যন্ত্রিদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সন্মুখাসন্মুখি হয়। এই গুহা অতিক্রম করতে রেলগাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগল। সে অঙ্ককারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এখানকার রেলগাড়ির মধ্যে দিনরাত আলো জ্বলাই আছে, কেন না এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা পর্বতগুহা ভেদ করতে হয়—সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালি থেকে ফ্রান্স পর্বন্ত সমস্ত রাস্তা—নির্বর নদী পর্বন্ত গ্রাম হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম।

সকালবেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। কী জমকালো শহর! অপ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। মনে হল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্তে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়ি-গুলোর কী আবশ্যক। হোটেল গেলুম, এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, টিলে কাপড় পরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলেরও বোধ করি তেমনি অসোয়াস্তি হয়। স্মরণশুভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতিতে অবাধ হয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌঁছিয়েই আমরা একটা 'টার্কিশ-বাথে' গেলুম। প্রথমত একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বসেছিলাম, সে-ঘরে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে কারও কারও ঘাম বেরতে লাগল, কিন্তু আমার তো বেরল না, আমাকে তার চেয়ে আর একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে-ঘরটা আগুনের মতো, চোখ মেলে থাকলে চোখ জ্বালা করতে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাকতে পারলাম না, সেখান থেকে বেরিয়ে খুব ঘাম হতে লাগল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে। ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ খোঁজা, এমন মাংসপেশল চমৎকার শরীর কখনো দেখি নি। "ব্যটোরস্কো বুঝক্কঃ শালপ্রাংগুর্হাভুজঃ।" মনে মনে ভাবলাম ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্তে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোনো আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৪১

বললে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে, এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব। আধ ঘণ্টা ধরে সে আমার সর্বদ্বি অবিশ্রান্ত দলন করলে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে যত ধুলো মেখেছি, শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। যথেষ্টরূপে দলিত করে আমাকে আর-একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ করে পরিষ্কার করলে। পরিষ্করণ-পর্ব শেষ হলে আর-একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড়ো পিচকিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল, হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বর্ষণ করতে লাগল; এইরকম কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা জলে স্নান করে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম, তার উপর থেকে নিচে থেকে চার পাশ থেকে বাণের মতো জল গায়ে বিঁধতে থাকে। সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা বরফ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিকক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্বন্ত যেন জমাট হয়ে গেল—রণে ভঙ্গ দিতে হল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মতো আছে, আমি সাতার দিতে রাজি আছি—কি না জিজ্ঞাসা করলে। আমি সাতার দিলে না, আমার সঙ্গী সাতার দিলেন। তাঁর সাতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল, “দেখো, দেখো, এরা কী অদ্ভুত রকম করে সাতার দেয়, ঠিক কুকুরের মতো।” এতক্ষণে স্নান শেষ হল। আমি দেখলেম টার্কিশ-বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা। তার পরে সমস্ত দিনের জন্তে এক পাউণ্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস এক্সিবিশন দেখতে গেলেম। তুমি এইবার হয়তো খুব আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া করেছ, ভাবছ আমি প্যারিস এক্সিবিশনের বিষয় কী না জানি বর্ণনা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী বলব, কলকাতার যুনিভার্সিটিতে বিজ্ঞা শেখার মতো প্যারিস এক্সিবিশনের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভালো করে দেখিনি। একদিনের বেশি আমাদের প্যারিসে থাকা হল না—সে বৃহৎ কাণ্ড একদিনে দেখা কারও সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখলেম—কিন্তু সে-রকম দেখায়, দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মাল কিন্তু দেখা হল না। সে একটা নগরবিশেষ। এক মাস থাকলে তবে তা বর্ণনা করবার দুরাশা করতেম। প্যারিস এক্সিবিশনের একটা সুপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণত মনে আছে যে চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি, স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি, নানা দেশবিদেশের নানা জিনিস দেখেছি; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেম—এমন বিবরণ অন্ধকার-পুরী আর কখনো দেখি নি—ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, কাদা আর লোকজনের

ব্যস্তসমস্ত ভাব। আমি দুই-এক ঘটামাত্র লগুনে ছিলাম, যখন লগুন পরিত্যাগ করলেম তখন নিখাস পরিত্যাগ করে বাঁচলেম। আমার বন্ধুরা আমাকে বললেন, লগুনের সঙ্গে প্রথম-দৃষ্টিতেই ভালোবাসা হয় না, কিছু দিন থেকে তাকে ভালো করে চিনলে তবে লগুনের মাধুর্য বোঝা যায়।

দ্বিতীয় পত্র

ইংলণ্ডে আসবার আগে আমি নির্বোধের মতো আশা করেছিলাম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির সর্বত্রই গ্যাডেন্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমুলরের বেদব্যাখ্যা, টিণ্ডালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে গুথরিত। সৌভাগ্যক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকে, তুমি নাচে গিয়েছিলে কি না, কনস্ট কেমন লাগল, থিয়েটারে এক জন নূতন অ্যাক্টর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যাণ্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বলবে, আফগান যুদ্ধের বিষয় তুমি কী বিবেচনা কর, Marquis of Lorneকে লগুনীয়েরা খুব সমাদর করেছিল, আজ দিন বেশ ভালো, কালকের দিন বড়ো মিজরেবল্ ছিল। এ-দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোকায়ে ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ক্লাট করে। এদেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক। টেম্পারেন্স মীটিং, ওয়ার্কিং মেন্‌স্ সোসাইটি প্রভৃতি যতপ্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদ্রের মধ্যে তাদের কণ্ঠ আছে। পুরুষদের মতো তাঁদের আপিসে যেতে হয় না, মেয়েদের মতো ছেলেপিলে মানুষ করতে হয় না, এদিকে হয়তো এত বয়স হয়েছে যে 'বলে' গিয়ে নাচা বা ক্লাট করে সময় কাটানো সংগত হয় না, তাই তাঁরা অনেক কাজ করতে পারেন, তাতে উপকারও হয়তো আছে।

এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজির দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান পদে পদে দেখতে পাই কিন্তু বইয়ের দোকান প্রায় দেখতে পাই নে। আমাদের একটি কবিতার বই কেনবার আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে একজন

ছবিগুলো তৈরি হয়, মাছুষে হাতে করে আঁকে না। আমার চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। একটা বাড়ির দোকানের সামনে নিয়ে, বাড়িটা যে খুব আশ্চর্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। একটা ঈভ নিং পার্টিতে মিস—আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি এর পূর্বে পিয়ানোর শব্দ শুনেছি কি না। এ-দেশের অনেক লোক হয়তো পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি একবিন্দুও খবর জানে। ইংলণ্ড থেকে কোনো দেশের যে কিছু তফাত আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক—সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই।

তৃতীয় পত্র

আমরা সেদিন ক্যালি-বলে অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলেম—কত মেয়ে-পুরুষ নানারকম সেজেগুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাবীর্ণ, চার দিকে ব্যাণ্ড বাজছে—ছ-সাত-শ স্তম্ভরী, স্তম্ভপুরুষ। ঘরে ন স্থানঃ তিল ধারয়েৎ—চাঁদের হাট তো তাকেই বলে। এক-একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচ আরম্ভ করেছে, যেন জোড়া জোড়া পাগলের মতো। এক-একটা ঘরে এমন সম্ভর-আশি জন যুগলমূর্তি, এমন ঘেঁষাঘেঁষি বে, কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। একটা ঘরে শ্রাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্যমাংসের ছড়াছড়ি, সেখানে লোকারণ্য; এক-একটা মেয়ের নাচের বিরাম নেই, দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে। এক জন মেম ভূষার-কুমারী সেজে গিয়েছিলেন, তার সমস্তই শুভ্র, সর্বাঙ্গে পুঁতির সজ্জা, আলোতে বাকমক করেছে। এক জন মুসলমানিনী সেজেছিলেন; একটা লাল ফুলো ইজের, উপরে একটা রেশমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মতো—এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল—এক জন সেজেছিলেন আমাদের দিশি মেয়ে, একটা শাড়ি আর একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর, তাতে ইংরেজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভালো দেখাচ্ছিল। একজন সেজেছিলেন বিলিতি দাসী। আমি বাংলার জমিদার সেজে-ছিলেম, জরি দেওয়া মখমলের কাপড়, জরি দেওয়া মখমলের পাগড়ি প্রভৃতি পরে-ছিলেম। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন, সাদা রেশমের ইজের জরিতে খচিত, সাদা রেশমের চাপকান, সাদা রেশমের জোকা, জরিতে বাকমকায়মান পাগড়ি, জরির কোমরবন্ধ—তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৪৫

যে এই রকম কাপড় পরে তা হয়তো নয়, কিন্তু ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আকগান সেনাপতি সেজেছিলেন।

গত মঙ্গলবারে আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যাবেলায় কোথাও নিমন্ত্রণে যেতে হলে শীতের জন্ত সচরাচর মোটা কাপড় পরতে হয়, কিন্তু ঈভনিং পার্টি প্রভৃতিতে পাতলা কালো বনাতের কাপড় পরাই রীতি। সাদ্য পরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা হওয়া চাই, তার উপরে প্রায় সমস্ত-বুক খোলা এক বনাতের ওয়েস্টকোট, কালো ওয়েস্টকোটের মধ্যে সাদা কামিজের স্মুথ দিকটা বেরিয়ে থাকে, গলায় সাদা কিতে (নেকটাই) বাঁধা, সকলের উপর একটি টেল-কোট (লাঙুল-কোট); টেলকোটের স্মুথ দিকটা কোঁমর পর্যন্ত কাটা, আমাদের চাপকান প্রভৃতি পোষাকগুলি যেমন হাঁটু পর্যন্ত পড়ে, এ তা নয়। এর স্মুথ দিকটার সীমা কোমর পর্যন্ত, কিন্তু পিছন দিকটা কাটা নয়, সুতরাং কতকটা সেজের মতো বুলতে থাকে। ইংরেজদের হস্তকরণে এই লেজকোট পরতে হলে। নাচ-পার্টিতে যেতে হলে হাতে একজোড়া সাদা দস্তানা পরা চাই, কারণ যে মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে নাচতে হবে, খালি হাত লেগে তাঁদের হাত ময়লা হয়ে যেতে পারে কিংবা তাঁদের হাতে যদি দস্তানা থাকে সেটা ময়লা হবার ভয় আছে। অথচ কোনো জায়গায় লেডিদের সঙ্গে শেক্‌হাণ্ড করতে গেলে হাতের দস্তানা খুলে ফেলতে হয়, কিন্তু নাচের ঘরে তার উল্টো।

যা হ'ক, আমরা তো সাড়ে নটার সময় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনো নাচ আরম্ভ হয় নি। ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্তী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে শেক্‌হাণ্ড করছেন, অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন ও সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। এ গোরাদের দেশে নিমন্ত্রণসভায় গৃহকর্তার বড়ো উচ্চ পদ নেই, তিনি সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়নগৃহে নিদ্রা দিন, তাতে কারও বড়ো কিছু এসে যায় না। আমরা ঘরে প্রবেশ করলেম, গ্যাসের আলোর ঘর উজ্জ্বল, শত শত রমণীর রূপের আলোকে গ্যাসের আলো ম্রিয়মান; রূপের উৎসব পড়ে গিয়েছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবামাত্রই চোখে ধাঁধা লেগে যায়। ঘরের একপাশে পিয়ানো, বেহালা, বাঁশি বাজছে, স্রের চারিধারে কোঁচ চোঁকি সাজানো, ইতস্তত দেয়ালের আয়নার উপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পড়ে বাকমক করছে। নাচবার ঘরের মেজে কাঠের, তার উপর কার্পেট প্রভৃতি কিছু পাতা নেই, সে কাঠের মেজে এমন পালিশ করা যে, পা পিছলে যায়। ঘর যত পিছল হয় ততই নাচবার উপযুক্ত হয়, কেননা পিছল ঘরে নাচের গতি সহজ হয়, পা কোনো বাধা পায় না,

আপনাআপনি পিছলে আসে। ঘরের চারিদিকে আশেপাশে যে-সকল বারান্দার মতো আছে, তাই একটু ঢেকেঢুকে, গাছপালা দিয়ে, দু-একটি কোচ চৌকি রেখে তাকে প্রণয়ীদের কুঞ্জ নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেইখানে নাচে শ্রান্ত হয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হয়ে যুবকযুবতী নিরিবিলা মধুরালাপে মগ্ন থাকতে পারেন। ঘরে ঢোকবার সময় সকলের হাতে সোনার অঙ্করে ছাপা এক-একখানি কাগজ দেওয়া হয়, সেই কাগজে কী কী নাচ হবে তাই লেখা থাকে। ইংরেজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, একরকম হচ্ছে খ্রীপুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দু-জন লোক একসঙ্গে নাচে; আর-একরকম নাচে চারটি জুড়ি নর্তকনর্তকী চতুষ্কোণ হয়ে সুমুখাসুমুখি দাঁড়ায় ও হাত ধরাধরি করে নানা ভঙ্গীতে চলাফেরা করে বেড়ায়, কোনো কোনো সময় চার জুড়ি না হয়ে আট জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচকে রাউণ্ড ডান্স বলে ও চলাফেরা করে নাচার নাম স্কোয়ার ডান্স। নাচ আরম্ভ হবার পূর্বে গৃহকর্ত্রী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ-করিয়ে দেন স্বর্গীয় পুরুষ-অভ্যাগতকে সঙ্গে করে কোনো এক অভ্যাগত-মহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, “মিস অমুক, ইনি মিস্টার অমুক।” অমনি মিস ও মিস্টার শিরঃকম্পন করেন। কোনো মিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর নাচবার ইচ্ছে করলে পকেট থেকে সেই সোনার জলে ছাপানো প্রোগ্রামটি বের করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, “আপনি কি অমুক নৃত্যে বাগ্‌দত্তা হয়ে আছেন?” তিনি যদি ‘না’ বলেন তা হলে তাঁকে বলতে হবে, “তবে আমি কি আপনার সঙ্গে নাচবার সুখভোগ করতে পারি?” তিনি খ্যাঙ্ক যু বললে বোঝা যাবে কপালে তাঁর সঙ্গে নাচবার সুখ আছে। অমনি সেই কাগজটিতে সেই নাচের পাশে তাঁর নাম এবং তাঁর কাগজে আবেদনকারীর নাম লিখে দিতে হয়।

নাচ আরম্ভ হল। ঘুর-ঘুর-ঘুর। একটা ঘরে মনে করো, চল্লিশ-পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে, ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেলাঠেলি, কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি। তবু ঘুর-ঘুর-ঘুর। তালে তালে বাজনা বাজছে, তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠেছে। একটা নাচ শেষ হল, বাজনা থেমে গেল; নর্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহ্বারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফলমূল মিষ্টান্ন মদ্যির আয়োজন; হয়তো আহার পান করলেন, না হয় দুজনে নিভৃত কুঞ্জে বসে রহস্যলাপ করতে লাগলেন। আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড়ো মিলে মিশে নিতে পারি নে, যে-নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে-নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারি নে। সত্যি কথা বলতে কি, নাচের নেমন্তন্নগুলো আমার বড়ো ভালো লাগে না। যাদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচতে মন্দ লাগে

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৪৭

না। যেমন তাগ খেলবার সময় খারাপ জুড়ি পেলে তার 'পরে তার দলের লোক চটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ জুড়ির 'পরে মেয়েরা ভারি চটে যায়। আমার নাচের সহচরী বোধ হয় নাচার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা করেছিলেন। নাচ ফুরিয়ে গেল, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম, তিনিও নিস্তার পেলেন।

প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চমকে উঠেছিলেম, দেখি যে শত শ্রেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটি ভারতবর্ষীয়া শ্রামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই তো আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। তার সঙ্গে কোনোমতে আলাপ করবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেম। কতদিন শ্রামলা মুখ দেখি নি! আর, তার মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালোমাহুবি নম্রাভাব মাখানো। আমি অনেক ইংরেজ মেয়েদের মুখে ভালোমাহুবি নরম ভাব দেখেছি কিন্তু এর সঙ্গে তার কী একটা তফাত আছে বলতে পারি নে। তার চুল বাঁধা আমাদের দেশের মতো। সাদা মুখ আর উগ্র অসংকোচ সৌন্দর্য দেখে দেখে আমার মনটা ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, এতদিন তাই বুঝতে পারলেম। হাজার হ'ক, ইংরেজ মেয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা জাত, আমি এতদূর ইংরেজি কায়দা শিখি নি যে, তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি ভাবে কথাবার্তা কইতে পারি। পরিচিত বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন করতে সাহস হয় না।

আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্কার কলে স্বর্ষ উঠেছেন। এদেশে রবি বেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন। সেদিন একটি লোকও কেউ ঘরে থাকে না। সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তার লোক কিলবিল করতে থাকে। এদেশে যদিও "বাড়ির ভিতর" নেই, তবু এদেশের মেয়েরা যেমন অস্বর্ষস্পন্দরূপা এমন আমাদের দেশে-নয়।

সাড়ে আটটার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠা হয় না, ছ-টার সময় বিছানা থেকে উঠলে এখানকার লোকেরা আশ্চর্য হয়। তার পরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এদেশে যাকে স্নান বলে, আমি সে-রকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে। আমি মাথায় জল ঢেলে স্নান করি, গরম জল নয়—এখানকার এই বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। ন-টার সময় আমাদের খাবার আসে। এখানকার ন-টা আর সেখানকার ছ-টা সমান। আমাদের আর-একটি খাওয়া দেড়টার সময়, সেইটাই প্রধান খাওয়া মধ্যাহ্নভোজন। মধ্যে একবার চাক্রি প্রস্তুতি আসে, তার পরে রাত আটটার সময় আর-একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে, এইরকম আমাদের দিনের প্রধান বিভাগগুলি খাওয়া নিরে।

অন্ধকার হয়ে আসছে, চারটে বাজে ব'লে, চারটে বাজলে পরে আলো না জ্বলে পড়া দুকর। এখানে প্রকৃতপক্ষে ন-টার সময় দিন আরম্ভ হয়, কেননা গড়ে রোজ

আটটার কমে ওঠা হয় না। তার পর আবার বৈকাল চারটের সময়েই এখানকার দিনের আলো নিভে যায়। দিনগুলো যেন দশটা চারটে আপিস করতে আসে। ট্যাক-বড়ির ডালা খুলতে খুলতেই এদেশে দিন চলে যায়। এখানকার রাত্রির তেমনি ঘোড়ায় চড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে ফেরে।

মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত—এ আর একদণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মুসলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, বাড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে; এখানে এ তা নয়, এ টিপ টিপ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতিনিঃশব্দ পদসঙ্ঘারে চলছে তো চলছেই। রাস্তার কাঁদা, পত্রহীন গাছগুলো শুকভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানলার উপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে; এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্বাবরজ্জ্বলের একটা অবসন্ন মুখশ্রী। লোকের মুখে সময়ে সময়ে গুনতে পাই বটে যে, কাল বজ্র ডেকেছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে তার মুখ থেকেই সে খবরটা পাই। সূর্য তো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে। যদি অনেক ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্যের মুখ দেখতে পাই, তবে তখনই আবার মনে হয়—

এমন দিন না রবে, তা জানো।

দিনে দিনে শীত খুব ঘনিজে আসছে; লোকে বলছে, কাল-পরশুর মধ্যে হয়তো আমরা বরফ পড়া দেখতে পাব। তাপমান যন্ত্র ত্রিশ ডিগ্রি পর্যন্ত নেবে গিয়েছে—সেই তো হচ্ছে ফ্রীজিং পয়েন্ট। অল্প স্বল্প ফ্রস্ট দেখা দিয়েছে। রাস্তার মাটি খুব শক্ত। কেন না তার মধ্যে যা জল ছিল সমস্ত জমাট হয়ে গিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে কাঁচের টুকরোর মতো শিশির খুব শক্ত হয়ে জমেছে। দুই-এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে কে যেন চুন ছড়িয়ে দিয়েছে, বরফের এই প্রথম স্তূপপাত। খুব শীত পড়েছে, এক-এক সময়ে হাত-পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জালা করতে থাকে। সকালে লেপ থেকে বেরোতে ভাবনা হয়।

আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক-এক জন সত্যি সত্যি হেসে ওঠে, এক-এক জন এত আশ্চর্য হয়ে যায় যে, তাদের আর হাসবার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক হয়তো আমাদের জন্ত গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে। প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দল ইঙ্কলের ছোকরা চীংকার করতে করতে ছুটেছিল, আমরা তাদের সেলাম করলেম। এক-এক জন আমাদের মুখের উপর হেসে ওঠে, এক-এক জন চোঁচাতে থাকে—“Jack, look at the blackies!”

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৪৯

চতুর্থ পত্র

আমরা সেদিন হাউস অফ কমন্সে গিয়েছিলেম। পার্লামেন্টের অভ্যন্তরীণ চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ-করা ঘরগুলো দেখলে তাক লেগে যায়। একটা বড়ো ঘরে হাউস বসে, ঘরের চারি দিকে গোল গ্যালারি, তার এক দিকে দর্শকেরা আর-এক দিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। গ্যালারি অনেকটা থিয়েটারের ড্রেস-সার্কলের মতো। গ্যালারির নিচে স্টলে মেম্বাররা বসে। তাদের জন্তে দু-পাশে হ্রদ দশখানি বেষ্টিত। এক পাশের পাঁচখানি বেষ্টিতে গবর্নমেন্টের দল, আর-এক পাশের পাঁচখানিতে বিপক্ষ দল। স্রুখের প্লাটফর্মের উপর একটা কেদারা আছে সেইখানে প্রেসিডেন্টের মতো এক জন (যাকে স্পীকার বলে) মাথায় পরচুলা পরে অত্যন্ত গজ্ঞার ভাবে বসে থাকেন। যদি কেউ কখনো কোনো অগাধ ব্যবহার বা কোনো আইনবিরুদ্ধ কাজ করে তাহলে স্পীকার উঠে তাকে বাধা দেয়। যেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সব বসে, তার পিছনে ঝড়ঝড়ি-দেওয়া একটা গ্যালারিতে মেয়েদের জায়গা, বাইরে থেকে তাদের দেখা যায় না। আমরা যখন গেলেম, তখন ও'ডোনেল বলে এক জন আইরিশ সভ্য ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, প্রেস-অ্যাক্টের বিরুদ্ধে ও অগাধ নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন করছিলেন। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল। হাউসের ভাবগতিক দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেম। যখন এক জন কেউ বক্তৃতা করছে, তখন হয়তো অনেক মেম্বার মিলে “ইয়া” “ইয়া” “ইয়া” “ইয়া” করে চীৎকার করছে, হাসছে। আমাদের দেশে সভাস্থলে ইচ্ছুর হোকরারাও হয়তো এমন করে না। অনেক সময়ে বক্তৃতা হচ্ছে আর মেম্বাররা কপালের উপর টুপি টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন। এক বার দেখলেম যে, ভারতবর্ষের বিষয় নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ঘরে নয়-দশ জনের বেশি মেম্বার ছিল না, অগাধ সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, পানি সাপার খেতে গিয়েছেন; আর যেই ভোট নেবার সময় হল অমনি সবাই চার দিক থেকে এসে উপস্থিত। বক্তৃতা শুনে বা কোনোপ্রকার যুক্তি শুনে যে কারো মত স্থির হয়, তা তো বোধ হল না।

গত বৃহস্পতিবারে হাউস অফ কমন্সে ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চলছিল। সেদিন ব্রাইট সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে, গ্লাডস্টোন তুলা-জাতের শুক ও আকগান যুদ্ধ সম্বন্ধে, ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন। চারটের সময় পার্লামেন্ট খোলে।

আমরা কয়েক জন বাঙালি চারটে না বাজতেই হাউসে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখন হাউস খোলে নি, দর্শনার্থীরা হাউসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চার দিকে বার্ক, কক্স, চ্যাটাম, ওঅলপোল প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ, মহাপুরুষদের প্রস্তরমূর্তি। প্রতি দরজার কাছে পাহারাওআলা পাকা চুলের পরচুলা-পরা। গাউন-বোলানো পার্লামেন্টের কর্মচারীরা হাতে দুই-একটা খাতাপত্র নিয়ে আনাগোনা করছিলেন। চারটের সময় হাউস খুলল। আমাদের কাছে স্পীকার্স গ্যালারির টিকিট ছিল। হাউস অফ কমন্সে পাঁচ শ্রেণীর গ্যালারি আছে,—স্ট্রেঞ্জার্স গ্যালারি, স্পীকার্স গ্যালারি, ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারি, রিপোর্টার্স গ্যালারি, লেডিজ গ্যালারি। হাউসের যে-কোনো মেম্বারের কাছ থেকে বৈদেশিক গ্যালারির টিকিট পাওয়া যায়, আর বক্তার অনুগ্রহ হলে তবে বক্তার গ্যালারির টিকিট পাওয়া যেতে পারে। ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারিটা কী পদার্থ তা ভালো করে বলতে পারি নে, আমি যে ক-বার হাউসে গিয়েছি দুই-এক জন ছাড়া সেখানে লোক দেখতে পাই নি। 'স্ট্রেঞ্জার্স গ্যালারি থেকে বড়ো ভালো দেখাগুলো যায় না; তার সামনে স্পীকার্স গ্যালারি; তার সামনে ডিপ্লম্যাটিক গ্যালারি। আমরা গিয়ে তো বসলেম। পরচুলা-ধারী স্পীকার মহাশয় গরুড় পক্ষটির মতো তাঁর সিংহাসনে উঠলেন। হাউসের সভ্যরা সব আসন গ্রহণ করলেন। কাজ আরম্ভ হল। হাউসের প্রথম কাজ প্রস্তোত্তর করা। হাউসের পূর্ব অধিবেশনে এক-এক জন মেম্বার বলে রাখেন যে, "আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দিতে হবে।" সেদিন ও'ডোনেল নামে একজন আইরিশ মেম্বার জিজ্ঞাসা করলেন যে, "একো এবং আরো দুই-একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরেজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে, সে বিষয়ে গবর্নমেন্ট কি কোনো সংবাদ পেয়েছেন? আর সে-সকল অত্যাচার কি খ্রীষ্টানদের অনুচিত নয়?" অমনি গবর্নমেন্টের দিক থেকে সার মাইকেল হিক্সবিচ উঠে ও'ডোনেলকে কড়া কড়া দুই-এক কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে ষত আইরিশ মেম্বার ছিলেন, সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগলেন। এইরকম অনেকক্ষণ বাগড়াবাঁটি করে দুই পক্ষ শান্ত হয়ে বসলেন। উত্তর-প্রত্যুত্তরের ব্যাপার সমাপ্ত হলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময় এল, তখন হাউস থেকে অধিকাংশ মেম্বার উঠে চলে গেলেন। দুই-একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সার্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হাউসে দাখিল করলেন। বুদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ওদার্ষ ও দয়া যেন মাখানো। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট সেদিন কিছু বক্তৃতা করলেন না। হাউসে অতি অল্প মেম্বারই অবশিষ্ট ছিলেন,

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৫১

ধারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজার আয়োজন করছিলেন, এমন সময় গ্যাডস্টোন উঠলেন। গ্যাডস্টোন ওঠবামাত্র সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, গ্যাডস্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেসার আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পূরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসবের মতো গ্যাডস্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে লাগল। কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জনগর্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা, ঘরের যেখানে যে-কোনো লোক বসেছিল, সকলেই একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। গ্যাডস্টোনের কী একরকম দৃঢ়স্বরে বলবার ধরন আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর করে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টি বদ্ধ করে একেবারে হুয়ে হুয়ে পড়েন, যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের করছেন। আর সেইরকম প্রতি জোর-দেওয়া কথা দরজা ভেঙে চুরে যেন মনের ভিতর প্রবেশ করে। গ্যাডস্টোন অনর্গল বলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতি কথা ওজন করা, তার কোনো অংশ অসম্পূর্ণ নয়; তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্বরে জোর দিয়ে বলেন না, কেননা সে-রকম বলপূর্বক বললে স্বভাবতই শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। তিনি যে-কথায় জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, সেই কথাতেই জোর দেন; তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন বটে, কিন্তু চীৎকার করে বলেন না, মনে হয় যা বলছেন, তাতে তাঁর নিজের খুব আন্তরিক বিশ্বাস।

গ্যাডস্টোনের বক্তৃতাও যেমন থামল, অমনি হাউস শূন্যপ্রায় হয়ে গেল, দু-দিকের বেঞ্চিতে ছ-সাত জনের বেশি আর লোক ছিল না। গ্যাডস্টোনের পর স্পলিট যখন বক্তৃতা আরম্ভ করলেন তখন দুই দিককার বেঞ্চিতে লোক ছিল না বললেও হয়; কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন, শূন্য হাউসকে সন্মোদন করে অত্যন্ত দীর্ঘ এক বক্তৃতা করলেন। সেই অবকাশে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ এক নিজা দিই। দুই-এক জন মেসার, ধারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেউ বা পরস্পর গল্প করছিলেন, কেউ বা চোখের উপর টুপি টেনে দিয়ে ডিসরেলির পদচ্যুতির পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছিলেন।

হাউসে আইরিশ মেসারদের ভারি মুশকিল; তাঁরা যখন বক্তৃতা করতে ওঠেন, তখন চার দিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, মেসারেরা হাঁসের মতো “ইয়া” “ইয়া” করে টেঁচাতে থাকে। বিজ্ঞপাত্তক “হিয়ার” “হিয়ার” শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়। এইরকম বাধা পেয়ে বক্তা আর আত্মসংবরণ করতে পারেন না, খুব জলে ওঠেন, আর তিনি যতই রাগ করতে থাকেন ততই হাস্ত্যাস্পদ হন। আইরিশ

৫৫২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মেঘারেরা এই রকম জ্বালাতন হয়ে আজকাল শোধ তুলতে আরম্ভ করেছেন। হাউসে যে কোনো কথা ওঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন, আর প্রতি প্রস্তাবে এক জনের পর আর-এক জন করে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হাউসকে বিভ্রত করে তোলেন।

পঞ্চম পত্র

বিলেতে নতুন এসেই বাঙালিদের চোখে কোন্ জিনিস ঠেকে, বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমে বাঙালিদের কী রকম লাগে, সে-সকল বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাতত কিছু বলব না। কেননা, এ-সকল বিষয় আমার বিচার করবার অধিকার নেই, যারা পূর্বে অনেক কাল বিলেতে ছিলেন ও বিলেত যারা খুব ভালো করে চেনেন তাঁরা আমাকে সঙ্গ করে এনেছেন, আর তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস করছি। বিলেতে আসবার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিস নিতান্ত নতুন মনে হয়েছে। এখানকার লোকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট খেয়ে খেয়ে আচার-ব্যবহার আমাকে শিখতে হয়নি। তাই ভাবছি যে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় আপাতত তোমাদের কিছু বলব না। এখানকার দুই-এক জন বাঙালির মুখে তাঁদের যে-রকম বিবরণ শুনেছি তাই তোমাদের লিখছি।

জাহাজে তো তাঁরা উঠলেন। যাত্রীদের সেবার জন্তে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে, তাদের নিয়েই প্রথম গোল বাধে। এঁরা অনেকে তাদের “সার” “সার” বলে সম্বোধন করতেন, তাদের কোনো কাজ করতে হুকুম দিতে তাঁদের বাধো-বাধো করত। জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসংকোচ ভাবে থাকতেন। তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের যে ও-রকম সংকোচ বোধ হত, সেটা কেবল ভয়ে নয়, তার সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। যে-কাজ করতে যান, মনে হয় পাছে বেদস্তুর হয়ে পড়ে। জাহাজে ইংরেজদের সঙ্গে মেশা বড়ো হয়ে ওঠে না। তারা টাটকা ভারতবর্ষ থেকে আসছে, “হুজুর ধর্মাবতার” গণ দেশী লোক দেখলে নাক তুলে, ঘাড় বঁকিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরেজ দেখতে পাবে, তাঁরা তোমাকে নিতান্ত সঙ্গীহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করবেন, তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাত্ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক। এখানকার গলিতে গলিতে যে “জন-জোন্স-টমাস” গণ কিলবিল করছে, তারা

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৫৩

ভারতবর্ষের যে-অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে-অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হয়ে যায়, যে-রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চড়ে যায় (হয়তো সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্তেই নয়। সে রাস্তাসুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের এক-একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক-একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে, এ-রকম অবস্থায় তাদের যে বিকৃতি ঘটে আমি তো তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাই নে। কোনো জন্মে যে-মামুষ ঘোড়া চালায় নি, তাকে ঘোড়া চালাতে দেও, ঘোড়াকে চাবুক মেয়ে মেয়েই অর্জরিত করবে; সে জানে না যে, একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে চালানো যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গর্বিত হয়ে ওঠেন না। সমাজ-শৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে, সহস্র সেবকদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ভারতবর্ষে থাকা উন্নত ও ভদ্র মনের একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা।

যা হ'ক, এত ক্ষণে জাহাজ সাউথাম্পটনে এসে পৌঁছেছে। বন্দীয় যাত্রীরা বিলেতে এসে পৌঁছিলেন। লণ্ডন উদ্দেশে চললেন। ট্রেন থেকে নামবার সময় একজন ইংরেজ গার্ড এসে উপস্থিত। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, তাঁদের কী প্রয়োজন আছে, কী করে দিতে হবে। তাঁদের মোট নাম্বিয়ে দিলে, গাড়ি ডেকে দিলে, তাঁরা মনে মনে বললেন, “বাঃ! ইংরেজরা কী ভদ্র!” ইংরেজরা যে এত ভদ্র হতে পারে, তা তাঁদের জ্ঞান ছিল না। তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হল বটে। তা হ'ক, একজন নবাগত বঙ্গ-যুবক একজন যে-কোনো খেতাবের কাছ থেকে একটিমাত্র সেলাম পেতে, অকাতরে এক শিলিং ব্যয় করতে পারেন। আমি খাঁদের কাছ থেকে সব কথা শুনে পাই, তাঁরা অনেক বৎসর বিলেতে আছেন, বিলেতের নানাপ্রকার ছোটোখাটো জিনিস দেখে তাঁদের প্রথম কী রকম মনে হয়েছিল, তা তাঁদের স্পষ্ট মনে নেই। যে-সব বিষয় তাঁদের বিশেষ মনে লেগেছিল, তাই এখনো তাঁদের মনে আছে।

তাঁরা বিলেতে আসবার পূর্বে তাঁদের বিনিতি বন্ধুরা এখানে তাঁদের জন্তে ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ছবি টাঙানো, একটা বড়ো আয়না এক জায়গায় ঝোলানো, কোঁচ, কতকগুলি চৌকি, দুই-একটা ফাঁচের ফুলদানি, এক পাশে একটি ছোটো পিয়ানো। কী সর্বনাশ! তাঁদের বন্ধুদের ডেকে বললেন, “আমরা কি এখানে বড়োমামুষি করতে এসেছি? আমাদের বাপু বেশি টাকাকড়ি নেই, এ-রকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না!” বন্ধুরা অত্যন্ত

আমোদ পেলেন, কারণ তখন তাঁরা একেবারে ভুলে গেছেন যে বহুপূর্বে তাঁদেরও একদিন এইরকম দশা ঘটেছিল। নবাগতদের নিতান্ত অন্তর্জীবী বাঙালি মনে করে অত্যন্ত বিজ্ঞতার স্বরে বললেন, “এখানকার সকল ঘরই এইরকম!” নবাগত ভাবলেন, আমাদের দেশে সেই একটা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে একটা তক্তা ও তার উপরে একটা মাদুর পাতা, ইতস্তত হাঁকোর বৈঠক, কোমরে একটুখানি কাপড় জড়িয়ে জুতোজোড়া খুলে দু-চার জন মিলে শতরঞ্চ খেলা চলছে, বাড়ির উঠোনে একটা গোরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজ়ে কাপড় শুকোচ্ছে ইত্যাদি। তাঁরা বলেন, প্রথম প্রথম দিনকতক চোঁকিতে বসতে, কোঁচে শুতে, টেবিলে খেতে, কার্পেটে বিচরণ করতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ হত। সোফায় অত্যন্ত আড় হয়ে বসতেন, ভয় হত, পাছে সোফা ময়লা হয়ে যায় বা তার কোনোপ্রকার হানি হয় মনে হত সোফাগুলো কেবল ঘর সাজাবার জন্তেই রেখে দেওয়া, এগুলো ব্যবহার করতে দিয়ে মাটি করা কখনোই ঘরের কর্তার অভিপ্রেত হতে পারে না। ঘরে এসে প্রথম মনের ভাব তো এই, তার পরে আর-একটি প্রধান কথা বলা বাকি।

বিলেতে ছোটোখাটো বাড়িতে “বাড়িওআলা” বলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়তো, কিন্তু যারা বাড়িতে থাকেন, “বাড়িওআলী”র সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া, কোনোপ্রকার বোঝাপড়া, আহারাদির বন্দোবস্ত করা, সে সমস্তই বাড়িওআলীর কাছে। আমার বন্ধুরা যখন প্রথম পদার্পণ করলেন, দেখলেন, এক ইংরেজনী এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের “সুপ্রভাত” অভিবাদন করলে, তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হয়ে ভদ্রতার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের অগ্রাগ্র ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসংকুচিত স্বরে কথাবার্তা আরম্ভ করে দিলেন, তখন আর তাঁদের বিস্ময়ের আদি অন্ত রইল না। মনে করো এক সজীব বিবিসাহেব জুতো-পরা, টুপি-পরা, গাউন-পরা! তখন ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গযুবকদের ভক্তির উদয় হল, কোনো কালে যে এই অসমসাহসিকদের মতো তাঁদেরও বুকের পাটা জন্মাবে, তা তাঁদের সম্ভব বোধ হল না। যা হ’ক, এই নবাগতদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে ইঙ্গবঙ্গ বন্ধুগণ স্ব স্ব আলয়ে গিয়ে সপ্তাহকাল ধরে তাঁদের অজ্ঞতা নিয়ে অপরাধ হস্তকৌতুক করলেন। পূর্বোক্ত গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ নবাগতদের অতি বিনীতভাবে, কী চাই কী না চাই, জিজ্ঞাসা করতে আসত। তাঁরা বলেন, এই উপলক্ষে তাঁদের অত্যন্ত আত্মদা হত। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন যেদিন তিনি এই ইংরেজ মেয়েকে একটুখানি ধমকাতে পেরেছিলেন, সেদিন সমস্ত দিন তাঁর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৫৫

ছিল। অথচ সেদিন সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে নি, পর্বত চলাফেরা করে বেড়ায় নি, বহিঃ শীতলতা প্রাপ্ত হয় নি।

কার্পেট-মোড়া ঘরে তাঁরা সুখে বাস করছেন। তাঁরা বলেন, “আমাদের দেশে নিজের ঘর বলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল না; যে-ঘরে বসতেম, সে-ঘরে বাড়ির দশজনে যাতায়াত করছেই। আমি একপাশে লিখছি, দাদা একপাশে একখানা বই হাতে করে চুলছেন, আর-এক দিকে মাতুর পেতে গুরুমশায় ভুলুকে উঠে-স্বরে সুর করে করে নামতা পড়াচ্ছেন। এখানে আমার নিজের ঘর; সুবিধামতো করে বইগুলি এক দিকে সাজালেম, লেখবার সরঞ্জাম একদিকে শুছিয়ে রাখলেম, কোনো ভয় নেই যে, একদিন পাঁচটা ছেলে মিলে সমস্ত ওলট-পালট করে দেবে, আর-এক দিন দুটোর সময় কলেজ থেকে এসে দেখব, তিনটে বই পাওয়া যাচ্ছে না, অবশেষে অনেক খোঁজ-খোঁজ করে দেখা যাবে বইগুলি নিয়ে আমার ছোটো ভায়ীটি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহচরীদের ডেকে ছবি দেখতে ঘোরতর ব্যস্ত। এখানে নিজের ঘরে বসে থাকে—দরজাটি ভেজানো, সট করে না বলে করে কেউ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে ঢোকবার আগে দরজায় শব্দ করে, ছেলেপিলেগুলো চারিদিকে টেঁচামেটি কানাকাটি জুড়ে দেয় নি, নিরিবিলি নিরান্না, কোনো হাদ্যমা নেই।” দেশের সম্বন্ধে মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠে। প্রায় দেখা যায় আমাদের দেশের পুরুষেরা এখানকার পুরুষ-সমাজে বড় মেশেন না। কারণ এখানকার পুরুষসমাজে মিশতে গেলে একরকম বলিষ্ঠ স্মৃতির ভাব থাকা চাই, বাধো-বাধো মিঠে সুরে দু-চারটে সংকোচ ‘হাঁ না’ দিয়ে গেলে চলে না। বাঙালি অভ্যাগত ডিনার টেবিলে তাঁর পার্শ্ব মহিলাটির কানে কানে মিষ্টি মিষ্টি টুকরো টুকরো দুই-একটি কথা যত্নে বীরস্বরে কইতে পারেন, আর সে মহিলার সহবাসে তিনি যে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করছেন, তা তাঁর মাথার চুল থেকে বুট জুতোর আগা পর্যন্ত প্রকাশ হতে থাকে, স্ততরাং মেয়ে-সমাজে বাঙালিরা পসার করে নিতে পারেন। আমাদের দেশে ঘোমটাচ্ছন্ন-মুখচন্দ্রশোভী অনালোকিত অন্তঃপুর থেকে এখানকার রূপের মুক্ত জ্যোৎস্নায় এসে আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে।

এক দিন আমাদের নবাগত বঙ্গযুবক তাঁর প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিমন্ত্রণসভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্থায়ী যুবতী কন্যা মিস অমকের বাহু গ্রহণ করে আহ্বারের টেবিলে গিয়ে বসলেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাই নে, তার পরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রীলোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারি নে। কোনো সামাজিকতার অল্পবোধে তারা আমাদের

মনোরঞ্জন করবার জন্তে যে-সকল কথাবার্তা হাশ্বালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্মে গ্রহণ করতে পারি নে, আমরা হঠাৎ মনে করি, আমাদের উপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি। আমাদের বঙ্গযুবকটি মিসকে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অনেক কথা জানালেন। বললেন তাঁর বিলেত অত্যন্ত ভালো লাগে, ভারতবর্ষে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে। শেষকালে দুই-একটি সাজানো কথাও বললেন। যথা, তিনি সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে গিয়ে একবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। মিসটি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেন ও তাঁর মিষ্টম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে হানতে লাগলেন। “আহা, কী গোছালো কথা! কোথায় আমাদের দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্ত শ্রমলভ্য দুই-একটি ‘ঈ না’ যা এত মুহূর্ষে ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়; আর কোথায় এখানকার বিদ্রোহ-নিঃসৃত অজস্র মধুধারা, যা অযাচিতভাবে মদিরার মতো শিরায় শিরায় প্রবেশ করে!”

হয়তো বুঝতে পারছ, কী কী মসলার সংযোগে বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত করে লিখতে পারি নি। এত সব ছোটো ছোটো বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্তন উপস্থিত করে যে, সে-সকল খুঁটিনাটি করে বর্ণনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।

ইঙ্গবঙ্গদের ভালো করে চিনতে গেলে তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরেজদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন, বাঙালিদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গবঙ্গদের সম্মুখে কী রকম ব্যবহার করেন। একটি ইঙ্গবঙ্গকে একজন ইংরেজের সম্মুখে দেখো, চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। ভদ্রতার ভাৱে প্রতি কথায় ষাড় হয়ে হয়ে পড়ছে, তর্ক করবার সময় অতিশয় সাবধানে নরম করে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ করতে হল বলে অপরাধাশ্রয় দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কথা কন আর না কন, একজন ইংরেজের কাছে একজন ইঙ্গবঙ্গ চূপ করে বসে থাকলেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখো, দেখবে তাঁর মেজাজ। বিলেতে যিনি তিন বৎসর আছেন, এক বৎসরের বিলেতবাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায় ভাৱি। এই তিন বৎসর ও এক বৎসরের মধ্যে যদি কখনো তর্ক ওঠে, তা হলে তুমি “তিন বৎসরের” প্রতাপটা একবার

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৫৭

দেখতে পাও। তিনি প্রতি কণা এমন ভাবে, এমন স্বরে বলেন যে, যেন সেই কথাগুলি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝাপড়া হয়ে একটা স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যিনি প্রতিবাদ করছেন, তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন “ভ্রান্ত” কখনো বা মুখের উপর বলেন “মূর্থ।”

সেদিন এক জন গল্প করছিলেন, যে, তাঁকে আর-এক জন বাঙালি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, “মশায়ের কী কাজ করা হয়?” এই গল্প শুনবামাত্র আমাদের একজন ইঙ্গবদ্ধ বন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বলে উঠলেন, “দেখুন দেখি, কী বাব্বারস।” ভাবটা এই যে, যেমন মিথ্যে কথা না বলা, চুরি না করা নীতি-শাস্ত্রের কতকগুলি মূল নিয়ম, তেমনি অল্প মানুষকে তার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে।

সেদিন এক জায়গায় আমাদের দেশের খাঁদের কথা হচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্য করি, বেশভূষা করি নে ইত্যাদি। শুনে একজন ইঙ্গবদ্ধ যুবক অধীর ভাবে আমাকে বলে উঠলেন যে, “আপনি অবিশ্বি, মশায়, এ-সকল অনুষ্ঠান ভালো বলেন না।” আমি বললেম, “কেন নয়? আমি দেখছি ইংরেজেরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে হবিষ্যার খেত, আর আমাদের দেশের লোকেরা না খেত, তা হলে হবিষ্যার খায় না বলে আমাদের দেশের লোকের উপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হত, ও মনে করতে, হবিষ্যার খায় না বলেই আমাদের দেশের এত দুর্দশা।” তুমি হয়তো জানো, ইংরেজেরা এক টেবিলে তেরো জন খাওয়া অলক্ষণ মনে করে, তাদের বিশ্বাস, তা হলে এক বৎসরের মধ্যে তাদের একজনের মৃত্যু হবেই। এক জন ইঙ্গবদ্ধ যখন নিমন্ত্রণ করেন তখন কোনোমতে তেরো জন নিমন্ত্রণ করেন না, জিজ্ঞাসা করলে বলেন, আমি নিজে বিশ্বাস করি নে, কিন্তু খাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে ভয় পান তাই বাধ্য হয়ে এ নিয়ম পালন করতে হয়।” সেদিন এক জন ইঙ্গবদ্ধ তাঁর একটি আত্মীয় বালককে রবিবার দিনে রাস্তায় খেলা করতে যেতে বারণ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, “রাস্তার লোকেরা কী মনে করবে?”

কতকগুলি বাঙালি বলেন, এখানকার মতো ঘর ভাড়া দেবার প্রথা তাঁরা আমাদের দেশে প্রচলিত করবেন। তাঁদের সেই একটিমাত্র সাধ। আর-এক জন বাঙালি বাংলা সমাজ সংস্কার করতে চান, বিলেতের সমাজে মেয়ে পুরুষে একত্রে নাচাটাই তাঁর চোখে অত্যাশ্চর্য ভালো লেগেছে। কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আমাদের দেশের ও এ-দেশের মেয়েদের অমিল দেখে তার পরে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ

বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষের মতো খুঁতখুঁত করতে থাকেন। একজন ইঙ্গবদ্দ নালিশ করছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পারে না, ও এখানকার মতো ভিজিটারদের সঙ্গে দেখা করতে ও ভিজিট প্রত্যাৰ্পণ করতে যায় না। এই রকম ক্রমাগত প্রতি ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে এ-দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করে করে তাঁদের চটাতাব চটনমান যন্ত্রে ব্লাড হীট ছাড়িয়ে ওঠে। একজন ইঙ্গবদ্দ তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বলছিলেন যে, যখন তিনি মনে করেন যে, দেশে ফিরে গেলে তাঁকে চারি দিকে ঘিরে মেয়েগুলো প্যান প্যান করে কাঁদতে আরম্ভ করবে, তখন আর তাঁর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। অর্থাৎ তিনি চান যে, তাঁকে দেখবামাত্রই “ডায়ার ডার্লিং” বলে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ও চুষন করে তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরি উল্টে ধরতে হবে, কি পাল্টে ধরতে হবে তাই জানবার জন্তে তাঁদের গবেষণা দেখলে তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হয়। কোটের কোন ছাঁটটা ফ্যাশন-সংগত, আজকাল নোবিলিটি আঁট প্যাণ্টলুন পরেন কি ঢল্‌কো পরেন, ওয়ালটুস নাচেন কি পোলকা মজুরী, মাছের পর মাংস খান কি মাংসের পর মাছ, সে-বিষয়ে তাঁরা অশ্রান্ত খবর রাখেন। ওইরকম ছোটোখাটো বিষয়ে একজন বাঙালি যত দস্তুর-বেদস্তুর নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এমন এ দিশি করে না। তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরি ব্যবহার কর তবে একজন ইংরেজ তাতে বড়ো আশ্চর্য হবেন না, কেননা তিনি জানেন তুমি বিদেশী, কিন্তু একজন ইঙ্গবদ্দ সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর স্মেলিং সল্‌টের আবশ্যক করবে। তুমি যদি শেরি খাবার গ্লাসে শ্যাম্পেন খাও তবে একজন ইঙ্গবদ্দ তোমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবেন, যেন তোমার এই অজ্ঞতার জন্তে সমস্ত পৃথিবীর সুখ শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় তুমি যদি মনিং কোট পর, তা হলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হলে জেলে নির্জনবাসের আজ্ঞা দিতেন। একজন বিলেত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে খেতে দেখলে বলতেন, “তবে কেন মাথা দিয়ে চল না?”

আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করে দেখেছি যে, বাঙালিরা ইংরেজদের কাছে স্বদেশের লোকদের ও আচারব্যবহারের যত নিন্দে করেন, এমন একজন ভারতবর্ষী অ্যাংগো-ইণ্ডিয়ানও করেন না। তিনি নিজের ইচ্ছা করে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্যপরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্যের দল বলে একরকম বৈষ্ণবের দল আছে। তাদের সমস্ত অলুপ্তান সবিস্তারে বর্ণনা করতে থাকেন। সভার লোকদের হাসাবার

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৫৯

অভিপ্রায়ে নেটিব নচ-গার্লরা কী রকম করে নাচে, অঙ্গভঙ্গী করে তার নকল করেন ও-তাই দেখে সকলে হাসলে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। সাহেব-সাজা বাঙালিদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙালি বলে ধরা পড়েন। এক জন বাঙালি এক বার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর-এক জন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানিতে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করে, তিনি মহা খাপা হয়ে উত্তর না দিয়ে চলে যান। তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ মনে না করতে পারে যে, তিনি হিন্দুস্থানি বোঝেন। একজন ইন্দবদ্ব একটি “জাতীয়-সংগীত” রামপ্রসাদী সুরে রচনা করেছেন; এই গানটার একটু অংশ পূর্ব পত্রে লিখেছি, বাকি আর-একটুকু মনে পড়েছে, এই জন্ত আবার তার উল্লেখ করছি। এ গীত যার রচনা, তিনি রামপ্রসাদের মতো আমার উপাসক নন, তিনি গৌরীভক্ত। এই জন্তে গৌরীকে সম্বোধন করে বলছেন,—

মা, এবার মলে সাহেব হব ;

রাঙা চুলে ছাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব।

সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব।

(আবার) কালো বদন দেখলে পরে “ডার্কি” বলে মুখ ফেরাব।

আমি পূর্বেই বিলাতে বাড়িওআলী শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছি। তারা বাড়ির লোকদের আবশ্যকমতো সেবা করে। অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরানী রাখে বা অল্প আত্মীয়েরা তাদের সাহায্য করবার জন্তে থাকে। অনেকে সুন্দরী ল্যাণ্ডলেডি দেখে ঘর ভাড়া করেন। বাড়িতে পদার্পণ করেই ল্যাণ্ডলেডির যুবতী কন্ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নেন, দু-তিন দিনের মধ্যে তার একটি-আদরের নামকরণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত হলে তার নামে হয়তো একটা কবিতা রচনা করে তাকে উপহার দেন। সেদিন ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে তাঁকে এক পেয়লা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বললেন, “না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার দরকার দেখছি নে!” আমি জানি, একজন ইন্দবদ্ব তাঁর বাড়ির দাসীদের মেজদিদি সেজদিদি বলে ডাকতেন।

আমি এক জনকে জানি, তিনি তাঁর মেজদিদি-সেজদিদিবর্গকে এত মাগু করে চলতেন যে, তাঁর ঘরে বা তাঁর পাশের ঘরে যদি এদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকত, এবং সে অবস্থায় যদি তাঁর কোনো ইন্দবদ্ব বন্ধু গান বা হাস্যপরিহাস করতেন তা হলে তিনি মহা অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠতেন, “আরে চুপ করো, চুপ করো, মিস এমিলি কী মনে করবেন?” আমার মনে আছে, দেশে থাকতে একবার এক ব্যক্তি

বিলেত থেকে ফিরে গেলে পর, আমরা তাকে খাওয়াই। খাবার সময় তিনি নিঃশাস ত্যাগ করে বললেন, “এই আমি প্রথম খাচ্ছি, যেদিন আমার খাবার টেবিলে কোনো লেডি নেই।” এক জন ইন্দুবদ্ধ একবার তাঁর কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাবার টেবিলে কতকগুলি ল্যাণ্ডলেডি ও দাসী বসে ছিল, তাদের এক জনের ময়লা কাপড় দেখে নিমন্ত্রণকর্তা তাকে কাপড় বদলে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। শুনে সে বললে, “যাকে ভালোবাসা যায়, তাকে ময়লা কাপড়েও ভালোবাসা যায়।”

এইবার ইন্দুবদ্ধদের একটি গুণের কথা তোমাকে বলছি। এখানে যারা আসেন, অনেকেই কবুল করেন না যে তাঁরা বিবাহিত, যেহেতু স্বভাবতই যুবতী কুমারী-সমাজে বিবাহিতদের দাম অল্প। অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতদের সঙ্গে মিশে অনেক যথেষ্টাচার করা যায়, কিন্তু বিবাহিত বলে জানলে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা ও-রকম অনিয়ম করতে দেয় না; সুতরাং অবিবাহিত বলে পরিচয় দিলে অনেক লাভ আছে।

অনেক ইন্দুবদ্ধ দেখতে পাবে তাঁরা আমার এই বর্ণনার বহির্গত। কিন্তু সাধারণত ইন্দুবদ্ধদের লক্ষণগুলি আমি যতদূর জানি তা লিখেছি।

ভারতবর্ষে গিয়ে ইন্দুবদ্ধদের কী রকম অবস্থা হয় সে-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও নেই, বক্তব্যও নেই। কিন্তু কিছু কাল ভারতবর্ষে থেকে তার পরে ইংলণ্ডে এলে কী রকম ভাব হয় তা আমি অনেকের দেখেছি। তাঁদের ইংলণ্ড আর তেমন ভালো লাগে না; অনেক সময়ে তাঁরা ভেবে পান না, ইংলণ্ড বদলেছে, কি তাঁরা বদলেছেন। আগে ইংলণ্ডের অতি সামান্য জিনিস ভালো লাগত; এখন ইংলণ্ডের শীত ইংলণ্ডের বর্ষা তাঁদের ভালো লাগছে না, এখন তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হলে দুঃখিত হন না। তাঁরা বলেন আগে তাঁরা ইংলণ্ডের স্ট্রবেরি ফল অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এমন কি, তাঁরা যত রকম ফল খেয়েছেন তার মধ্যে স্ট্রবেরিই তাঁদের সকলের চেয়ে স্বাদ মনে হত। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে স্ট্রবেরির স্বাদ বদলে গেল নাকি। এখন দেখছেন তার চেয়ে অনেক দিশি ফল তাঁদের ভালো লাগে। আগে ডেভন-শিয়ারের ক্রীম তাদের এত ভালো লাগত যে, তার আর কথা নেই, কিন্তু এখন দেখছেন আমাদের দেশের ক্ষীর তার চেয়ে ঢের ভালো। তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে খ্রীপুত্রপরিবার নিয়ে সংসারী হয়ে পড়েন, রোজগার করতে, আরম্ভ করেন, ভারতবর্ষের মাটিতে তাদের শিকড় এক রকম বসে যায়। মনটা কেমন শিথিল হয়ে আসে, তখন পায়ের উপর পা দিয়ে টানা পাখার বাতাস খেয়ে কোনোপ্রকারে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিলেতে আমোদ বিলাস ভোগ করতে গেলেও

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৬১

অনেক উত্তমের আবশ্যক করে। এখানে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে হলে গাড়ির চলন নেই, হাত-পা নাড়তে চাড়তে দশটা চাকরের উপর নির্ভর করলে চলে না। গাড়িভাড়া অত্যন্ত বেশি, আর চাকরের মাইনে মাসে সাড়ে তিন টাকা নয়। খিয়েটার দেখতে যাও; সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি পড়ছে, পথে কাঁদা, একটা ছাতা ঘাড়ে করে মাইল কতক ছুটোছুটি করে তবে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবে। যখন রক্তের তেজ থাকে। তখন এ-সকল পেরে ওঠা যায়।

ষষ্ঠ পত্র

আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়। এক সার হুড়ি-পচিশটি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম মেডিনা ভিলাজ। হঠাৎ মনে হয়েছিল বাগান-বাড়ি। এখানে এসে দেখি, “ভিলা” স্বর মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু-চার হাত জমিতে দু-চারটে গাছ পোঁতা আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া লাগানো, সেইটেতে ঠক ঠক করলেম, আমাদের ল্যাণ্ডলেডি এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের দেশের তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চওড়া ও উঁচুতে ঢের ছোটো। চারিদিকে জানলা বন্ধ, একটু বাতাস আসবার জো নেই, কেবল জানলাগুলো সমস্ত কাঁচের বলে আলো আসে। শীতের পক্ষে এ-রকম ছোটোখাটো ঘরগুলো ভালো, একটু আগুন জ্বাললেই সমস্ত বেশ গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু তা হ’ক, যেদিন মেঘে চারদিক অন্ধকার, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তিন-চার দিন ধরে মেঘ-বৃষ্টি-অন্ধকারের এক মুহূর্ত বিরাম নেই, সেদিন এই ছোটো অন্ধকার ঘরটার এক কোণে বসে আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়, কোনোমতে সময় কাটে না। খালি আমি বলে নয়, আমার ইংরেজ আলাপীরা বলেন, সে-রকম দিনে তাঁদের অত্যন্ত swear করার প্রবৃত্তি জন্মায় (swear করা রোগটা সম্পূর্ণ যুরোপীয়, সুতরাং ওর বাংলা কোনো নাম নেই), মনের ভাবটা অধার্মিক হয়ে ওঠে। যা হ’ক এখানকার ঘর-দুয়ারগুলি বেশ পরিষ্কার; বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে কোথাও ধুলো দেখবার জো নেই, মেজের সর্ব্বাঙ্গ কার্পেট প্রভৃতি দিয়ে মোড়া, সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক তক করছে। চোখে দেখতে খারাপ হলে এরা সইতে পারে না। প্রতি সামান্য বিষয়ে এদের ভালো দেখতে হওয়াটা প্রধান আবশ্যক। শোকবস্ত্রও সূত্রী দেখতে হওয়া

চাই। আমরা যাকে পরিষ্কার বলি সেটা কিন্তু আর একটা জিনিস। এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না, কেন না আঁচানো জল মুখ থেকে পড়ছে সে অতি কুশ্রী দেখায়। শ্রী হানি হয় বলে পরিষ্কার হওয়া হয় না। এখানে যে-রকম কলি-সর্দিয়া প্রাদুর্ভাব, তাতে ঘরে একটা পিকদান নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তার ব্যবহার কুশ্রী বলে ঘরে রাখা হয় না, রুমালে সমস্ত কাজ চলে। আমাদের দেশের যে রকম পরিষ্কার ভাব, তাতে আমরা বরঞ্চ ঘরে একটা পিকদান রাখতে পারি, কিন্তু জামার পকেটে এ-রকম একটা বীভৎস পদার্থ বহন করতে ঘৃণা হয়। কিন্তু এখানে চোথেরই আধিপত্য। রুমাল কেউ দেখতে পাবে না, তা হলেই হল। চুলটি বেশ পরিষ্কার করে আঁচড়ানো থাকবে, মুখটি ও হাত দুটি সাফ থাকবে, স্নান করবার বিশেষ দরকার নেই। এখানে জামার উপরে অন্ত্যন্ত অনেক কাপড় পরে বলে জামার সমস্তটা দেখা যায় না, খালি বুকের ও হাতের কাছে একটু বেরিয়ে থাকে। একরকম জামা আছে, তার ষতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া, সেটুকু খুলে খোবার বাড়ি দেওয়া যায়; তাতে সুবিধে হচ্ছে যে ময়লা হয়ে গেলে জামা বদলাবার কোনো আবশ্যক করে না, সেই জোড়া টুকরোগুলো বদলালেই হল। এখানকার দাসীদের কোমরে এক আঁচল বাঁধা থাকে, সেইটি দিয়ে তারা না পৌঁছে এমন পদার্থ নেই; খাবার কাঁচের প্লেট যে দেখছ বাক বাক করছে, সেটিও সেই সর্ব-পাবক-আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে, কিন্তু তাতে কী হানি, কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। এখানকার লোকেরা অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যাকে “নোংরা” বলে তাই। এখানে পরিষ্কার ভাবের যে অভাব আমরা দেখতে পাই, সে অনেকটা শীতের জন্তে। আমরা যে-কোনো জিনিস হ'ক না কেন, জল দিয়ে পরিষ্কার না হলে পরিষ্কার মনে করি নে। এখানে অত জল নিয়ে নাড়াচাড়া পোষায় না। তাছাড়া শীতের জন্তে এখানকার জিনিসপত্র শীঘ্র নোংরা হয়ে ওঠে না। এখানে শীতে ও গায়ের আবরণ থাকাতে শরীর তত অপরিষ্কার হয় না। এখানে জিনিসপত্র পচে ওঠে না। এইরকম পরিষ্কারের পক্ষে নানা বিষয়ে সুবিধে। আমাদের যেমন পরিষ্কার ভাব আছে, তেমনি পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক ঢিলেমিও আছে। আমাদের দেশের পুষ্করিণীতে কী না ফেলে? অপরিষ্কার জলকুণ্ডে স্নান; তেল মেখে ছুটো ডুব দিলেই আমরা শুচিতা কল্পনা করি। আমরা নিজের শরীর ও খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত জিনিসের বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার থাকি, কিন্তু ঘরদুয়ার যথোচিত পরিষ্কার করি নে। এমন কি অস্বাস্থ্যকর করে তুলি।

আমাদের দুই-একটি করে আলাপী হতে লাগল। ডাক্তার ম— একজন

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৬৩

আধবুড়ো চিকিৎসাব্যবসায়ী। তিনি এক জন প্রকৃত ইংরেজ, ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোনো জিনিস তাঁর পছন্দসই নয়। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডই সমস্ত পৃথিবী, তাঁর কল্পনা কখনো ভোভার প্রণালী পার হয় নি। তাঁর কল্পনার এমন অভাব যে, তিনি মনে করতে পারেন না যারা বাইবেলের দশ অল্পশাসন মানে না, তাদের মিথ্যে কথা বলতে কী করে সংকোচ হতে পারে। অখ্রীষ্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি। যে ইংরেজ নয়, যে খ্রীষ্টান নয়, এমন একটা অপূর্ব সৃষ্টি দেখলে তাঁর মনুষ্যত্ব কী করে থাকতে পারে ভেবে পান না। তাঁর মতো হচ্ছে Gladly he would learn and gladly teach, কিন্তু আমি দেখলুম তাঁর লার্ন করবার ঢের আছে, কিন্তু টীচ করবার মতো সফল বেশি নেই। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য কম জানেন; কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই-চারিটি করে ভাষা ভাষা জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কল্পনা করতে পারেন না একজন ভারতীয় কী করে এডুকটেড হতে পারে। এখানকার মেয়েরা শীতকালে হাত গরম রাখবার জন্তে একরকম গোলাকার লোমশ পদার্থের মধ্যে হাত গুঁজে রাখে তাকে মার্ক্ বলে। প্রথম বিলেতে এসে সেই অপূর্ব পদার্থ যখন দেখি, তখন ডাক্তার ম—কে সে-দ্রব্যটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমার অজ্ঞতায় তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। এখানকার অনেক লোকের রোগ দেখেছি, তাঁরা আশা করেন, আমরা তাঁদের সমাজের প্রত্যেক ছোটোখাটো বিষয় জানব। এক দিন একটা নাচে গিয়েছিলুম, এক জন মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বধূটিকে (bride) তোমার কী রকম লাগছে? আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “বধূটি কে?” অতগুলি মেয়ের মধ্যে এক জন নববধূ কোথায় আছেন তা আমি জানতুম না। শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তিনি বললেন, “তাঁর মাথায় কমলালেবুর ফুল দেখে চিনতে পার নি?”

দুই মিস ক—র সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা এখানকার পাদরির মেয়ে। পাড়ার পরিবারদের দেখাশুনো, রবিবাসরিক স্কুলে বন্দোবস্ত করা, শ্রমিকদের জন্তে টেম্পারেন্স সভা স্থাপন ও তাদের আমোদ দেবার জন্তে সেখানে গিয়ে গানবাজনা করা,—এই সকল কাজে তাঁরা দিনরাত্রি ব্যস্ত আছেন। বিদেশী বলে আমাদের তাঁরা অত্যন্ত যত্ন করতেন। নগরে কোথাও আমোদ-উৎসব হলে আমাদের খবর দিতেন, আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে সকালে কিংবা সন্ধ্যাবেলায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখাতেন, এক-এক দিন তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে যেতুম। এইরকম আমাদের যথেষ্ট যত্ন ও আদর করতেন। বড়ো মিস ক— অত্যন্ত ভালোমাহুষ ও গম্ভীর। একটা কথার

উত্তর দিতে কেমন খতমত খেতেন। “হাঁ—না—তা হবে—জানি নে” এইরকম তাঁর উত্তর। এক-এক সময় কী বলবেন ভেবে পেতেন না, এক-এক সময় একটা কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেমে পড়তেন, আর কথা জোগাত না, কোনো বিহীন মত জিজ্ঞাসা করলে বিব্রত হয়ে পড়তেন। যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, “আজ কি বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে?” তিনি বলতেন, “কী করে বলব।” তিনি বুঝতেন না যে অভ্যস্ত বেদবাক্য শুনতে চাচ্ছি নে। তিনি আন্দাজ করতে নিতান্ত নারাজ। ছোটো মিস ক—র মতো প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাব আর কারো দেখি নি। দেখে মনে হয় কোনো কালে তাঁর মনের কোনোখানে আঁচড় পড়ে নি। খুব ভালোমানুষ, সর্বদাই হাসিখুশি গল্প। কাপড়চোপড়ের আড়ম্বর নেই—কোনোপ্রকার ভান নেই; অত্যন্ত সাদাসিধে।

ডাক্তার ম—র বাড়িতে একদিন আমাদের সাক্ষ্যনিমন্ত্রণ হল। খাওয়াই এখানকার নেমস্তনের মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় গানবাজনা আমোদ-প্রমোদের জগুই দশজনকে ডাকা। আমরা সন্ধ্যার সময় গিয়ে হাজির হলুম। একটি ছোটো ঘরে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘরে প্রবেশ করে কর্তা-গিন্নিকে আমাদের সম্মান জানালুম। সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হল। ঘরে জায়গার এত টানাটানি ও লোক এত বেশি যে চোঁকির অত্যন্ত অভাব হয়েছিল; অধিকাংশ পুরুষে মিলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলুম। নতুন কোনো অভ্যাগত মহিলা এলে গিন্নি কিংবা কর্তা তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন, আলাপ হবামাত্র তাঁর পাশে গিয়ে এক বার বসছি কিংবা দাঁড়াছি ও দুই-একটা করে কথাবার্তা আরম্ভ করছি। প্রায় আবহাওয়া নিয়ে কথার আরম্ভ; মহিলাটি বলেন “ড্রেডফুল ওয়েদার।” তাঁর সঙ্গে আমার নিঃশব্দে মতের ঐক্য হল। তার পরে তিনি অল্পমান করলেন যে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ভারতীয়দের পক্ষে এমন ওয়েদার বিশেষ ট্রায়িং ও আশা করলেন আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হয়ে যাবে ইত্যাদি। তার পরে এই সূত্রে নানা কথা। সভার মধ্যে দুই জন সুন্দরী উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁরা জানতেন তাঁরা সুন্দরী। এখানে সৌন্দর্যের পূজা হয়; এখানে রূপ কোনোমতে আত্মবিশ্মৃত থাকতে পারে না, রূপাভিমান স্পষ্ট থাকতে পারে না; চারদিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তাকে জাগিয়ে তোলে। নাচঘরে রূপসীর দর অত্যন্ত চড়া; নাচে তাঁর সাহচর্য-সুখ পাবার জন্তে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আসছে; তাঁর তিলমাত্র কাজ করে দেবার জন্তে বহু লোক প্রস্তুত। রূপবান পুরুষদেরও যথোচিত আদর আছে। তারা এখানকার ড্রয়িং রুমের

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৬৫

ভালিঃ। আমি দেখছি, এ-কথা শুনে তোমার এখানে আসতে লোভ হবে। তোমার মতো সুপুরুষ এখানকার মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে চতুর্দিকে উঠবে

“.....ঘন

নিখাস প্রলয়বায়ু, অশ্রুবারিধারা

আসার, জীমূতমন্ত্র হাহাকার রব—”

যা হ'ক নিমন্ত্রণ-সভায় Miss —দ্বয় রূপসীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা দু-জনেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর। বড়ো যে মেশামেশি হাসিখুশি তা ছিল না। ছোটো মিস একটা কোঁচে গিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন, আর বড়ো মিস দেয়ালের কাছে এক চৌকি অধিকার করলেন। আমরা দুই-এক জনে তাঁদের আমোদে রাখবার জন্তে নিযুক্ত হইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কথোপকথনশাস্ত্রে বিচক্ষণ নই, এখানে যাকে উজ্জ্বল বলে তা নই। গৃহকর্তা, একজন সংগীতশাস্ত্রজ্ঞতাভিনিবী প্রোচা মহিলাকে বাজাতে অনুরোধের জন্তে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সব-চেয়ে বেশি; তিনি সব-চেয়ে বেশি সাজগোজ করে এসেছিলেন, তাঁর দু-হাতের দশ আঙুলে যতগুলো ধরে তত আংটি ছিল। আমি যদি নিমন্ত্রণকর্তা হতুম তা হলে তাঁর আংটির বাহুল্য দেখেই বুঝতে পারতুম যে তিনি পিয়ানো বাজাবেন বলে বাড়ি থেকে স্থিরসংকল্প হয়ে এসেছেন। তাঁর বাজনা সাজ হলে পর গৃহকর্তী আমাকে গান গাবার জন্তে অত্যন্ত গীড়াগীড়ি আরম্ভ করলেন। আমি বড়ো মুশকিলে পড়লাম। আমি জানতুম, আমাদের দেশের গানের উপর যে তাঁদের বড়ো অমুরাগ আছে তা নয়। ভালোমানুষ হবার বিপদ এই যে নিজেকে হাস্তকরতা থেকে বাঁচানো যায় না। তাই মিষ্টার টি— গান গাওয়ার ভূমিকা স্বরূপ দুই-একটি আরম্ভসূচক কাসি-ধ্বনি করলেন। সভা শান্ত হল। কোনোপ্রকারে কর্তব্য পালন করলাম। সভাস্থ মহিলাদের এত হাসি পেয়েছিল যে, ভদ্রতার বাঁধ টলমল করছিল; কেউ কেউ হাসিকে কাসির রূপান্তরে পরিণত করলেন, কেউ কেউ হাত থেকে কী যেন পড়ে গেছে ভান করে ঝাড় নিচু করে হাসি লুকোতে চেষ্টা করলেন, এক জন কোনো উপায় না দেখে তাঁর পার্শ্বস্থ সহচরীর পিঠের পিছনে মুখ লুকোলেন; যারা কতকটা শাস্ত থাকতে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ চলছিল। সেই সংগীতশাস্ত্রবিশারদ প্রোচাটির মুখে এমন একটু যুহু তাম্বিল্যের হাসি লেগে ছিল যে, সে দেখে শরীরের রক্ত জল হয়ে আসে। গান যখন সাজ হল তখন আমার মুখ কান লাল হয়ে উঠেছে, চারদিক থেকে একটা প্রশংসার গুঞ্জনধ্বনি উঠল, কিন্তু অত হাসির পর আমি সেটাকে কানে তুললাম না। ছোটো মিস হ— আমাকে গানটা ইংরেজিতে অনুবাদ

করতে অনুরোধ করলেন, আমি অনুবাদ করলেম। গানটা হচ্ছে “প্রেমের কথা আর ব'লো না।” তিনি অনুবাদটা শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি। কতকগুলি রোমের ভগ্নাবশেষের ফোটোগ্রাফ ছিল, সেইগুলি নিয়ে গৃহকর্ত্রী কয়েক জন অভ্যাগতকে জড়ো করে দেখাতে লাগলেন। ডাক্তার ম—একটা টেলিফোন কিনে এনেছেন, সেইটি নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কোঁতুহল তৃপ্ত করছেন। পাশের ঘরে টেবিলে খাবার সাজানো। এক-এক বার গৃহকর্ত্রী এসে এক-এক জন পুরুষের কানে কানে বলে যাচ্ছেন, মিস অথবা মিসেস অমুককে নিশিভোজনে নিয়ে যাও ; তিনি গিয়ে সেই মহিলার কাছে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করছেন ও তাঁর বাহুগ্রহণ করে তাঁকে পাশের ঘরে আহ্বারস্থলে নিয়ে যাচ্ছেন। এ-রকম সভায় সকলে মিলে এক বাঁরে খেতে যায় না, তার কারণ তা হলে আমোদপ্রমোদের শ্রোত অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। এই রকম এক সঙ্গে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে গানবাজনা গল্প আমোদপ্রমোদ আহ্বারাদিতে একটা সন্ধ্যা কাটানো গেল।

এখানে মিলনের উপলক্ষ্য কতপ্রকার আছে, তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল, *conversazione*, চা-সভা, লন পার্টি, এক্সকার্শন, পিকনিক ইত্যাদি। থ্যাকারে বলেন, “English society has this eminent advantage over all others—that is, if there be any society left in the wretched distracted old European continent—that it is above all others a dinner giving society.” অবসর পেলে এক সন্ধ্যা বন্ধুবান্ধবদের জড়ো করে আহ্বারাদি করি ও আমোদপ্রমোদ করে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে। ডিনার-সভার বর্ণনা করতে বসা বাহুল্য। ডাক্তার ম—র বাড়িতে যে পার্টির কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে ডিনার পার্টির প্রভেদ কেবল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে (এ স্নেচ্ছদের দেশে ডক্ষিণটা আবার দক্ষিণ বাম উভয় হস্তের ব্যাপার)। আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও পিকনিক পার্টিতে ছিলাম। এখানকার একটি রবিবারিক সভার সভ্যরা এই বোট-যাত্রার উদ্যোগী। এই সভার সভ্য এবং সভ্যারা রবিবার পালনের বিরোধী। তাই তাঁরা রবিবারে একত্র হয়ে নির্দোষ আমোদপ্রমোদ করেন। এই রবিবারিক সভার সভ্য আমাদের এক বাড়ালি মিত্র ম—মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ করে টিকিট দেন। লণ্ডন থেকে রেলোয়ে করে টেমসের ধারে এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলুম। গিয়ে দেখলুম টেমসে একটা প্রকাণ্ড নৌকো বাঁধা, আর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন রবিবার-বিরোধী মেয়েপুরুষ একত্র

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৬৭

হয়েছেন। দিনটা অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর বাদের বাদের আসবার কথা ছিল, তাঁরা সকলে আসেন নি। আমার নিজের এ পার্টিতে যোগ দিবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ম—মহাশয় নাছোড়বান্দা। আমরা অনেক ভারতবর্ষীয় একত্রে হয়েছিলুম, বোধ হয় ম—মহাশয় সকলকেই সুন্দরীর লোভ দেখিয়েছিলেন, কেন না সকলেই প্রায় বাহারে সাজগোজ করে গিয়েছিলেন। অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি বেঁধেছিলেন। ম—মহাশয় স্বয়ং তাঁর নেকটাইয়ে একটি তলবারের আকারে পিন গুঁজে এসেছিলেন। আমাদের মধ্যে এক জন তাঁকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলেন, “দেশের সমস্ত টাইয়ে যে তলবারের আঘাত করা হয়েছে, ওটা কি তার বাহ লক্ষণ?” তিনি হেসে বললেন, “তা নয় গো, বুকের কাছে একটা কটাঙ্কের ছুরি বিঁধেছে, ওটা তারই চিহ্ন।” দেশে থাকতে বিঁধেছিল, কি এখানে, তা কিছু বললেন না। ম—মহাশয়ের হাসিতামাশার বিরাম নেই; সেদিন তিনি স্টীমারে সমস্ত লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঠাট্টা ও গল্প করে কাটিয়েছিলেন। এক বার তিনি মহিলাদের হাত দেখে গুনতে আরম্ভ করলেন। তখন তিনি বোটসুদ্ধ মেয়েদের এত প্রচুর পরিমাণে হাসিয়েছিলেন যে, সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর উপর আমার মনে মনে একটুখানি ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছিল। যথাসময়ে বোট ছেড়ে দিল। নদী এত ছোটো যে, আমাদের দেশের খালের কাছাকাছি পৌঁছয়। স্টীমারের মধ্যে আমাদের আলাপ-পরিচয় গল্পসল্প চলতে লাগল। এক জন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের এক জন দিশি লোকের ধর্মসংক্রান্ত তর্ক উঠল। আমাদের সঙ্গে এক জনের আলাপ হল, তিনি তাঁদের ইংরেজি সাহিত্যের কথা তুললেন, তাঁর শেলির কবিতা অত্যন্ত ভালো লাগে; সে-বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হল দেখে তিনি ভারি খুশি হলেন; তিনি আমাকে বিশেষ করে তাঁর বাড়ি যেতে অহুরোধ করলেন। ইনি ইংরেজি সাহিত্য ও তাঁর নিজের দেশের রাজনীতি ভালোরকম করে চর্চা করেছেন, কিন্তু যেই ভারতবর্ষের কথা উঠল, অমনি তাঁর অজ্ঞতা বেরিয়ে পড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কোন রাজার অধীনে।” আমি অবাক হয়ে বললুম, “ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের।” তিনি বললেন, “তা আমি জানি, কিন্তু আমি বলছি, কোন ভারতবর্ষীয় রাজার অব্যবহিত অধীনে।” কলকাতার বিষয়ে এঁর জ্ঞান এই রকম। তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, “আমার অজ্ঞতা মাফ করবেন, ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত ছিল, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি আমি এ-বিষয়ে খুব কম জানি।” এইরকম বোটের ছাতের উপর আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল; আমাদের মাথার উপরে একটা কানাতের আচ্ছাদন। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করে

বৃষ্টি হচ্ছে, কানাতের আচ্ছাদনে সেটা কতকটা নিবারণ করছে। যেদিকে বৃষ্টির ছাঁট পৌঁছেছে না, সেইদিকে মেয়েদের রেখে আর-এক পাশে এসে ছাঁটা খুলে দাঁড়ালুম। দেখি আমাদের দিশি বন্ধু ক—মহাশয় সেই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। এই নিম্নে তাঁকে ঠাট্টা করাতে তিনি বার বার করে বললেন যে, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য অভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যা হ'ক সেদিন আমরা বৃষ্টিতে তিন-চার বার করে ভিজছি। এইরকম ভিজতে ভিজতে গম্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে ও জমি ভিজছে। মাঠে নেবে আমাদের খাওয়াদাওয়ার কথা ছিল, আকাশের ভাবগতিক দেখে তা আর হল না। আহ্বারের পর আমরা নৌকো থেকে নেবে বেড়াতে বেরোলেম। কোনো কোনো প্রণয়ীযুগল একটি ছোটো নৌকো নিয়ে দাঁড় বেঁয়ে চললেন, কেউ বা হাতে হাতে ধরে নিরিবিলা কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফওআলা তার ফটোগ্রাফের সুরঞ্জাম সঙ্গে করে এনেছিল, আমরা সমস্ত দল মাঠে দাঁড়ালেম, আমাদের ছবি নেওয়া হল। সহসা ম—মহাশয়ের খেয়াল গেল যে আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্তি আছি, একত্রে সকলের ছবি নেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন, তাঁরা এ প্রস্তাবে ইতস্তত করতে লাগলেন, এরকম একটা ইন্ডীডিয়স ডিসটিংসন তাঁদের মনঃপূত নয়; কিন্তু ম—মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন। অবশেষে স্টীয়ার লণ্ডন অভিমুখে ছাড়া হল। তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার সহস্র রশ্মি সংঘমন পুরঃসর অন্তাচল-চূড়াবল্লী জলধরপটল-শয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিত্বাসপূর্বক অরুণ-বর্ণ নিজাতুর লোচন মুদ্রিত করিলেন; বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্তন করিল, গাভীরন্দ্র হাঙ্গারব করিতে করিতে গোপালের অঙ্গবর্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা করলেম।

সপ্তম পত্র

এখানকার ধনী ক্যাশনেবল মেয়েদের কথা একটু বলে নিই। তাঁদের দোরস্ত করতে হলে দিন-দুই আমাদের দিশি শাণ্ডি়র ও বিধবা ননদের হাতে রাখতে হয়। তাঁরা হচ্ছেন বড়োমাল্লের মেয়ে কিংবা বড়োমাল্লের স্ত্রী। তাঁদের চাকর আছে, কাজকর্ম করতে হয় না, একজন হাউস-কীপার আছে, সে বাড়ির সমস্ত

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৬৯

ঘরকরা তদারক করে, একজন নার্স আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে, একজন গভর্নেস আছেন তিনি ছেলেপিলেদের পড়াশুনা দেখেন ও অত্যন্ত নানাবিধ বিষয়ে তদারক করেন; তবে আর পরিশ্রম করার কী রইল বলা। কেবল একটা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে সাজসজ্জা; কিন্তু তার জন্য তাঁর লেডিজ মেড আছে, সুতরাং সেটাও সমস্টা নিজে হাতে করতে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আঁস্ত পড়ে থাকে। সকালবেলায় বিছানায় পড়ে, দরজা-জানলা বন্ধ করে সূর্যের আলো আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খান ও এগারোটার আগে শয়নগৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজসজ্জা; সে-বিষয়ে তোমাকে কোনো প্রকার খবর দিতে পারছি নে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা ক্যাশন হয়েছে কিন্তু এখনো এটা খুব কম দূর ব্যাপ্ত। সীমস্তিনীরা হাতের যতটুকু বেরিয়ে থাকে—মুখটি ও গলাটি—দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন; বাকি অঙ্গ পরিষ্কার করার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না; কেননা মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোনোপ্রকার মরচে না পড়লেই হল। মাসে দু-বার একটা স্পঞ্জ-বাথ নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন। আমি কোনো ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস করতে গিয়েছিলাম, আমি স্নান করি শুনে তাঁরা বিপন্ন হয়েছিলেন। কোনো প্রকার স্নানের সরঞ্জাম ছিল না, সেজন্তে অগভীর একটা গোল জলাধার খার করে আনতে হয়েছিল। বাড়ীতে লোক দেখা করতে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারি করা গৃহিণীর কাজ, অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমানভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারো সঙ্গে বেশি কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশি যত্ন করাটা উচিত নয়। এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যাসে দুরন্ত হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে শেষ করেই সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা তাঁরা একজনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বলতে বলতে এক-এক বার করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন, কখনো বা, তাস খেলবার সময় যে-রকম করে চটপট তাস বিতরণ করে, তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে করে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়াতাড়ি ও এমন দক্ষতার সঙ্গে যে, তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। এক জনকে বললেন, “Lovely morning, isn’t it?” তার পরেই তাড়াতাড়ি আর-এক জনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন,

“কাল রাত্রিরে সংগীতশালায় মাদাম নীলসন গান করেছিলেন, it was exquisite !” যতগুলি মহিলা ভিজিটর বসেছিলেন সকলে ওই কথায় এক-একটা বিশেষণ যোগ করতে লাগলেন ; এক জন বললেন “charming,” এক জন বললেন “superb,” এক জন বললেন “something unearthly,” আর-এক জন বাকি ছিলেন, তিনি বললেন “Isn’t it?” আমার বোধ হয়, এ এক রকম সকালবেলা উঠে কথোপকথনের মুণ্ডর ভাঁজ। যা হ’ক এই রকম মাঝে মাঝে ভিজিটর আনাগোনা করছে। মুভীজ লাইব্রেরিতে তিনি চাঁদা দিয়ে থাকেন। সেখান থেকে অনবরত ক্ষণজীবী নভেলগুলো তাঁর ওখানে যাতায়াত করে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ করেন। তা ছাড়া আছে ভালোবাসার অভিনয়। মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার আদান-প্রদান, অলীক ছুতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান, হয়তো পুরুষ-পক্ষ থেকে একটু রসিকতা, অপর পক্ষে উত্তত ক্ষুদ্র মুষ্টি সহযোগে স্তমধুর লাঞ্ছনা, “oh you naughty, wicked, provoking man !” তা ত নটি ম্যান-এর পরিপূর্ণ তৃপ্তি ! এই রকম ভিজিটর অভ্যর্থনা, ভিজিট প্রত্যাৰ্পণ, নতুন নভেল পড়া, নতুন ক্যাশন সৃষ্টি ও নতুন ক্যাশনের অল্পবর্তন করা, এবং তার সঙ্গে মধুর রস যোগ করে ফ্লার্ট এবং হয়তো ‘লাভ’ করা তাঁদের দিনকৃত্য। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্তে প্রস্তুত করে, যথেষ্ট লেখাপড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আপিসে যেতে হবে না ; এখানেও তেমনি মাগ্গি দরে বিকোবার জন্তে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্তে যতটুকু লেখাপড়া শেখা দরকার ততটুকু যথেষ্ট। একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা, খানিকটা ফরাসি ভাষা বিকৃত উচ্চারণ, একটু বোনা ও সেলাই করা জানলে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রংচঙে পুতুল গড়ে তোলা যায়। এ-বিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত, আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত মাত্র। আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অগ্নাত টুকিটাকি শেখবার দরকার করে না, বিলিতি মেয়েদেরও অল্পখল লেখাপড়া শিখতে হয়, কিন্তু দুই-ই দোকানে বিক্রি হবার জন্তে তৈরি। এখানেও পুরুষেরাই হঠাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের অল্পগতা ; স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছামতো চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন। ক্যাশনী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে সংসার চলত না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের অনেকটা মেহনত করতে হয়, বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার রান্নাঘর তদারক করতে

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৭১

হয়, সে-সব পরিষ্কার আছে কি না, জিনিসপত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে কি না, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কি না ইত্যাদি দেখাশুনো করা; রান্না ও খাবার জিনিস ক্রমান্বয়ে হুকুম দেওয়া, পরস্পর বাঁচাবার জন্তে নানাপ্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলা, কালকের মাংসের হাড়গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে তা হলে বন্দোবস্ত করে তার থেকে আজকের সুপ চালিয়ে নেওয়া, পরশু দিনকার বাসি রান্না মাংস যদি খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা বাকি থাকে তা হলে সেটাকে রপান্তরিত করে আজকের টেবিলে আনবার সুবিধে করে দেওয়া, এইরকম নানাপ্রকার গৃহীণনা। তার পরে ছেলেদের জন্ত মোজা কাপড়চোপড়, এমন কি নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন। এদের সকলের ভাগ্যে নভেল পড়া ঘটে ওঠে না; বড়োজোর খবরের কাগজ পড়েন, তাও সকলে পড়েন না দেখেছি; অনেকের পড়াশুনোর মধ্যে কেবল চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা, দোকানদারদের বিল পড়া ও হিসাব লেখা। তাঁরা বলেন, “পলিটিক্স এবং অত্যন্ত গ্রাম্ভারি বিষয় নিয়ে পুরুষেরা নাড়াচাড়া করুন; আমাদের কর্তব্য কাজ স্বতন্ত্র।” দুর্বলতা মেয়েদের একটা গর্বের বিষয়; সুতরাং অনেক মেয়ে শ্রাস্ত না হলেও এলিয়ে পড়েন। বুদ্ধিবিহার বিষয়েও এইরকম; মেয়েরা জাঁক করে বলেন, “আমরা বাপু ও-সব বুঝিই নে।” বিহার অভাব, বুদ্ধির খর্বতা একটা প্রকাশ্য জাঁকের বিষয় হয়ে ওঠে। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা বিচারচার দিকে ততটা মনোযোগ দেন না, তাঁদের স্বামীরাও তার জন্তে বড়ো দুঃখিত নন, তাঁদের জীবন হচ্ছে কতকগুলি ছোটোখাটো কাজের সমষ্টি। সন্ধ্যাবেলায় স্বামী কর্মক্ষেত্র থেকে এলে একটি আদরের চুষন উপার্জন করেন, (পরিবার-বিশেষে যে তার অন্তর্থা হয় তা বলাই বাহুল্য) ঘরে তাঁর জন্তে আগুন জ্বালানো, খাবার সাজানো আছে। সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রী হয়তো একটা সেলাই নিয়ে বসলেন, স্বামী তাঁকে একটি নভেল টেবিলে পড়ে শোনাতে লাগলেন, সুমুখে আগুন জ্বলছে, ঘরটি বেশ গরম, বাইরে পড়ছে বৃষ্টি, জানলা-দরজাগুলি বন্ধ। হয়তো স্ত্রী পিয়ানো বাজিয়ে স্বামীকে খানিকটা গান শোনালেন। এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গিন্নিরা সাদাসিধে। যদিও তাঁরা ভালো করে লেখাপড়া শেখেন নি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার। এদেশে কথাবার্তার জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বন্ধ নন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ করেন, আত্মীয়-সভায় একটা কোনো উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চা হলে তাঁরা শোনে ও নিজের বক্তব্য বলতে পারেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির একটা বিষয়ের কত দিক দেখেন ও কী রকম চক্ষে দেখেন তা বুঝতে পারেন। সুতরাং একটা কথা উঠলে কতকগুলো ছেলেমানুষি আকাশ-থেকে-পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না

ও তাঁকে হাঁ করে থাকতে হয় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খুব সহজভাবে গল্পখল্প করতে পারেন, নিমন্ত্রণসভায় মুখ ভার করে বা লজ্জায় অবসন্ন হয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্তায় ঘেঁষাঘেঁষি নেই, কিংবা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক ভাবে দূরেও থাকেন না। লোকসমাজে মুখটি খুব হাসিখুশি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকানন, কিন্তু হাসিতামাশা বেশ উপভোগ করতে পারেন, একটা কিছু ভালো লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু মজার কথা শুনলে প্রাণ খুলে হাসি করেন।

আমি দিনকতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস করেছিলুম। সে বড়ো অদ্ভুত পরিবার। মিষ্টার ব—মধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাতিন ও গ্রীক খুব ভালো রকম জানেন। তাঁর ছেলেপিলে কেউ নেই,—তিনি, তার স্ত্রী, আমি, আর এক জন দাসী, এই চার জনমাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম। কর্তা আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্তি, দিনরাত খুঁতখুঁত খিট খিট করেন, নিচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট্টো জানলাওয়ালা দরজা-বন্ধ অন্ধকার ঘরে থাকেন। একে তো সূর্যকিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে না, তাতে জানলার উপরে একটা পর্দা ফেলা, চারদিকে পুরোনো ছেঁড়া ধুলোমাখা নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাতিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ করলে এক রকম বন্ধ হাওয়ায় হাপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর স্টাডি, এইখানে তিনি পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্বদাই বিরক্ত। আট বুটজুতো পরতে বিলম্ব হচ্ছে, বুটজুতোর উপর চটে ওঠেন; যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকের তাঁর পকেট আটকে যায়, রেগে ভুরু কঁকড়ে ঠোঁট নাড়তে থাকেন। তিনি যেমন খুঁতখুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁতখুঁতের কারণ প্রতি পদে জোটে। আসতে যেতে হুঁচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেয়াল খোলে না, যদি বা খোলে তবু যে-জিনিস খুঁজছিলেন তা পান না। এক-এক দিন সকালে তাঁর স্টাডিতে এসে দেখি, তিনি অকারণে বসে বসে জরুটি করে উ-জা করছেন, ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু ব—আসলে ভালোমানুষ; তিনি খুঁতখুঁতে রটে, রাগী নন, খিটখিট করেন কিন্তু ঝগড়া করেন না। নিদেন তিনি মানুষের উপর রাগ প্রকাশ করেন না, টাইনি বলে তাঁর একটি কুকুর আছে তার উপরেই তাঁর আক্রোশ। সে একটু নড়লে চড়লে তাকে ধমকাতে থাকেন, আর দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাসতে দেখি নি। তাঁর কাপড়চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মানুষটা এই রকম। তিনি এক-কালে পাখি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বলতে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন। তাঁর এত কাজের ভিড়, এত লোককে

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৭৩

পড়াতে হত যে, এক-এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক-এক দিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন অবস্থায় খিটখিটে হয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য নয়। গৃহিণী খুব ভালোমাত্র, রাগী উদ্ধত নন, এককালে বোধ হয় ভালো দেখতে ছিলেন, যত বয়স, তার চেয়ে তাঁকে বড়ো দেখায়, চোখে চশমা, সাজগোজের বড়ো আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম করেন, ছেলেপিলে নেই, স্ততরাং কাজকর্ম বড়ো বেশি নয়। আমাকে খুব যত্ন করতেন। খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, দম্পতির মধ্যে বড়ো ভালোবাসা নেই, কিন্তু তাই বলে যে দু-জনের মধ্যে খুব বিরোধ ঘটে তাও নয়, অনেকটা নিঃশব্দে সংসার চলে যাচ্ছে। মিসেস ব— কখনো স্বামীর স্টাডিতে যান না; সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দু-জনের মধ্যে দেখাশুনা হয় না, খাবার সময়ে দু-জনে চুপচাপ বসে থাকেন। খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দু-জনে পরস্পর গল্প করেন না। ব—র আলুর দরকার হয়েছে, তিনি চাপা গলায় মিসেসকে বললেন, “some potatoes” (please কথাটা বললেন না কিংবা শোনা গেল না)। মিসেস ব— বলে উঠলেন “I wish you were a little more polite”। ব— বললেন “I did say ‘please’”; মিসেস ব— বললেন “I did not hear it”; ব— বললেন “it was no fault of mine”। এইখানেই দুই পক্ষ চুপ করে রইলেন। মাঝে থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়ে যেতাম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরি করেছিলাম, গিয়ে দেখি, মিসেস ব—, ব—কে ধমকাচ্ছেন, অপরাধের মধ্যে তিনি মাংসের সঙ্গে একটু বেশি আলু নিয়েছিলেন। আমাকে দেখে মিসেস ক্ষান্ত হলেন, মিষ্টার সাহস পেয়ে শোধ তোলবার জন্তে দ্বিগুণ করে আলু নিতে লাগলেন, মিসেস তাঁর দিকে নিরুপায় মর্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে যথারীতি ডিয়ার ডার্লিং বলে ভুলেও সোধোন করেন না, কিংবা কারো ক্রিস্টান নাম ধরে ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে মিষ্টার ব— ও মিসেস ব— বলে ডাকেন। আমার সঙ্গে মিসেস হয়তো বেশ কথাবার্তা কছেন, এমন সময় মিষ্টার এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষই এই রকম। একদিন মিসেস আমাকে পিয়ানো শোনাচ্ছেন, এমন সময় মিষ্টার এসে উপস্থিত; বললেন “When are you going to stop?” মিসেস বললেন “I thought you had gone out”। পিয়ানো থামল। তার পরে আমি যখন পিয়ানো শুনতে চাইতাম মিসেস বলতেন, “that horrid man যখন বাড়িতে না থাকবেন তখন শোনাব”, আমি ভারি অপ্রস্তুতে পড়ে যেতাম। দু-জনে এই রকম অমিল অঞ্চ

ও তাঁকে হাঁ করে থাকতে হয় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খুব সহজভাবে গল্পবল্ল করতে পারেন, নিমন্ত্রণসভায় মুখ ভার করে বা লজ্জায় অবসন্ন হয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁষাঘেঁষি নেই, কিংবা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক ভায়ে দূরেও থাকেন না। লোকসমাজে মুখটি খুব হাসিখুশি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকানন, কিন্তু হাসিতামাশা বেশ উপভোগ করতে পারেন, একটা কিছু ভালো লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু মজার কথা শুনলে প্রাণ খুলে হাস্য করেন।

আমি দিনকতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস করেছিলুম। সে বড়ো অদ্ভুত পরিবার। মিষ্টার ব—মধ্যবিত্ত লোক। তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক খুব ভালো রকম জানেন। তাঁর ছেলেপিলে কেউ নেই, তিনি, তার স্ত্রী, আমি, আর এক জন দাসী, এই চার জনমাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম। কর্তা আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্তি, দিনরাত খুঁতখুঁত খিট খিট করেন, নিচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট্টো জানলাওয়ালা দরজা-বন্ধ অন্ধকার ঘরে থাকেন। একে তো সূর্যকিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে না, তাতে জানলার উপরে একটি পর্দা ফেলা, চারদিকে পুরোনো ছেঁড়া ধুলোমাখা নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক ল্যাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ করলে এক রকম বন্ধ হাওয়ায় হাপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর স্টাডি, এইখানে তিনি পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্বদাই বিরক্ত। আঁট বুটজুতো পরতে বিলম্ব হচ্ছে, বুটজুতোর উপর চটে ওঠেন; যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকের তাঁর পকেট আটকে যায়, রেগে ভুরু কঁকড়ে ঠোঁট নাড়তে থাকেন। তিনি যেমন খুঁতখুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁতখুঁতের কারণ প্রতি পদে জোটে। আসতে যেতে হুঁচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেওয়াল খোলে না, যদি বা খোলে তবু যে-জিনিস খুঁজছিলেন তা পান না। এক-এক দিন সকালে তাঁর স্টাডিতে এসে দেখি, তিনি অকারণে বসে বসে ভ্রুকুটি করে উ-আঁ করছেন, ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু ব—আসলে ভালোমানুষ; তিনি খুঁতখুঁতে রটে, রাগী নন, খিটখিট করেন কিন্তু ঝগড়া করেন না। নিদেন তিনি মানুষের উপর রাগ প্রকাশ করেন না, টাইনি বলে তাঁর একটি কুকুর আছে তার উপরেই তাঁর আক্রোশ। সে একটু নড়লে চড়লে তাকে ধমকাতে থাকেন, আর দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাসতে দেখি নি। তাঁর কাপড়চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মানুষটা এই রকম। তিনি এক-কালে পাদরি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বলতে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন। তাঁর এত কাজের ভিড়, এত লোককে

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৭৩

পড়াতে হত যে, এক-এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক-এক দিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন অবস্থায় খিটখিটে হয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য নয়। গৃহিণী খুব ভালোমানুষ, রাগী উদ্ধত নন, এককালে বোধ হয় ভালো দেখতে ছিলেন, যত বয়স, তার চেয়ে তাঁকে বড়ো দেখায়, চোখে চশমা, সাজগোজের বড়ো আড়ম্বর নেই। নিজের রাগে, বাড়ির কাজকর্ম করেন, ছেলেপিলে নেই, স্ত্রুতাং কাজকর্ম বড়ো বেশি নয়। আমাকে খুব যত্ন করতেন। খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, দম্পতির মধ্যে বড়ো ভালোবাসা নেই, কিন্তু তাই বলে যে দু-জনের মধ্যে খুব বিরোধ ঘটে তাও নয়, অনেকটা নিঃশব্দে সংসার চলে যাচ্ছে। মিসেস ব— কখনো স্বামীর স্টাডিতে যান না; সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দু-জনের মধ্যে দেখাশুনা হয় না, খাবার সময়ে দু-জনে চুপচাপ বসে থাকেন। খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দু-জনে পরস্পর গল্প করেন না। ব—র আলুর দরকার হয়েছে, তিনি চাপা গলায় মিসেসকে বললেন, “some potatoes” (please কথাটা বললেন না কিংবা শোনা গেল না)। মিসেস ব— বলে উঠলেন “I wish you were a little more polite”। ব— বললেন “I did say ‘please’”; মিসেস ব— বললেন “I did not hear it”; ব— বললেন “it was no fault of mine”। এইখানেই দুই পক্ষ চুপ করে রইলেন। মাঝে থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরি করেছিলেম, গিয়ে দেখি, মিসেস ব—, ব—কে ধমকাচ্ছেন, অপরাধের মধ্যে তিনি মাংসের সঙ্গে একটু বেশি আলু নিয়েছিলেন। আমাকে দেখে মিসেস ক্ষান্ত হলেন, মিষ্টার সাহস পেয়ে শোধ তোলবার জন্তে দ্বিগুণ করে আলু নিতে লাগলেন, মিসেস তাঁর দিকে নিরুপায় মর্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে যথারীতি ডিয়ার ডার্লিং বলে ভুলেও সন্দোহন করেন না, কিংবা কারো ক্রিস্টান নাম ধরে ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে মিষ্টার ব— ও মিসেস ব— বলে ডাকেন। আমার সঙ্গে মিসেস হয়তো বেশ কথাবার্তা কছেন, এমন সময় মিষ্টার এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষই এই রকম। একদিন মিসেস আমাকে পিয়ানো শোনাচ্ছেন, এমন সময় মিষ্টার এসে উপস্থিত; বললেন “When are you going to stop?” মিসেস বললেন “I thought you had gone out”। পিয়ানো থামল। তার পরে আমি যখন পিয়ানো শুনতে চাইতেম মিসেস বলতেন, “that horrid man যখন বাড়িতে না থাকবেন তখন শোনাব”, আমি ভারি অপ্রস্তুতে পড়ে যেতুম। দু-জনে এই রকম অমিল অথচ

৫৭৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সংসার বেশ চলে যাচ্ছে। মিসেস রাখছেন বাড়ছেন কাজকর্ম করছেন, মিষ্টার রোজকার করে টাকা এনে দিচ্ছেন; দু-জনে কখনো প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখনো কখনো দুই-এক বার দুই একটা কথা-কাটাকাটি হয়, তা এত যত্নসহে যে, পাশের ঘরের লোকের কানে পৰ্যন্ত পৌঁছয় না। বা হ'ক আমি সেখানে দিনকতক থেকে বিব্রত হয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চলে এসে বেঁচেছি।

অষ্টম পত্র

আমরা এখন লণ্ডন ত্যাগ করে এসেছি। লণ্ডনের জনসমুদ্রে জোয়ারভাঁটা খেলে তা জান? বসন্তের আরম্ভ থেকে গরমির কিছুদিন পর্যন্ত লণ্ডনের জোয়ার-ঝড়। এই সময়ে লণ্ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে—থিয়েটার, নাচগান, প্রকাণ্ড ও পারিবারিক 'বল', আমোদপ্রমোদে ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেসি। ধনী লোকদের বিলাসিনী মেয়েরা রাতকে দিন করে তোলে। আজ তাদের নাচে নৈমন্ত্য, কাল ডিনারে, পরশু থিয়েটার, তরশু রান্দিরে ম্যাডাম-প্যাটি'র গান, দিনের চেয়ে রান্দিরের ব্যস্ততা বেশি। সুকুমারী মহিলা, ষাঁদের তিলমাত্র শ্রম লাঘবের জন্তে শত শত ভক্ত সেবকের দল দিনরাত্রি প্রাণপণ করছেন—চৌকিটা সরিয়ে দেওয়া, প্লেটটা এগিয়ে দেওয়া, দরজাটা খুলে দেওয়া, মাংসটা কেটে দেওয়া, পাখাটা কুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি—তাঁরা রান্দিরের পর রান্দির ন-টা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত গ্যাসের ও মালুকের নিশ্বাসে গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্যে রত; সে আবার আমাদের দেশের অলস নড়েচড়ে বেড়ানো বাইনাচের মতো নয়, অনবরত ঘুরপাক। ললিতা রমণীরা কী করে টিকে থাকেন, আমি তাই ভাবি। এই তো গেল আমোদপ্রমোদ, তা ছাড়া এই সময়ে পার্লামেন্টের অধিবেশন। ব্যাণ্ডের একতান স্বর, নাচের পদশব্দ, ডিনার-টেবিলের হাশালাপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র একটা পোলিটিকাল উত্তেজনা। স্থিতিশীল ও গতিশীল দলভুক্তরা প্রতি রাত্রের পার্লামেন্টের রাজনৈতিক মন্তব্যের বিবরণ কী আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকে। সীজনের সময় লণ্ডনে এই রকম আলোড়ন। তার পরে আবার ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হয়, লণ্ডনের ক্লমপক্ষ আসে। তখন আমোদ-কোলাহল বন্ধ হয়ে যায়, বাকি থাকে অল্পবল্ল লোক, যাদের শক্তি নেই, বা দরকার আছে, বা বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই। সেই সময়ে লণ্ডন থেকে চলে যাওয়া একটা ফ্যাশন। আমি একটা বইয়ে ("Sketches and Travels in London": Thackeray) পড়েছিলুম, এই সময়টাতে অনেকে যারা নগরে থাকে তারা বাড়ির সম্মুখে দরজা

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৭৫

জানলা সব বন্ধ করে বাড়ির পিছনদিকের ঘরে লুকিয়ে-চুরিয়ে বাস করে। দেখাতে চায় তারা লগুন ছেড়ে চলে গেছে। সাউথ কেনসিংটন বাগানে যাও; ক্ষিতে, টুপি, পালক, রেশম, পশম ও গাল-রং-করা মুখের সমষ্টি চোখ বলসে প্রজাপতির ঝাঁকের মতো বাগান আলো করে বেড়াচ্ছে না; বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখানে তেমনি ফুল ফুটেছে, কিন্তু তার সজীব শ্রী নেই। গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি যুচে গিয়ে লগুনটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সম্প্রতি লগুনের সীজ্জ্বন অতীত, আমরাও লগুন ছেড়ে টন্ব্রিজ ওয়েল্‌স বলে একটা আধা-পাড়াগেঁয়ে জায়গায় এসেছি। অনেক দিনের পর হালকা বাতাস খেয়ে বাঁচা গেল। হাজার হাজার চিমনি থেকে অবিশ্রান্ত পাখুরে কয়লার ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ো উড়ে উড়ে লগুনের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করেছে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোয়া জলে বোধ করি কালির কাজ করা যায়। নিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কয়লার গুঁড়ো টেনে মগজটা বোধ হয় অত্যন্ত দাহ পদার্থ হয়ে দাঁড়ায়। টন্ব্রিজ ওয়েল্‌স অনেক দিন থেকে তার লোহপদার্থমিশ্রিত উৎসের জন্তে বিখ্যাত। এই উৎসের জল খাবার জন্তে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। উৎস গুনেই আমরা কল্পনা করলেম—না জানি কী সুন্দর দৃশ্য হবে; চারদিকে পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, সারসমরালকুল-কুজিত, কমলকুমুদকল্লার-বিকশিত সরোবর, কোকিল-কুজন, মলয়-বীজন, ভ্রমর-গুঞ্জন ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে পঞ্চশব্দের প্রহার ও এক ষটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসা। গিয়ে দেখি, একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো, সেখানে একটু একটু করে জল উঠছে, একটা বুড়ি কাঁচের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে। এক-এক পেনি নিয়ে এক-এক গেলাস জল বিতরণ করছে ও অবসরমতো একটা খবরের কাগজে গতরাত্ত্রের পার্লামেন্টের সংবাদ পড়ছে। চারিদিকে দোকানবাজার; গাছপালার কোনো সম্পর্ক নেই; সম্মুখেই একটা কসাইয়ের দোকান, সেখানে নানা চতুষ্পদের ও “হংসমরালকুলের” ডানা-ছাড়ানো মৃতদেহ দড়িতে ঝুলছে; এই সব দেখে আমার মন এমন চটে উঠল যে, কোনোমতে বিশ্বাস হল না যে, এ জলে কোনোপ্রকার রোগ নিবারণ বা শরীরের উন্নতি হতে পারে।

টন্ব্রিজ ওয়েল্‌স শহরটা খুব ছোটো, দু-পা বেরোলেই গাছপালা মাঠ দেখতে পাওয়া যায়। বাড়িগুলো লগুনের মতো থামবারান্দাশূন্য, ঢালুহাতওআলা সারি সারি একঘেয়ে ভাবে দাঁড়িয়ে; অত্যন্ত শ্রীহীন দেখতে। দোকানগুলো তেমনি সুসজ্জিত, পরিপাটি, কাঁচের জানলা দেওয়া। কাঁচের ভিতর থেকে সাজানো পণ্য-

দ্রব্য দেখা যাচ্ছে ; কসাইয়ের দোকানে কোনোপ্রকার কাঁচের আবরণ নেই, চতুষ্পদেয় আস্ত আস্ত পা ঝুলছে—ভেড়া, গোরু, গুওর, বাছুরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানাপ্রকার ভাবে চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখা, হাঁস প্রভৃতি নানাপ্রকার ময়লা পাখি লম্বা লম্বা গলাগুলো নিচের দিকে ঝুলিয়ে আছে, আর খুব একটা জোয়ান পেটমোটা ব্যক্তি হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে কোমরে একটা আঁচলা ঝুলিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ।

বিলাতের ভেড়াগোরুগুলো তাদের মোটামোটা মাংসচৰ্বিওআলা শরীরের ও স্নায়বাদের জন্তে বিখ্যাত, যদি কোনো মানুষ-থেকে সন্তোষজনক থাকত, তাহলে বোধ হয় বিলাতের কসাইগুলো তাদের হাতে অত্যন্ত মাগুগি দামে বিকোত । একজন মেমসাহেব বলেন যে, কসাইয়ের দোকান দেখলে তাঁর অত্যন্ত তৃপ্তি হয় ; মনে আশ্বাস হয়, দেশে আহারের অপ্রতুল নেই, দেশের পেট ভরবার মতো খাবার প্রচুর আছে, দুর্ভিক্ষের কোনো সম্ভাবনা নেই । ইংরেজদের খাবার টেবিলে যে-রকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয়, সেটা আমার কাছে দুঃখজনক । কেটে-কুটে মসলা দিয়ে মাংস তৈরী করে আনলে একরকম ভুলে যাওয়া যায় যে একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বসেছি ; কিন্তু মুখ-পা বিশিষ্ট আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা মৃতদেহ খেতে বসেছি বলে গা কেমন করতে থাকে ।

নাপিতের দোকানের জানলায় নানাপ্রকার কাঠের মাথায় নানাপ্রকার কৌকড়ানো পরচুলো বসানো রয়েছে, দাড়িগোফ ঝুলছে, মার্কামার শিশিতে টাক-নাশক চুল-উঠে-যাওয়া-নিবারক অব্যর্থ গুথ রয়েছে ; দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকেরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে, চুল বেঁধে দেবে, চুল কঁকড়ে দেবে । এখানে মদের দোকানগুলোই সব-চেয়ে জমকালো, সন্ধ্যার সময় সেগুলো আলোয় আকীর্ণ হয়ে যায়, বাড়িগুলো প্রায় প্রকাণ্ড হয়, ভিতরটা খুব বড়ো ও সাজানো, খদ্দেরের ঝাঁক দোকানের বাইরে ও ভিতরে সর্বদাই, বিশেষত সন্ধ্যাবেলায় লেগে থাকে । দরজির দোকানও মন্দ নয় । নানা ক্যাশনের সাজসজ্জা কাঁচের জানলার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে, বড়ো বড়ো কাঠের মূর্তিকে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ; ময়েদের কাপড়চোপড় এক দিকে ঝোলানো ; এইখানে কত লোক নেত্র দিনরাত্রি তাকিয়ে আছে তার সংখ্যা নেই, এখানকার বিলাসিনীরা, যাদের নতুন ক্যাশনের দামি কাপড় কেনবার টাকা নেই, তারা দোকানে এসে কাপড়গুলো ভালো করে দেখে যায়, তার পরে বাড়িতে গিয়ে সস্তায় নিজের হাতে তৈরী করে ।

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৭৭

আমাদের বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে ; সেটা কমন অর্থাৎ সরকারি জায়গা ; চারিদিক খোলা, বড়ো গাছ খুব অল্প ; ছোটো ছোটো গুল্মের রোপ ও ঘাসে পূর্ণ, চারিদিক সবুজ, বিচিত্র গাছপালা নেই বলে কেমন ধূ ধূ করছে, কেমন বিধবার মতো চেহারা। উঁচুনিচু জমি, কাঁটাগাছের রোপরোপ, জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে ; মাঝে মাঝে এইরকম কাঁটা-খোঁচা এবড়ো-খেবড়োর মধ্যে এক-এক জায়গায় ব্লু-বেল্‌স নামক ছোটো ছোটো ফুল ঘেঁষাঘেঁষি ফুটে সবুজের মধ্যে স্তূপাকার নীল রং ছড়িয়ে রেখেছে, কোথাও বা ঘাসের মধ্যে রাশ রাশ সাদা ডেজি ও হলুদে বাটার-কাপ অজস্র সৌন্দর্যে প্রকাশিত। রোপরোপের মাঝে মাঝে এবং গাছের তলায় এক-একটা বেক্সি পাতা। এইটে সাধারণের বেড়াবার জায়গা। এখানে মানুষ এত অল্প ও জায়গা এত বেশি যে ঘেঁষাঘেঁষি নেই। লগুনের বড়ো বড়ো বেড়াবার বাগানের মতো চারদিকেই ছাতা-হস্তক, টুপি-মস্তক, চোখ-ধাঁধক ভিড়ের আনাগোনা নেই ; দূর দূর বেক্সির মধ্যে নিরালা যুগলমূর্তি রোদদূরে এক ছাতার-ছায়ায় আসীন ; কিংবা তারা হাতধরাধরি করে নিরিবিলা বেড়াচ্ছে। সবসুদ্ধ জড়িয়ে জায়গাটা উপভোগ্য। এখানে গরমিকাল শেষ হয় নি। এখানে গরমিকালে সকাল ও সন্ধ্যা অত্যন্ত সুন্দর। গরমির পূর্ণর্যোবনের সময় রাত দুটো-তিনটের পরে আলো দেখা দিতে আরম্ভ করে, চারটের সময় রোদদূর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ও রাত্রি ন-টা দশটার আগে দিনের আলো নেবে না। আমি একদিন পাঁচটার সময় উঠে কমন-এ বেড়াতে গিয়েছিলুম। পাহাড়ের উপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলুম, দূরে ছবির মতো ঘুমন্ত শহর। একটুও কুয়াশা নেই। নির্জন রাস্তাগুলি, গির্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্ররঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি কাঠে খোদাই করা ছবির মতো আঁকা। আসলে এই শহরটা কিছুই ভালো দেখতে নয় ; এখানকার বাড়িগুলোতে জানলা-কাটা-কাটা চারটে দেয়াল, একটা ঢালু ছাদ ও তার উপরে ধোয়া বেরোবার কতকগুলি কুশী নল। ক্রমে ক্রমে যতই বেলা হতে লাগল শত শত চিমনি থেকে অমনি ধোয়া বেরোতে লাগল, ধোঁয়াতে ক্রমে শহরটা অস্পষ্ট হয়ে এল, রাস্তায় ক্রমে মানুষ দেখা দিল, গাড়িষোড়া ছুটেতে আরম্ভ হল, হাতগাড়ি কিংবা ষোড়ার গাড়িতে করে দোকানিরা মাংস ঝুটি তরকারি বাড়ি বাড়ি বিতরণ করে বেড়াতে লাগল (এখানে দোকানিরা বাড়িতে বাড়িতে জিনিসপত্র দিয়ে আসে), ক্রমে কমন-এ লোক জমতে শুরু হল, আমি বাড়ি ফিরে এলেম।

এখানে আমার একটি শখের বেড়াবার জায়গা আছে। গাড়ির চাকার দাগে এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনিচু পাহাড়ে রাস্তা, দুধারে ব্ল্যাকবেরী ও ঘন লতা-গুল্মের

বেড়া, বড়ো বড়ো গাছে ছায়া করে আছে, রাস্তার আশেপাশে ঘাস ও ঘাসের মধ্যে ডেজি প্রভৃতি বুনো ফুল। শ্রমজীবীরা ধুলোকাঁদা-মাথানো ময়লা কোট-প্যান্টলুন ও ময়লা মুখ নিয়ে আনাগোনা করছে, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে লাল-লাল-ফুলো ফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে কিংবা রাস্তায় খেলা করছে, এমন মোটাসোটা গোলগাল ছেলে কোনো দেশে দেখি নি। এক-একটা বাড়ির কাছে ছোটো ছোটো পুকুরের মতো, সেখানে পোষা হাঁসগুলো ভাসছে। মাঠগুলো যদিও পাহাড়ে, উঁচুনিচু, কিন্তু চবা জমি সমতল ও পরিষ্কার। ঘাসগুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা, এখানে রোঁদ্র তাঁর নয় বলে ঘাসের রং আমাদের দেশের মতন জলে যায় না, তাই এখানকার মাঠের দিকে চেয়ে থাকতে অত্যন্ত ভালো লাগে, অজস্র স্নিগ্ধ সবুজ রঙে চোখ যেন ডুবে যায়। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো গাছ ওঁসাদা সাদা বাড়িগুলো দূর থেকে ছোটো ছোটো দেখাচ্ছে। এই রকম শূণ্য মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে এক-একটা প্রকাণ্ড পাইন গাছের অরণ্য পাওয়া যায়, ঘেঁষাঘেঁষি গাছে অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার, খুব গম্ভীর, খুব নিস্তব্ধ।

নবম পত্র

গরমিকাল। স্নন্দর সূর্য উঠেছে। এখন দুপুর ছোটো বাজে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপুরবেলাকার বাতাসের মতো বেশ একটি মিষ্টি হাওয়া, রোদ্দুরে চারদিক ঝাঁঝী করছে। এমন ভালো লাগছে আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আসছে যে কী বলব।

আমরা এখন ডেভনশিয়রের অন্তর্গত টর্কি বলে এক নগরে আছি। সমুদ্রের ধারে। চারদিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কুয়াশা নেই, অন্ধকার নেই; চারিদিকে গাছপালা, চারিদিকে পাখি ডাকছে, ফুল ফুটছে। যখন টনব্রিজ ওয়েল্‌সে ছিলাম, তখন ভাবতুম এখানে যদি মদন থাকে, তবে অনেক বনবাদাড় বোপঝাপ কাঁটাগাছ হাতড়ে দু-চারটে বুনো ফুল নিয়েই কোনোমতে তাকে ফুলশর বানাতে হয়। কিন্তু টর্কিতে মদন যদি গ্যাটলিং কামানের মতো এমন একটা বাণ উদ্ভাবন করে থাকে, যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা করে তীর ছোঁড়া-যায় আর সেই বাণ দিনরাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবে মদনের ফুলশরের তহবিল এখানে দেউলে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এত ফুল। যেখানে-সেখানে, পথে-ঘাটে, ফুল মাড়িয়ে চলতে হয়। আমরা রোজ

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৭৯

পাহাড়ে বেড়াতে যাই। গোক চরছে, ভেড়া চরছে; এক-এক জায়গায় রাস্তা এত ঢালু যে, উঠতে-নামতে কষ্ট হয়। এক এক জায়গায় খুব সংকীর্ণ পথ, দু'ধারে গাছ উঠেছে আঁধার করে, ওঠবার সুবিধের জন্তে ভাঙা ভাঙা সিঁড়ির মতন আছে, পথের মধ্যেই লতা-গুল্ম উঠেছে। চারদিকে মধুর রোদ্দুর। এখানকার বাতাস বেশ গরম; ভারতবর্ষ মনে পড়ে। এইটুকু গরমেই লগনের প্রাণীদের চেয়ে এখানকার জীবজন্তুদের কত নিজীব ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘোড়াগুলো আস্তে আস্তে যাচ্ছে, মানুষগুলোর তেমন ভারি ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি করে চলেছে।

এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড়ো ভালো লাগে। যখন জোয়ার আসে, তখন সমুদ্রতীরের খুব প্রকাণ্ড পাথরগুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো দেখায়। জলের ধারেই ছোটো বড়ো কত পাহাড়। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নিচে গুহা তৈরি হয়ে গেছে; যখন ভাঁটা পড়ে যায়, তখন আমরা এক-এক দিন এই গুহার মধ্যে গিয়ে বসে থাকি। গুহার মধ্যে জায়গায় জায়গায় অতি পরিষ্কার একটু জল জমে রয়েছে, ইতস্তত সমুদ্র-শৈবাল জমে আছে, সমুদ্রের একটা স্বাস্থ্যজনক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, চারদিকে পাথর ছড়ানো। আমরা সবাই মিলে এক-এক দিন সেই পাথরগুলো ঠেলাঠেলি করে নড়াবার চেষ্টা করি, নানা শামুক বিহুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি। এক-একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের উপর খুব ঝুঁকে পড়েছে; আমরা প্রাণপণ করে এক-এক দিন সেই অতি দুর্গম পাহাড়গুলোর উপর উঠে বসে নিচে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠাপড়া দেখি। হু হু শব্দ উঠছে, ছোটো ছোটো নৌকো পাল ভুলে চলে যাচ্ছে, চারদিকে রোদ্দুর, মাথার উপর ছাতা খোলা, পাথরের উপর মাথা দিয়ে আমরা গুয়ে গুয়ে গল্প করছি। আলাশে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর কোথায় পাব? এক-এক দিন পাহাড়ে যাই, আর পাথর-দিয়ে-ঘেরা ঝোপঝাপে ঢাকা একটা প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখলে সেই খাদটিতে গিয়ে বই নিয়ে পড়তে বসি।

দশম পত্র

ক্রিসমাস ফুরোল, আবার দেখতে দেখতে আর-একটা উৎসব এসে পড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার-জন্তে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্ছি নে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসবে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসরকে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল

৫৮০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখেছিল। পাছে পুরোনো বৎসর ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে, পাছে নতুন বৎসর এসে জানলার কাছে বৃথা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

টুকি থেকে বহুদিন হল আমরা আবার লগুনে এসেছি। এখন আমি ক—র পরিবারের মধ্যে বাস করি। তিনি, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও টেবি বলে এক কুকুর নিয়ে এই বাড়ির জনসংখ্যা। মিষ্টার ক— একজন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পাকা। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখতে। অমায়িক স্বভাব, অমায়িক মুখশ্রী। মিসেস ক— আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পরলে তাঁর কাছে ভৎসনা খাই। খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয়, আমি ক—কম করে খেয়েছি, তাহলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মতো খাই, ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতের লোকে কাশিকে ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে দু-বার কেশেছি তা হলেই তিনি জোর করে আমার ন্নান বন্ধ করান, আমাকে দশ রকম ওষুধ গেলান, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন, তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড়ো মিস ক—গুঠন। তিনি নিচে এসে ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়েছে কি না তদারক করেন; অগ্নি-কুণ্ডে দু-চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল করে রাখেন। খানিক বাদে সিঁড়িতে একটা দুন্দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বড়ো ক— শীতে হি হি করতে করতে খাবার ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আঙুলে হাত-পা পিঠ-বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বসেন। তাঁর বড়ো মেয়েকে চুষন করেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হয়। লোকটা প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে খানিকটা হাসিতামাশা হয়, খবরের কাগজ থেকে এটা-ওটা পড়ে শোনান। তাঁর এক পেয়লা কফি শেষ হয়ে গেছে। এমন সময়ে তাঁর আর দুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুষন করলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যেদিন মিষ্টার ক—র আগে উঠবেন, সেদিন মিষ্টার ক— তাঁদের পাঁচ সিকে পুরস্কার দিবেন, আর যেদিন মিষ্টার ক— তাঁদের আগে উঠবেন, সেদিন তাঁদের চার আনা দণ্ড দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হত, তবু তাদের কাছে প্রায় দু-তিন পাউণ্ড পাওনা হয়েছে। রোজ সকালে পাওনাদার পাওনার দাবি করেন। কিন্তু দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। ক— বলেন, “এ ভারি অনায়াস।” আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন, “আচ্ছা মিষ্টার টি— তুমিই বলো, এ-রকম ডেট অফ অনর কীকি দেওয়া কি ভদ্রতা?” যা হোক

মুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৮১

পরিশোধের অভাবের পাণ্ডনা বেড়েই চলেছে। তার পরে মিসেস ক—এলেন। আমাদের ব্রেকফাস্ট প্রায় সাড়ে নটার মধ্যে শেষ হয়। বাড়ির বড়ো ছেলোঁ আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েছেন, আর মিস্টার ক—র ছোটো ছেলেটি ও ছোটো মেয়েটি অনেকক্ষণ হল খাওয়া শেষ করেছে। একজনের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। টেবি কুকুরটি অনেকক্ষণ হল এসে আগুনের কাছে বসে আছে। ছোট কুকুরটি। কাঁকড়া কাঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াতে চোখমুখ ঢাকা। বুড়ো হয়েছে, আর তার একটা চোখ কানা হয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির অভ্যাস হয়েছে নবাবি চাল। ড্রয়িংরুম ছাড়া অন্য কোনো ঘরে তার মন বসে না। ঘরের সকলের চেয়ে ভালো কেদারাটিতে অগ্নানবদনে লাফিয়ে উঠে বসে, এক পাশে যদি আর কেউ এসে বসল, অমনি সে সদর্পে পাশের কোঁচটির উপরে গিয়ে বসে পড়ে। সকালবেলায় ব্রেকফাস্টের সময় তার তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ। সে বিস্কুটগুলি নিয়ে খাবার ঘরে বসে থাকে, যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেই বিস্কুটগুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখ থেকে কেড়ে নিই, একবার গড়িয়ে দিই। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেয়ি হত, সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বসে ষেউ ষেউ করত। কিন্তু গোল করলে বিরক্ত হতুম দেখে সে এখন আর ষেউ ষেউ করে না। আন্তে আন্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে, যতক্ষণ না দরজা খুলে দিই চুপ করে বাইরে বসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোলেই লাফিয়ে কাঁপিয়ে লেজ নেড়ে উৎসাহ প্রকাশ করে; তার পরে একবার বিস্কুটের দিকে চায়, একবার আমার মুখের দিকে। যা হোক সাড়ে নটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট শেষ হয়। তার পরে হাতে দস্তানা-পরী গৃহিণী দাসীদের নিয়ে তাঁর চোঁতলা থেকে একতলা পর্যন্ত, জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরঘার পরিষ্কার ও গৃহকার্য তদারক করে ওঠানাবায় প্রবৃত্ত। একবার রান্নাঘরে যান, সেখানে শাকওআলা, কুটিওআলা, মাংসওআলার বিল দেখেন, দেনা চুকিয়ে দেন। মাঝে মাঝে উপরে এসে কর্তার সঙ্গে গৃহকার্যের পরামর্শ হয়। রান্নাঘরের উপকরণ পরিষ্কার আছে কি না ও যথাস্থানে তাদের রাখা হয়েছে কি না দেখেন, ভালো মাংস এনেছে কি না, ওজনে কম পড়েছে কি না তদন্ত করেন। রাঁধুনির সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দেন। এইরকম ব্রেকফাস্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা-দেড়টা পর্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড়ো মেয়ে যোগ দেন। মেজো মেয়ে প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে ড্রয়িংরুম সাফ করেন। দাসীরা ঘর বাঁট দিয়ে যায়, আর জিনিসপত্রে যা কিছু ধুলো লাগে তা তিনি নিজের হাতে বেড়ে-ঝুড়ে সাফ করেন। তৃতীয় মেয়ে বালিশের

আচ্ছাদন আসন মোজা কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠিপত্র লেখেন, ঐক-এক দিন বাজনা ও গান অভ্যাস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে বাজিয়ে। আজকাল স্কুল বন্ধ, ছোটো ছেলেটি ও মেয়েটি ভারি খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময় -আমাদের লাঞ্চ খাওয়া সমাপন হলে আবার যিনি ধীর কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ভিজিটরদের আসবার সময়। হয়তো মিসেস ক— তাঁর স্বামীর এক জোড়া ছেঁড়া মোজা নিয়ে চশমা পরে ড্রয়িংরুমে বসে সেলাই করছেন। ছোটো মেয়ে একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্তে তৈরি করে দিচ্ছেন। মেজো মেয়েটি একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে বসে হয়তো গ্রীনের লিখিত ইংরেজ জাতির ইতিহাস পড়তে নিযুক্ত। বড়ো মিস ক— হয়তো তাঁর কোনো আলাপীর বাড়িতে ভিজিট করতে গিয়েছেন। তিনটের সময় হয়তো একজন ভিজিটর এলেন। দাসী ড্রয়িংরুমে 'এস' নাম উচ্চারণ করলে "মিস্টার ও মিসেস এ—" বলতে বলতে ঘরের মধ্যে তাঁরা দু-জনে উপস্থিত। মোজা জামা রেখে বই মুড়ে গৃহিণী ও তাঁর কণ্ঠারা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করলেন। আবহাওয়া সম্বন্ধে পরস্পরের মতামতের ঐক্য নিয়ে আলাপ শুরু হল। মিসেস এ— বললেন, "মিস্টার এক্স—এর তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে হাম হয়। হাম হয়েছিল বলে তিনি চার দিন আপিসে যেতে পারেন নি। কাল আপিসে গিয়েছিলেন। তাঁর হামের প্রসঙ্গে আপিসের লোকেরা তাঁকে নির্দয়রূপে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে।" অন্তরা লোকটি সম্বন্ধে দরদ প্রকাশ করলে। এই কথা থেকে ক্রমে হামরোগের বিষয়ে যত কথা উঠতে পারে উঠল। মিস ক— খবর দিলেন মিস্টার জ—এর তৃতীয় ছেলেটির হাম হয়েছে। তার থেকে কথা উঠল যে, মিস্টার জ—এর যে এক পিতৃব্য বোন মিস ই— অস্ট্রেলিয়ায় আছেন, তাঁর কাপ্তান ব—এর সঙ্গে বিবাহ-হয়ে গেছে। এই রকম খানিকক্ষণ কথোপকথন হলে পর তাঁরা চলে গেলেন। বিকেলে হয়তো আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছ-টার সময় আমাদের ডিনার। ডিনার খেয়ে সাতটার সময় আমরা সবাই মিলে ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসি। আগুন জ্বলছে। ঘরটি বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আমরা আগুনের চারদিকে ঘিরে বসলুম। এক-এক দিন আমাদের গান-বাজনা হয়। আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি গান শিখেছি। আমি গান করি। মিস ক— বাজান। মিস ক— আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যাবেলায় আমাদের একটু-আধটু পড়াশুনো হয়। আমরা পালা করে ছ-দিনে ছ-রকমের বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে এক-এক দিন প্রায় সাড়ে এগারোটা বারোটা হয়ে যায়।

ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। তারা আমাকে আর্থার খুড়ো বলে।

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

৫৮৩

এখেল ছোটো মেয়েটির ইচ্ছে যে, আমি কেবল একলা তারই আঙ্কল্ আর্থার হই। তার ভাই টম যদি আমাকে দাবি করে তবেই তার দুঃখ। একদিন টম তার ছোটো বোনকে রাগাবার জন্তে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিল, আমারই আঙ্কল্ আর্থার। তখনই এখেল আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঠোট দুটি ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। টম একটু অস্থির, কিন্তু ভারি ভালোমানুষ। খুব মোটাসোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারি ভারি। সে এক-এক সময়ে আমাকে এক-একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, “আচ্ছা, আঙ্কল্ আর্থার, ইদুররা কী করে?” আঙ্কল্ বললেন, “তারা রান্নাঘর থেকে চুরি করে খায়।” সে একটু ভেবে বললে, “চুরি করে? আচ্ছা, চুরি করে কেন?” আঙ্কল্ বললেন, “তাদের খিদে পায় বলে।” শুনে টমের বড়ো ভালো লাগল না। সে বরাবর শুনে আসছে যে, জিজ্ঞাসা না করে পরের জিনিস নেওয়া অগ্রায়। আর-একটি কথা না বলে সে চলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে, সে তাড়াতাড়ি এসে সাহসনার স্বরে বলে, “Oh, poor Ethel, don't you cry! Poor Ethel!” এখেলের মনে মনে জ্ঞান আছে যে, সে একজন লেডি। সে কেমন গভীরভাবে কেদারায় ঠেস দিয়ে বসে। টমকে এক-এক সময়ে ভৎসনা করে বলে, “আমাকে বিরক্ত ক'রো না।” একদিন টম পড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বললেম, “ছি, কাঁদতে আছে!” অমনি এখেল আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক করে বললে, “আঙ্কল্ আর্থার, আমি একবার ছেলেবেলায় রান্নাঘরে পড়ে গিয়েছিলেম, কিন্তু কাঁদি নি।” ছেলেবেলায়!

মিষ্টার ন—, ভাতারের আর এক ছেলে, বাড়িতে থাকেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই নে। তিনি সমস্ত দিন আপিসে। আপিস থেকে এলেও তাঁর বড়ো একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ মিস্ ই—র সঙ্গে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ। তাঁদের দু-জনে কোর্টশিপ চলছে। রবিবার দু-বেলা প্রেয়সীকে নিয়ে তাঁর চার্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, প্রণয়িনীর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়লা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নেমস্তন্ন। এই রকমে তাঁর সময় ভারি অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসরকাল কাটার জন্তে অল্প কোনো জীবের সদ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় যদি আকাশ ভেঙে পড়ে তবু মিষ্টার ন— পরিক্ষার করে চুলটি কিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট ব্রাস করে কিটফাট হয়ে ছাতা হাতে বাড়ি থেকে বেরোবেনই। একবার খুব শীত পড়েছিল, আর তাঁর ভারি

৫৮৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কাশি হয়েছিল ; মনে করলেম, আজ বুঝি বেচারির আর যাওয়া হয় না । সাতটা বাজতে না বাজতেই দেখি তিনি কিটকাট হয়ে নেবে এসেছেন ।

যা হ'ক, আমার এই পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে । সেদিন মেজো মেয়ে আমাকে বলছিলেন যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে, একজন ভারতবর্ষীয় ভ্রমলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছে, তাঁদের ভারি ভয় হয়েছিল । যেদিন আমার আসবার কথা সেই দিন মেজো ও ছোটো মেয়ে, তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন । প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি । তার পর হয়তো যখন তাঁরা শুনলেন যে, মুখে ও সর্বদা উষ্ণ নেই, ঠোঁট বিষিয়ে অলংকার পরে নি, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন । ওঁরা বলেন যে প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথাবার্তা করেছিলেন তবুও দু-দিন পর্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি । হয়তো ভয় হয়েছিল যে কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালা মুখই না জানি দেখবেন । তার পর যখন মুখ দেখলেন—তখন ?

যা হ'ক, এই পরিবারে স্নেহই আছে । সন্ধ্যাবেলা আগোদে কেটে যায়—গান-বাজনা, বই পড়া । আর এখেল তার আত্মল আর্থারকে মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে চায় না ।

১২৮৮

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত

সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ

স্মরণোপহার স্বরূপে

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

শুক্রবার। ২২শে আগস্ট ১৮৯০। দেশকালের মধ্যে যে একটা প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা আছে, বাষ্পযানে সেটা লোপ করে দেবার চেষ্টা করছে। পূর্বে সময় দিয়ে দূরত্বের পরিমাণ হত ; লোকে বলত এক প্রহরের রাস্তা, দু-দিনের রাস্তা। এখন কেবল গজের মাপটাই অবশিষ্ট। দেশকালের চিরদাম্পত্যের মাঝখান দিয়ে অবোধে বড়ো বড়ো কলের গাড়ি এবং কলের জাহাজ চলে যাচ্ছে।

কেবল তাই নয়—এশিয়া এবং আফ্রিকা দুই ভূগীর বাহুবন্ধন বিচ্ছিন্ন করে মাঝে বিরহের লবণাস্থরাশি প্রবাহিত করা হয়েছে। আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ যমজ ভ্রাতার মতো জন্মাবধি সংলগ্ন হয়ে আছে, শোনা যায় তাদের মধ্যেও লৌহাত্ম চালনার উদ্যোগ করা হয়েছিল। এমনি করে সভ্যতা সর্বত্রই জলে স্থলে দেশে কালে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে আপনার পথটি করে নেবার চেষ্টা করছে।

পূর্বে যখন দীর্ঘ পথ প্রদক্ষিণ করে যুরোপে পৌছতে অর্ধেক বৎসর লাগত তখন এই দুই মহাদেশের যথার্থ ব্যবধান সম্পূর্ণ ধারণা করবার দীর্ঘকাল অবসর পাওয়া যেত। এখন ক্রমেই সেটা হ্রাস হয়ে আসছে।

কিন্তু দেশকালের ঘনিষ্ঠতা যতই হ্রাস হ'ক, চিরকালের অভ্যাস একেবারে যাবার নয়। যদিও তিন মাসের টিকিট মাত্র নিয়ে যুরোপে চলেছি, তবু একটা কাল্পনিক দীর্ঘকালের বিভীষিকা মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিনের জন্তে চলেছি।

কালিদাসের সময়ে যখন রেলগাড়ি, ইন্সটিমার পোস্ট আপিস ছিল না তখনই খাঁটি বিরহ ছিল ; এবং তখনকার দিনে বছরখানেকের জন্ত রামগিরিতে বদলি হয়ে যক্ষ যে স্নুদীর্ঘচ্ছন্দে বিলাপ-পরিতাপ করেছিল সে তার পক্ষে অযথা হয় নি। কিন্তু স্তুপাকার তুলো যেমন কলে চেপে একটি পরিমিত গাঁটে পরিণত হয়, সভ্যতার চাপে আমাদের সমস্তই তেমনি সংক্ষিপ্ত নিবিড় হয়ে আসছে। ছয় মাসকে জাঁতার তলায় ফেলে তিন মাসের মধ্যে ঠেসে দেওয়া হচ্ছে ; পূর্বে যা মুঠের মাথার বোঝা ছিল এখন তা পকেটের মধ্যে ধরে। এখন দুই-এক পাতার মধ্যেই বিরহগীতি

৫৮৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সমাপ্তি এবং বিদ্যাংগান যখন প্রচলিত হবে তখন বিরহ এত গাঁঢ় হবে যে, চতুর্দশ-পদীও তার পক্ষে ঢিলে বোধ হবে।

সূর্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্ছে। বামে বোম্বাই বন্দরের দীর্ঘ রেখা এখনও দেখা যাচ্ছে।

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় দেহ বিস্তার করলে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে লাইট-হাউসের আলো জলে উঠল; সমুদ্রের শিরের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্তে ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল আগ্রহ দৃষ্টি।

জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাসল তরী সন্ধ্যাবেলা,

ভাবিলাম এ জলখেলা,

মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রদে।

কিন্তু সী-সিকনেসের কথা কে মনে করেছিল!

যখন সবুজ জল ক্রমে নীল হয়ে এল এবং তরঙ্গে তরীতে মিলে আন্দোলন উপস্থিত করে দিলে তখন দেখলুম সমুদ্রের পক্ষে জলখেলা বটে কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

ভাবলুম এই বেলা মানে মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে কঞ্চলটা মুড়ি দিয়ে গুয়ে পড়ি গে। যথাসম্ভব ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে কাঁধ থেকে কঞ্চলটা বিছানার উপর ফেলে দরজা বন্ধ করে দিলুম। ঘর অন্ধকার। বুঝলুম, আলো নিবিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় গুয়েছেন। শারীরিক দুঃখ নিবেদন করে একটুখানি স্নেহ উদ্রেক করবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “দাদা, ঘুমিয়েছেন কি?” হঠাৎ নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হংকার দিয়ে উঠল, “হুজ্জাট!” আমি বললুম, “বাস রে! এ তো দাদা নয়!” তৎক্ষণাৎ বিনীত অল্পতপ্ত স্বরে জ্ঞাপন করলুম, “ক্ষমা করবেন, দৈবক্রমে ভুল কুঠরিতে প্রবেশ করেছি।” অপরিচিত কণ্ঠ বললে, “অল রাইট!” কঞ্চলটি পুনশ্চ তুলে নিয়ে কাতর শরীরে সংকুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাই নে। বাস্তব তোরঙ্গ লাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিসের মধ্যে খট্ খট্ শব্দে হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম। ইঁদুর কলে পড়লে তার মানসিক ভাব কী রকম হয় এই অবসরে কতকটা বুঝতে পারা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়েছিল।

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৫৮৯

মন যতই ব্যাকুল হয়ে উঠছে শরীর ততই গলদঘর্ষ এবং কঠাগত অন্তরিস্থিরের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠছে। অল্পসন্ধানের পর যখন হঠাৎ মঙ্গল চিহ্ন খেতকাচ-নির্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেকল, তখন মনে হল এমন প্রিয়স্পর্শসুখ বহুকাল অনুভব করা হয় নি। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে নিঃসংশয়চিত্তে পরবর্তী ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়েই দেখি, আলো জ্বলছে; কিন্তু মেজের উপর পরিত্যক্ত গাউন পেটিকোট প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত। আর অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্বেই পলায়ন করলুম। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বার বার তিন বার ভ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তৃতীয় বার পরীক্ষা করতে সাঁহস হল না। এবং সেরূপ শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে বিহ্বলচিত্তে জাহাজের কাঠরার 'পরে ঝুঁকে পড়ে শরীরমনের একান্ত উদ্বেগ কক্ষিং লাঘব করা গেল। তার পরে বহুলাঙ্ঘিত অপরাধীর মতো আন্তে আন্তে কবলটি গুটিয়ে তার উপর লজ্জিত নতমস্তক স্থাপন করে একটি কাঠের বেঞ্চিতে গুয়ে পড়লুম।

কী সর্বনাশ! এ কার কবল! এ তো আমার নয় দেখছি। যে সুখসুপ্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোকটির ঘরের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ করে কয়েক মিনিট ধরে অল্পসন্ধান-কার্ষে ব্যাপৃত ছিলুম নিশ্চয় এ তারই। একবার ভাবলুম ফিরে গিয়ে চুপিচুপি তার কবল স্বস্থানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি; কিন্তু যদি তার ঘুম ভেঙে যায়! পুনর্বীর যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার প্রয়োজন হয় তবে সে কি আর আমাকে বিশ্বাস করবে! যদি বা করে, তবু এক রাত্রে মধ্য দু-বার ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিদ্রাকাতর বিদেশীর খ্রীষ্টীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি! আরো একটা ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল। দৈববশত দ্বিতীয় বার যে ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে পড়েছিলুম তৃতীয় বারও যদি ভ্রমক্রমে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রলোকটির কবলটি সেখানে রেখে সেখানকার একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তাহলে কী রকমের একটা রোমহর্ষণ প্রমাদ-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়! ইত্যাকার দুশ্চিন্তায় তীব্র তাত্রকূটবাসিত পরের কবলের উপর কাষ্ঠাসনে রাজি যাপন করলুম।

২৩ আগস্ট। আমার স্বদেশীয় সঙ্গী বন্ধুটি সমস্ত রাত্রির সুখনিদ্রাবসানে প্রাতঃকালে অত্যন্ত প্রফুল্ল পরিপুষ্ট সুস্থ মুখে ডেকের উপর দর্শন দিলেন। আমি তাঁর দুই হস্ত চেপে ধরে বললুম, “ভাই, আমার তো এই অবস্থা।” শুনে তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপ করে হাস্যসহকারে এমন দুটো-একটা

৫৯০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা গুরুমশায়ের সান্নিধ্য পরিত্যাগের পর থেকে আর কখনো শোনা হয় নি। সমস্ত রজনীর দুঃখের পর প্রভাতের এই অপমানটীও নিরুত্তরে সহ্য করলুম। অবশেষে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমার ক্যাবিনের ভূত্যাটিকে ডেকে দিলেন। তাঁকেও আবার একে একে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বলতে হল। প্রথমে সে কিছুই বুঝতে পারলে না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহ এ-রকম ঘটনা এই প্রথম। অবশেষে ধীরে ধীরে সে সমুদ্রের দিকে এক বার মুখ ফেরালে এবং ঈষৎ হাসলে; তার পর চলে গেল।

সী-সিকুনেস ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সে-ব্যাধিটার যন্ত্রণা অনভিজ্ঞ স্থলচরদের কিছুতে বোঝানো যেতে পারে না। নাড়িতে ভারতবর্ষের অন্ন তিলমাত্র অবশিষ্ট রইল না। যুরোপে প্রবেশ করবার পূর্বে সমুদ্র এই দেহ হতে ভারতবর্ষটাকে যেন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একেবারে সাক্ষ করে ফেলবার চেষ্টা করছে। ক্যাবিনে চার দিন পড়ে আছি।

২৬ আগস্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড়ো কম হয় নি—সূর্য চার বার উঠেছে এবং তিন বার অস্ত গেছে, বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দস্তধাবন থেকে দেশ উদ্ধার পর্যন্ত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেছে—জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল—কেবল আমি শয়্যাগত জীবন্মুত হয়ে পড়ে ছিলাম। আধুনিক কবিরা কখনো মুহূর্তকে অনন্ত কখনো অনন্তকে মুহূর্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত ব্যাখ্যা-বিপাকে প্রবৃত্ত করান। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড়ো রকমের একটা মুহূর্ত বলব, না এর প্রত্যেক মুহূর্তকে একটা বৃৎ বলব স্থির করতে পারছি নে।

যাই হ'ক কষ্টের সীমা নেই। মানুষের মতো এতবড়ো একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখ ভোগ করে তার একটা মহৎ নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল; কিন্তু জ্বলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার দরুন জীবাত্মার এত বেশি পীড়া নিতান্ত অস্বাভাবিক অসংগত এবং অর্গোরবজনক বলে বোধ হয়। কিন্তু জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে কোনো স্মৃতি নেই, কারণ সে নিন্দাবাদে কারো গায়ে কিছু ব্যথা বাজে না, এবং জগৎ-রচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।

যন্ত্রণাশয্যায় অচেতনপ্রায় ভাবে পড়ে আছি। কখনো কখনো ডেকের উপর

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৫৯১

থেকে পিয়ানোর সংগীত মুহু মুহু কর্ণে এসে প্রবেশ করে, তখন স্মরণ হয়, আমার এই সংকীর্ণ শরন-কারাগারের বাইরে সংসারের নিত্য আনন্দস্রোত সমভাবে প্রস্রাবিত হচ্ছে। বহুদূরে ভারতবর্ষের পূর্বসীমায় আমার সেই সংগীতধ্বনিত স্নেহমধুর গৃহ মনে পড়ে। সুখ-স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যময় জীবজগৎকে অতিদূরবর্তী ছায়ারাজ্যের মতো বোধ হয়। মধ্যের এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে কখন সেখানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি। মঙ্গলবার প্রাতে যখন শরীরের মধ্যে প্রাণটা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, তখন আমার বন্ধু অনেক আশ্বাস দিয়ে আমাকে জাহাজের ছাদের উপরে নিয়ে গেলেন; সেখানে লম্বা বেতের চৌকিটির উপর পা ছড়িয়ে বসে পুনর্বীর এই মর্ত্য পৃথিবীর স্পর্শ এবং নবজীবনের আশ্বাস লাভ করা গেল।

জাহাজের যাত্রীদের বর্ণনা করতে চাই নে। অতিনিকট হতে কোনো মসীলিষ্ঠ লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ যে তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য স্থাপন করতে পারে এ-কথা তারা স্বপ্নেও না মনে করে বেশ বিশ্বস্তচিত্তে ডেকের উপর বিচরণ করছে, টুংটাং শব্দে পিয়ানো বাজাচ্ছে, বাজি রেখে হার-জিত খেলছে, ধূমপানশালায় বসে তাস পিটোচ্ছে; তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তিন বাঙালি তিন লম্বা চৌকিতে জাহাজের একটি প্রান্ত সম্পূর্ণ অধিকার করে অবশিষ্ট জনসংখ্যার প্রতি অত্যন্ত ঔদাসীন্যদৃষ্টিপাত করে থাকি।

আমার সঙ্গী বুঝকটির নিত্যকর্ম হচ্ছে তামাকের থলিটি বার বার হারানো, তার সন্ধান এবং উদ্ধারসাধন। আমি তাঁকে বারংবার সতর্ক করে দিয়েছি যে, যদি তাঁর মুক্তির কোনো ব্যাঘাত থাকে সে তাঁর চুরুট। মহাবি ভরত মৃত্যুকালেও হরিণ-শিশুর প্রতি চিত্তনিবেশ করেছিলেন বলে পরজন্মে হরিণশাবক হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আমার সর্বদাই আশঙ্কা হয়, আমার বন্ধু জন্মান্তরে ব্রহ্মদেশীয় কোন্ এক কৃষকের কুটিরের সম্মুখে মস্ত একটা তামাকের খেত হয়ে উঠত হবেন। বিনা প্রমাণে তিনি শাস্ত্রের এ-সকল কথা বিশ্বাস করেন না, বরঞ্চ তর্ক করে আমারও সরল বিশ্বাস নষ্ট করতে চান এবং আমাকে পর্যন্ত চুরুট ধরাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এ-পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারেন নি।

২৭।২৮ আগস্ট। দেবাস্তরগণ সমুদ্র মহন করে সমুদ্রের মধ্যে যা-কিছু ছিল সমস্ত বাহির করেছিলেন। সমুদ্র দেবেরও কিছু করতে পারলেন না, অস্তুরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য দুর্বল মানুষের উপর তার প্রতিশোধ তুলছেন। মন্দর-পর্বত কোথায় জানি নে এবং শেষ নাগ তদবধি পাতালে বিশ্রাম করছেন, কিন্তু সেই

৫৯২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সনাতন মন্ডনের ঘূর্ণিবেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে তা নরজঠরধারী মাত্রেরই অনুভব করেন। যারা করেন না তাঁরা বোধ করি দেবতা অথবা অন্তরবংশীয়। আমার বন্ধুটিও শেষোক্ত দলের, অর্থাৎ তিনিও করেন না।

রোগশয্যা ছেড়ে এখন ডেক-এ উঠে বসেছি। সম্পূর্ণ বললাভ হয় নি। শরীরের এই রকম অবস্থার মধ্যে একটু মাধুর্য আছে। এই সময়ে পৃথিবীর আকাশ বাতাস সূর্যালোক সবস্বচ্ছ সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে যেন একটি নূতন পরিচয় আরম্ভ হয়। তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছুকালের মতো বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আবার যেন নবপ্রেমিকের মতো উভয়ের মধ্যে যত্ন সলজ্জ মধুর ভাবে কথাবার্তা জানাশোনার অল্প অল্প সূত্রপাত হতে থাকে।

২৯ আগস্ট। আজ রাতে এডেনে পৌঁছব। সেখানে কাল প্রাতে জাহাজ বদল করতে হবে। সমুদ্রের মধ্যে দুটি-একটি করে পাহাড়-পর্বতের রেখা দেখা যাচ্ছে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থামল। আহারের পর রহস্তালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্তে আমরা দুই বন্ধু ছাদের এক প্রান্তে চৌকি দুটি সংলগ্ন করে আরামে বসে আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিশুদ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্ত-বিজড়িত অর্ধনিম্নলিত নেত্রে স্বপ্ন-মরীচিকার মতো লাগছে।

এমন সময় শোনা গেল এখনই নূতন জাহাজে চড়তে হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। ক্যাবিনের মধ্যে স্তূপাকার বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র যেমন-তেমন করে চর্মপেটকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে তার উপরে তিন-চারজনে দাঁড়িয়ে নির্দয়ভাবে নৃত্য করে বহুকষ্টে চাবি বন্ধ করা গেল। ভৃত্যদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে ছোটো বড়ো মাঝারি নানা আকারের বাস্তু তোরঙ্গ বিছানাপত্র বহন করে নৌকারোহণপূর্বক নূতন জাহাজ “ম্যাসীলিয়া” অভিমুখে চললুম।

অনতিদূরে মান্ডল-কণ্টকিত ম্যাসীলিয়া তার দীপালোকিত ক্যাবিনগুলির সূদীর্ঘ-শ্রেণীবদ্ধ বাতায়ন উদঘাটিত করে দিয়ে পৃথিবীর আদিম কালের অতিকায় সহস্রচক্ষু জলজন্তুর মতো স্থির সমুদ্রে জ্যোৎস্নালোকে নিস্তব্ধভাবে ভাসছে। সহসা সেখান থেকে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। সংগীতের ধ্বনিতে এবং নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নানিশীথে মনে হতে লাগল, অর্ধরাত্রে এই আরবের উপকূলে আরব্য উপন্যাসের মতো কী একটা মায়ার কাণ্ড ঘটবে।

ম্যাসীলিয়া অস্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে আসছে। কুতূহলী নরনারীগণ ডেকের বারান্দা ধরে সকৌতুকে নবযাত্রিসমাগম দেখছে। কিন্তু সে-রাত্রে নূতনত্ব সম্বন্ধে আমাদেরই তিনজনের সব-চেয়ে জিত। বহুকষ্টে জিনিসপত্র উদ্ধার করে ডেকের

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৫৯৩

উপর যখন উঠলুম মুহূর্তের মধ্যে এক-জাহাজ দৃষ্ট আমাদের উপর বর্ষিত হল। যদি তার কোনো চিহ্ন দেবার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমাদের সর্বাঙ্গ কটা কালে ও নীল দাপে ভরে যেত। জাহাজটি প্রকাণ্ড। তার সংগীতশালা এবং ভোজনগৃহের ভিত্তি খেতপ্রস্তরে মণ্ডিত। বিদ্যুতের আলো এবং ব্যাণ্ডের বাজে উৎসবময়।

অনেক রাতে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

৩০ আগস্ট। আমাদের এ জাহাজে ডেকের উপরে আর-একটি দোতলা ডেকের মতো আছে। সেটি ছোটো এবং অপেক্ষাকৃত নির্জন। সেইখানেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

আমার বন্ধুটি নীরব এবং অন্তমনস্ক। আমিও তজ্রপ। দূর সমুদ্রতীরের পাহাড়গুলো রোঁজে ক্লান্ত এবং বাপসা দেখাচ্ছে। একটা মধ্যাহ্নতন্দ্রার ছায়া পড়ে যেন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

খানিকটা ভাবছি, খানিকটা লিখছি, খানিকটা ছেলেদের খেলা দেখছি। এ-জাহাজে অনেকগুলি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আছে; আজকের দিনে যেটুকু চাকল্য সে কেবল তাদেরই মধ্যে। জুতোমোজা খুলে ফেলে তারা আমাদের ডেকের উপর কমলালেবু গড়িয়ে খেলা করছে—তাদের তিনটি দাসী বেক্সির উপরে বসে নতমুখে নিস্তব্ধভাবে সেলাই করে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে যাত্রীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।

বহুদূরে এক-আধটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রে এক-একটা পাহাড় জেগে উঠছে, অল্পের কঠিন কালো দগ্ধ তপ্ত জনশূন্য। অন্তমনস্ক প্রহরীর মতো সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে, সামনে দিয়ে কে আসছে কে যাচ্ছে তার প্রতি কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

এইরকম করে ক্রমে সূর্যাস্তের সময় হল। “কাসল অফ ইণ্ডোলেন্স” অর্থাৎ কুঁড়েমির কেল্লা যদি কাকেও বলা যায় সে হচ্ছে জাহাজ। বিশেষত গরম দিনে প্রশান্ত লোহিতসাগরের উপরে। যাত্রীরা সমস্ত বেলা ডেকের উপর আরাম-কেন্দারায় পড়ে জ্বর উপরে টুপি টেনে দিয়ে দিবাস্বপ্নে তলিয়ে রয়েছে। চলবার মধ্যে কেবল জাহাজ চলছে এবং তার দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণ কলস্বরে পাশ কাটিয়ে কোনোমতে একটুখানিমান্ত সরে যাচ্ছে।

সূর্য অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমৎকার রং দেখা দিয়েছে। সমুদ্রের জলে একটি রেখামাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট জলরাশি যৌবনপরিপূর্ণ পরিস্ফুট

দেহের মতো একেবারে নিটোল এবং সুডোল। এই অপার অথও পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ধমধম করছে। বৃহৎ সমুদ্র হঠাৎ যেন একটা জায়গায় এসে থেমেছে যার উর্ধ্ব আর গতি নেই, পরিবর্তন নেই; যুগ অনন্তকাল অবিশ্রাম চাক্ষু্যের পরম পরিণতি, চরম নির্বাণ। স্বর্ষ্যাস্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে একটি সর্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতল-রেখায় বিস্তৃত করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহস্রা-সেইরকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্তে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। জলের যে বর্ণবিকাশ হয়েছে সে আকাশের ছায়া, কি সমুদ্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আকাশের নীরব নিনিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্তি পেয়ে তাকে অপূর্ব মহিমায়িত করে তুলেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজল। সকলে বেশভূষা পরিবর্তন করে সান্ধ্যভোজনের জন্তে সুসজ্জিত হতে গেল। আধঘণ্টা পরে আবার ঘণ্টা। নরনারীরগণ দলে দলে ভোজনশালায় প্রবেশ করলে। আমরা তিন বাঙালি একটি স্বতন্ত্র ছোটো টেবিল অধিকার করে বসলুম। আমাদের সামনে আর-একটি টেবিলে দুটি মেয়ে একটি উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে খেতে বসেছেন।

চেয়ে দেখলুম তাঁদের মধ্যে একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুলপরিমাণে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে সহাস্তমুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত। তাঁর শুভ্র স্নগোল সূচিকণ গ্রীবাবক্ষবাহর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেষ আলো এবং পুরুষ-মণ্ডলীর বিন্মিত সকৌতুক দৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। একটা অনাবৃত আলোকশিখা দেখে দৃষ্টিগুলো যেন কালো কালো পতঙ্গের মতো চারিদিক থেকে বাঁকে বাঁকে লক্ষ্য দিয়ে পড়ছে। এমন কি, অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছে এবং তাই নিয়ে ঘরের সর্বত্র একটা চাপা হাসির চাক্ষু্য উঠেছে। অনেকেই সেই যুবতীর পরিচ্ছদটিকে “ইণ্ডোকোরাস” বলে উল্লেখ করছে। কিন্তু আমাদের মতো বিদেশী লোকের পক্ষে তার বেআক্স বেআদবিটা বোঝা একটু শক্ত। কারণ, নৃত্যশালায় এ-রকম কিংবা এর চেয়ে অনাবৃত বেশে গেলে কারো বিশ্বাস উদ্বেক করে না।

কিন্তু বিদেশের সমাজনীতি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা ভালো নয়। আমাদের দেশে বাসরঘরে এবং কোনো কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে, অল্প কোনো সভায় তেমন করলে সাধারণের কাছে

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৫৯৫

দৃশ্য হত সন্দেহ নেই। সমাজে যেমন নিয়মের বাধাবাধি, তেমনি মাঝে মাঝে ছুটো-একটা ছুটিও থাকে।

৩১ আগস্ট। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে উপরের ডেকে চোঁকিতে বসে সমুদ্রের বায়ু সেবন করছি, এমন সময় নিচের ডেকে খ্রীষ্টানদের উপাসনা আরম্ভ হল। যদিও জানি এদের মধ্যে অনেকেই গুরুভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়িয়ে কলটেপা আর্গিনের মতো গান গেয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু তবু এই যে দৃশ্য, এই যে গুটিকতক চঞ্চল ছোটো ছোটো মনুষ্য অপার সমুদ্রের মাঝখানে স্থির বিনয়ভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কণ্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের ভক্তি-উপহার প্রেরণ করছে, এ অতি আশ্চর্য।

কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এক-একবার অটুহাস্ত শোনা গেল। গতরাত্রেই সেই ডিনার-টেবিলের নায়িকাটি উপাসনায় যোগ না দিয়ে উপরে ডেকে বসে তাঁরই একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কোঁতুকালোপে নিমগ্ন আছেন। মাঝে মাঝে উচ্চহাস্ত করে উঠছেন, আবার মাঝে মাঝে গুন গুন স্বরে ধর্মসংগীতেও যোগ দিচ্ছেন।

আজ আহ্বারের সময় একটি নূতন সংবাদের সৃষ্টি করা গেছে। ছোটো টেবিলটিতে আমরা তিন জনে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি। একটা শক্ত গোলাকার ক্রটির উপরে ছুরি চালনা করতে গিয়ে ছুরিটা সবলে পিছলে আমার বাম হাতের দুই আঙুলের উপর এসে পড়ল। রক্ত চারদিকে ছিটকে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আহ্বারে ভঙ্গ দিয়ে ক্যাবিনে পলায়ন করলুম। ইতিহাসে অনেক রক্তপাত লিপিবদ্ধ হয়েছে—আমার ডায়ারিতে আমার এই রক্তপাত লিখে রাখলুম; ভাবী বঙ্গবীরদের কাছে গৌরবের প্রার্থী নই, বর্তমান বঙ্গদেশীদের মধ্যে কেউ যদি একবার ‘আহা’ বলেন।

১ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পর আহ্বারান্তে উপরের ডেকে আমাদের যথাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। মৃদু শীতল বায়ুতে আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং দাদা অলসভাবে ধূমসেবন করছেন, এমন সময়ে নিচের ডেকে নাচের বাজনা বেজে উঠল। সকলে মিলে জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনৃত্য আরম্ভ হল।

তখন পূর্বদিকে নব কৃষ্ণপঙ্কজের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে সমুদ্রশয়ন থেকে উঠে আসছে। এই তীররেখাশূণ্য জলময় মহামেষ্টির পূর্বসীমান্তে উদয়পথের ঠিক নিচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিকমিক করছে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন এক অলৌকিক বস্তুর উপরে অপূর্ব শুভ্র রঞ্জনীপঙ্কজ মতো আপন প্রশান্ত সৌন্দর্যে নিঃশব্দে চতুর্দিকে দলপ্রসারণ করল।

৯৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ধরে পাগলের মতো তীব্র আমোদে ঘুরপাক খাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে, উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

৩ সেপ্টেম্বর। বেলা দশটার সময় সুরেজখালের প্রবেশমুখে এসে জাহাজ থামল। চারিদিকে চমৎকার রঙের খেলা। পাহাড়ের উপর রৌদ্র, ছায়া এবং নীলিম বাষ্প। ঘনীল সমুদ্রের প্রান্তে বালুকাভীরের রৌদ্রহুঃসহ গাঢ় পীত রেখা।

খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ সমস্ত দিন অতি ধীর গতিতে চলছে। দু-ধারে তরুহীন বালুকা। কেবল মাঝে মাঝে এক-একটি ছোটো কোঠাঘর বহুযত্নবর্ধিত গুটিকতক গাছে পালায় বেষ্টিত হয়ে আরামজনক দেখাচ্ছে।

অনেক রাতে আধখানা চাদ উঠল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট ধু ধু করছে।—রাত দুটো-তিনটের সময় জাহাজ পোর্টসৈয়দে নোঙর করলে।

৪ সেপ্টেম্বর। এখন আমরা ভূমধ্যসাগরে, যুরোপের অধিকারের মধ্যে। বাতাসও শীতল হয়ে এসেছে, সমুদ্রও গাঢ়তর নীল। আজ রাত্রে আর ডেকের উপর শোওয়া হল না।

৫ সেপ্টেম্বর। বিকালের দিকে ক্রীট দ্বীপের তটপর্বত দেখা দিয়েছিল। ডেকের উপর স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। জাহাজে একদল নাট্যব্যবসারী যাত্রী আছে তারা অভিনয় করবে। অগ্নদিনের চেয়ে সকাল সকাল ডিনার খেয়ে নিয়ে তাগাশা আরম্ভ হল। প্রথমে যাত্রীদের মধ্যে যারা গানবাজনা কিঞ্চিৎ জানেন এবং জানেন না, তাঁদের কারো বা দুর্বল পিয়ানোর টিং টিং কারো বা মুহু ক্ষীণকণ্ঠে গান হল। তার পরে যবনিকা উদঘাটন করে নটনটী কর্তৃক 'ব্যালো' নাচ, সং মিগ্রোর গান, জাহু, প্রহসন, অভিনয় প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক হয়েছিল। মধ্যে নাবিকাগ্রমের জন্তে দর্শকদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ হল।

৬ সেপ্টেম্বর। খাবার ঘরে খোলা জ্বানলার কাছে বসে বাড়িতে চিঠি লিখছি। একবার মুখ তুলে বামে চেয়ে দেখলুম 'আয়োনিয়ান' দ্বীপ দেখা দিয়েছে। পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ঠিক ধারেই মহুগুরচিত ঘনসন্নিবিষ্ট একটি খেত মৌচাকের মতো দেখা যাচ্ছে। এইটি জাস্তি শহর (Zanthe)। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন পর্বতটা তার প্রকাণ্ড করণ্ডে কতকগুলো খেত পুষ্প নিয়ে সমুদ্রকে অঞ্জলি দেবার উপক্রম করছে।

ডেকের উপর উঠে দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ সমুদ্রপথে চলছি। আকাশে মেঘ করে এসেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের সর্বোচ্চ ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেলে দিলে। পর্বতের উপর অত্যন্ত নিবিড় মেঘ নেমে এসেছে; কেবল দূরে একটিমাত্র পাহাড়ের উপর মেঘছিন্নমুক্ত সন্ধ্যা-

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৫৯৭

লোকের একটি দীর্ঘ আরক্ত ইঙ্গিত এসে স্পর্শ করেছে, অল্প সবগুলো আসন্ন বাটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু বাড় এল না। একটু প্রবল বাতাস এবং সবগ বৃষ্টির উপর দিয়েই সমস্ত কেটে গেল। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। শুনলুম, আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছি এখান দিয়ে জাহাজ সচরাচর যায় না। জাহাজটা নাকি ভারি ঝোড়ে।

রাত্রে ডিনারের পর যাত্রীরা কাম্বেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে। কাল ব্রিন্দিসি পৌঁছব। জিনিসপত্র বাঁধতে হবে।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছনো গেল। মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম।

গাড়ি যখন ছাড়ল তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আহা! করে এসে একটি কোণে জানলার কাছে বসা গেল।

প্রথমে, দুই ধারে কেবল আঙুরের খেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটলবিশিষ্ট, বলি অঙ্কিত, বৈচিত্র্যময় রকমের; পাতাগুলো উর্ধ্বমুখ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায়, এই গাছগুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত লম্বাছাড়া, কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক-একটা এমন বৈকে ঝুঁকে পড়েছে যে পাথর উঁচু করে তাদের ঠেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে।

বামে চবা মাঠ; সাদা সাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুকরো চবা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক-একটি ছোটো ছোটো শহর দেখা দিচ্ছে। চার্চছড়া-মুকুটিত সাদা ধবধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তরী নাগরীর মতো কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাসছে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার খেত, আঙুরের খেত, ফলের খেত, জলপাইয়ের বন; খেতগুলি খণ্ড প্রস্তরের বেড়া দেওয়া। মাঝে মাঝে এক-একটি বাঁধা কূপ। দূরে দূরে দুটো-একটা সজ্জীন ছোটো সাদা বাড়ি।

স্বর্ষাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে বসে এক-আধটা করে মুখে দিচ্ছি। এমন মিষ্ট টসটসে সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্বে কখনো খাই নি। মাথায় রঙিন রুমাল বাঁধা ওই ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, ইতালিয়ানীরা এখানকার আঙুরের গুচ্ছের মতো, অমনি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুভোল সৌন্দর্য, যৌবনরসে অমনি উৎপূর্ণ,—এবং ওই আঙুরেরই মতো তাদের মুখের রং—অতি বেশি সাদা নয়।

এখন একটা উচ্চ সমুদ্রতটের উপর দিয়ে চলেছি। আমাদের ঠিক নিচেই ডানদিকে সমুদ্র। ভাঙাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। গোটা চার-পাঁচ পাল-মোড়া নৌকো ডাঙার উপর তোলা। নিচেকার পথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে লোক চলেছে। সমুদ্রতীরে কতকগুলো গোরু চরছে—কী খাচ্ছে ওরাই জানে; মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো গুরুনো খড়কের মতো আছে মাত্র।

রাত্রে আমরা গাড়ির ভোজনশালায় ডিনারে বসেছি, এমন সময়ে গাড়ি একটা স্টেশনে এসে দাঁড়াল। একদল নরনারী প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের ভোজ দেখতে লাগল। তারই মধ্যে গ্যাসের আলোকে দুটি-একটি সুন্দর মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল, তাতে করে ভোজনপাত্র থেকে আমাদের চিত্তকে অনেকটা পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করছিল। ট্রেন ছাড়বার সময়ে আমাদের সহযাত্রীগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি ক্রমাল আন্দোলন, অনেক চুধন-সংকেত প্রেরণ, তারস্বরে অনেক উল্লাসধ্বনি প্রয়োগ করলে; তারাও গ্রীবা আন্দোলনে আমাদের প্রত্যাভিবাদন করতে লাগল।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড়িয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আসছিলাম, আজ শস্তাঙ্গামলা লম্বাডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেছে। চারিদিকে আঁড়ুর, জলপাই, ভুট্টা ও তুঁতের খেত। কাল যে আঁড়ুরের লতা দেখা গিয়েছিল সেগুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মতো। আজ দেখছি খেতময় লম্বা লম্বা কাঠি পোতা, তারই উপর ফলগুচ্ছপূর্ণ দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেছে।

ক্রমে পাহাড় দেখা দিচ্ছে। পাহাড়গুলি উপর থেকে নিচে পর্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে, তারই মাঝখানে এক-একটি লোকালয়।

রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটির; এক হাতে তারই একটি দুয়ার ধরে এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালিয়ান হুবতী সর্কোতুক কৃষ্ণ-নেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করছে। অনতিদূরে একটি বালিকা একটা প্রথরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গোরুর গলার দড়িটি ধরে নিশ্চিন্তমনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার থেকে আমাদের বাংলা দেশের নবদম্পতির চিত্র মনে পড়ল। মস্ত একটা চশমা-পরা গ্রাজুয়েট-পুংগব, এবং তারই দড়িটা ধরে ছোটো একটি চোন্দ-পনেরো বৎসরের নোলকপরা নববধূ; জন্তুটি দিব্যি পোষ মেনে চরে বেড়াচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে বিস্ফারিতনয়নে কত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করছে।

ট্রারিন স্টেশনে আসা গেল। এদেশের সামান্য পুলিশম্যানের সাজ দেখে অবাক হতে হয়। মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি, বিস্তর জরিজড়াও, লম্বা তলোয়ার,—সকল কটিকেই সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র বলে মনে হয়।

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৫৯৯

দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত স্নানীল পর্বতশ্রেণী। বামে ঘনচ্ছায়ান্বিত অরণ্য। যেখানে অরণ্যের 'একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্ছে সেইখানেই শস্তক্ষেত্র, তরুশ্রেণী ও পর্বতসমেত এক-একটা নব নব আশ্চর্য দৃশ্য খুলে যাচ্ছে। পর্বতশৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গশিখর, তলদেশে এক-একটি ছোটো ছোটো গ্রাম। যত এগোচ্ছি অরণ্যপর্বত ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আসছে সেগুলি তেমন উদ্বৃত্ত শুভ্র নবীন পরিপাটি নয়; একটু যেন স্নান দরিদ্র নিভৃত; একটি আখটি চার্চের চূড়া আছে মাত্র; কিন্তু কলকারখানার ধূমোদগারী বৃহত্তরানিত উর্ধ্বমুখ ইষ্টকগুণ্ড নেই।

ক্রমে অল্পে অল্পে পাহাড়ের উপরে ওঠা যাচ্ছে। পার্বত্য পথ সাপের মতো এঁকে-বঁকে চলেছে; ঢালু পাহাড়ের উপর চষা খেত সোপানের মতো থাকে থাকে উঠেছে। একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সংকীর্ণ উপলপথ দিয়ে বারে পড়ছে।

গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এখনই মন্ট সেনিসের দীর্ঘ রেলোয়ে-সুরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। গহ্বরটি উত্তীর্ণ হতে প্রায় আধঘণ্টা লাগল।

এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলশ্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফ্রান্সি জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হান্তপ্রিয় কলভাষী।

ফ্রান্সের প্রবেশদ্বারে একবার একজন কর্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে গেল আমাদের মাসুল দেবার যোগ্য জিনিস কিছু আছে কি না। আমরা বললুম, না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ইংরেজ বললেন, I don't parlez-vous francaise.

সেই শ্রোত এখনো আমাদের ডান দিক দিয়ে চলেছে। তার পূর্ব তীরে 'ফার' অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নিবারণী বঁকেচুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে পাথরগুলোকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড় দিয়েছে। মাঝে মাঝে একটা লোহার সাঁকো-মুষ্টি দিয়ে তার ক্ষীণ কটিদেশ পরিমাপ করবার চেষ্টা করছে। এক জায়গায় জলরাশি খুব সংকীর্ণ; দুই তীরের শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষগুলি শাখায় শাখায় বেঁটন করে দুঃস্বপ্ন শ্রোতকে অন্তঃপুরে বন্দী করতে বুথা চেষ্টা করছে। উপর থেকে বরনা এসে সেই প্রবাহের সঙ্গে মিশছে। বরাবর পূর্ব তীর দিয়ে একটি পার্বত্য পথ সমরেখায় শ্রোতের সঙ্গে বঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সংকীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

শ্রামল তৃণাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক-একটা পাহাড় তৃণহীন সহস্র-রেখাঙ্কিত পাষাণ-কঙ্কাল প্রকাশ করে নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে; কেবল তার মাঝে মাঝে এক-

এক জায়গায় খানিকটা করে অরণ্যের খণ্ড আবরণ রয়েছে। প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র হিংস্র নখের বিদারণরেখা রেখে যেন ওর শ্রামল ত্বক অনেকখানি করে আঁচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।

আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্বসঙ্গিনী মুহূর্তের জন্তু দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বামে, একবার অন্তরালে। আবার হয়তো যেতে যেতে কোনো এক পর্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্তে করতালি দিয়ে আচমকা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে গেছে। বিবিধ শস্তের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপুলার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাকসবজি। কেবলই যেন বাগানের পর বাগান। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু-যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে। এদেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাসবে তাতে কিছু আশ্চর্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদানপ্রদান চলছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আর-একদিকে বৈরাগ্যবুদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে—যুরোপের সে-ভাবে নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে। এর জন্তে যদি প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্তে দেবে! এই প্রেমসীর প্রতি কেউ তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করলে কি আর সহ্য হয়? আমরা তো জঙ্গলে থাকি; খালবিল বনবাদাড় ভাঙা রাস্তা এবং পানাপুকুরের ধারে বাস করি। খেত থেকে দু-মুঠো ধান আনি, মেয়েরা আঁচল ভরে শাক তুলে নিয়ে আসে, ছেলেরা পাকের মধ্যে নেমে চিংড়িমাছ ধরে আনে, প্রান্তরের গাছ থেকে গোটাকতক তেঁতুল পাড়ি, তার পরে শুকনো কাঠকুট সংগ্রহ করে এক-বেলা অথবা দু-বেলা কোনো রকম করে আহার চলে যায়; ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থিকঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে তখন কাঁধা মুড়ি দিয়ে রোস্ত্রে পড়ে থাকি, গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় পঙ্কজগুলোর হরিদ্বর্ণ জলাবশেষ থেকে উঠে এসে ওলাউঠা যখন আমাদের গৃহ আক্রমণ করে তখন ওলাদেবীর পূজা দিই এবং অদৃষ্টের দিকে কোটরপ্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ করে দল বেঁধে মরতে আরম্ভ করি। আমরা কি আমাদের দেশকে পেয়েছি না পেতে চেষ্টা করেছি? আমরা ইহলোকের প্রতি ঔদাস্য করে এখানে কেবল অনিচ্ছুক পথিকের

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৬০১

মতো যেখানে-সেখানে পড়ে থাকি এবং যত শীঘ্র পারি দ্রুতবেগে বিশ-পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একেবারে পরলোকে গিয়ে উপস্থিত হই।

কিন্তু এ কী চমৎকার চিত্র। পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপলার-উইলো-বেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কটক নিরাপদ নিরাময় কলশস্তপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষেপে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালোবাসছে। মানুষের মতো জীবের এই তো যোগ্য আবাসস্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জল করে না তুলতে পারে তবে তরুকেটর-গুহাগহ্বর-বনবাসী জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কী?

৮ সেপ্টেম্বর। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিসে নাববার প্রস্তাব হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই ট্রেন প্যারিসে যায় না—একটু পাশ-কাটিয়ে যায়। প্যারিসের একটি নিকটবর্তী স্টেশনে স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত রাখবার জন্তে টেলিগ্রাফ করা গেল।

রাত দুটোর সময় আমাদের জাগিয়ে দিলে। ট্রেন বদল করতে হবে। জিনিসপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা। অনতিদূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র একটি এঞ্জিন, একটি ফার্স্ট ক্লাস এবং একটি ব্রেকভ্যান। আরোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয়। রাত তিনটের সময় প্যারিসের জনশূণ্য বৃহৎ স্টেশনে পৌঁছোনো গেল। সুশোখিত দুই-একজন “মসিয়” আলো-হস্তে উপস্থিত। অনেক হাদ্যম করে নিদ্রিত কার্ভাস-হাউসকে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তখন প্যারিস তার সমস্ত দ্বার বন্ধ করে শুদ্ধ রাজপথে দীপশ্রেণী জালিয়ে রেখে নিদ্রামগ্ন। আমরা হোটেল ট্যার্মিনুতে আমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটবৃত, চিত্রিত-ভিত্তি, নীলবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা; বিহগপক্ষসুকোমল শুভ শয্যা।

বেশ বদল করে শয়নের উত্তোগ করবার সময় দেখা গেল আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে আর-একজনের ওভারকোট গাত্রবস্ত্র। আমরা তিনজনেই পরস্পরের জিনিস চিনি নে; সুতরাং হাতের কাছে যে-কোনো অপরিচিত বস্ত্র পাওয়া যায় সেইটেই আমাদের কারো-না-কারো স্থির করে অসংশয়ে সংগ্রহ করে আনি। অবশেষে নিজের নিজের জিনিস পৃথক করে নেবার পর উদ্ভূত সামগ্রী পাওয়া গেলে, তা আর পূর্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোনো সুযোগ থাকে না। ওভারকোটটি রেলগাড়ি থেকে আনা হয়েছে; যার কোট সে বেচারী বিশ্বস্তচিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গাড়ি এতক্ষণে সমুদ্রতীরস্থ ক্যালো নগরীর নিকটবর্তী হয়েছে। লোকটি কে, এবং সমস্ত ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে তার ঠিকানা কোথায়, আমরা কিছুই জানি নে। মাঝের

৬০২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

থেকে তার লম্বা কুর্তি এবং আমাদের পাপের ভার স্বপ্নের উপর বহন করে বেড়াচ্ছি— প্রায়শ্চিত্তের পথ বন্ধ। মনে হচ্ছে একবার যে লোকটির কবল হরণ করেছিলুম এ-কুর্তিটিও তার। সে বেচারী বৃদ্ধ, শীতপীড়িত, বাতে পঙ্গু, অ্যাংলোইণ্ডিয়ান পুলিশ অধ্যক্ষ। পুলিশের কাজ করে মানবচরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছে, তার পরে যখন কাল প্রত্যুষে ব্রিটিশ চ্যানেল পার হবার সময় তীব্র শীতবায়ু তার হৃৎকুর্তি জীর্ণ দেহকে কম্পান্বিত করে তুলবে তখন সেই সঙ্গে মহুগুজাতীর সাধুতার প্রতিও তার বিশ্বাস কম্পিত হতে থাকবে।

৯ সেপ্টেম্বর। প্রাতঃকালে দ্বিতীয়বার বেশপরিবর্তন করবার সময় দেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্টম্যান্টো পাওয়া যাচ্ছে না।

পুলিসে সংবাদ দিয়ে প্রাতঃকালে তিনজনে প্যারিসের পথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড রাজপথে দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্তি ফোয়ারা লোকজন গাড়িবোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে অল্প আহার করে এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল স্তম্ভ দেখতে গেলুম। এই লৌহস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কালের দোলায় চড়ে এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিম্নে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড়ো মাপের মতো প্রসারিত দেখতে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন করে একদিনে তাড়াতাড়ি চক্ষু দ্বারা বহির্ভাগ লেহন করে প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, ধনিগৃহের মেয়েদের মতো বন্ধ পালকির মধ্যে থেকে গঙ্গামান করবার মতো—কেবল নিতান্ত তীরের কাছে একটা অংশে এক ডুবে যতখানি পাওয়া যায়। কেবল হাঁপানিই সার।

হোটেল এসে দেখলুম পুলিশের সাহায্যে বন্ধুর পোর্টম্যান্টো ফিরে এসেছে, কিন্তু এখনো সেই পরের হাত কোর্তা সম্বন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি।

১০ সেপ্টেম্বর। লগুন অভিমুখে চললুম। সন্ধ্যার সময় লগুনে পৌঁছে ছুই-একটি হোটেল অব্বেষণ করে দেখা গেল স্থানাভাব। অবশেষে একটি ভদ্রপরিবারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১১ সেপ্টেম্বর। সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল।

প্রথমে লগুনের মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনি নে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বললে তিনি এ-বাড়িতে থাকেন না।

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৬০৩

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় থাকেন? সে বললে, আমি জানি নে, আপনারা ঘরে এসে বসুন, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি। পূর্বে যে-ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলেম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই—সে-ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোন এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। নিরাশহৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরোলুম।

আমাদের গাড়ি মিস শ—এর বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়াল। গিয়ে দেখি তিনি নির্জন গৃহে বসে একটি পীড়িত কুকুরশাবকের সেবায় নিযুক্ত। জলবাগু, পরস্পরের স্বাস্থ্য এবং কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রচলিত শিষ্টালাপ করা গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে, লণ্ডনের সুরঙ্গপথে যে পাতাল-বাস্তবান চলে, তাই অবলম্বন করে বাসায় স্কেরবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পরিণামে দেখতে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সহজে সফল হয় না। আমরা দুই ভাই তো গাড়িতে চড়ে বেশ নিশ্চিত বসে আছি; এমন সময় গাড়ি যখন হামারস্মিথ নামক দূরবর্তী স্টেশনে গিয়ে থামল তখন আমাদের বিশ্বাসপরায়ণ চিত্তে ঈর্ষা সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাদের গম্যস্থান যেদিকে এ-গাড়ির গম্যস্থান সেদিকে নয়। পুনর্বার তিন-চার স্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। অবশেষে গম্য স্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাই নে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা টিকিন খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা দুই ভাই লিভিংস্টোন অথবা স্টানলির মতো ভৌগোলিক আবিষ্কার কার্যের যোগ্য নই; পৃথিবীতে যদি অক্ষয় খ্যাতি উপার্জন করতে চাই তো নিশ্চয় অল্প কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে তিনি যতই কল্পনার চর্চা করুন না কেন, কখনো পথ ভোলেন না। সুতরাং তাঁকেই আমাদের লণ্ডনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে, এ-রকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ-পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ-সংসারে কুসুমের কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু ভাগ্যিস আছে!

৬০৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

১৫ সেপ্টেম্বর। শ্রাভয় থিয়েটারে “গণ্ডোলিয়ার্স” নামক একটি গীতিনাট্য অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। আলোকে সংগীতে সৌন্দর্যে বর্ণবিজ্ঞাসে দৃশ্যে নৃত্যে হাশ্বে কোঁতুকে মনে হল একটা কোন কল্পনারাজ্যে আছি। মাঝে এক অংশে অনেকগুলি নর্তক-নর্তকীতে মিলে নৃত্য আছে; আমার মনে হল যেন হঠাৎ একসময়ে একটা উদ্গাদকর ঘোবনের বাতাসে পৃথিবী জুড়ে নরনারীর একটা উলটপালট ঢেউ উঠেছে—তাতে আলোক এবং বর্ণচ্ছটা, সংগীত এবং ভংগুন্ন নয়নের উজ্জ্বল হাসি সহস্র ভঙ্গীতে চারিদিকে ঠিকরে পড়ছে।

১৬ সেপ্টেম্বর। আজ আমাদের গৃহস্থামীর কুমারী কণ্ঠা আমার কতকগুলি পুরাতন পূর্বস্রুত সুর পিয়ানোর বাজাচ্ছিলেন; তাই শুনে আমার গৃহ মনে পড়তে লাগল। সেই ভারতবর্ষে রোদ্দালোকিত প্রাতঃকাল, মুক্ত বাতায়ন, অব্যাহত আকাশ এবং পিয়ানো যন্ত্রে এই স্বপ্নবহু পরিচিত সংগীতধ্বনি।

১৭ সেপ্টেম্বর। যে দুর্ভাগার শীতকোর্তা আমরা বহন করে করে বেড়াচ্ছি ইণ্ডিয়া আপিস যোগে সে আমাদের একটি পত্র লিখেছে—আমরাই যে তার গাত্রবস্ত্রটি সংগ্রহ করে এনেছি সে-বিষয়ে পত্রলেখক নিজের দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশ করেছে; তার সঙ্গে ‘ভ্রমক্রমে’ বলে একটা শব্দ যোগ করে দিয়েছিল। একটা সম্ভাব্যের বিষয় এই, যার কথল নিয়েছিলুম এটা তার নয়। ভ্রমক্রমে দুবার একজনের গরম কাপড় নিলে ভ্রম সপ্রমাণ করা কিছু কঠিন হত।

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশাভ্যুগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন। নবনীর মতো অকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্মল নীলনেত্র—দেখে প্রবাসদুঃখ দূর হয়ে যায়। শুভাভ্যুগায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, প্রিয় বয়স্শ্রেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ-কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে হাসা মানুষের যেন একটি পরমার্শ্চর্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ওই হাসিটা এদেশে কিছু বাহ্যল্যপরিমাণে পেয়ে থাকি। অনেক সময়ে রাজপথে কোনো নীলনয়না পান্থরমণীর সম্মুখবর্তী হবামাত্র সে আমার মুখের দিকে চেয়ে আর হাসি সংবরণ করতে পারে না। তখন তাকে ডেকে বলে দিতে ইচ্ছা করে, “সুন্দরী, আমি হাসি ভালোবাসি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিশ্বাধরসংলগ্ন হাসি যতই সুমিষ্ট হোক না কেন, তারো একটা যুক্তিসংগত কারণ থাকা চাই; কারণ, মানুষ কেবলমাত্র যে সুন্দর তা নয়, মানুষ

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৫৯৭

লোকের একটি দীর্ঘ আরক্ত ইঙ্গিত এসে স্পর্শ করেছে, অল্প সবগুলো আসন্ন বাটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু বাড় এল না। একটু প্রবল বাতাস এবং সবগ বৃষ্টির উপর দিয়েই সমস্ত কেটে গেল। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। শুনলুম, আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছি এখান দিয়ে জাহাজ সচরাচর যায় না। জাহাজটা নাকি ভারি ঝোড়ে।

রাঙে ডিনারের পর যাত্রীরা কাম্বেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে। কাল ব্রিন্দিসি পৌঁছব। জিনিসপত্র বাঁধতে হবে।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছনো গেল। মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম।

গাড়ি যখন ছাড়ল তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আহা! করে এসে একটি কোণে জানলার কাছে বসা গেল।

প্রথমে, দুই ধারে কেবল আঙুরের খেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটলবিশিষ্ট, বলি অঙ্কিত, বৈটেখাটো রকমের; পাতাগুলো উর্ধ্বমুখ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায়, এই গাছগুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত লম্বাছাড়া, কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক-একটা এমন বৈকে ঝুঁকে পড়েছে যে পাথর উঁচু করে তাদের ঠেকো দিয়ে রাখতে হয়েছে।

বামে চবা মাঠ; সাদা সাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুকরো চবা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক-একটি ছোটো ছোটো শহর দেখা দিচ্ছে। চার্চছড়া-মুকুটিত সাদা ধবধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্ত্রী নাগরীর মতো কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাসছে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার খেত, আঙুরের খেত, ফলের খেত, জলপাইয়ের বন; খেতগুলি খণ্ড প্রস্তরের বেড়া দেওয়া। মাঝে মাঝে এক-একটি বাঁধা কূপ। দূরে দূরে দুটো-একটা সজ্জীন ছোটো সাদা বাড়ি।

স্বর্ষাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে বসে এক-আধটা করে মুখে দিচ্ছি। এমন মিষ্ট টসটসে সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্বে কখনো খাই নি। মাধ্যায় রঙিন রুমাল বাঁধা ওই ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, ইতালিয়ানীরা এখানকার আঙুরের গুচ্ছের মতো, অমনি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য, যৌবনরসে অমনি উৎপূর্ণ,—এবং ওই আঙুরেরই মতো তাদের মুখের রং—অতি বেশি সাদা নয়।

৬০৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি, কিন্তু মর্ত্যের এই চরম সৌন্দর্যের উপর, জীব-
অভিব্যক্তির এই সর্বশেষ কীর্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অস্তরাল টেনে
রেখে দিয়েছে। এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সূষ্ঠাম সূনিপুণ
ভঙ্গিমার উপরে অসীম স্নন্দরের সমস্ত অঙ্গুলির সত্ত্বস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র
দেহের সৌন্দর্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য যে বড়ো সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয়
তা বলতে পারি নে—কিন্তু এতে আরও অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি
প্রীতিরমণীয় স্নকোমল নারী-প্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে,
তারই দিব্য লাভণ্য এর সর্বত্র উদ্ভাসিত। দূর থেকে চকিতের মতো সেই অনির্বচনীয়
চির-রহস্তকে দেহের স্ফটিক-বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল।

২৭ সেপ্টেম্বর। আজ লাইসীয়ম নাট্যালায় গিয়েছিলুম। স্কট রচিত “ব্রাইড
অফ লামারমুর” উপন্যাস নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিং
নায়ক সেজেছিলেন। তাঁর উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং অঙ্গভঙ্গী অদ্ভুত। তৎসঙ্গেও
তিনি কী এক নাট্যকৌশলে ক্রমশ দর্শকদের হৃদয়ে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে
পারেন।

আমাদের সম্মুখবর্তী একটি বাক্সে দুটি মেয়ে বসে ছিল। তার মধ্যে একটি
মেয়ের মুখ রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং হৃদয় আকৃষ্ট করেছিল। নিখুঁত
সুন্দর ছোটো মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুলছে, বেশভূষার আড়ম্বর নেই।
অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল স্টেজের আলো জ্বলছিল
এবং সেই আলো স্টেজের অনতিদূরবর্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল
—তখন তার আলোকিত স্নকুমার মুখের রেখা এবং স্নভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর
চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জনা করবেন—
অভিনয়কালে আমার সেদিকে দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু হৃদয় কষাটা আমার
আসে না। নির্লজ্জ স্পর্ধার সহিত পরস্পরের প্রতি অসংকোচে হৃদয় প্রয়োগ করা
নিতান্ত রুঢ় মনে হয়।

২ অক্টোবর। একটি গুজরাটির সঙ্গে দেখা হল। ইনি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত
পথ জাহাজের ডেকে চড়ে এসেছেন। তখন শীতের সময়। মাছ-মাংস খান না।
সঙ্গে চিড়ে শুক ফল প্রভৃতি কিছু ছিল এবং জাহাজ থেকে শাকসবজি কিছু সংগ্রহ
করতেন। ইংরেজি অতি সামান্য জানেন। গায়ে শীতবস্ত্র অধিক নেই। লগুনে স্থানে
স্থানে উদ্ভিজ্জ ভোজনের ভোজনশালা আছে সেখানে ছয় পেনিতে তাঁর আহার সমাধা
হয়। যেখানে বা কিছু দ্রষ্টব্য জাতব্য বিষয় আছে সমস্ত অনুসন্ধান করে বেড়ান।

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৬০৭

বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে অসংকোচে সাক্ষাৎ করেন। কী রকম করে কথাবার্তা চলে বলা শক্ত। মধ্যে মধ্যে কার্ডিনাল ম্যানিঙের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে আসেন। ইতিমধ্যে এক্সিবিশনের সময় প্যারিসে দুই মাস যাপন করে এসেছেন এবং অবসরমতো আমেরিকায় যাবার সংকল্প করছেন। ভারতবর্ষে এঁকে আমি জানতুম। ইনি বাংলা শিক্ষা করে অনেক ভালো বাংলা বই গুজরাটিতে তরজমা করেছেন। এর স্ত্রীপুত্র পরিবার কিছুই নেই। ভ্রমণ করা, শিক্ষা করা, এবং স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা এঁর একমাত্র কাজ। লোকটি অতি নিরীহ, শীর্ণ, ধর্ম, পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণ স্থান অধিকার করেন। এঁকে দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হয়।

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠছি নে। বলতে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভালো লাগছে না। সেটা গর্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়—সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ত সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, যুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য ইতিহাস পড়ে। সেটা হচ্ছে আইডিয়াল যুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করার জো নেই। তিন মাস, ছ-মাস কিংবা ছ-বৎসর এখানে থেকে আমরা যুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত-পা নাড়া দেখতে পাই মাত্র। বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চলছে ফিরছে, যাচ্ছে আসছে, খুব একটা সমারোহ। সে-যতই বিচিত্র, যতই আশ্চর্য হ'ক না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়; কেবলমাত্র বিশ্বয়ের উত্তেজনা চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না বরং তাতে মনকে সর্বদা বিক্ষিপ্ত করতে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে—আচ্ছা ভালো রে বাপু, আমি মেনে নিচ্ছি তুমি মস্ত শহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের সীমা নেই। অধিক প্রশংসার আবশ্যকতা নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আশ্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তা হলে বিদেশেও আপনার স্বজাতীয়কে দেখে এ-স্থানকে আর প্রবাস বলে মনে হত না। কিন্তু এখানে এসে দেখি কেবল ইংরেজ, কেবল বিদেশী, তাদের চালচলন ধরনধারন যা-কিছু নূতন সেইটেই কেবল ক্রমিক চক্ষে পড়ে, যা চিরকালে পুরাতন সেটা

৬০৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ঢাকা পড়ে থাকে; সেই জন্তে এদের সঙ্গে কেবল পরিচয় হতে থাকে কিন্তু প্রণয় হয় না।

এইখানে কথামালার একটা গল্প মনে পড়ছে।

একটা চতুর শৃগাল একদিন সুবিজ্ঞ বককে আহ্বারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড়ো বড়ো খালা সুমিষ্ট লেছ পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্ট-সম্ভাষণের পর শৃগাল বললে, “ভাই, এস আরম্ভ করে দেওয়া যাক।” বলেই তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে খালের মধ্যে যতই ঠোকর মারে মুখে কিছুই তুলতে পারে না। অবশেষে চেষ্টায় নিবৃত্ত হয়ে স্বাভাবিক অটল গাভীর সর্বোবরকুলে ধ্যানে নিমগ্ন হল। শৃগাল বোধ করি মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত করে বলছিল, “ভাই, খাচ্ছ না যে। এ কেবল তোমাকে মিথ্যা-কষ্ট দেওয়াই হল। তোমার যোগ্য আয়োজন হয় নি।” বক বোধ করি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল, “আহা সে কী কথা। রন্ধন অতি পরিপাটি হয়েছে। কিন্তু শরীর-গতিকে আজ আমার ক্ষুধা বোধ হচ্ছে না।” পরদিন বকের নিমন্ত্রণে শৃগাল গিয়ে দেখেন, লম্বা ভাঁড়ের মধ্যে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দেখে লোভ হয় কিন্তু তার মধ্যে শৃগালের মুখ প্রবেশ করে না। বক অনতিবিলম্বে লম্বচঞ্চু চালনা করে ভোজনে প্রবৃত্ত হল। শৃগাল বাহিরের থেকে পাত্রেলেহন এবং দুটো-একটা উৎক্ষিপ্ত খাত্তখণ্ডের স্বাদগ্রহণ করে নিতান্ত ক্ষুধাতুরভাবে বাড়ি ফিরে গেল।

জাতীয় ভোজে বিদেশীর অবস্থা সেইরকম। খাত্তটা উভয়ের পক্ষে সমান উপাদেয় কিন্তু পাত্রটা তফাত। ইংরেজ যদি শৃগাল হয় তবে তার সুবিস্তৃত গুপ্ত-রজতখালের উপর উদ্ঘাটিত পায়সান্ন কেবল চক্ষু দর্শন করেই আমাদের ক্ষুধিতভাবে চলে আসতে হয়, আর আমরা যদি তপস্বী বক হই, তবে আমাদের সুগভীর পাথরের পাত্রটার মধ্যে কী আছে শৃগাল তা ভালো করে চক্ষুও দেখতে পায় না—দূর থেকে ঈষৎ জ্ঞান নিয়েই তাকে ফিরতে হয়।

প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচারব্যবহার তার নিজের পক্ষে সুবিধা, কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা। এইজন্য ইংরেজসমাজ যদিও বাহ্যত সাধারণসমক্ষে উদ্ঘাটিত কিন্তু আমরা চক্ষুর অগ্রভাগটুকুতে তার দুই-চার ফোঁটার স্বাদ পাই মাত্র। ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারি নে। সর্বজাতীয় ভোজ কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেখানে যার লম্বা চঞ্চু সে-ও বঞ্চিত হয় না, যার লোলজিহবা সে-ও পরিভৃগ্ন হয়।

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৬০৯

কারণটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হ'ক বা না হ'ক, এখানকার লোকের সঙ্গে হৌ-ডু-ডু বলে, হাঁ করে রাস্তায় ঘাটে পর্যটন করে, থিয়েটার দেখে, দোকান ঘুরে, কলকারখানার তথ্য নির্ণয় করে—এমন কি, সুন্দর মুখ দেখে আমার প্রাস্তি বোধ হয়েছে।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।

৭ অক্টোবর। 'টেম্‌স' জাহাজে একটা ক্যাবিন স্থির করে আসা-গেল। পরশু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলেতে রয়ে গেলেন। আমার নির্দিষ্ট ক্যাবিনে গিয়ে দেখি সেখানে এক কক্ষে চারজনের থাকবার স্থান; এবং আর-একজনের জিনিসপত্র একটি কোণে রাশীকৃত হয়ে আছে। বাস-তোয়ালের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আছে 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস।' বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে ভাবী সঙ্গসুখের কল্পনায় আমার মনে অপরিমেয় আনন্দের সঞ্চার হয় নি। ভাবলুম ভারতবর্ষের রোদে বলসা শুকনো খটখটে হাড়-পাকা অত্যন্ত কাঁজালো রুনো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেছে। গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছি এমন সময়ে একজন অল্পবয়স্ক স্ত্রী ইংরেজ যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে সহাস্রমুখে শুভপ্রভাত অভিবাদন করলেন—মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে যাত্রা করছেন। এঁর শরীরে ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের স্বাভাবিক সহৃদয় ভদ্রতার ভাব এখনো সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য উঠেছে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডান দিক থেকে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট দ্বীপের পার্বত্য তীর এবং ভেন্ট্রন শহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

এ জাহাজে বড়ো ভিড়। নিরিবিলাি কোণে চোঁকি টেনে যে একটু লিখব তার জো নেই, স্মরণ্যে যা-কিছু চোখে পড়ে তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।

ইংরেজ মেয়ের চোখ নিয়ে আমাদের দেশের লোক প্রায়ই ঠাট্টা করে, বিড়ালের চোখের সঙ্গে তার তুলনা করে থাকে। কিন্তু এমন সর্বদাই দেখা যায়, তারাই যখন আবার বিলেতে আসে তখন স্বদেশের হরিণনয়নের কথাটা আর বড়ো মনে করে না। যতক্ষণ দূরে আছি কোনো বালাই নেই, কিন্তু লক্ষ্যপথে প্রবেশ করলেই ইংরেজ সুন্দরীর দৃষ্টি আমাদের অভ্যাসের আবরণ বিদ্ধ ক'রে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে।

৬১০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ইংরেজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মতো পরিষ্কার, হীরকের মতো উজ্জ্বল এবং ঘন-পল্লবে আচ্ছন্ন, তাতে আবেশের ছায়া নেই। এমন ভারত-সন্তান আমার জানা আছে যে নীলনেত্রের কাছেও অভিভূত এবং হরিণনয়নকেও কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। কৃষ্ণ কেশপাশও সে মুণ্ডের পক্ষে বন্ধন এবং কনককুন্তলও সামান্য দৃঢ় নয়।

সংগীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্বে যে ইংরেজি সংগীতকে পরিহাস করে আনন্দলাভ করা গেছে, এখন তার প্রতি মনোযোগ করে ততোধিক বেশি আনন্দ লাভ করা যায়। এখন অভ্যাসক্রমে যুরোপীয় সংগীতের যতটুকু আশ্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে যদি চর্চা করা যায় তা হলে যুরোপীয় সংগীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সংগীত যে আমার ভালো লাগে সে-কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহ্যিক। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

১৩ অক্টোবর। একটি রমণী গল্প করছিলেন, তিনি পূর্বকার কোন্ এক সমুদ্র-যাত্রায় কাপ্তেন অথবা কোনো কোনো পুরুষযাত্রীর প্রতি কঠিন পরিহাস ও উৎপীড়ন করতেন—তার মধ্যে একটা হচ্ছে চোঁকিতে পিন ফুটিয়ে রাখা। শুনে আমার তেমন মজাও মনে হল না এবং সেই সকল বিশেষ অল্পগৃহীত পুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হতেও একান্ত বাসনার উদ্রেক হল না। দেখা যাচ্ছে, এখানে পুরুষদের প্রতি মেয়েরা অনেকটা দূর পর্যন্ত রূঢ়াচরণ করতে পারেন। যেমন বালকের কাছ থেকে উপদ্রব অনেক সময় আমোদজনক লীলার মতো মনে হয় স্ত্রীলোকদের অত্যাচারের প্রতিও পুরুষেরা সেইরকম স্নেহময় উপেক্ষা প্রদর্শন করে, এবং অনেক সময় সেটা ভালো-বাসে। পুরুষদের মুখের উপরে রূঢ় সমালোচনা শুনিতে দেওয়া স্ত্রীলোকদের একটা অধিকারের মধ্যে। সেই লঘুগতি তীব্রতার দ্বারা তাঁরা পুরুষের শ্রেষ্ঠতাভিমান বিদ্ধ করে গৌরব অল্পভব করেন। সামাজিক প্রথা এবং অনিবার্য কারণবশত নানা বিষয়ে তাঁরা পুরুষের অধীন বলেই লৌকিকতা এবং শিষ্টাচার সম্বন্ধে অনেক সময়ে তাঁরা পুরুষদের লজ্জন করে আনন্দ পান। কার্যক্ষেত্রে যেখানে প্রতিযোগিতা নেই সেখানে দুর্বল কিঞ্চিৎ দুর্বল এবং সুবল সম্পূর্ণ সহিষ্ণু এটা দেখতে মন্দ হয় না। বলাভিমানী পুরুষের পক্ষে এ একটা শিক্ষা। অবলার দুর্বলতা পুরুষের ইচ্ছাতেই বল প্রাপ্ত হয়েছে, এইজন্য যে-পুরুষের পৌরুষ আছে স্ত্রীলোকের উপদ্রব সে বিনা বিজ্রোহে আনন্দের সহিত সহ্য করে, এবং সহিষ্ণুতায় তার পৌরুষেরই চর্চা হতে থাকে। যেদেশের পুরুষেরা কাপুরুষ তারাই নিলজ্জভাবে পুরুষ-পূজাকে পুরুষের

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৬১১

প্রাণপণ সেবাইকে স্ত্রীলোকের সর্বোচ্চ ধর্ম বলে প্রচার করে; সেই দেশেই দেখা যায় স্বামী রিক্তহস্তে আগে আগে যাচ্ছে আর স্ত্রী তার বোঝাটি বহন করে পিছনে চলেছে, স্বামীর দল ফার্টক্লাসে চড়ে যাত্রা করছে আর কতকগুলি জড়োসড়ো ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিয়ন্ত্রণীতে পুরে দেওয়া হয়েছে, সেই দেশেই দেখা যায় আহায়ে বিহারে ব্যবহারে সকল বিষয়েই সুখ এবং আরাম কেবল পুরুষের, উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্ত কেবল স্ত্রীলোকের, তাই নিয়ে বেহারা কাপুরুষেরা অসংকোচে গৌরব করে থাকে এবং তার তিলমাত্র ব্যত্যয় হলে সেটাকে তারা খুব একটা প্রহসনের বিষয় বলে জ্ঞান করে। স্বভাবদুর্বল সুকুমার স্ত্রীলোকদের সর্বপ্রকার আরামসাধন এবং কষ্টলাঘবের প্রতি সমস্ত মনোযোগ যে কঠিনকায় বলিষ্ঠ পুরুষদের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ হওয়া উচিত এ তারা কল্পনা করতে পারে না—তারা কেবল এইটুকুমাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে, তাদের বদনে অন্ন জুগিয়ে দেবে, তাদের তপ্ত কলেবরে পাখার ব্যঞ্জন করবে, তাদের আলমুচটার আয়োজন করে দেবে, পঙ্কিল পথে পায়ে জুতো দেবে না, শীতের সময় গায়ে কাপড় দেবে না, রৌদ্রের সময় মাথায় ছাতা দেবে না, ক্ষুধার সময় কম করে থাকে, আমোদের সময় যবনিকার আড়ালে থাকবে এবং এই বৃহৎ মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে আলোক আনন্দ সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আছে তার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। স্বার্থপরতা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে কিন্তু নির্লজ্জ নিঃসংকোচ স্বার্থপরতা কেবল সেই দেশেই আছে যেদেশে পুরুষেরা ষোলো আনা পুরুষ নয়।

মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা করে থাকে এবং পুরুষেরা আপনার উদার দুর্বলবৎসলতা থেকে স্ত্রীলোকের সেবা করে থাকে; যেদেশে স্ত্রীলোকেরা সেই সেবা পায় না, কেবল সেবা করে, সেদেশে তারা অপমানিত এবং সেদেশও লক্ষ্মীছাড়া।

কিন্তু কথাটা হচ্ছিল স্ত্রীলোকের দৌরাণ্য সম্বন্ধে। গোলাপের যে-কারণে কাঁটা থাকা আবশ্যক, যেখানে স্ত্রীপুরুষে বিচ্ছেদ নেই সেখানে স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে প্রখরতা থাকা চাই, তীক্ষ্ণ কথায় মর্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস অবলার পক্ষে অনেক সময়ই কাজে লাগে।

আমাদের গোলাপগুলিই কি একেবারে নিষ্কণ্টক? কিন্তু সে-বিষয়ে সমধিক সমালোচনা করতে বিরত থাকা গেল।

১৪ অক্টোবর। জিব্রাল্টার পৌঁছনো গেল। মুঘলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে।

আজ ডিনার-টেবিলে একটা মোটা আঙুল এবং ফুলো গৌঁফওআলা প্রকাণ্ড জোয়ান গোরা তার সুন্দরী পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষীয় পাখাওআলার গল্প করছিল।

সুন্দরী কিঞ্চিৎ নালিশের নাকিস্বরে বললেন—পাখাওআলারা রাত্রে পাখা টানতে টানতে ঘুমোয়। জোয়ান লোকটা বললে তার একমাত্র প্রতিবিধান লাথি কিংবা লাঠি। পাখা-আন্দোলন সম্বন্ধে এইভাবে আন্দোলন চলতে লাগল। আমার বৃকে হঠাৎ যেন একটা তপ্ত শূল বিধল। এইভাবে যারা স্ত্রীপুরুষে কথোপকথন করে তারা যে অকাতরে একসময় একটা দিশি দুর্বল মানব-বিড়ম্বনাকে ভবপারে লাথিয়ে ফেলে দেবে তার আর বিচিত্র কী? আমিও তো সেই অপমানিত জাতের লোক, আমি কোন্ লজ্জায় কোন্ সূত্রে এদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাই এবং একত্রে দস্তোয়ালীন করি। শরীরের সমস্ত রাগ কণ্ঠ পর্যন্ত এল কিন্তু একটা কথাও বহু চেষ্টাতে সে-জায়গায় এসে পৌঁছল না। বিশেষত ওদের ওই ইংরেজি ভাষাটা বড়োই বিজাতীয়—মনটা একটু বিচলিত হয়ে গেলেই ও-ভাষাটা মনের মতো কায়দা করে উঠতে পারি নে। তখন মাথার চতুর্দিক হতে রাজ্যের বাংলা কথা চাক-নাড়া মোমাছির মত মুখদ্বারে ভিড় করে ছুটে আসে। ভাবলুম এত উতলা হয়ে উঠলে চলবে না, একটু ঠাণ্ডা হয়ে ছুটো-চারটে ব্যাকরণগুরু ইংরেজি কথা মাথার মধ্যে গুছিয়ে নিই। বগড়া করতে গেলে নিদেন ভাষাটা ভালো হওয়া চাই।

তখন মনে মনে নিম্নলিখিত মতো ভাবটা ইংরেজিতে রচনা করতে লাগলুম :

কথাটা ঠিক বটে মশায়, পাখাওআলা মাঝে মাঝে রাত্রে ঢুললে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। দেহধারণ করলেই এমন কতকগুলো সহ্য করতে হয় এবং সেইজন্যই খ্রীষ্টীয় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ঘটে। এবং এইরূপ সময়েই ভদ্রাভদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে লোক তোমার আশাতের প্রতিশোধ নিতে একেবারেই অক্ষম, খপ করে তার উপরে লাথি তোলা চূড়ান্ত কাপুরুষতা ; অভদ্রতার চেয়ে বেশি।

আমরা জাতটা যে তোমাদের চেয়ে দুর্বল সেটা একটা প্রাকৃতিক সত্য—সে আমাদের অস্বীকার করবার জো নেই। তোমাদের গায়ের জোর বড়ো বেশি—তোমরা ভারি পালোয়ান।

কিন্তু সেইটেই কি এত গর্বের বিষয় যে, মনুষ্যত্বকে তার নিচে আসন দেওয়া হবে?

তোমরা বলবে—কেন, আমাদের আর কি কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই?

ধাকতেও পারে। তবে, যখন একজন অস্বিজর্জর অর্ধ-উপবাসী দরিদ্রের রিক্ত উদরের উপরে লাথি বসিয়ে দাও এবং তৎসম্বন্ধে রমণীদের সঙ্গে কৌতুকালাপ কর এবং স্নহুমারীগণও তাতে বিশেষ বেদনা অনুভব করেন না, তখন কিছুতেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ বলে ঠাहर করা যায় না।

যুরোপ-বাত্রীর ডায়ারি

৬১৩

বেচারার অপরাধ কী দেখা যাক। ভোরের বেলা অর্ধাশনে বেরিয়েছে, সমস্ত দিন খেটেছে। হতভাগা আর দুটো পয়সা বেশি উপার্জন করবার আশায় রাজ্যের বিশ্রামটা তোমাকে দু-চার আনার বিক্রি করেছে। নিতান্ত গরিব বলেই তার এই ব্যবসায়, বড়োসাহেবকে ঠকাবার জন্তে সে ষড়যন্ত্র করে নি।

এই ব্যক্তি রাজ্যে পাখা টানতে টানতে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে—এ দোষটা তার আছে বলতেই হবে।

কিন্তু আমার বোধ হয় এটা মানবজাতির একটা আদিম পাপের ফল। যন্ত্রের মতো বসে বসে পাখা টানতে গেলেই আদমের সন্তানের চোখে ঘুম আসবেই। সাহেব নিজেকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

এক ভৃত্যের দ্বারা কাজ না পেলে দ্বিতীয় ভৃত্য রাখা যেতে পারে, কিন্তু যে কাপুরুষ তাকে লাথি মারে সে নিজেকে অপমান করে, কারণ তখনই তার একটি প্রতিলাধি প্রাপ্য হয়—সেটা প্রয়োগ করবার লোক কেউ হাতের কাছে উপস্থিত নেই, এইটুকুমাত্র প্রভেদ।

তোমরা অবসর পেলেই আমাদের বলে থাক যে, তোমাদের মধ্যে যখন বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত তখন তোমরা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে কোনো স্বাধীন অধিকার প্রাপ্তির যোগ্য নও।

কিন্তু তার চেয়ে এ-কথা সত্য যে, যে-জাত নিরাপদ দেখে দুর্বলের কাছে ‘তেরিয়া’—অর্থাৎ তোমরা যাকে বলে ‘বুলি’—যার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই—অপ্রিয় অশিষ্ট ব্যবহার যাদের স্বভাবত আসে, কেবল স্বার্থের স্থলে যারা নম্রভাব ধারণ করে, তারা, কোনো বিদেশী রাজ্যশাসনের যোগ্য নয়।

অবশ্য যোগ্যতা দু-রকমের আছে—ধর্মত এবং কার্যত। এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে শুদ্ধমাত্র কৃতকারিতাই যোগ্যতার প্রমাণ নয়। গায়ের জোর থাকলে অনেক কাজই বলপূর্বক চালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ উপযোগী নৈতিক গুণের দ্বারাই সে কার্যবহনের প্রকৃত অধিকার পাওয়া যায়।

কিন্তু ধর্মের শাসন সত্ত্বে সত্ত্বে দেখা যায় না বলে যে, ধর্মের রাজ্য অরাজক তা বলা যায় না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ঠুরতা এবং প্রতিদিনের ঔদ্ধত্য প্রতিদিন সঞ্চিত হচ্ছে, এক সময় এরা তোমাদেরই মাথায় ভেঙে পড়বে।

যদি বা আমরা সকল অপমানই নীরবে অথবা কথঞ্চিৎ কলরব সহকারে সহ্য করে যাই, প্রতিকারের কোনো ক্ষমতাই যদি আমাদের না থাকে, তবু তোমাদের মজল হবে না।

কারণ, অপ্রতিহত ক্ষমতার দত্ত জাতীয় চরিত্রের মূল আক্রমণ করে। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার ভিত্তির উপর তোমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত, তলে তলে সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে। সেইজন্ত ইংলওবাসী ইংরেজদের কাছে শোনা যায় ভারতবর্ষীয় ইংরেজ একটা জাতই স্বতন্ত্র; কেবলমাত্র বিকৃত যন্ত্রই তার একমাত্র কারণ নয়, যন্ত্রের চেয়ে মানুষের আরো উচ্চতর অন্তরীন্দ্রিয় আছে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু আমার এ বিভীষিকায় কেউ ভরাবে না। যার দ্বারে অর্গল নেই সে-ই অগত্যা চোরকে সাধুভাবে ধর্মোপদেশ দিতে বসে; যেন চোরের পরকালের হিতের জন্তই তার রাগে ঘুম হয় না।

লাখির পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া এবং ধর্মভয় দেখানো যদিচ দেখতে অতি মনোহর বটে কিন্তু লাখির পরিবর্তে লাখি দিলেই ফলটা অতি শীঘ্র পাওয়া যায়। এই পুরাতন সত্যটি আমাদের জানা আছে, কিন্তু বিধাতা আমাদের সমস্ত শরীরমনের মধ্যে কেবল রসনার অগ্রভাগটুকুতে বলসঞ্চায় করেছেন। সুতরাং হে জোয়ান, কিঞ্চিৎ নীতি-কথা শোনো।

শোনা যায় ভারতবর্ষীয়ের পিলে যন্ত্রটাই কিছু খারাপ হয়ে আছে, এইজন্ত তার পেটের উপরে ইংরেজ প্রভুর নিতান্ত 'পেটানাল ট্রুটমেন্ট'-টুকুরও ভর সইতে পারে না। কিন্তু ইংরেজের পিলে কী রকম অবস্থায় আছে এ-পর্যন্ত কার্যত তার কোনো পরীক্ষাই হয় নি।

কিন্তু সে নিয়ে কথা হচ্ছে না; পিলে কেটে যে আমাদের অপঘাতমৃত্যু হয় সেটা আমাদের ললাটের লিখন। কিন্তু তার পরেই সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা যে-রকম ভুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাও, তাতেই আমাদের সমস্ত জাতিকে অপমান করা হয়। তাতেই একরকম করে বলা হয় যে, আমাদের তোমরা মানুষ জ্ঞান কর না। আমাদের দুটো-চারটে মানুষ যে খামকা তোমাদের চরণতলে বিলুপ্ত হয়ে যায় সে আমাদের পিলের দোষ। পিলে যদি ঠিক থাকত তা হলে লাখিও খেতে, বেঁচেও থাকতে এবং পুনশ্চ দ্বিতীয়বার খাবার অবসর পেতে।

যা হ'ক ভদ্রনাম ধারণ করে অসহায়কে অপমান করতে যার সংকোচ বোধ হয় না, তাকে এত কথা বলাই বাহুল্য; বিশেষত যে ব্যক্তি অপমান সহ করে দুর্বল হলেও তাকে যখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা না করে থাকা যায় না।

কিন্তু একটা কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে। ইংলণ্ডে তো তোমাদের এত বিশ্বহিতৈষিনী মেয়ে আছেন তাঁরা সভাসমিতি করে নিতান্ত অসম্পর্কীয় কিংবা

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৬১৫

দূরসম্পর্কীয় মানবজাতির প্রতিও দূর থেকে দয়া প্রকাশ করেন। এই হৃতভাগ্য দেশে সেই ইংরেজের ঘর থেকে কি যেথেষ্ট পরিমাণে মেয়ে আসেন না খারা উক্ত বাহুল্য কর্ণ-রসের কিয়দংশ উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যয় করে মনোভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে যেতে পারেন। বরঞ্চ পুরুষমানুষে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখেছি। কিন্তু তোমাদের মেয়েরা এখানে, কেবল নাচগান করেন, সুরযোগমতে বিবাহ করেন এবং কথোপকথনকালে সূচাক নাসিকার স্নুসুমার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে আমাদের স্বজাতীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। জানি না, কী অভিপ্রায়ে বিধাতা আমাদের ভারতবাসীকে তোমাদের ললনাদের স্নায়ুতন্ত্রের ঠিক উপযোগী করে সৃজন করেন নি।

যাই হ'ক, স্বগত উক্তি যত ভালোই হ'ক স্টেজ ছাড়া আর কোথাও শ্রোতাদের কর্ণগোচর হয় না। তা ছাড়া যে কথাগুলো আক্ষেপবশত মনের মধ্যে উদয় হয়েছিল সেগুলো যে এই গৌণওআলা পালোয়ানের বিশেষ কিছু হৃদয়ঙ্গম হত এমন আমার বোধ হয় না। এদিকে, বুদ্ধি যখন বেড়ে উঠল চোর তখন পালিয়েছে—তার। পূর্বপ্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য কথায় গিয়ে পড়েছে। মনের খেদে কেবল নিজেকেই দিক্কার দিতে লাগলুম।

১৫ অক্টোবর। জাহাজে আমার একটি ইংরেজ বন্ধু জুটেছে। লোকটাকে লাগছে ভালো। অল্প বয়স, মন খুলে কথা কয়, কারো সঙ্গে বড়ো মেশে না, আমার সঙ্গে খুব চট করে বনে গেছে। আমার বিবেচনায় শেষটাই সব-চেয়ে মহৎ গুণ।

এ জাহাজে তিনটি অস্ট্রেলিয়ান কুমারী আছেন—তাদের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। বেশ সহজ সরল রকমের লোক, কোনোপ্রকার অতিরিক্ত ঝাঁজ নেই। আমার নববন্ধু এঁদের প্রশংসাস্বরূপে বলে, "They are not at all smart." বাস্তবিক, অনেক অল্পবয়সী ইংরেজ মেয়ে দেখা যায় তারা বড়োই smart—বড্ডো চোখমুখের খেলা, বড্ডো নাকে মুখে কথা, বড্ডো খরতর হাসি, বড্ডো চোখাচোখা জবাব—কারো কারো লাগে ভালো, কিন্তু শান্তিপ্ৰিয় সামান্ত লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রাস্তিজনক।

১৬ অক্টোবর। আজ জাহাজে দুটি ছোটো ছোটো নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। দলের মধ্যে একটি অভিনেত্রীকে যেমন সুন্দর দেখতে তিনি তেমনি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

আজ অনেক রাত্রে নিরালস্য একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাটরা ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে অগ্নমনস্কভাবে গুনগুন করে একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখতে পেলুম অনেকদিন ইংরেজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন অতৃপ্ত হয়ে ছিল।

৬১৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

হুঁতাং এই বাংলা সুরটা পিপাসার জলের মতো বোধ হল। আমি দেখলুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যে-রকম প্রসারিত হল, এমন আর কোনো সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরেজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরেজি সংগীত মানব-জগতের সংগীত, আর আমাদের সংগীত প্রকাণ্ড নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদ-গভীর সংগীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিনীর মধ্যে যৈ-গাস্তীষি এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকুল অসীমের প্রাস্তবর্তী এই সঙ্গিহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মার্টা দীপে পৌঁছল। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অটালিকাখচিত তরুণলহীন শহর। এই শ্রামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাধি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে নাবতে ইচ্ছে করে না। অবশেষে আমার নববন্ধুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল। সমুদ্রতীর থেকে সুরদপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মতো উঠেছে, তারই সোপান বেয়ে শহরের মধ্যে উঠলুম। অনেকগুলি গাইড পাণ্ডা আমাদের হেঁকে ধরলে। আমার বন্ধু বহুকষ্টে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমাদের সঙ্গে ছাড়লে না। বন্ধু তাকে বার বার বোঁকে বোঁকে বললেন, “চাই নে তোমাকে, একটি পরিসাও দেব না।” তবু সে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল। তার পরে যখন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তখন সে স্নানমুখে চলে গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বললেন, লোকটা গরিব সন্দেহ নেই কিন্তু কোনো ইংরেজ হলে এমন করত না। আসলে মানুষ পরিচিত দোষ গুরুতর হলেও মার্জনা করতে পারে কিন্তু সামান্য অপরিচিত দোষ সহ করতে পারে না।

মার্টা শহরটা দেখে মনে হয় একটা অপরিণত বিকৃত যুরোপীয় শহর। পাথরে বাঁধানো সন্ন্যাসীরা একবার উপরে উঠেছে একবার নিচে নামছে। সমস্তই দুর্গন্ধ ঘেঁষাঘেঁষি অপরিষ্কার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুম। অনেক দাম দেওয়া গেল, কিন্তু খাওয়াব্য কদর্য। আহারান্তে, শহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক আছে, সেইখানে ব্যাঙ বাতুল শুনে রাত দশটার সময় জাহাজে ফিরে আসা গেল। ফেরবার সময় নৌকোওআলা আমাদের কাছ থেকে শ্রাব্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেষ্টায় ছিল। আমার বন্ধু এদের অসং ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত। তাতে আমার মনে পড়ল এবারে লগুনে প্রথম যেদিন আমরা দুই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুম

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৬১৭

গাড়োরান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল। সে লোকটার তত দোষ ছিল না, দোষ আমাদেরই। আমাদের দুই আইরের মুখে বোধ করি এমন কিছু ছিল যা দেখলে সংলোকেরও ঠকিয়ে নিতে হঠাৎ প্রলোভন হতে পারে। যা হ'ক মার্টাবাসীর অসাধু স্বভাবের প্রতি আমার বন্ধুর অতিমাত্র ক্রোধ দেখে এ ঘটনাটা উল্লেখ করা আমার কর্তব্য মনে করলুম।

১৮ অক্টোবর। আজ ডিনার-টেবিলে 'স্মাগিং' সম্বন্ধে কেউ কেউ নিজ নিজ কীতি রটনা করছিলেন। গবর্নেন্টকে মাগুস ফাঁকি দেবার জন্তে মিথ্যা প্রতারণা করাকে এরা তেমন নিন্দা বা লজ্জার বিষয় মনে করে না। অথচ মিথ্যা এবং প্রতারণাকে যে এরা দুষণীয় জ্ঞান করে না সে-কথা বলাও অস্বাভাবিক। মানুষ এমনি জীব! একজন ব্যারিস্টার তার মক্কেলের কাছ থেকে পুরা ফি নিয়ে যদি কাজ না করে এবং সেজন্তে যদি সে হতভাগ্যের সর্বনাশ হয়ে যায় তা হলেও কিছু লজ্জা বোধ করে না, কিন্তু ওই মক্কেল যদি তার দেয় ফির দুটি পয়সা কম দেয় তা হলে কৌশলির মনে যে ঘৃণামিশ্রিত আক্রোশের উদয় হয় তাকে তাঁরা ইংরেজি করে বলেন 'ইণ্ডিগ্নেশন!'

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ যখন ব্রিন্দিসি পৌঁছল তখন ঘোর বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে এক দল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্-বেয়লা ম্যাগোলিন নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গানবাজনা জুড়ে দিলে।

বৃষ্টি থেমে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিসিতে বেরোনো গেল। শহর ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে রাস্তা শুকিয়ে গেছে, কেবল দুই ধারের নালার মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে গাছে চড়ে দুটো খালি-পা ইটালিয়ান ছোকরা ফিগ পেড়ে খাচ্ছিল; আমাদের ডেকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা খাবে কি? আমরা বললুম, না। খানিক বাদে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ খাবে? আমরা অসম্মত হলুম। তার পরে ইশারায় তামাক প্রার্থনা করে বন্ধুর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ তামাক আদায় করলে। তামাক খেতে খেতে দু-জনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমরা পরস্পরের ভাষা জানি নে—আমাদের উভয় পক্ষে প্রবল অল্পভঙ্গীদ্বারা ভাবপ্রকাশ চলতে লাগল। জনশূন্য রাস্তা ক্রমশ উচু হয়ে শৃঙ্খলিত্রের মধ্য দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে এক একটা ছোটো বাড়ি, সেখানে জানলার কাছে ফিগ ফল শুকোতে দিয়েছে। এক-এক জায়গায় ছোটো ছোটো শাখাপথ বক্রধারায় এক পাশ দিয়ে নেমে নিচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

৬১৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ফেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢোকা গেল। এখানকার গোর নূতন রকমের। অধিকাংশ গোরের উপরে এক-একটি ছোটো ঘর গাঁথেছে। সেই ঘর পর্দা দিয়ে ছবি দিয়ে রঙিন জিনিস দিয়ে নানা রকমে সাজানো, যেন মৃত্যুর একটা খেলাঘর—এর মধ্যে কেমন একটা ছেলেমানুষি আছে, মৃত্যুটাকে যেন যথেষ্ট খাতির করা হচ্ছে না।

গোরস্থানের এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির নিচেকার ঘরে নাবা গেল। সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার মাথা অতি শূশ্রূষালভাবে স্তুপাকারে সাজানো। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই নিশিদিন যে একটা কঙ্কাল চলে বেড়াচ্ছে ওই মুণ্ডগুলো দেখে তার আকৃতিটা মনে উদয় হল। জীবন এবং সৌন্দর্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা চিত্রিত পর্দা ফেলে রেখেছে—কোনো নিষ্ঠুর দেবতা যদি হঠাৎ একদিন সেই লাভাধ্যম চর্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, তা হলে অকস্মাৎ দেখতে পাওয়া যায় আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে গোপনে বসে বসে শুষ্ক ষ্ঠেত দন্তপংক্তি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিজ্রপের হাসি হাসছে। পুরোনো বিষয়! পুরোনো কথা! ওই নরকপাল অবলম্বন করে নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করেছেন, কিন্তু অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে আমার কিছুই ভয় হল না। শুধু এই মনে হল, সীতাকুণ্ডের বিদীর্ণ জলবিধ থেকে যেমন খানিকটা তপ্ত বাষ্প বেরিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর কত যুগের কত হুশিস্তা, দুরাশা, অনিশ্চয় ও শিরশীড়া ওই মাথার খুলিগুলোর, ওই গোলাকার অস্থি-বুদবুদগুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। এবং সেই সঙ্গে এও মনে হল, পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার অনেক টাকের ওষুধ আবিষ্কার করে চাংকার করে মরছে, কিন্তু ওই লক্ষ লক্ষ কেশহীন মস্তক তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং দন্তমার্জনওআলারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করছে এই অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোনো খোঁজ নিচ্ছে না।

যাই হ'ক আপাতত আমার নিজের কপালকলকটার ভিতরে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চার করছে। যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলিটার মধ্যে খানিকটা খুশির উদয় হবে, আর যদি না পাই তা হলে এই অস্থিকোটরের মধ্যে দুঃখ নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে, ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্ছি।

২৩ অক্টোবর। সুরেজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জাহাজের গতি অতি মধুর।

উজ্জল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলোশ্রু পূর্ণ আছি। যুরোপের ভাব সম্পূর্ণ কাটল। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্তী

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৬১৯

পৃথিবীর অপরিচিত নিভৃত নদীকলধনিত ছায়াশ্রুত বাংলা দেশ, আমার সেই অকর্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাবিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুত্তম চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি এই স্বর্ষকিরণে, এই তপ্ত বায়ুহিলোলে সুদূর মরীচিকার মতো আমার দৃষ্টির সন্মুখে জেগে উঠেছে।

ডেকের উপরে গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে দেখলুম, দু'খারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর—জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাড় এবং অর্ধশত তৃণ উঠেছে। আমাদের ডান দিকের বালুকায়ারির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। প্রথমে স্বর্ষালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং সাদা পাগড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগহবরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলসভাবে গুয়ে আছে, কেউ বা নমাজ পড়ছে, কেউ বা নাসারজু ধরে অনিচ্ছুক উটকে টানাটানি করছে। সমস্তটা মিলে খররৌত্র আরব মরুভূমির এক খণ্ড ছবির মতো মনে হল।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস—কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ বলে মনে হয়। সেখানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও সুবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষ্ণধার—যৌবনকালে নিঃসন্দেহ সেই তীক্ষ্ণতা ছিল উজ্জ্বল। যদিও এখনো এর নাকে মুখে কথা, এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মতো ক্রীড়াচাতুর্য, তবু কোনো যুবক এর সঙ্গে দুটো কথা বলবার ছতো অব্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহ্বারের সময়ে সযত্নে পরিবেষণ করে না। তার চঞ্চলতার মধ্যে শ্রী নেই, প্রৌঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে একটি স্নেহময় সুরসঙ্গ সুরগঞ্জীর মাড়ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাও তাঁর কিছুমাত্র দেখি নে।

২৫ অক্টোবর। আজ সকালবেলা স্নানের ঘর বন্ধ দেখে দরজার সামনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ বাদে বিরলকেশ পৃথুকলেবর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হস্তে উপস্থিত। ঘর খালাস হবামাত্র সেই জন-বুল অগ্নানবদনে প্রথমাগত আমাকে অতিক্রম করে ঘরে প্রবেশ করলে। প্রথমই মনে হল তাকে ঠেলে ঠুলে ঘরের মধ্যে ঢুক পড়ি, কিন্তু শারীরিক দৃঢ়তা অত্যন্ত হীন এবং রুঢ় বলে মনে হয়, বেশ স্বাভাবিকরূপে আসে না। স্মরণ্য অধিকার ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম, নব্রতা গুণটা খুব ভালো হতে পারে কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের ঊনবিংশ শতাব্দী পরেও এই পৃথিবী পক্ষে অল্পপযোগী এবং দেখতে অনেকটা ভীকৃতার মতো। এ-ক্ষেত্রে নাবার ঘরে প্রবেশ করতে যতটা জেদের ততটা সংগ্রামের দরকার ছিল না। কিন্তু প্রাতঃকালেই একটা মাংসবহুল কপিশবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু রুঢ় ব্যক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ-সম্ভাবনাটা

৬২০

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কেমন সংকোচজনক মনে হল। স্বার্থোত্তম জয়লাভ করে, বলিষ্ঠ বলে নয়, অতিমাংস-গ্রস্ত কুৎসিত বলে।

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক।

সকালে ডেক ধুয়ে গেছে, এখনো ভিজ়ে রয়েছে। দুই ধারে ডেকচেয়ার বিশৃঙ্খল-ভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। খালিপায়ে রাত-কাপড় পরা পুরুষগণ কেউ বা বন্ধু সঙ্গে কেউ একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে বেড়াচ্ছে। ক্রমে যখন আটটা বাজল এবং একটি-আধটি করে মেয়ে উপরে উঠতে লাগল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান।

স্নানের ঘরের সম্মুখে বিষম ভিড়। তিনটি মাত্র স্নানাগার; আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই।

স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণ-শীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েছে। ঘন ঘন টুপি উদ্ঘাটন করে মহিলাদের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদন করে গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মত ব্যস্ত করা গেল।

ন-টার ঘণ্টা বাজল। ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত। বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপান-পথ দিয়ে নিয়কক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট নেই কেবল সারি সারি শূন্য চৌকি উর্ধ্বমুখে প্রভুদের জন্ত প্রতীক্ষমান।

ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর। মাঝে দুই সার লম্বা টেবিল; এবং তার দুই পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ছোটো ছোটো টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করে সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিন বার ক্ষুধা নিবৃত্ত করে থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদ্রিয়ার এবং হাশ্বকৌতুক গল্পগুজবে এই অনতি-উচ্চ স্প্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং সেটা যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেছে তার ঠিক নেই।

তার পর যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু বাতাস, যেখানে একটু রোদের তেজ কম, যেখানে যার অভ্যাস সেইখানে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে সমস্ত দিনের মতো নিশ্চিন্ত।

দেখা যায় কোনো চৌকিহারা স্নানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছে,

যুরোপ-বাত্মীর ডায়ারি

৬২১

কিংবা কোনো বিপদগ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি ঝুলিষ্ট করে নিয়ে অভিগ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারছে না—তখন পুরুষগণ নারীসহায়ত্রে চৌকি-উদ্ধারকার্বে নিযুক্ত হয়ে সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জন করে থাকে।

তার পর যে বার চৌকি অধিকার করে বসে যাওয়া যায়। ধূমসেবিগণ, হুঁয় ধূম-সেবনকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাভাগে সমবেত হয়ে পরিভ্রমণে ধূমপান করছে। মেয়েরা অধীনলীন অবস্থায় কেউ বা নভেল পড়ছে, কেউ বা সেলাই করছে, মাঝে মাঝে দুই-একজন যুবক ক্ষণেকের জন্তে পাশে বসে মধুকরের মতো কানের কাছে গুন গুন করে আবার চলে যাচ্ছে।

আহার কিঞ্চিং পরিপাক হবামাত্র একদলের মধ্যে কয়েটস খেলা আরম্ভ হল। দুই বালতি পরস্পর হতে হাত দশেক দূরে স্থাপিত হল। দুই জুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে পালাক্রমে স্ব স্ব স্থান থেকে কলসীর বিড়ের মতো কতকগুলো রজ্জুচক্র বিপরীত বালতির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। যে পক্ষ সর্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। মেয়ে-খেলোয়াড়েরা কখনো জল্পোচ্ছ্বাসে কখনো নৈরাগ্রে উর্ব্বকণ্ঠে চীৎকার করে উঠছে। কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখছে, কেউ বা গণনা করছে, কেউ বা খেলায় যোগ দিচ্ছে, কেউ বা আপন আপন পড়ায় কিংবা গল্পে নিবিষ্ট।

একটার সময় আবার বণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে ফিরে এসে দুই স্তর খাণ্ডের ভায়ে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে। কেদারায় হেলান দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অধিকাংশ আনীল নয়ন নিদ্রাবিষ্ট। কেবল দুই-একজন দাঁবা, ব্যাকগ্যামন কিংবা ড্রাক্ট খেলছে এবং দুই-একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই কয়েটস খেলায় নিযুক্ত। কোনো রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখছে এবং কোনো শিল্পকুশলা কোঁতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহবাত্মীর ছবি আঁকতে চেষ্টা করছে।

ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল। তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকার্যগণ নিচে নেমে গিয়ে রুটিমাখনমিষ্টান্ন সহযোগে চা-রস পানে শরীরের জড়তা পরিহার করে পুনর্বীর ডেকে উপস্থিত। পুনর্বীর যুগলমূর্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং মৃদুমন্দ হাস্যলাপ আরম্ভ হল। কেবল দু-চার জন পাঠিকা উপভাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না, দিবাসানের স্নান স্নানালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক-নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করছে।

৬২২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দক্ষিণ আকাশে তপ্ত স্বর্ণবর্ণের প্রলেপ, তরল অগ্নির মতো জলরাশির মধ্যে সূর্য অন্তর্মিত, এবং বামে সূর্যাস্তের কিছু পূর্ব হতেই চন্দ্রোদয়ের সূচনা। জাহাজ থেকে পূর্বদিগন্ত পর্যন্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিকঝিক করছে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জলে উঠল। ছটার সময় বাজল ডিনারের প্রথম ঘণ্টা। বেশ-পরিবর্তন উপলক্ষে সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঘণ্টা। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেলি। সারি সারি নরনারী বসে গেছে। কারো বা কালো কাপড়, কারো রঙিন কাপড়, কারো বা গুদ্র বক্ষ অর্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক। গুনগুন আলাপের সঙ্গে কাঁটাচামচের টুংটাং টুংটাং শব্দ মুখরিত, এবং বিচিত্র খাত্তের পর্যায় পরিচারকদের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মতো যাতায়াত করছে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু সেবন। কোথাও বা যুবকযুবতী অঙ্ককার কোণের মধ্যে চোঁকি টেনে নিয়ে গুনগুন করছে, কোথাও বা দু-জনে জাহাজের বারান্দা ধরে ঝুঁকে পড়ে রহস্যলাপে নিমগ্ন, কোনো কোনো জুড়ি গল্প করতে করতে ডেকের আলোক ও অঙ্ককারের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে একবার দেখা দিচ্ছে একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কোথাও বা পাঁচ-সাতজন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্মচারী জটলা করে উচ্চহাস্তে প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে তুলছে। অলস পুরুষেরা কেউ বা বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা অর্ধশয়ান অবস্থায় চুরট টানছে, কেউ বা স্মোকিং সেলুনে কেউ বা নিচে খাবার ঘরে ছইন্ধি সোডা পাশে রেখে চারজনে দল বেঁধে বাজি রেখে তাস খেলছে। ওদিকে সংগীতশালায় সংগীতপ্রিয় দু-চারজনের সমাবেশে গানবাজনা এবং মাঝে মাঝে করতালি শোনা যাচ্ছে।

ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে, মেয়েরা নেবে যায়, ডেকের উপরে আলো হঠাৎ যায় নিবে, ডেক নিঃশব্দ নির্জন অঙ্ককার হয়ে আসে। চারিদিকে নিশীথের নিশ্চলতা চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ডেকের উপর মেয়েরা সমস্ত দিন তুষাতুরা হরিণীর মতো ক্লিষ্ট কাতর। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে পাখা নাড়ছে, শ্বেলিং সন্ট শুঁকছে, এবং সক্রমণ যুবকেরা যখন পাশে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করছে তখন নিম্নলিখিতপ্রায় নেত্রপল্লব দ্বয় উন্নীলন করে শ্লানহাস্তে কেবল গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা আপন সুকুমার দেহলতার একান্ত অবসন্নতা ইঙ্গিতে জানাচ্ছে। যতই পরিপূর্ণ করে টিফিন এবং লেবুর শরবৎ খাচ্ছে, ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়ছে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্বশরীর শিথিল হয়ে আসছে।

যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

৬২৩

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌঁছানো গেল।

২৯ অক্টোবর। আমাদের জাহাজে একটি পার্সি সহযাত্রী আছে। তার ছুঁচোলো ছাঁটা দাড়ি এবং বড়ো বড়ো চোখ সর্বপ্রথমই চোখে পড়ে। অল্প বয়স। নয় মাস যুরোপে বেড়িয়ে বিলিতি পোশাক এবং চালচলন ধরেছে। বলে, ইণ্ডিয়া লাইক করে না। বলে, তার যুরোপীয় বন্ধুদের (অধিকাংশই স্ত্রীবন্ধু) কাছ থেকে তিন-শ চিঠি এসে তার কাছে জমেছে, তাই নিয়ে বেচারা মহা মুশকিলে পড়েছে, কখনই বা পড়বে কখনই বা জবাব দেবে। লোকটা আবার নিজে বন্ধুত্ব করতে বড়োই নারাজ, কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনার বন্ধুত্ব তার মাথার উপরে অনাহৃত অঘাচিত বর্ষিত হতে থাকে। সে বলে বন্ধুত্ব করে কোনো 'ফান' নেই। উপরন্তু কেবল ল্যাঠা। এমন কি শত শত জার্মান ফরাসি ইটালিয়ান এবং ইংরেজ মেয়ের সঙ্গে সে 'ফ্লার্ট' করে এসেছে কিন্তু তাতে কোনো মজা পায় নি।

২ নবেম্বর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌঁছবার কথা। আজ সুন্দর সকালবেলা। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, সমুদ্র সন্দেশ তরঙ্গে নৃত্য করছে, উজ্জল রোদ উঠেছে; কেউ ক্রয়টুস্ খেলছে, কেউ নভেল পড়ছে, কেউ গল্প করছে; ম্যাজিক সেলুনে গান, স্মোকিং সেলুনে তাস, ডাইনিং সেলুনে খানার আয়োজন হচ্ছে এবং একটি সংকীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী মরছে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন সাহেবের মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

৩ নবেম্বর। সকালে অন্ত্যেষ্টি-অন্ত্যেষ্ণের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল। আজ আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে নেমে এখন আমার অদৃষ্টের সঙ্গে আর কোনো মনান্তর নেই। সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্ছে। কেবল একটা গোল বেধেছিল—টাকাকড়ি সমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে এসেছিলুম, তাতে করে সংসারের আবহাওয়ার হঠাৎ অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে এনেছি। এই ব্যাগ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মতো একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনই সাধবান করে দিলুম ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বললে, ক্ষেপেছ! আজ সকালে তাকে বৃথা ভৎসনা করেছি। নষ্টোদ্ধার করে হোটেল ফিরে এসে স্নানের পর আরাম বোধ হচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে আমার

৬২৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কটাক্ষপাত করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই।
 স্মৃতিরাত্র রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে বসা গেল, তখন যদিও আমার
 বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলের ফেলে এসেছিলুম তবু স্মৃতিস্রোতের বিশেষ ব্যাঘাত
 হয় নি।

১৩০০

গ্রন্থ-পরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, ও রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধ্যাসংগীত ১২৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে,

আমার রচিত কবিতার মধ্যে যেগুলি সন্ধ্যাসংগীত নামে উক্ত হইতে পারে, সেই গুলিই এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। ইহার অধিকাংশ কবিতাই গত দুই বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে, কেবল ‘বিষ ও স্নুধা’ নামক দীর্ঘ কবিতাটি বাল্যকালের রচনা।

‘বিষ ও স্নুধা’ কবিতাটি, এবং প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত ‘কেন গান গাই’ ও ‘কেন গান শুনাই’ কবিতা দুইটি পরবর্তী কালে বর্জিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের অন্ত কবিতাগুলি, সন্ধ্যাসংগীতের বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে (বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র, ১৩৩৪) অল্পবিস্তর খণ্ডিতভাবে মুদ্রিত আছে। এই শেষোক্ত সংস্করণ হইতে ‘ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে’ (‘সন্ধ্যা’) কবিতাটি “পুনরাবৃত্তি” বলিয়া বর্তমান রচনাবলীতে কবি বর্জন করিয়াছেন, অল্প অনেক কবিতারও কোনো কোনো অংশ বর্জিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাসংগীতের প্রথম সংস্করণে মূলগ্রন্থের ভূমিকারূপে ও গ্রন্থ “সমাপ্ত” হইবার পর, ‘উপহার’ শীর্ষক দুইটি কবিতা মুদ্রিত আছে। প্রথম ‘উপহার’ কবিতাটি বর্তমান রচনাবলীতে ‘সন্ধ্যা’ নামে, এবং দ্বিতীয়টি ‘উপহার’ নামেই মুদ্রিত আছে। দ্বিতীয়টিকেই এই গ্রন্থের উপহার বা উৎসর্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৬২৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

১৯১৫ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের (ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

সন্ধ্যাসংগীতের পূর্ববর্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যাসংগীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা আরম্ভ তো আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়।

সন্ধ্যাসংগীত হইতেই আমার কাব্যশ্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে—গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে। তখন শক্তি অল্প, বাধা বিস্তর, নিজের কাব্যরূপকে তখনো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভালোমন্দ বিচার করিবার কোনো আদর্শ মনের মধ্যে ছিল না। তাহা ছাড়া, প্রথম রচনার সর্ব্বলের চেয়ে মস্ত দোষ এই যে তাহার মধ্যে সত্যের অভাব থাকে। কেননা সত্যকে মানুষ ক্রমে ক্রমে পায়—অথচ সত্যকে পাইবার পূর্বেই তাহার কর্ম আরম্ভ হইয়া থাকে; সেই কর্মের মধ্যে আবর্জনার ভাগই বেশি থাকে।

মানুষের জীবন তাহার প্রতিদিনের আবর্জনা প্রতিদিন মোচন করিয়া তাহা মার্জনা করিয়া চলে। যুবা আপনার শৈশবের হামাগুড়িকে জমাইয়া রাখে না। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্য-ভাণ্ডারে আবর্জনাগুলোকে একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায় না। যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে বিদায় করা কঠিন।

অতএব সন্ধ্যাসংগীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল। ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সেজন্ত ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রভাতসংগীত

প্রভাতসংগীত ১৯২০ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে,

প্রভাতসংগীত প্রকাশিত হইল। ‘অভিমানিনী নির্বারিণী’ নামক কবিতাটি আমার লিখিত নহে। ‘নির্ব্বরের স্বপ্নভঙ্গ’ রচিত হইলে পর আমার কোনো শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাহারই প্রসঙ্গক্রমে ‘অভিমানিনী নির্বারিণী’

রচনা করেন। উভয় কবিতাই ভারতীতে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন না করিয়া দুটিকেই একত্রে রক্ষা করিলাম।

‘শরতে প্রকৃতি’, ‘শীত’, ও ‘শুটিকতক অল্পবাদ ব্যতীত প্রভাত-সংগীতের আর সমুদয় কবিতাগুলিই সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে।

‘অভিমানিনী’ নির্ঝরিনী’ কবিতাটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার “বাল্যকালে কাব্যালোচনার মন্ত এক জন অল্পকূল স্তম্ভদ” অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছেন।

‘অভিমানিনী নির্ঝরিনী’, শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে লিখিত ‘স্নেহ-উপহার’ এবং ‘শরতে প্রকৃতি’ ও ‘শীত’, প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত এই কয়টি কবিতা পরবর্তী কালে বর্জিত হইয়াছে (‘শীত’ কবিতাটি শিশুতে খণ্ডিত ভাবে সংকলিত হইয়াছে)। প্রথম সংস্করণের অগ্র কবিতাগুলি প্রভাতসংগীতের বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫) মুদ্রিত আছে। এই শেষোক্ত সংস্করণ হইতে ‘কবি’, ‘বিসর্জন’, ‘তারা ও আঁধার’, ‘স্বপ্ন ও ফুল’ (চারিটিই ভিক্টর হুগোর অল্পবাদ) ও ‘সন্মিলন’ (শেলির অল্পবাদ) বর্তমান রচনাবলীতে বর্জিত হইয়াছে। অগ্র কোনো কোনো কবিতারও অল্পবিস্তর পরিবর্তন কবি রচনাবলীতে করিয়াছেন।

ছবি ও গান

ছবি ও গান ১২৯০ সালের ফাল্গুনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে,

এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোটো ছোটো কবিতাগুলি গত বৎসরে লিখিত হয়—কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

ছন্দের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই পুস্তকের কোনো কোনো গানে ছন্দ নাই বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে-সকল পাঠকের কান আছে, তাহারা ছন্দ খুঁজিয়া লইবেন, দেখিতে পাইবেন বাঁধাবাঁধি ছন্দ অপেক্ষা তাহা শুনিতে মধুর;—হসন্ত বর্ণকে অকারান্ত করিয়া পড়িলে কোন কোন স্থলে ছন্দের ব্যাঘাত হইবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লিখিত একটি পত্রে (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথ ছবি ও গান সম্বন্ধে লিখিতেছেন,

৬২৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আমার ছবি ও গান আমি যে কী মাতাল হয়ে লিখেছিলুম,
...আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলাম। আমার সমস্ত বাহুলক্ষণে
এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে, তখন যদি তোমরা আমাকে
প্রথম দেখতে তো মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের খেপামি দেখিয়ে
বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ
বন্টার মতো এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্ছি,
আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা বাতাসের হিল্লোলে একরাত্রির মধ্যে
কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু
ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল
না। তোমাদেরও বোধ হয় এ রকম অবস্থা হয়—

“উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ

উদাস পরান কোথা নিরুদ্দেশ,

হাতে লয়ে বাঁশি, মুখে লয়ে হাসি,

ভ্রমিতেছি আনমনে—

চারিদিকে মোর বসন্ত হাসিত,

যৌবনমুকুল প্রাণে বিকশিত,

সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া

রটিতেছে বনে বনে।

সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার
হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। ছবি ও গান পড়তে পড়তে আমার মন
যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।

ছবি ও গানের প্রথম সংস্করণের প্রথম ও শেষ কবিতা দুইটি (‘আজু সখি মুহু মুহু’
ও ‘মরণ রে তুঁহঁ মম শ্রাম সমান’) পরে ভানুসিংহের পদাবলীর অন্তর্গত হইয়াছে।
প্রথম সংস্করণের অন্ত্র কবিতাগুলি ছবি ও গানের বর্তমানে প্রচলিত স্বতন্ত্র সংস্করণে
(আখিনি, ১৩৩৫) মুদ্রিত আছে। এই শেষোক্ত সংস্করণ হইতে ‘দীপ্ত দীপ্ত প্রভাত
হল’ (‘বিরহ’) কবিতাটি বর্তমান রচনাবলীতে বর্জিত ও অন্ত্রগুলি গৃহীত হইয়াছে।

ছবি ও গানের ‘রাহুর প্রেম’ কবিতাটি সঙ্কল্পিতায় বহুলাংশে পরিবর্তিত
হইয়াছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

৬২৯

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রকৃতির প্রতিশোধ ১২৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রকৃতির প্রতিশোধের বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে (ভাদ্র, ১৩৩৫) প্রথম সংস্করণের চতুর্দশ দৃশ্যটি নাই। ইহা ছাড়াও অনেক অংশ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হইয়াছে। রচনাবলীতে বর্তমান সংস্করণই অল্পস্বত হইয়াছে। প্রকৃতির প্রতিশোধের সমসাময়িক আলোচনা গ্রন্থে কবি প্রকৃতির প্রতিশোধের অন্তর্নিহিত ভাবটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচনা গ্রন্থ এখন অপ্রচলিত। জীবনস্মৃতিতে এ-সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,

আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গল্প প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্ববিশেষে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কি না, এবং কাব্যবিশেষে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর স্থান কি তাহা জানি না কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

বঙ্গভাষার লেখক (১৯১১) গ্রন্থে প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

আমি বালকবয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিয়াছিলাম...তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।

বাল্মীকি-প্রতিভা

বাল্মীকি-প্রতিভা ১২৮৭ সালের ফাল্গুনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১২৯২ সালের ফাল্গুনে প্রকাশিত "দ্বিতীয় সংস্করণে" দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিত আছে,

অনেকগুলি গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে
কাল-মৃগয়া গীতিনাট্য হইতে গৃহীত।

কাল-মৃগয়ার অনেকটা অংশ বান্ধীকি-প্রতিভায় গৃহীত হইয়াছে বলিয়া
কাল-মৃগয়া পরে আর ছাপানো হয় নাই, এ-কথা জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত আছে।

কাল-মৃগয়া হইতে নিম্নোক্ত গানগুলি বান্ধীকি-প্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণে অংশত,
পরিবর্তিত অথবা বিশুদ্ধ আকারে গৃহীত হয় :

আঃ বেঁচেছি এখন ; এনেছি মোরা এনেছি মোরা ; রিম রিম ঘন ঘন রে বরষে ;
এই বেলা সবে মিলে চল হো ; গহনে গহনে যা রে তোরা ; চল্ চল্ ভাই স্বরা করে
মোরা আগে যাই ; কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে ; প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে ;
সদার মশায় দেবি না সয় ; কাজ কী খেয়ে তোফা আছি।

দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের কোনো কোনো গান বর্জিত হয় ও নিম্নোক্ত
গানগুলি নূতন সন্নিবিষ্ট হয় :

সহে না সহে না কঁাদে পরান ; ঐ মেঘ করে গগনে ; মরি ও কাহার বাছা ; ছাড়ব
না ভাই ছাড়ব না ; এত রক্ত শিখেছ কোথায় ; রাঙাপদ পদ্মযুগে ; কী দোষে বাঁধিলে
আমায় ; রাজা মহারাজা কে জানে ; আছে তোমার বিচ্ছেদাশি জ্ঞান ; আঃ কাজ
কী গোলমালে ; অহো আম্পর্ধা এ কী তোদের ; আয় মা আমার সাথে ; ক্রোধায়
জুড়াতে আছে ঠাই ; কেন রাজা ডাকিস কেন ; বলব কী আর বলব খুড়ো ; রাখ
রাখ্ ফেল্ ধর ; দেখ্ দেখ্ দুটো পাখি ; নমি নমি ভারতী ; শ্রামা, এবার ছেড়ে
চলেছি মা ; বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী।

বান্ধীকি-প্রতিভার (প্রথম এবং) দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থশেষে সরস্বতীর
'আশীর্বাদের পূর্বে বান্ধীকির একটি সরস্বতী-বন্দনা ছিল ('হৃদয়ে রাখ গো দেবি')।
বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে (গীতবিতান, প্রথম খণ্ড, আশ্বিন, ১৩৩৮) তাহা নাই।
সামান্য আরও দু-একটি পরিবর্তন ব্যতীত, বর্তমান সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণের অনুরূপ।
রচনাবলীতে গীতবিতান অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, দু-এক স্থানে সামান্য পরিবর্তন আছে।

বান্ধীকি-প্রতিভার দ্বিতীয় (১২০২) সংস্করণকে, প্রথম সংস্করণ বান্ধীকি-প্রতিভা
ও কাল-মৃগয়ার যোগে পুনর্লিখিত গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা অসংগত নহে। এইজগৎ
বর্তমান রচনাবলীর গ্রন্থাক্রমে ইহাকে প্রকৃতির প্রতিশোধের পরে বসানো হইয়াছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

৬৩১

মায়ার খেলা

মায়ার খেলা ১২২৫ সালের অগ্রহায়ণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ও তাহার সহিত মুদ্রিত নাট্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা পাঠকের সহায়তরির জন্য বর্তমান রচনাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হইল। এগুলি বর্তমান সংস্করণে ছিল না।

প্রথম সংস্করণে বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, “আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিংকর গল্প নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিং সাদৃশ্য আছে।” এই গল্প নাটিকা “নলিনী” (১২২১)।

আয়ার খেলার প্রথম সংস্করণ ও বর্তমান সংস্করণে (গীতবিতান, প্রথম খণ্ড, আখিন, ১৩৩৮) প্রভেদ সামান্য। বর্তমান রচনাবলীতে মায়ার খেলা গীতবিতান অনুযায়ী মুদ্রিত হইয়াছে, দু-এক স্থানে পরিবর্তন আছে।

রাজা ও রানী

রাজা ও রানী ১২২৬ সালের শ্রাবণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ও বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের (বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ, ১৩৩৪) কতকগুলি প্রভেদ সাধারণ ভাবে নির্দেশ করা গেল। স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন ব্যতীত, বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণই রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রথম সংস্করণের প্রথম অঙ্কে পঞ্চম দৃশ্যে “নারায়ণী। মিছে না। ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই।” (রচনাবলী, পৃ. ২৭২)—এই ছত্রের পর অতিথির প্রবেশ, ও অতিথি (রামচরণ), নারায়ণী ও দেবদত্তের কথোপকথন ছিল। ইহা বর্তমানে নাই।

বর্তমানে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষে যে ত্রিবেদীর প্রবেশ ও উক্তি আছে, (রচনাবলী, পৃ. ২২৮) প্রথম সংস্করণে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃশ্য (দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য) ছিল।

প্রথম সংস্করণের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য ছিল, জালন্ধর রণক্ষেত্রে বিক্রমদেবের শিবিরদ্বারে স্মিত্রা ও সেনাপতির কথোপকথন। শিবিরপ্রবেশার্থিনী স্মিত্রাকে সেনাপতি বাধা দিতেছেন, ইহাই এই দৃশ্যে বর্ণিত ছিল। এই দৃশ্য বর্তমান সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য ছিল কাশ্মীর প্রাসাদে রেবতী, যুধাজিৎ, গ্রহরী ও চন্দ্রসেনের কথোপকথন। কুমারকে বন্দী করিবার উত্তম রেবতী যুধাজিৎকে

৬৩২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দুঃস্থেজিত করিতেছেন, ইহাই এই দৃশ্যের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়। এই দৃশ্য বর্তমান সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণের পঞ্চম অঙ্কের দশম দৃশ্য ছিল, কাশ্মীরে বৃদ্ধ, করমটাঁদ, হুম্মন্ত ও অগ্নাতের কথোপকথন। কুমার কাশ্মীরে ফিরিয়া আসিবেন, বিক্রমজিৎ স্বয়ং তাঁহাকে রাজ্যটিকা প্রদাইবেন, এইরূপ সংবাদ শুনিয়া জ্বীপুরুষ-সাধারণের আনন্দ প্রকাশ ও উৎসবের আয়োজন এই দৃশ্যে বর্ণিত আছে। এই দৃশ্য বর্তমান সংস্করণে নাই।

ইহা ছাড়া অগ্নাত দৃশ্যও মাঝে মাঝে অংশবিশেষ পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে।

রাজা ও রানীর কাহিনী লইয়া কবি পরবর্তীকালে গল্পনাট্য “তপতী” (১৩৭৬) রচনা করেন। তপতীর ভূমিকায় তিনি রাজা ও রানীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

“রাজা ও রানী আমার অল্প বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা।

“সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটি বিরোধ আছে—সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে-প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহণ করবার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটাই রাজা ও রানীর মূলকথা।

“রচনার দোষে এই ভাবটি পরিস্ফুট হয় নি। কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার দ্বারা নাটককে বাধা দিয়াছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে-অসংগত প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত। এই নাটকের অন্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বারা চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—এই মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নয়।

“অনেকদিন ধরে রাজা ও রানীর ক্রটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগনেন্দ্র যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদ্যোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নূতন করে না লিখলে এর সদগতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমতো দায়িত্ব শোধ করেছি।”

গ্রন্থ-পরিচয়

৬৩৩

তপতী রচনার কিছুদিন পূর্বে রাজা ও রানী অভিনয়ের জ্ঞান সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করিবার কথা কবি যে উল্লেখ করিয়াছেন সেই অভিনয় (১৯২৯) সংস্করণের নাম ছিল “ভৈরবের বলি”। ভৈরবের বলির অভিনয়পত্রীতে উহাকে “রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানীর কবি-কৃত নূতন সংস্করণ” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সংক্ষেপণ ও পরিবর্তন পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে, রাজা ও রানীর কোনো সংস্করণেঙ্গম্নিবিষ্ট হয় নাই।

বউ-ঠাকুরানীর হাট

বউ-ঠাকুরানীর হাট ১২৮৯ সালের পৌষে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রচনাবলীতে বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণের (শ্রাবণ, ১৩৩৯) পাঠ অল্পমত হইয়াছে। প্রথম ও বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণের কতকগুলি সাধারণ প্রভেদ নির্দেশ করা গেল।

প্রথম সংস্করণের প্রথম পরিচ্ছেদ বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে নাই; কাহিনীটির শেষ দৃশ্যের এক অংশ প্রথম পরিচ্ছেদেই নিবদ্ধ করা হইয়াছিল; তাহা চত্বারিংশ পরিচ্ছেদেও ভাবান্তরে লিপিবদ্ধ ছিল।

প্রথম সংস্করণের সপ্তদশ পরিচ্ছেদ বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণে নাই।

প্রথম সংস্করণের ষড়বিংশ পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ পূর্বতন (প্রথম সংস্করণ, ২৫শ; বর্তমান সংস্করণ, ২৩শ) পরিচ্ছেদের শেষে যুক্ত হইয়াছে, অবশিষ্ট অংশ বর্জিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অনেক অংশ পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে।

বউ-ঠাকুরানীর হাটের কাহিনী অবলম্বনে কবি “প্রায়শ্চিত্ত” (১৩১৬) নাটক রচনা করেন; “প্রায়শ্চিত্ত” পরে “পরিজ্ঞান” (১৩৩৬) নামে পুনর্লিখিত হয়।

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র

যুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১২৮৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের ভূমিকায় লিখিত আছে,

“বন্ধুদের দ্বারা অল্পক্ষণ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল;—কারণ কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতীয় উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে, আর কোনো উপকার হউক

বা না হউক একজন বাঙালী ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।

“আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনদের সহিত মুখামুখী একপ্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর-একপ্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসংগত বলিয়া বোধ হয়।

“পূজ্ঞনীয় ভারতীয় সম্পাদক মহাশয় আমার পত্রের উত্তরে তাঁহার যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও পুস্তকে নিবিষ্ট হইল। সকল বিষয়েরই দুই পক্ষ আছে। উভয় পক্ষই পাঠকদের দেখা আবশ্যক।”.....

এই গ্রন্থের প্রকাশ কবি পরে আর ইচ্ছা করেন নাই, এইজন্ত বহুকাল ইহা গ্রন্থাকারে প্রচারিত ছিল না। বহুকাল পরে “পাশ্চাত্য ভ্রমণ” (আশ্বিন, ১৩৪৩) গ্রন্থে পরিবর্তিত রূপে ইহা যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারির দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত প্রকাশিত হয়। বর্তমান রচনাবলীতে পাশ্চাত্য ভ্রমণের পাঠ অনুল্লভ হইয়াছে। যুরোপ-প্রবাসীর পত্র পুনঃপ্রকাশে কবির অনভিপ্রায় ও পরে স্বীকৃতির কারণ তিনি পাশ্চাত্য ভ্রমণের ভূমিকায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, প্রথম সংস্করণের ভূমিকার প্রথম কয় ছত্রেও সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে। পাশ্চাত্য ভ্রমণের ভূমিকাটিও বর্তমান রচনাবলীতে প্রকাশিত হইল।

যুরোপ-প্রবাসীর পত্রগুলি যখন ভারতীতে প্রকাশিত হয়, তখন ভারতী-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ পত্রগুলির কোনো কোনোটিতে প্রকাশিত মন্তব্যের বিশেষ সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রগুলিতে “ইঙ্গবর্জ”দের সম্বন্ধে যেমন বঠিন সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, বিলাতের ধনীসমাজের মহিলাদের “বিলাসিনী” শ্রেণীর সম্বন্ধে যেমন পরিহাস করিয়াছিলেন, বিদেশের তুলনায় দেশের সামাজিক রীতি ও প্রথার (বিশেষত জ্ঞানস্বাধীনতার অভাব ও গুরুজনের সহিত ব্যবহারের প্রচলিত রীতির) সম্বন্ধেও তেমনই বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতী-সম্পাদক দেশীয় প্রথা ও রীতির সমর্থন ও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া টিপ্পনী প্রকাশ করেন, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী পত্রে তাহার উত্তর দেন। এইরূপে বাদপ্রতিবাদ চলিয়াছিল। প্রথম সংস্করণেও তাহা মুদ্রিত আছে। পাশ্চাত্য ভ্রমণে এই বাদপ্রতিবাদ সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের ষষ্ঠ পত্রের অংশ, সপ্তম পত্র, নবম পত্র ও দশম পত্র, এবং তৎসহ ভারতী-সম্পাদকের মন্তব্যগুলিও পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্য পত্রগুলিরও অনেক অংশ বর্জিত হইয়াছে।

ইউরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

ইউরোপ-যাত্রীর ডায়ারি প্রথমে দুই খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল (বৈশাখ, ১২৯৮; আশ্বিন, ১৩০০)। ইহার প্রথম খণ্ড “ভূমিকা”, তাহাতে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি, জীবন-দর্শন প্রভৃতির তুলনা ও আলোচনা আছে, ভ্রমণবৃত্তান্ত নাই। দ্বিতীয় খণ্ড ভ্রমণের ডায়ারি।

ইউরোপ-যাত্রীর ডায়ারির কোনো খণ্ডই পরবর্তী কালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত ছিল না। প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশ “স্বদেশ” গ্রন্থে ‘নূতন ও পুরাতন’ নামে, ও দ্বিতীয় অংশ “সমাজ” গ্রন্থে ‘প্রাচ্য ও প্রতীচ্য’ নামে প্রবন্ধাকারে সংকলিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ড “বিচিত্র প্রবন্ধ” গ্রন্থে ‘ইউরোপ-যাত্রী’ নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডটি পরে পাশ্চাত্য ভ্রমণে ইউরোপ-প্রবাসীর পত্রের সহিত মুদ্রিত হয়। রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে এই দ্বিতীয় খণ্ডটি পাশ্চাত্য ভ্রমণের পাঠ অল্পসারে মুদ্রিত হইল।

কবির ব্যাখ্যান

রবীন্দ্রনাথ বহু পত্রে, প্রবন্ধে ও ভাষণে স্বীয় রচনার আলোচনা করিয়াছেন। তাহার রচনার মর্মগ্রহণের পক্ষে সেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই আলোচনার কতকগুলি কোনো কোনো গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। কতকগুলি গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমান রচনাবলীতেও সেগুলি সেইভাবে মুদ্রিত হইবে। অল্পগুলি পাঠকের সহায়তার জন্য একত্র সংগৃহীত হইয়া পরিশিষ্ট খণ্ডে মুদ্রিত হইবে।

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বান্ধীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, ও ইউরোপ প্রবাসীর পত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত আলোচনা জীবনস্মৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে। ইউরোপ-প্রবাসীর পত্রে বর্ণিত অনেক ব্যক্তির চরিত্র-চিত্র পূর্ণতর ভাবে জীবনস্মৃতিতে লিখিত আছে; বউ-ঠাকুরানীর হাট উপস্থাসের উল্লেখ জীবনস্মৃতিতে আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা-বক্তৃতা “মানুষের ধর্ম” (১৯৩৩) গ্রন্থের পরিশিষ্টে ‘মানব সত্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রভাতসংগীতের অনেক কবিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কোনো কোনো আলোচনা প্রয়োজনবোধে গ্রন্থ-পরিচয়ে অংশত সংকলিত হইল।

বর্তমান রচনাবলীতে বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা ও স্মৃতিগুলি রচনাবলীর জন্য কবিকর্তৃক নূতন লিখিত।

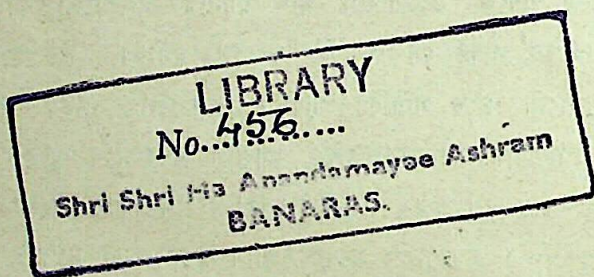
৬৩৬

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বিবিধ

প্রথম সংস্করণের উৎসর্গপত্রগুলি অনেক গ্রন্থে পরবর্তী সংস্করণে বর্জিত হইয়াছিল। রচনাবলীতে সেগুলি পুনঃসংকলিত হইল। একটি উৎসর্গের কবিতা-অংশ বর্জনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশের কাল অল্পসারে “চিঠিপত্র” (বর্তমানে “সমাজ” গ্রন্থের অন্তর্গত) যুরোপ-প্রবাসীর পত্রের পরেই ছাপা উচিত ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য ভ্রমণ গ্রন্থে যুরোপ-প্রবাসীর পত্র ও যুরোপ-বাত্রীর ডায়ারি (দ্বিতীয় খণ্ড) একই ভূমিকায় কবি আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া, ও ঐ ভূমিকাটি বর্তমান রচনাবলীতেও রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে হইয়াছে বলিয়া, যুরোপ-প্রবাসীর পত্র ও যুরোপ-বাত্রীর ডায়ারি (দ্বিতীয় খণ্ড) পর পর এই রচনাবলীতে মুদ্রিত হইল; “চিঠিপত্র” রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইবে।



বর্ণানুক্রমিক সূচী

অধিক করি না আশা কিসের বিষাদ	...	...	৬৫
অনন্ত জীবন	...	...	৬৫
অনন্ত মরণ	...	...	৬৮
অনুগ্রহ	...	...	২২
অবশ নয়ন নিমৌলিয়া	...	...	১১
অভিমানিনী	...	...	১৫১
অগ্নি প্রতিধ্বনি, বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি	..	..	৭৬
অগ্নি সন্ধ্যা, অনন্ত আকাশতলে	...	...	১
অরুণময়ী তরুণী উষা	...	...	২৬
অলি বার বার ফিরে যায়	...	...	২৫০
অসহ ভালোবাসা	...	...	১২
অহো আম্পর্ধা এ কী তোদের নরাধম	...	...	২১৫
আঃ কাজ কী গোলমালে	...	...	২১৪
আঃ বেঁচেছি এখন	...	...	২০৭
আচ্ছন্ন	...	...	১৩৫
আছে তোমার বিচ্ছেদ সাধি জানা	...	...	২১৪
আজ আমি কথা কহিব না	...	...	১০১
আজ একেলা বসিয়া আকাশে চাহিয়া	...	...	১০৭
আজ কিছু করব না আর	...	...	১৩১
আজকে তবে মিলে সবে	...	...	২০৮
আজি এ প্রভাতে প্রভাত-বিহগ	...	...	৫৬
আদরিণী	...	...	১১৪

৬৩৮

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে	...	...	১২৪
আবছায়া	...	...	১৩৩
আবার	...	...	২৬৬
আমার পরান যাহা চায়	...	...	২৩৩
আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে	...	...	১০৫
আমি কারেও বুঝি নে	...	...	২৫১
আমি জেনে শুনে	...	...	২৬৩
আমি তো বুঝিছি সব	...	...	২৫৫
আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি	...	...	৩৪৩
আমি-হারা	...	...	৩৯
আমি হৃদয়ের কথা	...	...	২৪৫
আয় দুঃখ, আয় তুই	...	...	১৫
আয় মা আমার সাথে	...	...	২১৬
আয় কেন, আয় কেন	...	...	২৫৫
আয় না আয় না এখানে আয় না	...	...	২২০
আয়ন্তিছে শীতকাল পড়িছে নীহার-জাল	...	...	৩২
আরে কী এত ভাবনা	...	...	২১৩
আর্তস্বর	...	...	১২৯
আশার নৈরাশ	...	...	৮
আহা আজি এ বসন্তে	...	...	২৫৪
আহ্বানসংগীত	...	...	৫১
উপহার	...	...	৪৪
এই বেলা সবে মিলে চল হো চল হো	...	...	২১৭
এই যে জগৎ হেরি আমি	...	...	২২
এই যে হেরি গো দেবী আমারি	...	...	২২৪
একটি মেয়ে একেলা সাঁঝের বেলা	...	...	১১২
একটুখানি সোনার বিন্দু একটুখানি মুখ	...	...	১১৪
এক ভোরে বাঁধা আছি	...	...	২০৮
একলা ঘরে বসে আছি	...	...	১২৮
একাকিনী	...	...	১১২

বর্ণানুক্রমিক সূচী

৬৩৯

এ কী এ এ কী এ স্থির চপলা	...	...	২২২
এ কী এ ঘোর বন	...	...	২১০
এ কেমন হল আমার মন	...	...	২১২
এখন করব কী বল	...	...	২০৯
এত দিন বুঝি নাই	...	...	২৫৫
এত রঙ্গ শিখেছি কোথায়	...	...	২১৫
এ তো খেলা নয়	...	...	২৪৫
এনেছি মোরা এনেছি মোরা	...	...	২০৮
এ ভাঙা স্নেহের মাঝে	...	...	২৫৫
এমন ক-দিন কাটে আর	...	...	২০
এরা পরকে আপন করে	...	...	৩০৯
এরা স্নেহের লাগি	...	...	২৫৭
এস এস বসন্ত ধরাতলে	...	...	২৫২
এসেছি গো এসেছি	...	...	২৩৭
ঐ আঁখি রে	...	...	৩০৩
ঐ কে আমার ফিরে ডাকে	...	...	২৫০
ঐ বুঝি বাঁশি বাজে	...	...	৩১৬
ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে	...	...	২১০
ও আমার অভিমানী মেয়ে	...	...	১৫১
ওই কে গো হেসে চায়	...	...	২৪১
ওই জানালার কাছে বসে আছে	...	...	১০৬
ওই মধুর মুখ জাগে মনে	...	...	২৪৬
ও কী সুরে গান গাং হৃদয় আমার	...	...	১৩
ওকে বল সখী বল	...	...	২৩৭
ওকে বোঝা গেল না	...	...	২৪৩
ওগো দেখি আঁখি ভুলে চাও	...	...	২৪২
ওগো সখী, দেখি, মন	...	...	২৪৫
ওরে আশা কেন তোর হেন	...	...	৮
ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট	...	...	৫১
ওলো রেখে দে সখী	...	...	২৩১

কথা কোস নে লো রাই	...	...	১৭২
কাছে আছে দেখিতে না পাও	...	...	২৩২
কাছে ছিলে দূরে গেলে	...	...	২৪২
কালী কালী কালী বলো রে আজ	...	...	২১০
কিসের ইরব কোলাহল	...	...	৭০
কী দোষে বাধিলে আমার	...	...	২১২
কী বলিলু আমি	...	...	২২২
কে ?	...	...	১০৫
কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে	...	...	২১৮
কে ডাকে ! আমি কভু	...	...	২৩৬
কেন এলি রে	...	...	২৫৬
কেন গো আপন মনে	...	...	২২৩
কেন রাজা ডাকিস কেন এসেছি সবে	...	...	২১৭
কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে	...	...	৬৮
কোথায় জুড়াতে আছে ঠাই	...	...	২১৬
কোথায় সে উষ্মায়ী প্রতিমা	...	...	২২৩
কোথা লুকাইলে	...	...	২২৩
খেলা	...	...	১১৬
গহনে গহনে যা রে তোরা	...	...	২১৭
গান আরম্ভ	...	...	৩
গান সমাপন	...	...	৪৩
গ্রামে	...	...	১১৩
ঘুম	...	...	১১৮
ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন	...	...	১৭
ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি	...	...	১১৮
চল্ চল্ ভাই, ত্বর্য করে	...	...	২১৮
চলে গেল, আর কিছু নাহি কহিবার	...	...	২
চাঁদ হাসো হাসো	...	...	২৫৫
চারিদিকে কেহ নাই, একা ভাঙা বাড়ি	...	...	১৫০
চারিদিকে খেলিতেছে মেঘ	...	...	৩

বর্ণানুক্রমিক সূচী

৬৪১

চেয়ে আছে আকাশের পানে	...	...	১২১
চেয়ে থাক।	...	...	২৩
ছাড়ব না ভাই ছাড়ব না ভাই	...	...	১১৩
ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা	...	...	১১৬
জগৎ-শ্রোতে ভেসে চলো	...	...	২২
জগতের বাতাস করুণা	...	...	২২
জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখি নি আর	...	...	৪৩
জন্মেছি নিশীথে আমি তারার আলোকে	...	...	১৫২
জাগ্রতস্বপ্ন	...	...	১০৭
জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত	...	...	২৫২
জীবনের কিছু হল না, হায়	...	...	২২১
জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে	...	...	৬
ঝিকিমিকি বেলা গাছের ছায়া কাঁপে জলে	...	...	১১০
তবে সুখে থাকো সুখে থাকো	...	...	২৪৮
তারকার আশ্রয়ত্যা	...	...	৬
তারা সেই ধীরে ধীরে আসিত	...	...	১৩৩
তারে কেমনে ধরিবে	...	...	২৪৬
তারে দেখাতে পারিনে	...	...	২৩৮
তুমি কে গো, সখীরে কেন	...	...	২৪৭
তুমি কেন আসিলে হেথায়	...	...	২৬
ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে	...	...	২০২
থাম্ থাম্ কী করিবি বিধি	...	...	২২১
দিবস রজনী আমি যেন কার	...	...	২৪৩
দুই দিন	...	...	৩২
দুঃখ আবাহন	...	...	১৫
দুখের মিলন টুটিবার নয়	...	...	২৫৬
দূরে দাঁড়ায়ে আছে	...	...	২৪১
দেখো দেখো দুটো পাখি বসেছে গাছে	...	...	২২১
দেখো চেয়ে দেখো ঐ	...	...	২৪০
দেখো ভুল করে	...	...	২৪২

৬৪২

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দেখো হে ঠাকুর বলি এনেছি মোরা	...	...	২১২
দে লো সখী দে	...	...	২৩৪
দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য 'পরি	...	...	৮২
দৌল	...	...	১১০
নবীন প্রভাতে কনককিরণে	...	...	১১৩
নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে	...	...	২২২
না বুঝে কারে তুমি	...	...	২৫১
নিমেষের তরে শরমে বাধিল	...	...	২৪৫
নিষে আয় রূপাণ	...	...	২১২
নির্ব্বারের স্বপ্নভঙ্গ	...	...	৫৬
নিশীথ চেতনা	...	...	১৫৮
নিশীথ জগৎ	...	...	১৫২
পথ ভুলেছি সত্যি বটে	...	...	২১১
পথহারা তুমি পথিক যেন গো	...	...	২৩২
পরাজয়সংগীত	...	...	৩৪
পরিত্যক্ত	...	...	৯
পশ্চিমে ডুবেছে ইন্দু	...	...	১২৩
পাগল	...	...	১২৪
পাষাণী	...	...	২২
পুনর্মিলন	...	...	৭০
'পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি সমস্ত গগন	...	...	৮০
পূর্ণিমায়	...	...	১৪৮
পোড়ো বাড়ি	...	...	১৫০
প্রতিধ্বনি	...	...	৭৬
প্রভাত উৎসব	...	...	৬২
প্রভাত হইল নিশি	...	...	২৫১
প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে	...	...	২১২
প্রিয়ে তোমার ঢেঁকি হলে	...	...	১৭২
প্রেম-পাশে ধরা পড়েছে হৃ-জনে	...	...	২৪২
প্রেমের কাঁদ পাতা ভুবনে	...	...	২৩৬

বর্ণানুক্রমিক সূচী

৬৪৩

বধু তোমায় করব রাজা	...	...	৬৪২
বনে এমন ফুল ফুটেছে	...	...	১৮৩
বলব কী আর বলব খুড়ো	...	...	২১২
বাজিবে সখী বাঁশি বাজিবে	...	...	৩১
বাণী বাঁণাপাণি করুণাময়ী	...	...	২২৪
বাদল	...	...	১২৮
বিদায়	...	...	১১২
বিদায় করেছে যারে	...	...	২৫০
বুঝি বেলা বহে যায়	...	...	১৭২
বুঝি রে চাঁদের কিরণ পান করে ওর	...	...	১২৬
বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি	...	...	১২
ব্যাকুল হয়ে বনে বনে	...	...	২১৩
ভালো করে বুঝিলি নে হল তোরি পরাজয়	...	...	৩৪
ভালোবেসে দুখ সেও সুখ	...	...	২৪১
ভালোবেসে যদি সুখ নাহি	...	...	২৬২
ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে	...	...	১৭৩
ভুল করেছিছ	...	...	২৪২
ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা এক দিন	...	...	৪৪
মধুর বসন্ত এসেছে	...	...	২৫৩
মধ্যাহ্নে	...	...	১৪৪
মনেতে সাধ যেদিকে চাই	...	...	৯৩
মরি ও কাহার বাছা	...	...	২১১
মরি লো মরি	...	...	১৮৫
মহাস্বপ্ন	...	...	৮০
মাতাল	...	...	১২৬
মিছে ঘুরি এ জগতে	...	...	২৩৮
মেঘেরা চলে চলে যায়	...	...	১৮৮
মোরা জলে স্থলে কত ছলে	...	...	২৩১
যদি আসে তবে কেন যেতে চায়	...	...	৩০৭
যদি কেহ নাহি চায়	...	...	২৫৬

যমের ছুরোর খোলা পেয়ে	...	...	৩৩৮
যাই যাই ডুবে যাই	...	...	১৪৮
যেয়ো না যেয়ো না কিরে	...	...	২৫৬
যোগী	...	...	১২৩
যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে	...	...	১৮৬
রাখ রাখ ফেলু খহু	...	...	২২০
রাঙাপদ-পদ্ম-যুগে প্রণমি গো ভবদারা	...	...	২১১
রাজা মহারাজা কে জানে	...	...	২১৪
রাহুর প্রেম	...	...	১৪০
রিম্ রিম্ ঘন ঘন রে বরিষে	...	...	২১৬
লতার লাবণ্য যেন	...	...	১৩৫
শাস্তি-গীত	...	...	১৭
শিশির	...	...	৩৫
শিশির কাদিয়া শুধু বলে	...	...	৩৫
শুনেছি আমারে ভালো লাগে না	...	...	১৪০
শোন্ তোরা তবে শোন্	...	...	২০২
শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ	...	...	২১৩
শ্রামা এবার ছেড়ে চলেছি মা	...	...	২২৩
শ্রাবণে গভীর নিশি	...	...	১২২
সংগ্রামসংগীত	...	...	৩৭
সকল হৃদয় দিয়ে	...	...	২৪৭
সখা আপন মন নিয়ে	...	...	২৩৮
সখী বহে গেল বেলা	...	...	২৩৫
সখী, সাধ করে যাহা দেবে	...	...	২৪৪
সখী সে গেল কোথায়	...	...	২৩৪
সন্ধ্যা	...	...	১
সমাপন	...	...	১০১
সদীর মশায় দেয় না সন্	...	...	২১২
সহে না সহে না কান্দে পরান	...	...	২০৭
সাধ	...	...	২৬

বর্ণানুক্রমিক সূচী

৩৪৫

সুখস্বপ্ন	...	...	১০৬
সুখে আছি সুখে আছি	...	...	২৪০
সুখের বিলাপ	..	...	১১
সুখের স্মৃতি	...	...	১২১
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়	...	...	৮
সেই শান্তিভবন	...	...	২৪২
সে জন কে সখী	...	...	২৪৬
সে যখন বিদায় নিয়ে গেল	...	...	১১২
স্বপ্ন বাতুলের মতো জড়িয়ে অব্যুত শাখা	...	...	১৫৮
স্নেহময়ী	...	...	১৩৭
স্মৃতি-প্রতিমা	...	...	১৩১
শ্রোত	...	...	৯২
হলাহল	...	...	২০
হা কী দশা হল আমার	...	...	২১৫
হায় হায়, জীবনের তরুণ বেলায়	...	...	৩৯
হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসিমুখখানি	...	...	১৩৭
হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি	...	...	৬২
হৃদয়ের গীতিধ্বনি	...	...	১৩
হৃদয়ের সাথে	...	...	৩৭
হেদে গো নন্দরানী	...	...	১৬৯
হেরো ঐ বাড়িতেছে বেলা	...	...	১৪৪

